ইরানের সমকালীন ইতিহাস

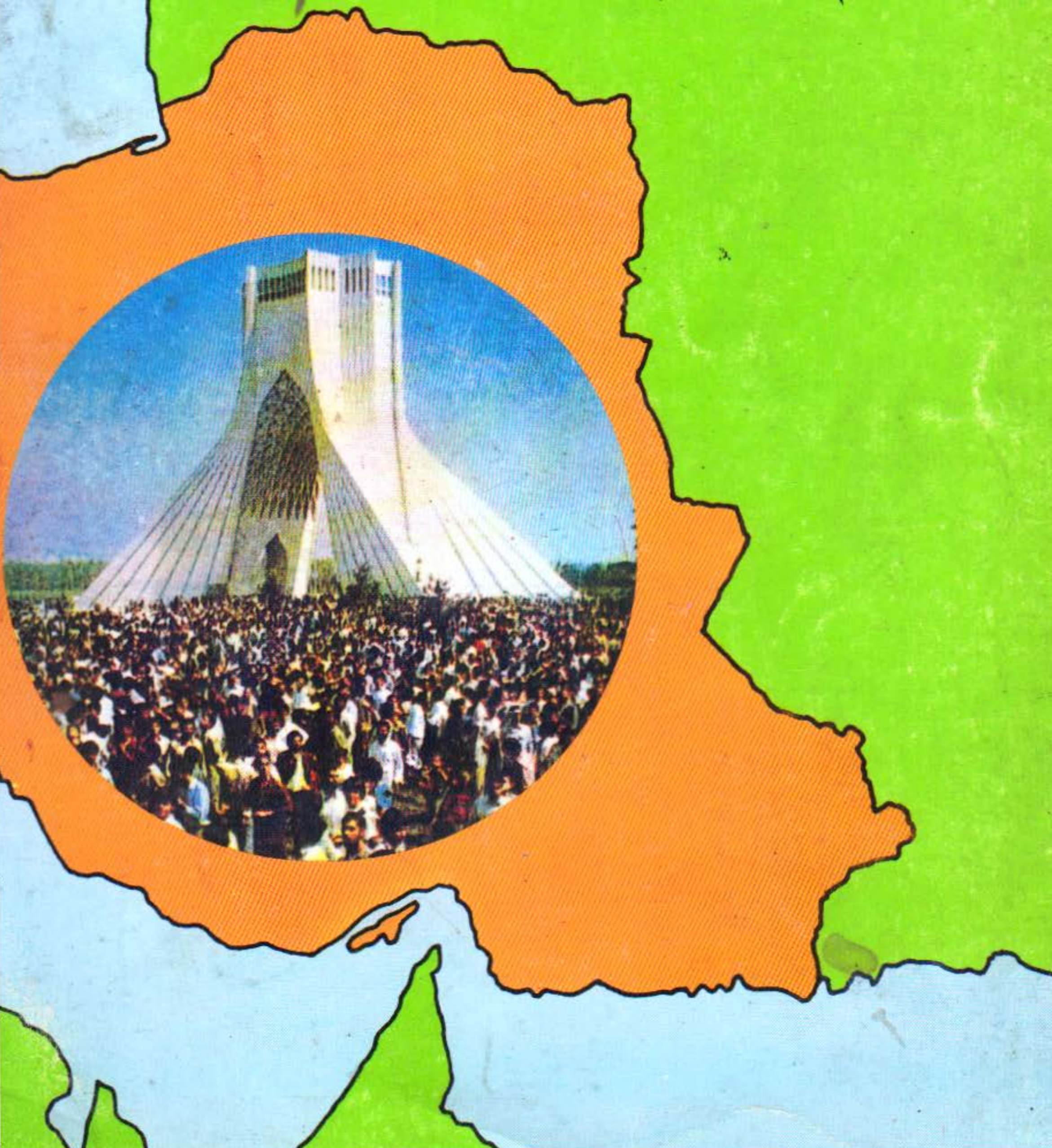

ইরানের সমকালীন ইতিহাস

রচনায় ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও
পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দফতরের ইতিহাস বিভাগ

অনুবাদ ঃ

নূর হোসেন মজিদী

তত্ত্বাবধানে ঃ

আলী আভারসাজী
কালচারাল কাউন্সেলর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইরানের সমকালীন ইতিহাস

রচনায় ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও
পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দফতরের ইতিহাস বিভাগ

অনুবাদ ঃ

নূর হোসেন মজিদী

তত্বাবধান ঃ

আলী আভারসাজী
কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ

শাবান, ১৪১৭/ পৌষ, ১৪০৩/ ডিসেম্বর, ১৯৯৬/ দেই, ১৩৭৫

প্রকাশক ঃ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ী নং ৫৪, সড়ক নং ৮/এ, ধানমন্ডী আ/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ

মুদ্রণে ঃ

চৌকস
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০ ।

মূল্য ঃ

১৫০ টাকা মাত্র

IRANER SAMAKALIN ITIHAS (CONTEMPORARY HISTORY OF IRAN) : Written by the History Group in the Department of Planning and Writing Text Books, Education Ministry, Government of the Islamic Republic of Iran, translated from the original Persian text into Bengali by Noor Hossain Majidi under the supervision of Ali Averseji, Cultrural Counsellor of the Islamic Republic of Iran, Dhaka and Published by the Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, Bangladesh, December 1996.

Price : Tk. 150.00 only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইতিহাস মানব জাতির অভিজ্ঞতার ভান্ডার। ইতিহাস অধ্যয়নের মানে প্রকৃতপক্ষে অতীতের অগণিত মানুষ ও সমাজের সাথেই পরিচিত হওয়া (যাদের প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ যুগে এ পৃথিবীতে বসবাস করে গেছেন।

বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রসম-রেওয়াজ, ধর্ম, জীবনাচার, প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা ও এর বিভিন্ন উপাদান, জীবনের বিচার বিশ্লেষণ, মানুষের গতি-প্রকৃতি, তাদের সকল দুর্বল দিক প্রভৃতির সাথে পরিচয় লাভ করার জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন ছাড়া উপায় নেই।

ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের দর্পণ। উন্নততর জীবন যাপন এবং জীবনের সত্যিকার পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে আমাদের অবশ্যই পূর্ববর্তীদের ভাগ্য সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। তাদের আচরণ, জীবনবোধ ও তার ফলাফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর বুকে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তারা দীর্ঘকাল মানুষের উপর শাসন কর্তৃত্ব চালিয়েছে। তারা জুলুম, বেইনসাফী, হত্যাকান্ড এবং আরো যেসব বিভীষিকার আশ্রয় নিয়েছে তা ইতিহাসে যথাস্থানে সংরক্ষিত আছে। অপরদিকে যারা মানব সমাজের খেদমত করেছেন, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রবর্তন করেছেন, জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার করিয়েছেন এবং মানুষকে হেফাযত করেছেন ও আলোর পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে; এসবের সাথে পরিচয় লাভ আমাদেরকে সঠিক জীবন ও সুন্দর ভবিষ্যতের পথ দেখাবে।

ইরানের ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে তিক্ত-মধুর হাজারো ঘটনায় আকীর্ণ। যার সাথে পরিচয় লাভ নিঃসন্দেহে খুবই শিক্ষনীয় হবে। কিন্তু একটি গ্রন্থে ইরানের পুরো ইতিহাস তুলে ধরা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই আমরা ইরানের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি অর্থাৎ বিগত শতাব্দীতে বৃটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপের সময়কাল থেকে নিয়ে জালিম ঘৃণ্য পাহলভী রাজবংশের পতন, ইসলামী বিপ্লবের বিজয় এবং ইসলামী বিপ্লবোত্তর দেড় দশকের ঘটনাবলী নিয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাসকে এ বইতে পর্যালোচনা করেছি।

www.pathagar.com

নিশ্চিতভাবেই ইরানের সমাজে বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ, হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ইরানের সর্বস্তরের জনগণের নিরেট ঐক্য ও সংহতি, অতঃপর বিপ্লবের বিজয়, বিজয়ের অব্যাবহিত পরেই দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বিদেশী আগ্রাসনের মোকাবিলায় পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধ, সকল অঙ্গনে এ বিপ্লবের সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রভৃতির কারণ ও উপাদনসমূহ এমন সব বিষয় যেগুলোর অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মহোদয়গণের কাছে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আশাকরি এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁদের সে লক্ষ্য অর্জিত হবে।

পরিশেষে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, এ গ্রন্থটি ইতিহাস বেত্তা একাডেমিক গবেষণা পরিষদের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। কাজেই তা পুরোপুরি গবেষণাধর্মী ও তথ্য নির্ভর। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বাংলাদেশস্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এজন্য গর্বিত যে, বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থটির অনুবাদ ও মুদ্রণের মাধ্যমে ইরানের সমকালীন ইতিহাসের সাথে পরিচয় ঘটাতে বাংলাভাষী ভাই ও বোনদেরকে সহায়তা করতে পারছে। পরিশেষে বইটি প্রকাশোপযোগী করার ক্ষেত্রে যেসব সহকর্মী মূল্যবান শ্রম দিয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আলী আভারসাজী
কালচারাল কাউন্সেলর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান
ঢাকা।
২০ শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১৭
প্রথম অধ্যায়	ঃ	**কাজার বংশের শাসনামলে ইরান**	২১
		আগা মোহাম্মদ খানের রাজত্ব	২১
		তিফলিসের গণহত্যা	২৩
		ফাৎহ্ আলী শাহ্র রাজত্ব	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	**উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক গতিধারা ও লক্ষ্য**	২৮
		উপনিবেশবাদের লক্ষ্য হাসিলের পথে সমস্যা	২৯
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	**ইরানের ওপর ফরাসী, বৃটিশ ও রুশ উপনিবেশবাদী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি**	৩১
		ইরানে ফ্রান্সের লক্ষ্য	৩২
		সম্পর্কের সূচনা	৩২
		ফিঙ্কেন্স্টেইন চুক্তি	৩৩
		তিল্সিৎ চুক্তি ও নেপোলিয়নের চুক্তিভঙ্গ	৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	**ইরানে বৃটেনের লক্ষ্য**	৩৫
		কাজার বংশের শাসনামলে ইরান-বৃটেন সম্পর্ক	৩৬
		বৃটেন ও তুর্কামান্চাই চুক্তি	৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	**ইরানে রাশিয়ার লক্ষ্য**	৪১
		রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন ও রুশ-ইরান যুদ্ধের সূচনা	৪২
		গোলেস্তানের সন্ধি	৪২
		দ্বিতীয় দফা রুশ-ইরান যুদ্ধ	৪৩
		গান্জাহ্ যুদ্ধ	৪৪
		তুর্কামান্চাই চুক্তির বিষয়বস্তু	৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	**মোহাম্মদ শাহ্ ও নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামল**	৪৯
		আফগানিস্তান অভিযান ও হেরাত অবরোধ	৪৯
		আর্‌যানাতুর্ রুমের চুক্তি	৫১
		উপনিবেশবাদীদের উদ্যোগে ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব	৫১
		নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামল	৫২
		আমীর কবীরের প্রধানমন্ত্রিত্ব ও তাঁর পদক্ষেপসমূহ	৫২
		প্যারিস চুক্তি ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতা	৫৪
		নাসিরুদ্দীন শাহের আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	৫৫
		সাইয়েদ জামালুদ্দীন আসাদ আবাদী (আফগানী)	৫৬

www.pathagar.com

বিষয়			পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	**ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লবের পটভূমি**	৬২
		নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের চৈন্তিক পটভূমি	৬২
		(ক) আভ্যন্তরীণ চৈন্তিক ভিত্তি	৬২
		(খ) বহিরাগত চৈন্তিক ভিত্তি	৬৩
		সাংবিধানিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি	৬৫
		(ক) দেশী উপাদানসমূহ	৬৫
		(খ) বৈদেশিক উপাদানসমূহ	৬৬
		১। ইরানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বিদেশীদের অর্থনৈতিক আধিপত্য	৬৭
		২। বৃটিশদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা	
		রয়টারকে প্রদত্ত সুবিধা	৬৭
		ট্যালবোট চুক্তি (তামাক ব্যবসার একচেটিয়া স্বার্থ)	৬৮
		৩। ইরানে রুশদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা	৭০
		উত্তর ইরানে মৎস্য আহরণ সুবিধা	৭০
		ইরানে কাজ্জাক বাহিনী গঠন	৭১
		রাশিয়ান ক্রেডিট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুবিধা	৭১
		ইরান-রাশিয়া শুল্ক চুক্তি	৭১
		বিদেশ থেকে গৃহীত ঋণ	৭২
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	**স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম ও সাংবিধানিক বিপ্লব**	৭৫
		১। মাসিউনুযের ঘটনা	৭৬
		২। ব্যাংকের ঘটনা	৭৬
		৩। বণিকদের প্রহার ও বাজার ধর্মঘট	৭৭
		ছোট হিজরত	৭৭
		বড় হিজরত	৭৯
		বড় হিজরতের পরে তেহরানের অবস্থা	৮০
		সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ও হিজরতকারীদের নতুন দাবী	৮০
		শাহের ফরমান জারী ও আলেমদের তেহরান প্রত্যাবর্তন	৮১
		সংবিধান প্রণয়ন	৮১
		ইরানের প্রথম সংবিধান	৮২
নবম অধ্যায়	ঃ	**মোহাম্মদ আলী শাহের স্বৈরাচারী শাসনামল**	৮৪
		সাংবিধানিকতা ও সংবিধানপন্থীদের প্রতি শাহের উপেক্ষা	৮৫
		আমিনুস্ সুলতানের প্রধানমন্ত্রিত্ব ও তাঁর হত্যাকাণ্ড	৮৫
		মজলিস কামানের গোলাবর্ষণ ও স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৮৬
		স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে গণঅভ্যুত্থান	৮৭

www.pathagar.com

বিষয় — পৃষ্ঠা

১। তাব্রীযের অভ্যুত্থান ৮৭
২। গীলানের গণঅভ্যুত্থান ৮৮
৩। বাখ্তিয়ারীদের অভ্যুত্থান ৮৯
তেহ্রান বিজয় ঃ রুশ-বৃটিশ চক্রান্ত ৮৯
তেহ্রান বিজয় ও মোহাম্মদ আলী শাহের পতন ৯০
আলেম সমাজ ও সাংবিধানিক বিপ্লব ৯১
তেহ্রান বিজয় ও শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী ৯২

দশম অধ্যায় ঃ **সাংবিধানিক শাসনামল** ৯৮
মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর থেকে রেযা খানের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের অবস্থা ৯৮
মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর রাশিয়া ও বৃটেনের তৎপরতা ৯৮
নতুন শাসকগোষ্ঠীর তৎপরতার ওপর এক নজর ৯৯
১৯০৭-এর রুশ-বৃটিশ চুক্তি প্রসঙ্গ ৯৯
আহ্মাদ শাহের রাজত্ব ও আয্দুল্ মুল্কের প্রতিনিধিত্ব ১০০
রাজনৈতিক দল গঠন ১০০
ইরানের প্রতি রাশিয়ার চরমপত্র ১০১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১০২
ওসুকুদ্দাওলাহ্র মন্ত্রিসভা ১০৪
শেখ খিয়াবনীর অভ্যুত্থান ১০৪

একাদশ অধ্যায় ঃ **সাংবিধানিকতার পথচ্যুতির কারণ** ১০৮
উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র ১০৮
দেশী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা ১১০
আলেম সমাজের কোণঠাসা অবস্থা ১১০
গণঅসন্তোষের বিস্তার ১১১

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ **রেযা খানের ক্ষমতা দখল ও ইরানে পূর্ণাঙ্গ বৃটিশ আধিপত্যের যুগ** ১১৩
ক্যু-দেতা ঃ মূল লক্ষ্যে পৌছার প্রস্তুতি ১১৫
কালো ক্যু-দেতা ১১৬
কালো মন্ত্রিসভার পতন ১১৭
কাওয়ামুস সাল্তানাহ্র প্রধানমন্ত্রিত্ব ১১৮
কর্নেল তাকী খান পাসিয়ানের অভ্যুত্থান ১১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ **মীর্যা কুচাক খান জাঙ্গালীর অভ্যুত্থান** ১২২
রাশিয়া ওবৃটেন এবং জঙ্গল আন্দোলন ১২৩
প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা ১২৪
হেয্বে এদালাতের লাল ক্যু-দেতা ১২৪

Cultural ... of Iran

বিষয়			পৃষ্ঠা
		জাঙ্গালী আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা	১২৫
		আন্দোলনের পরাজয় ও মীর্যা কুচাক খানের শাহাদাত	১২৬
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ	**রেযা খানের ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি ও কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্‌র মন্ত্রিসভার পতন**	১২৮
		মুশীরুদ্দাওলাহ্‌র মন্ত্রিসভা গঠন	১২৮
		কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী	১২৯
		মেস্তুফীউল্ মামালেকের প্রধানমন্ত্রিত্ব	১৩০
		শাহের অভিষেক বার্ষিকী অনুষ্ঠানে রেযা খানের শক্তির মহড়া	১৩১
		পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে মুশীরুদ্দাওলাহ্ ঃ রেযা খানের প্রতিক্রিয়া	১৩২
		রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব	১৩৩
		রেযা খানের প্রজাতন্ত্র	১৩৪
		আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস	১৩৪
		মোদার্‌রেস ও রেযা খানের প্রজাতন্ত্র	১৩৬
		মজলিসের প্রতি আহমাদ শাহের টেলিগ্রাম ও রেযা খানকে অনাস্থা দেয়ার আহ্বান	১৩৭
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ	**অক্টোবর বিপ্লবের পরে রুশদের ইরান-নীতি**	১৪১
		প্রাচ্যে সার্বজনীন বিপ্লব	১৪১
		ইরান ঃ ভারতে পৌঁছার সেতু	১৪১
		বৃটিশ-নীতির ফাঁদে রাশিয়া ঃ রেযা খানের প্রতি সমর্থন	১৪২
ষোড়শ অধ্যায়	ঃ	**কাজার বংশের শাসনাবসান ও রেযা খানের শাসনকাল**	১৪৪
		স্বৈরাচারী মসনদে রেযা খান এবং তাঁর শাসনামলের কতিপয় সংস্কার ও অন্যান্য পদক্ষেপ	১৪৬
		সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী গঠন	১৪৬
		দেশব্যাপী রেললাইন প্রতিষ্ঠা	১৪৬
		উপজাতীয়দের বসতিতে প্রতিষ্ঠা	১৪৬
		অভিন্ন পোশাক প্রবর্তন ও হিজাব উৎখাত	১৪৭
		১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের তেল চুক্তি	১৪৭
		রেযা খান ও তাঁর দ্বিমুখী ধর্ম নীতি	১৪৯
		আয়াতুল্লাহ্ মোদাররেসের শাহাদাৎ	১৫০
		সা'দ্ আবাদ চুক্তি	১৫১
		রেযা খানের জার্মানীমুখী নীতি গ্রহণ	১৫২
		মিত্রশক্তির ইরান দখল	১৫৩
		রেযা খানের সশস্ত্র বাহিনী বনাম মিত্রবাহিনী	১৫৩
		রেযা খানের পদত্যাগ ও মোহাম্মদ রেযার মসনদে আরোহণ	১৫৪
		রেযা খানের স্বৈরতন্ত্র ঃ উদ্ভবের মূল কারণ	১৫৪

www.pathagar.com

বিষয়			পৃষ্ঠা
সপ্তদশ অধ্যায়	ঃ	**মিত্রবাহিনীর দখলের পর '৫৩-এর ক্যু-দেতা পর্যন্ত ইরানের অবস্থা**	১৫৯
		১। গণভিত্তিক নেতৃত্বের অভাব	১৫৯
		২। ফোরুগীর ধোঁকা-প্রতারণা	১৬০
		উত্তর ইরানের তেল উত্তোলন সুবিধা	১৬০
		বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার আবেদন এবং রাশিয়া ও বৃটেনের ভিন্ন ভিন্ন নীতি	১৬২
		স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র	১৬২
		কাওয়ামুস সালতানাহ্‌র প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং সোভিয়েত বাহিনীর ইরান ত্যাগ	১৬৩
		ইরানে মার্কিন প্রভাবের ক্রমবিস্তার	১৬৩
		ইরানে মার্কিন প্রভাব সীমিতকরণে বৃটিশ প্রচেষ্টা	১৬৪
		গেস্‌-গোলশয়িয়ান চুক্তি	১৬৫
		দ্বীনী ও জাতীয় শক্তির পারস্পরিক সহযোগিতা	১৬৬
		তেলশিল্প জাতীয়করণের সংগ্রাম	১৬৭
		তেলশিল্প জাতীয়করণরোধে রায্‌ম্‌ আরা ও বৃটিশ সরকারের প্রচেষ্টা	১৬৮
		ফেদাইয়ানে ইসলাম ঃ রায্‌ম্‌ আরার বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড	১৬৮
		জনগণের বিজয় ও তেলশিল্পের জাতীয়করণ	১৭০
		প্রধানমন্ত্রী পদে মোসাদ্দেক	১৭০
		তিরিশে তীরের গণঅভ্যুত্থান	১৭১
অষ্টাদশ অধ্যায়	ঃ	**রেযা খানের পতন পরবর্তী ইরানে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ধারা**	১৭৫
		ধর্মীয় আন্দোলন	১৭৫
		জাতীয় আন্দোলন	১৭৫
		কম্যুনিস্ট আন্দোলন	১৭৫
		ধর্মীয় ও জাতীয় শক্তির ঐক্য এবং তেলশিল্প জাতীয়করণের আন্দোলন	১৭৮
		বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়	১৭৯
		আন্দোলনে মতানৈক্য	১৮০
		১৯৫৩-র ক্যু-দেতা	১৮২
		জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন	১৮৪
উনবিংশ অধ্যায়	ঃ	**ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা**	১৮৬
		সমস্যার সমাধান ঃ যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশিত সংস্কার	১৮৭
		ইরানে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশিত সংস্কার	১৮৭
		প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল এবং ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতিরোধ	১৮৮
		ইমামের আরো সতর্ক প্রতিরোধ	১৯০

www.pathagar.com

বিষয়			পৃষ্ঠা
বিংশ অধ্যায়	ঃ	**শাহের ছয়দফা সংস্কার কর্মসূচী এবং আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা**	১৯৪
		কোমে মারজা'গণের বৈঠকে ইমাম খোমেনীর (রঃ) ভাষণ	১৯৫
		গণভোট বয়কট ও তেহরানের গণঅভ্যুত্থান	১৯৬
		শাহের কোম সফর	১৯৭
		তথাকথিত গণভোট	১৯৮
		১৯৬৩-র রমযান কর্মসূচী	১৯৮
		নতুন বছরের প্রথম দিনে সংগ্রাম অব্যাহত এবং মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় হামলার প্রস্তুতি	১৯৯
		শাহী জল্লাদদের কোমে প্রবেশ	২০০
		শাহী এজেন্টদের মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় হামলা	২০১
		ইমামের পক্ষ থেকে তাকিয়াহ্ হারামের ফতোয়া ও সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব	২০২
		আলেমদেরকে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রেরণ	২০৩
একবিংশ অধ্যায়	ঃ	**চরম পর্যায়ে আন্দোলন**	২০৮
		ফায়যিয়ার শহীদগণের চেহ্লাম	২০৮
		মুহররম মাসে বক্তৃতার ওপর শাহী সরকারের পক্ষ থেকে শর্তারোপ	২০৮
		তেহরানে আশুরার দিনে ব্যাপক বিক্ষোভ	২০৯
		আশুরার দিনে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঐতিহাসিক ভাষণ	২০৯
		ইমামকে গ্রেফতার ও ১৫ই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি	২১২
		কোমের গণঅভ্যুত্থান	২১৩
		পনরই খোর্দাদে তেহরানে রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থান	২১৪
		ভারামীনের কাফন পরিধানকারীদের হত্যা	২১৫
		গণঅভ্যুত্থানকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র	২১৬
		ব্যাপক ধরপাকড়	২১৬
		পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থান বনাম বিদেশী প্রচার মাধ্যম	২১৬
দ্বাবিংশ অধ্যায়	ঃ	**ইসলামী বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব**	২২০
		পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২২১
		পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব	২২৪
		পনরই খোর্দাদ থেকে তেরই অবান	২২৬
		ক্যাপিচুলেশন এবং ইমামের বিরোধিতা ও নির্বাসন	২২৮
		১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সাল পর্যন্ত ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	২২৯
		ক ঃ সরকারের তৎপরতা	২৩০
		১ ঃ রাজনৈতিক তৎপরতা	২৩০
		মানুছুরের মন্ত্রিসভা	২৩১
		হোভায়দার সরকার গঠন	২৩১

www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

		সংবিধান পরিবর্তন ও ফারাহ্‌কে নায়েবাহ্‌	
		সাল্‌তানা মনোনয়ন	২৩২
		উপর্যুপরি উৎসব	২৩২
		হেয্‌বে রাস্তাখীয গঠন	২৩৩
	২ ঃ	পুলিশী ও নিরাপত্তা বিভাগীয় তৎপরতা	২৩৪
	৩ ঃ	সরকারের সাংস্কৃতিক তৎপরতা	২৩৫
	খ ঃ	জনগণের সংগ্রাম	২৩৭
	১ ঃ	রাজনৈতিক সংগ্রাম	২৩৭
	২ ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম	২৩৮
		ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশন	২৩৯
		হেয্‌বে মেলালে ইসলামী	২৩৯
		মুজাহিদীনে খাল্‌ক	
		অন্যান্য গ্রুপ	২৪১
		ফেদায়িরয়ানে খাল্‌ক্‌	২৪১
	৩ ঃ	সাংস্কৃতিক সংগ্রাম	২৪২
		জনগণের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বিভিন্ন দিক	২৪৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ঃ	আন্দোলন বিপ্লবে রূপান্তরিত		২৪৯
	১৩৫৬ ফার্সী সালে ইরানের সাধারণ অবস্থা		২৪৯
	উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ		২৫০
	মোস্তাফা খোমেনীর শাহাদাত		২৫১
	আহমদ রাশীদী মোৎলাকের প্রবন্ধ		২৫৩
	১৯শে দেই-এর কোমের অভ্যুত্থান		২৫৩
	তাব্‌রীযের গণঅভ্যুত্থান		২৫৪
	তাব্‌রীযের শহীদগণের চেহ্‌লাম		২৫৫
	১৩৫৭ ঃ ভাগ্য নির্ধারণের বছর		২৫৫
	১৩৫৭ ফার্সী সালের রমযান মাস		২৫৮
	১৭ই শাহ্‌রীভার		২৫৯
চতুর্বিংশ অধ্যায় ঃ	ইসলামী বিপ্লব		২৬৩
	ইমামের নাজাফ থেকে প্যারিস গমন		২৬৩
	ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী		২৬৫
	একের পর এক ধর্মঘট		২৬৬
	১৩ই অবান ও শরীফ ইমামীর পতন		২৬৬
	আয্‌হারীর মন্ত্রিসভা		২৬৭
	তলোয়ারের ওপর রুধিরের বিজয়		২৬৮
	পহেলা মুহাররামের গৌরবময় ঘটনা		২৬৭
	তাসূয়া ও আশুরার মিছিল		২৭০

www.pathagar.com

বিষয়		পৃষ্ঠা
	শাহ্পুর বাখ্তিয়ারের সরকার	২৭২
	বিপ্লব এবং রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ	২৭৩
	বিপ্লব এবং কারামুক্ত গেরিলা গোষ্ঠীসমূহ	২৭৪
	বিপ্লবী পরিষদ গঠনের ঘোষণা	২৭৬
	শাহের পলায়ন	২৭৬
	ইমামের প্রত্যাবর্তন	২৭৭
	অস্থায়ী সরকার গঠন	২৮০
	বিমান বাহিনীর ঘটনা ঃ বিপ্লবের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ	২৮১
	সামরিক শাসন ঘোষণা	২৮৪
	বিপ্লবের বিজয়	২৮৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ	**ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরান**	২৮৭
	এক ঃ ইসলামী বিপ্লবের বিজয় থেকে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগকাল	২৮৭
		২৯১
	দুই ঃ অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধশুরুর পূর্বকাল	২৯১
	তাবাসে আমেরিকার ব্যর্থতা	২৯৩
	ক্যু-দেতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ	২৯৩
	রাজায়ীর প্রধানমন্ত্রিত্ব	২৯৪
	তিন ঃ যুদ্ধের সূচনা থেকে আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ পর্যন্ত সময় কাল	২৯৫
	আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি	২৯৭
	চার ঃ আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ থেকে ইমামের ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়কাল	৩০১
	ক ঃ আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী	৩০১
	হযরত ইমামের ইন্তেকাল	৩০৪
	খ ঃ চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ	৩০৫
	পাঁচ ঃ আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নেতৃত্বের যুগ	৩১০

www.pathagar.com

ভূমিকা

এ গ্রন্থে সমকালীন ইরান ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী স্থান দেয়া হয়েছে। এ সময়কালে ইরান বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিবর্তনের অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছে। এসব ঘটনা ও বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে ইরানে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের হামলা, পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইরানীদের সংগ্রাম, সাংবিধানিক বিপ্লব, কাজার বংশের নিকট থেকে পাহ্‌লভী বংশের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইরানের ওপর তার প্রভাব, তেল জাতীয়করণ আন্দোলন, ২৮শে মোর্‌দাদ (১৯শে আগস্ট ১৯৫৩)-র ক্যু-দেতা, ইরানের ওপর ক্রমান্বয়ে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, ১৫ই খোর্‌দাদ (৫ই জুন ১৯৬৩)-র গণঅভ্যুত্থান এবং ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ও শাহানশাহী শাসন ব্যবস্থার পতন।

আপনারা এ গ্রন্থে কাজার রাজবংশের শাসন ক্ষমতায় আরোহণকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইরানের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

ইরানে কাজার রাজবংশের শাসনের সূচনাকালে ইউরোপে ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এসব পরিবর্তনের কারণেই ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে উপর্যুপরি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সংঘটিত হয় এবং এর ফলে দুর্বল জাতিসমূহকে উপনিবেশে পরিণত করণের প্রবণতা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কাজার বাদশাহ্‌গণ অনেকটা হঠাৎ করেই ইউরোপের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমনকি একজন সাধারণ দায়িত্বশীল কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টিও ছিল না। তাঁরা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী এবং উপনিবেশবাদী শক্তিবর্গের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার সুস্পষ্ট পর্যালোচনাপূর্বক ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতাদের মোকাবিলায় যথার্থ নীতি-অবস্থান গ্রহণে সক্ষম হননি। অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌দের ন্যায় কাজার বংশীয় বাদশাহগণের নিকটে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বের অধিকারী ছিল তা হচ্ছে তাদের তখত ও তাজের হেফাজত এবং মাহরুম জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে আরাম-আয়েশ-ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকা ও নিজেদের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়ো তোলা। ইউরোপ যখন উত্তরোত্তর উন্নতি-অগ্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছিল তখন তাঁরা ভ্রান্তনীতি গ্রহণের মাধ্যমে ইরানকে পুরোপুরি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিয়ে আসে এবং

www.pathagar.com

ইরানের বুকে বিজাতীয়দের দীর্ঘস্থায়ী প্রত্যাশা ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন। এই বাদশাহ্গণ শুধু যে, উপনিবেশবাদী নীতির প্রকৃতি অনুধাবনে সক্ষম হননি তা নয়, বরং তাঁরা উপনিবেশবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। অনেক সময় তাঁরা বিজাতীয়দের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

কাজার বংশের শাসনামলের শেষ দিকে উপর্যুপরি সংঘটিত কতক ঘটনা এবং আরো বিভিন্ন কারণে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং শাহ্ শাসিত ইরানে স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এসব আন্দোলন বিজয়ী হবার ও বিপ্লবের বীজের সদ্য অঙ্কুরোদগমের প্রায় পরপরই এর নেতৃত্ব সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদী, বিজাতীয় শক্তির পূজারী ও আত্মবিক্রিত লোকদের হাতে পড়ে। ফলে যে বিপ্লবের জন্য ইরানের মুসলিম জনগণ প্রচুর রক্ত বিসর্জন দিয়েছিল তার মধ্য থেকেই রেযা খানী স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হয় এবং নতুন রূপে ও নতুন পোশাকে স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদ নতুন জীবন লাভ করে। এভাবে তারা ইরানের ওপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

আমরা যদি ইতিহাসকে আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য শিক্ষার দর্পণ হিসেবে গণ্য করি এবং স্বীকার করি যে, অতীতের ঘটনাবলীর আলোকে সঠিক পথ চিহ্নিত করতে সক্ষম হব, তাহলে বলতে হবে, আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে ইরানের সমকালীন ইতিহাস সহায়ক প্রমাণিত হবে। এ যুগের ঘটনাবলীর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বর্তমান পরাশক্তিবর্গের পূর্বসূরী তৎকালীন ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে সঠিকভাবে চিনতে পারব ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে পারব। বিজাতীয় আধিপত্যবাদীরা ও তাদের দেশীয় সেবাদাসরা ইরানী জনগণের সাথে কি ধরনের দুর্ব্যবহার করেছিল তা-ও আমরা জানতে পারব।

এ ব্যাপারে ধারণা লাভ করতে পারলে তার আলোকে আমরা বিজাতীয়দের সাথে আমাদের আচরণ কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হব। এছাড়া স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী বিভিন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তিটি অধিকতর আন্তরিক, নিষ্ঠাবান ও আপোষহীন তা-ও জানতে পারব। তেমনি জানতে পারব এ ধরনের সংগ্রামে এইসব সামাজিক শক্তির মধ্যে কোন শক্তিটির পথনির্দেশ ও পরিচালনার ওপর প্রত্যাশা সহকারে নির্ভর করা উচিত এবং কোন্ ধরনের চিন্তা-চেতনা

www.pathagar.com

আকিদা-বিশ্বাস এ সংগ্রামকে বিজয়ী করতে সক্ষম তা-ও জানতে পারব। তেমনি আমরা বুঝতে পারব বিজাতীয়রা তাদের উপনিবেশবাদী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্যে কি কি পথ অবলম্বন করেছে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করেছে, আভ্যন্তরীণ উপাদান হিসেবে কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির ওপর নির্ভর করেছে, কাদেরকে ভয় করছে, সমাজে কোন্ কোন্ ধরনের চিন্তা-চেতনা ও আকিদা বিশ্বাস প্রবর্তনের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং কোন্ কোন্ ধরনের চিন্তা-চেতনাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সবশেষে, ইরানের সমকালীন ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বিপ্লবের জন্য সৃষ্ট গুরুতর সমস্যাবলী এবং কিভাবে বিপ্লব বিরোধী শক্তি বিপ্লবী জনগণের আন্তরিক ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সাধনার ফসলকে আত্মসাত করার চেষ্টা করেছিল তা জানতে পারব।

ঘটনাবলীর সাথে অধিকতর উত্তমভাবে পরিচিত হওয়া এবং ইরানের আভ্যন্তরীণ ও বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক ও সুদৃঢ় যোগসূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে আমরা প্রথমে কাজার বংশ কিভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছিল তার ওপরে আলোকপাত করব। এরপর উপনিবেশবাদীদের উপনিবেশিক নীতিসমূহ এবং আধিপত্য কবলিত জাতিসমূহের ওপর তাদের নীতিসমূহ কার্যকর করার প্রক্রিয়ার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। এরপর ইরানে তৎকালীন ইউরোপীয় উনিবেশবাদী শক্তিবর্গের প্রত্যেকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরে সকালীন ইতিহাসকে ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

"ইরানে যদি শান্তিতে রাজত্ব করতে চাও তাহলে জনগণকে ক্ষুধার্ত ও নিরক্ষর রাখার চেষ্টা করো।"

- ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র প্রতি আগা মোহাম্মদ খানের উপদেশ

কাজার[১] বংশের শাসনামলে ইরান

ইল্ কাজার[২] ছিল তুর্কী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি যাযাবর গোত্র। ইরানে মোগল শাসন চলাকালে এ গোত্র ইরানে চলে আসে এবং আর্মেনিয়া[৩] এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। শাহ্ ইসমাইল সাফাভী[৪] কর্তৃক ইরানে সাফাভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন যাযাবর গোত্র তাঁকে সহায়তা করে; ইল্ কাজার ছিল তাদের অন্যতম। পরবর্তীকালে তারা কিজিল্‌বাশ্‌দের[৫] দলে শামিল হয়। ১২১০ হিজরীতে[৬] তেহরানে আগা মোহাম্মদ খানের[৭] অভিষেকের মধ্য দিয়ে ইরানে কাজার বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কাজার বংশ থেকে পরম্পরায় সাত জন শাহ্ ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আগা মোহাম্মদ খান এবং সর্বশেষ আহ্‌মাদ শাহ্।[৮]

আগা মোহাম্মদ খানের রাজত্ব

আগা মোহাম্মদ খান শীরাযে বসবাস করতেন। তাঁর পিতা নিহত হবার পর করীম খান যান্দের[৯] পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। করীম খান যান্দ্ মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে আগা মোহাম্মদ খান সুকৌশলে শীরায থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। শীরায থেকে বেরিয়ে কয়েকজন কাজারকে সাথে নিয়ে তিনি তেহ্‌রান রওয়ানা হন। তিনি প্রথমে ইল্ কাজার গোত্রের লোকদের বাসস্থান আস্‌তারাবাদের[১০] দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু শীঘ্রই জানতে পারেন যে, তাঁর ভাইদের মধ্যে কয়েকজন ইল্ আশাকে বশ্[১১]-এর ওপর তাঁর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে তাঁর উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মোটেই প্রস্তুত নন। আগা মোহাম্মদ খানের জন্য এটা মেনে নেয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন, বরং অসম্ভব। তাই তিনি তাঁর এক ভাই জাফর কুলী খান[১২]-কে তাঁর বিরুদ্ধাচারী ভ্রাতাদের দমন করতে প্রেরণ করেন।

বিরোধী ভ্রাতাদের দমনে সফল হবার পর আগা মোহাম্মদ খান মাযেন্দারানে[১৩] প্রবেশ করেন। অল্পকাল পরে গীলান্-কেও[১৪] তিনি তাঁর আনুগত্যে বাধ্য করেন। এরূপ সাফল্য সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত ইরানের বিশাল এলাকা আগা মোহাম্মদ খানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ইরানের প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তি ক্ষমতা ও রাজত্বের দাবী করছিলেন। আগা মোহাম্মদ খান কাজার তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। তাঁর সর্বাধিক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লুৎফ্ আলী খান যান্দ্।[১৫] লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ ছিলেন করীম খান যান্দের পুত্র এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে শীরাযে রাজত্ব করছিলেন। হিজরী ১২০৩ সালে[১৬] আগা মোহাম্মদ খান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যান্দ্ বংশের

www.pathagar.com

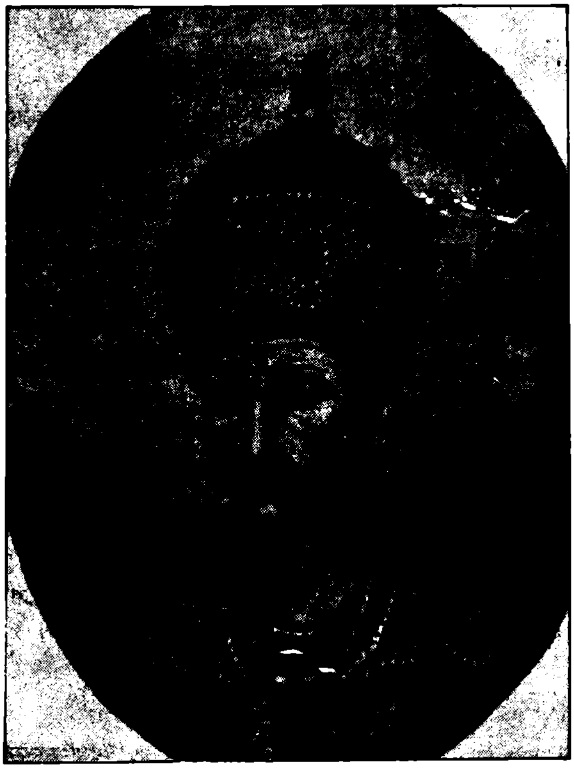

আগা মোহাম্মদ খান কাজার্

রাজধানী শীরায অবরোধ করেন। কিন্তু লুৎফ্ আলী খান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে আগা মোহাম্মাদ খান কাজারের পক্ষে শীরায দখল করা সম্ভব হয়নি। অগত্যা তিনি তেহরানে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৭]

পরবর্তী বছর লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ আরো বেশী সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যে শীরায থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দাশ্‌তেস্তানের[১৮] দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় হাজী ইবরাহীম কালান্তর[১৯]সহ শীরাযের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ লুৎফ্ আলী খান যান্দের শীরায ত্যাগের খবর আগা মোহাম্মদ খান কাজারের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে শীরায দখলের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

শীরাযের ওপর আগা মোহাম্মদ খানের হামলার আগেই লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ দাশ্‌তেস্তান থেকে রাজধানী শীরাযে ফিরে আসেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও এবং তাঁরা বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাঁকে শহরে প্রবেশে বাধাদান করলেও তিনি শীরাযে প্রবেশে সক্ষম হন। তবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আগা মোহাম্মদ খান কাজারের শীরায আক্রমণের অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর ওপরে হামলা করবেন। কিন্তু তিনি শীরায থেকে বেরিয়ে যাবার পর পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। হাজী ইবরাহীম কালান্তর বুঝতে পারেন যে, লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ আপাততঃ তাঁকে কিছু না বললেও তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং আগা মোহাম্মদ খান কাজারকে তাঁর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানোর খবর তিনি জেনে ফেলেছেন। তাই ভবিষ্যত বিপদের কথা ভেবে তিনি পরিস্থিতি পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে হাজী ইবরাহীম কালান্তরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তিনি সে প্রভাব কাজে লাগিয়ে লুৎফ্ আলী খানের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা করেন। সৈন্যরা সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ আগা মোহাম্মদ খান কাজারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটে যান।

সেনাবিদ্রোহের কারণে লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ রাজধানী শীরাযের দিকে পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু হাজী ইবরাহীম কালান্তর শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেন। ফলে লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ শহরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। লুৎফ্ আলী খান কিছুদিন হাজী ইবরাহীম কালান্তর ও আগা মোহাম্মদ খান কাজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু তাতে তেমন সুবিধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কেরমানে[২০] চলে যান

www.pathagar.com

এবং শহরটি দখল করেন। কেরমান দখলের পর তিনি সেখানেই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

লুৎফ্ আলী খান কের্মানে চলে যাবার অব্যবহিত পরেই আগা মোহাম্মদ খান কাজার কের্মানের দিকে ছুটে যান এবং শহরটি অবরোধ করেন। দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত শহরের প্রবেশদ্বারের রক্ষকদের মধ্য থেকে একজন লুৎফ্ আলী খানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আগা মোহাম্মদ খান কাজারের সৈন্যদের প্রবেশের জন্য শহরের একটি প্রবেশদ্বার খুলে দেয়।

আগা মোহাম্মদ খান কাজার কের্মান দখল করার পর সেখানে গণহত্যার ফরমান জারী করেন। তিনি সৈন্যদের হুকুম দেন, কের্মান-বাসীদের বিশ হাজার জোড়া চোখ বের করে এনে তাঁর পায়ের সামনে জমা করার জন্য। লুৎফ্ আলী খান যান্দ্ বন্দী হলে আগা মোহাম্মদ খান কাজার নিজ হাতে তাঁর চোখ অক্ষিকোটর থেকে বের করে আনেন এবং তাঁকে অন্ধ অবস্থায় তেহরানে পাঠিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

তিফ্লিসের[২১] গণহত্যা

সমগ্র সাফাভী ও আফ্শারিয়া[২২] যুগে কাফ্কাজ[২৩] এলাকার "শের্ভন্[২৪] ও গোর্জেস্তান[২৫] প্রদেশ" ইরানের অংশ ছিল এবং ইরানের শাহের আনুগত্য করত। যান্দ্ বংশের শাসনামলে ইরানে কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটলে এ প্রদেশটি প্রথমে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের[২৬] শাসনামলে প্রদেশটি রাশিয়ার ছত্রছায়ায় চলে যায়। আগা মোহাম্মদ খান দক্ষিণ ইরানের শাসনক্ষমতার দাবীদার লুৎফ্ আলী খানের পতন ঘটানোর পর দেশের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য গোর্জেস্তান অভিমুখে রওনা হন। এ সময় গোর্জেস্তানের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় হেরাক্লিয়াস। তিনি রাশিয়ার সাথে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন। তিনি হিজরী ১২০৭ সালে[২৭] গান্জা[২৮] দখল করেন। আগা মোহাম্মদ খান কাজার হেরাক্লিয়াসের নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পাঠান যে, তাঁকে আজারবাইজান, ইরাভন[২৯] শাক্কী[৩০] ও শের্ভনের শাসনক্ষমতা এ শর্তে দেয়া যেতে পারে যে, তাঁকে রুশ ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং অতীতের ন্যায়ই গোর্জেস্তান রাজ্যকে ইরানের করদরাজ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু হেরাক্লিয়াস এ প্রস্তাবে রাজী হননি।

আগা মোহাম্মদ খান কাজার হিজরী ১২০৯ সালে[৩১] আজারবাইজানে অভিযান চালান এবং শূশী অবরোধ করেন। কিন্তু শূশী অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি অবরোধ তুলে নেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তিফ্লিস অভিমুখে যাত্রা করেন। যেহেতু হেরাক্লিয়াস অসতর্ক ছিলেন সেহেতু কোনরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন এবং অগত্যা তিফ্লিস থেকে পালিয়ে যান। এভাবে হিজরী ১২১০ সালে[৩২] আগা মোহাম্মদ খান কাজার তিফ্লিস দখল করেন। তিফ্লিস দখল করার পর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে পাইকারী লুটতরাজ ও গণহত্যার নির্দেশ দেন। অগা মোহাম্মাদ খান কাজারের পাশবিকতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তাঁর সৈন্যরা শুধু হত্যা ও লুণ্ঠনই নয়, বরং অনেক মানুষের ইজ্জত-আব্রুর ওপরে হামলা চালাতেও দ্বিধা করেনি।

আগা মোহাম্মদ খান কাজার কাফ্কাজ্ এলাকা থেকে ফিরে এলে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সেনাবাহিনী ঐ এলাকায় হামলা চালায়। তারা দার্বান্দ্,[৩৩] 'বাকু[৩৪] ও শাক্কী', কারাবাগ[৩৫] এবং গান্জা দখল করে নেয়। কিন্তু ঠিক এ সময়ই দ্বিতীয় ক্যাথারিন মারা যান এবং তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রুশ বাহিনীকে কাফ্কাজ্ থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন।

এদিকে আগা মোহাম্মদ খান কাজার কাফ্কাজ্ অভিযান থেকে ফিরে এসে তেহরান রওয়ানা হন।

www.pathagar.com

এখানে এসে তিনি হিজরী ১২১০ সালে[৩৬] আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসেন এবং "ইরানের বাদশাহ্" উপাধি ধারণ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে বাদশাহ্ হিসেবে ঘোষণার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় কাফ্‌কাজে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু হিজরী ১২১১ সালে[৩৭] কাফকাজের শূশী[৩৮] শহরে থাকাকালে নিহত হন।

ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র রাজত্ব

ফাৎহ্ আলী শাহ্ কাজার্

আগা মোহাম্মদ খান কাজার নিহত হবার পর তাঁর সেনাপতিগণের প্রত্যেকেই ইরানের দিকে রওয়ানা হন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঐ সময় হোসেন কুলী খান জাহান্‌সূজের[৩৯] পুত্র বাবাখান[৪০] শীরাযে অবস্থান করছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তেহরান অভিমুখে রওনা হন এবং ১২১২ হিজরীর ২০শে সফর[৪১] তারিখে হাজী ইবরাহীম খান কালান্তর (এতেমাদুদ্দাওলাহ্)[৪২]কে সাথে নিয়ে তেহরানে উপনীত হন ও শাহী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফাৎহ্ আলী শাহ্[৪৩] উপাধি ধারণ করেন। যেহেতু এতেমাদুদ্দাওলা বাবাখানকে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনেক চেষ্টাসাধনা করেছিলেন সেহেতু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই বাবাখান তাঁকে 'ছাদারাতে শাহ্'[৪৪] তথা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র প্রথম ও প্রধান সমস্যা ছিল দেশে স্থিতিশীলতা আনয়ন। ইরানের অভ্যন্তরে সিংহাসনের জন্য বেশ কয়েকজন দাবীদার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন; তাঁদের প্রত্যেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র বিরোধিতা করছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সাফাভী বংশের অবশিষ্ট লোকেরা, জমিদারগণ এবং ইল্ কাজার গোত্রের কতক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

www.pathagar.com

ফাৎহ্ আলী শাহ্ তেহরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্রক্ষমতার দাবীদার বেশীর ভাগ লোককেই দমন এবং নিজ ক্ষমতার ভিত্‌কে মজবুত করেন। শাহের ক্ষমতা সুদৃঢ় হবার সাথে সাথে এতেমাদুদ্দাওলার ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে অধিকতর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা কাজার বংশীয় শাহের জন্য ভবিষ্যতে খারাপ পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারত। হাজী ইবরাহীম কালান্তর (এতেমাদুদ্দাওলাহ্) ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও সুক্ষ্মধী ব্যক্তি। এ কারণেই তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর যাবত যান্দ্ ও কাজার বংশের শাসকদের খেদমত করতে সক্ষম হন। এ কারণে এ আশঙ্কা বিরাজ করছিল যে, তাঁর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেলে তা কাজার রাজবংশের জন্যেও হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই শাহ্ তাঁর প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহে ভুগতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করেন। শাহ্ তাঁকে হত্যার পর তাঁর শূন্যস্থানে মীর্যা মোহাম্মাদ শাফী মাযেন্দারানীকে[৪৫] প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন।

ফাৎহ্ আলী শাহ্ হিজরী ১২৫০ সাল[৪৬] পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র দীর্ঘ রাজত্বকালে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক উপনিবেশবাদী প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করে। এ সময় তাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়ে ইরানের দরবারের দিকে। এর পরিণতিতে ইরানে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

টীকা ঃ

(১) قاجار — আধুনিক ফার্সী উচ্চারণ "গ্বজর্" (গ্ব+অ+জ্+অ+র্)। কারণ, আধুনিক ফার্সীতে ق এর উচ্চারণ غ এর ন্যায় এবং ا (আলেফ) যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণ অ—কারান্ত)। কিন্তু উচ্চারণের সহজসাধ্যতার স্বার্থে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমরা আরবী—ফার্সী শব্দের প্রচলিত নিয়মের বাংলা উচ্চারণ ব্যবহার করেছি। তবে অপ্রচলিত নামসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আধুনিক ফার্সী উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়েছে। —অনুবাদক

(২) ایل قاجار — "ইল্" বলতে "গোত্র" এবং "যাযাবর জনগোষ্ঠী" উভয়ই বুঝায়। (فرهنگ عمید)

(৩) ارمنستان — কাফ্‌কাজ্ (ককেশাস) পার্বত্য অঞ্চলের আর্মেনিয়া এলাকা (যা বর্তমানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র) ইতিহাসের সুদীর্ঘকালব্যাপী পারস্য ও ইরানী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। —অনুবাদক

(৪) شاه اسماعیل صفوی — ইরানে সাফাভী রাজবংশের রাজত্বকাল ছিল হিজরী ৯০৭ থেকে ১১৩৫ সাল (১৫০১ থেকে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত। শাহ্ ইসমাইলের পূর্বপুরুষ শেখ ছাফিউদ্দিন আর্দেবিলী (شیخ صفی الدین اردبلی)—এর নামানুসারে এ রাজবংশ 'সাফাভী বংশ হিসেবে' পরিচিত হয়। (فرهنگ عمید)

(৫) قزلباس — লালমাথা। শাহ্ ইসমাইল সাফাভীর সেনাবাহিনীর একটি অংশ। তারা লাল টুপি পরিধান করত বিধায় তাদেরকে কিজিলবাশ (ঘেযেল্‌বশ্) বলা হত। পরবর্তীকালে গোটা সাফাভী সেনাবাহিনীই এ নামে পরিচিত হয়ে উঠে। (فرهنگ عمید)

(৬) ১১৭৪ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ।

(৭) آقا محمد خان قاجار—অগা মোহাম্মাদ খান কাজার (শাসনকাল ১২১০—১২১১ হিজরী সাল)। آقا শব্দের মানে "জনাব", কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তা সম্মানার্থে নামের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৮) احمد شاه — সাংবিধানিক বিপ্লবের পর ১২ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীর পিতা রেযা খান তাঁর নিকট থেকে সিংহাসন কেড়ে নেন।

www.pathagar.com

(৯) کریم خان زند—যান্দ্ গোত্র ইরানের মালায়ের (ملایر)—এর অধিবাসী, নাদির শাহ্ (نادر شاه)—এর অন্যতম সেনাপতি করীম খান যান্দ্ নাদির শাহের মৃত্যুর পর যান্দ্ গোত্রের লোকদের নির্বাসন (খোরাসান) থেকে মালায়েরে ফিরিয়ে এনে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন (فرهنگ عمید) এবং শীরাযের শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন।

(১০) استرآباد—তেহরানের উত্তরে অবস্থিত। (المنجد)

(১১) ایل اشاقه باش—গোত্রের নাম।

(১২) جعفر قلی خان

(১৩) مازندران—কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী প্রদেশ।

(১৪) گیلان—মাজেন্দারানের পশ্চিমে অবস্থিত উত্তর ইরানের আরেকটি প্রদেশ। আরবী নাম 'জীলান্' (جیلان))

(১৫) لطف علی خان زند

(১৬) ফার্সী ১১৬৭ সাল মোতাবেক ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) تهران—ঐ সময় ইরান একাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বলাবাহুল্য যে, তেহরান তখন মাযেন্দারানের সাথে যুক্ত ছিল। আর শীরায (شیراز) ছিল যান্দ্ শাসিত দক্ষিণ ইরানের রাজধানী। —অনুবাদক

(১৮) دشتستان—দক্ষিণ ইরানের বুশেহ্র প্রদেশের অন্তর্গত একটি জিলা।

(১৯) حاج ابراهیم کلانتر—যান্দ্ ও কাজার বংশের রাজত্বকালে সরকারের খেদমতে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর শীর্ষনেতাকে কালান্তর বলা হত। (فرهنگ مید)

(২০) کرمان—বর্তমানে ইরানের কেরমান প্রদেশের রাজধানী।

(২১) تفلیس— বর্তমানে জর্জিয়ার রাজধানী।

(২২) افشاریه—আফ্শার্ (افشار) গোত্র তুর্কী বংশোদ্ভূত একটি গোত্র। এরা তৎকালীন ইরানের আজারবাইজান (آذربایجان), কায্ভীন (قزوین) ও কেরমানে বসবাস করত। ইতিহাসখ্যাত নাদির শাহ্ এ বংশের লোক ছিলেন। নাদির শাহ্ ও তাঁর উত্তরাধিকারী শাসকগণ আফ্শারিয়া বা আফ্শার্ রাজবংশ নামে পরিচিত। (فرهنگ عمید)

(২৩) قفقاز—ককেশাস অঞ্চল। বর্তমান আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং রুশ ফেডারেশনের দক্ষিণাঞ্চলীয় জাতিগত প্রজাতন্ত্র দাগেস্তান, চেচনিয়া, ইঙ্গুশ্তিয়া ও উত্তর ওশেশিয়া কাফকাজ পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এর পুরোটাই একসময় পারস্য ও পরবর্তীকালে ইরানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। —অনুবাদক

(২৪) شروان—দক্ষিণ কাফকাজের একটি অঞ্চল। (فرهنگ عمید)

(২৫) گرجستان— জর্জিয়া। ঐ সময় শের্ভন্ ও গোর্জেস্তান ইরানের একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হত।

(২৬) کاترین دوم—Chatherine the Second. আয়ুষ্কাল ১৭২৯ থেকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ। (المنجد)

(২৭) ফার্সী ১১৭১ সাল মোতাবেক ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ।

(২৮) گنجه—কবি নেযামী গান্জাভী (نظامی گنجوی) এখানকার লোক ছিলেন।

(২৯) ایروان—বর্তমানে আর্মেনিয়ার রাজধানী।

www.pathagar.com

(৩০) شکی — বর্তমানে আজারবাইজানের অন্তর্ভুক্ত। (المنجد)

(৩১) ফার্সী ১১৭৩ সাল মোতাবেক ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ।

(৩২) ফার্সী ১১৭৪ সাল মোতাবেক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ।

(৩৩) دربند —বর্তমান রাশিয়ার জাতিগত প্রজাতন্ত্র দাগেস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। (المنجد)

(৩৪) باکو —বর্তমান স্বাধীন আজারবাইজানের রাজধানী।

(৩৫) قره باغ —আজারবাইজানের অন্তর্ভুক্ত আর্মেনীয় খৃষ্টান অধ্যুষিত একটি এলাকা। (নামটির আভিধানিক অর্থ "কালো বাগান")।

(৩৬) ফার্সী ১১৭৪ সাল মোতাবেক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ।

(৩৭) ফার্সী ১১৭৫ সাল মোতাবেক ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ।

(৩৮) شوشی

(৩৯) حسین قلی خان جهانسوز —"জাহান্ সূজ্" মানে "বিশ্বকে দগ্ধকারী"।

(৪০) بابا خان

(৪১) ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট (ফার্সী ১১৭৬ সাল)।

(৪২) اعتماد الدولة —"সরকারের আস্থা"। এটা ছিল হাজী ইবরাহীম কালান্তরের উপাধি।

(৪৩) فتح علی شاه

(৪৪) صدارت شاه

(৪৫) میرزا محمد شفیع مازندرانی

(৪৬) ফার্সী ১২১৩ সাল মোতাবেক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বৃহৎশক্তিবর্গের অর্থনৈতিক গতিধারা ও লক্ষ্য

ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ঐ মহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারাকে পাল্টে দিয়েছিল। ফলে ইউরোপীয় দেশসমূহ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে সমগ্র ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব উৎপাদনকেন্দ্রের মালিক ইউরোপীয় পুঁজিপতিগোষ্ঠী দু'টি ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে, যার লক্ষ্য ছিল স্বীয় অর্থনৈতিক জীবনধারা অব্যাহত রাখা এবং অধিকতর মুনাফা হাসিল করা। ক্ষেত্র দু'টি ছিল ঃ (১) কাঁচামাল সংগ্রহ এবং (২) ইউরোপীয় বাজারের বাইরে পণ্য বিক্রির নতুন বাজারপ্রাপ্তি

এক ঃ কাঁচামাল সংগ্রহ ঃ সাধারণ ও ছোট ছোট কলকারখানার মোকাবিলায় বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সহায়তায় পূর্বের তুলনায় কয়েকশ' গুণ বেশী উৎপাদন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। এ কারণে এসব উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঁচামালের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ফলে একদিকে যেমন ইউরোপে মওজুদ কাঁচামালের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় কাঁচামালের মওজুদ সীমিত থাকায় ক্রমান্বয়ে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় ও মূল্য বেড়ে যায়। এ কারণে ইউরোপের শিল্পপতি ও কারখানা মালিকরা ইউরোপের বাইরে থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের চিন্তা করতে বাধ্য হয়।

দুই ঃ ইউরোপের বাইরে পণ্যবাজার সৃষ্টি ঃ ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে পূর্বেকার তুলনায় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়ে আসে এবং তার প্রসারও দ্রুততর হয়। আর শিল্প-কারখানার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অথচ ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে। এমতাবস্থায় শিল্প-কারখানার মালিকদের সামনে দু'টি পথ ব্যতীত তৃতীয় কোন বিকল্প ছিল না। তা হচ্ছে, ইউরোপের মুনাফালোভী নববিকশিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে হয় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে হত, নতুবা বহির্বিশ্বে পণ্যবাজার খুঁজে পেতে হত।

ইউরোপের পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকগণ প্রাচ্যের সাথে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। (অনেক ইউরোপীয় দেশ অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশে সীমিত পরিমাণে হলেও কিছু না কিছু প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং নিজেদের জন্য ঐসব দেশে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়েছিল।) এ কারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা দ্বিতীয় পথকেই বেছে নেয় এবং এসব অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দেয়। এভাবেই শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আগেকার চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ়তার সাথে বহির্বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টি ও অনুপ্রবেশ শুরু করে।

www.pathagar.com

উপনিবেশবাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে সমস্যা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইউরোপের নববিকশিত পুঁজিবাদী শক্তির জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখার জন্য তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রাচ্যে ও অন্যত্র পণ্যবাজার সৃষ্টি। আর তারা এ বাজার প্রাপ্তি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রাচ্যের দেশসমূহের দিকে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য সমস্যা ছিল, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ছাড়া তাদের পক্ষে না প্রাচ্য দেশসমূহ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, না প্রাচ্যের জনগণকে ইউরোপীয় পণ্যের ভোক্তায়, বিশেষতঃ কাঙ্খিত পর্যায়ের ভোক্তায় পরিণত করা সম্ভব ছিল। বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের জনগণ ইসলামী হুকুম-আহ্‌কামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিজাতীয় প্রভাব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একদিকে এসব দেশের জনগণের ঐতিহ্যিক ও ধর্মীয় জীবনধারার সাথে ইউরোপীয় প্রভাব ও জীবনধারা মেনে নেয়ার বিষয়টি মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, অন্যদিকে এসব দেশের দ্বীনী নেতৃবৃন্দ ও সচেতন আলেম সমাজ উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের তীব্র বিরোধিতা করেন। এসব কারণে ইউরোপের উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে থাকে। এসব ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান প্রধান ছিল ঃ

এক ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং জাতীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর হামলা ঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার, বিশেষ করে প্রাচ্যের জনগণকে পশ্চিমা পণ্যের ভোক্তায় পরিণত করার পথে প্রাচ্যের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য এবং জাতীয় সংস্কৃতি ছিল এক বিরাট ও দুর্জয় বাধা। মুসলিম দেশসমূহের জনগণ যতদিন তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রেক্ষিতে বিজাতীয় পণ্য ব্যবহার এবং আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে বা অন্য যে কোন দিক দিয়ে বিধর্মীদের সাথে কোন প্রকার সাযুজ্যকে নিজেদের জন্য হারাম গণ্য করত, ততদিন তাদের পক্ষে পশ্চিমা শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হওয়া সম্ভব ছিল না। তেমনি পশ্চিমাদের নিকট সস্তায় নিজেদের কাঁচামাল বিক্রি করে ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন উপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এমতাবস্থায় পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিবর্গ প্রথমতঃ ব্যাপক প্রচারের আশ্রয় নিয়ে আধুনিকতা, সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির নামে ইউরোপের ব্যাপক গুণগান ছড়িয়ে দিয়ে মুসলিম দেশসমূহের জনগণের ভিতর থেকে কিছু লোকের মধ্যে পশ্চিমা জীবনধারার প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে। অতঃপর এই মুষ্টিমেয়সংখ্যক লোকের সহায়তায় তারা জনসাধারণের অনুসৃত মূল্যবোধসমূহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা জনগণকে তাদের দ্বীনী চিন্তা-চেতনা ও স্বকীয় আদব-রসমের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলার কাজে ব্যাপৃত হয়।

একদল লোক উপনিবেশবাদীদের এ ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল এবং তারা নিজেদেরকে পুরোপুরি পাশ্চাত্যের দালালীতে নিয়োজিত করেছিল। উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে এভাবে যারা কাজ করতে শুরু করেছিল তারা ছিল এসব দেশের সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী ও এ ধারার বুদ্ধিজীবীগণ। এদের মধ্যে একদল পশ্চিমা জগতের বাহ্যিক চাকচিক্যের সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পিত ও আত্মবিক্রিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এ ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে স্বকীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করা এবং পশ্চিমা রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নেয়া। আর আরেক দল অসচেতনতার কারণে

www.pathagar.com

পশ্চিমা জীবনধারা ও সংস্কৃতির বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশের প্রশংসায় লিপ্ত হয় এবং কার্যতঃ বিজাতীয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করতে থাকে।

দুই ঃ ধর্ম ও দ্বীনী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ মুসলিম দেশসমূহে উপনিবেশবাদীদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দ্বীন ইসলাম। ইরানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে হয় যে, শিয়া মাজহাব সেখানে উপনিবেশবাদী প্রভাব বিস্তারের পথে সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দেখা দেয়। উপনিবেশবাদের ঘোরতর বিরোধিতাকারী দ্বীনী নেতৃবৃন্দ ও আলেম সমাজ উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন এবং প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। যেহেতু ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণের প্রতিরোধ বেশীরভাগই ইসলামী মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত হচ্ছিল সেহেতু উপনিবেশবাদী শক্তি ইসলাম, দ্বীনী নেতৃবৃন্দ এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অভিযান শুরু করে। উপনিবেশবাদী শক্তির এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার মধ্যে ছিল ধর্মহীনতা (সেক্যুলারিজম)-এর চিন্তাধারার বিস্তার সাধন, নতুন ধর্মমত সৃষ্টি,[১] আলেম সমাজের বিরুদ্ধে অপবাদ দান, ধর্ম ও রাজনীতির পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতার চিন্তাধারার বিস্তার সাধন ইত্যাদি। বস্তুতঃ ইসলাম, দ্বীনী নেতৃত্ব ও আলেম সমাজ ছিলেন উপনিবেশবাদবিরোধী প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ। এ কারণে উপনিবেশবাদ এসব কর্মসূচির মাধ্যমে এ প্রতিরোধদুর্গের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। আর এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং উপনিবেশবাদীদের আমদানীকৃত চিন্তাধারার প্রবর্তন ও বিস্তারের বেশীর ভাগ দায়িত্বই উপনিবেশবাদের তাবেদার ও এজেন্টদের মধ্য থেকে পশ্চিমায়িত[২] বুদ্ধিজীবীদের ওপর অর্পিত হয়।

টীকা ঃ

(১) এ প্রসঙ্গে ভারত উপমহাদেশে কাদিয়ানী ধর্ম এবং মধ্যপ্রাচ্যে বাহাই ধর্ম উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় ধর্মই বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা গড়ে ওঠে যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও পথচ্যুত করে উপনিবেশবাদীদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মানসিক পটভূমি প্রস্তুতকরণ। — অনুবাদক।

(২) غربزده — পাশ্চাত্যপন্থী — (طرفدار غرب Pro-Western) এবং পাশ্চাত্যবাদী (Westernized)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এখানে যে, একজন পশ্চিমাপন্থী নিজেকে প্রাচ্যের লোক ও পশ্চিমাদের থেকে আলাদা ভেবেও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বা অন্য কোন কারণে (যেমন ঃ কম্যুনিস্ট প্রাচ্যব্লকের বিলুপ্তির পূর্বে কম্যুনিজমের মোকাবিলায়) পশ্চিমা সমর্থক হতে পারে ও সেই সাথে জাতীয় স্বকীয়তা রক্ষার অনুভূতি কিছুটা হলেও পোষণ করতে পারে। কিন্তু একজন পশ্চিমায়িত ব্যক্তি মনে-মগজে পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-দর্শনকে প্রাচ্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করে থাকে। — অনুবাদক

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইরানের ওপর ফরাসী, বৃটিশ ও রুশ উপনিবেশবাদী শক্তির লোলুপদৃষ্টি

আগেই বলা হয়েছে যে, ইরানে ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র শাসন চলাকালে ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। বস্তুতঃ ইউরোপের উপনিবেশিক শক্তিসমূহ এ সময় বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে স্বীয় শিল্পের জন্যে সস্তা কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল ও কুপোকাৎ করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করে। এ সময় ফ্রান্সের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টি।[১] তিনি তাঁর আধিপত্যবাদী নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাঁর শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেনের ওপর জয়লাভ ও তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপে লড়াই করার পরিবর্তে উপনিবেশসমূহে বৃটেনের কণ্ঠরোধ করাকে অধিকতর উত্তম বলে বিবেচনা করেন। এ সময় ভারত উপমহাদেশ ছিল বৃটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশসমূহের অন্যতম; ইংরেজরা তাদের এ উপনিবেশটির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করত। আর যেহেতু ইরান ছিল ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী গুরুত্বপূর্ণ দেশ, বরং ইরান ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিগণিত হত, সেহেতু এ দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হওয়ায় এবং ফ্রান্সের গৃহীত নীতির কারণে, হঠাৎ করেই উভয় শক্তির নিকট ইরানের গুরুত্ব অসাধারণভাবে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় উভয় দেশ ইরানের শাহী দরবারের প্রতি তাদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে। অন্যদিকে রাশিয়াও বৃটেনের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তার বিশেষ এশিয়া-নীতির কারণে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ইরানের প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ফলে সহসাই কাজার বংশের শাহী দরবার ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিবর্গের মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সাথে তারা ইরানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন শুরু করে এবং ইরানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

ফরাসী বিপ্লবের পরে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যখন এ বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হলেন এবং নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন তখন তিনি ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় সকল দেশে তাঁর ক্ষমতার বিস্তার সাধনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ সময় ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী উপনিবেশিক শক্তি ছিল বৃটেন ও রাশিয়া। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি তাঁর আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য হাসিলের জন্য কখনো উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, আবার কখনো এক শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য শত্রুর সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতেন, কিন্তু কিছুদিন পর কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়ায় সে চুক্তি ছিন্ন করে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতেন। অন্যদিকে বৃটেন এবং রাশিয়াও যেহেতু সর্বাবস্থায়ই নেপোলিয়নকে নিজেদের ঘোরতর শত্রু মনে করত, সেহেতু কখনো কখনো এ দু'টি শক্তি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এসব মৈত্রীচুক্তিই নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ হয়ে দেখা দেয়।

www.pathagar.com

ইরানে ফ্রান্সের লক্ষ্য

নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন বৃটেনের শক্তি ও স্থায়িত্বের উৎস ছিল তার উপনিবেশগুলো। আর যেহেতু নেপোলিয়নের এটা খুব ভালই জানা ছিল সেহেতু তিনি, প্রথমতঃ স্বীয় উপনিবেশবাদী আধিপত্যের সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়তঃ বৃটেনকে দুর্বল ও পরাজিত করার লক্ষ্যে, মিসর ও ভারতসহ বৃটিশ উপনিবেশগুলো দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বৃটেন একটি দ্বীপরাষ্ট্র। বৃটেনের এ বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তার দুশমনদের পক্ষে স্থলপথে বৃটেনে হামলা করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে বৃটেনের নৌবাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সামুদ্রিক পথে যে কোন হামলাকে প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল। নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল বৃটেনকে দুর্বল করে সমগ্র ইউরোপে এবং বহির্বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্যের বিস্তার সাধন ও একক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। এমতাবস্থায় এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য, বিশেষতঃ বৃটেনকে দুর্বল করার জন্য বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে হামলা চালানোই একমাত্র পন্থা বলে তিনি মনে করতেন। এ সময় বৃটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ ছিল ভারত উপমহাদেশ। এ কারণে নেপোলিয়ন, এমন কি মিসর দখলেরও পূর্বে, ভারত দখলের আকাঙ্খা পোষণ করতেন।

নিঃসন্দেহে তাঁর ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সম্ভাব্য নিকটতম ও সংক্ষিপ্ততম একমাত্র পথ ছিল ইরান। কারণ, ইরান প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সাথে ইউরোপের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য নিকটতম পথ ও ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য হত। তাই নেপোলিয়নের এ সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী লক্ষ্য তাঁকে ইরানের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে।

সম্পর্কের সূচনা

মিসর দখলের অভিযান ব্যর্থ হবার পর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি স্থলপথে ভারতে হামলা চালাবার পরিকল্পনা করেন।[২] এমতাবস্থায় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইরানে আগা মোহাম্মদ খান কাজারের শাসনামলে একটি ফরাসী প্রতিনিধিদল ইরানে আগমন করে।

এ প্রতিনিধিদল আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হামলা চালাতে উৎসাহিত করা। ফরাসী প্রতিনিধিদল ইরানের প্রতি ফরাসী সমর্থনের বিনিময়ে ফ্রান্সকে ভারত আক্রমণে ব্যবহারের জন্যে ইরানে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রদানের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ প্রতিনিধিদলের আগমনের কিছুদিনের মধ্যই আগা মোহাম্মদ খান কাজার নিহত হন। এমতাবস্থায় ফরাসী প্রতিনিধিদল ইরান সরকারের সাথে কোনরূপ সফল আলোচনা ছাড়াই, হাজী ইবরাহীম কালান্তরের পরামর্শে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে।

আগা মোহাম্মদ খানের হত্যাকাণ্ডের পরে ইরানের শাসনক্ষমতায় আসীন ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় মূলতঃ অন্য যে কোন যাযাবর গোত্রপতির চেয়ে বেশী ছিল না। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। ইরান ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের সময় তিনি ইরাভনের আর্মেনীয় ধর্মযাজকের নিকট থেকে ফ্রান্স ও নেপোলিয়ন সম্পর্কে মোটামুটি অবগত হন।

ফাৎহ্ আলী শাহ্ ইরানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই সিংহাসনের অন্যান্য দাবীদারদের নিয়ে বেশ সমস্যার মধ্যে ছিলেন। তিনি প্রথমে ইংরেজদের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

যুদ্ধ-বিগ্রহের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান যে, এ ব্যাপারে ইংরেজদের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি ফরাসীদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[৩] ঘটনাক্রমে একই সময় নেপোলিয়নও তাঁর ভারত আক্রমণের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ইরানে আরেকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং শীঘ্রই এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

হিজরী ১২২০ সালের রজব মাসে[৪] ফরাসী সম্রাটের প্রতিনিধি জুবার[৫] ইরানের পথে রওনা হন। এর পরপরই রোমিও নামে আরো একজন প্রতিনিধি তেহরান আগমন করেন। কিন্তু জুবারের আগেই রোমিও তেহরান পৌঁছে যান। তিনি ইরানের শাহের বরাবরে লিখিত নেপোলিয়নের পত্র বহন করে নিয়ে আসেন এবং শাহের নিকট পেশ করেন। পরবর্তী আলোচনায় নেপোলিয়ন ও ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এর ফলে বৃটেন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়া ইরানের শাহী দরবার ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ফিঙ্কেন্‌স্টেইন[৬] চুক্তি

দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা এবং ইরানের শাহের বরাবরে নেপোলিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা পত্র প্রেরণের পর ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অবশেষে ফাৎহ্ আলী শাহ্ নেপোলিয়নের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মীর্যা রেযা খান কায্‌ভীনীকে তাঁর পক্ষ থেকে মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্যে পোল্যাণ্ডের ফিঙ্কেন্‌স্টেইনে নেপোলিয়নের শিবিরে প্রেরণ করেন। হিজরী ১২২২ সালে[৭] ফিঙ্কেন্‌স্টেইনে ইরান-ফ্রান্স মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষই বেশ কিছু বিষয়ে পরস্পরকে সহায়তার জন্যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়।

ফিঙ্কেন্‌স্টেইন চুক্তির পরে নেপোলিয়ন জেনারেল গর্ডন[৮] নামে একজন ফরাসী জেনারেলের নেতৃত্বে একদল সামরিক উপদেষ্টাকে ইরানে প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল ইরানী সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কামান তৈরীর প্রক্রিয়া শেখানো। কামান তৈরীর জন্যে ইস্‌ফাহানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া ইরানের পথঘাটের মানচিত্র তৈরীও ছিল ফরাসী সামরিক উপদেষ্টাদের অন্যতম প্রধান করণীয়।

কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধিদল ইরানে এসে পৌঁছার আগেই অর্থাৎ পথে থাকতেই নতুন এক ঘটনা সংঘটিত হয় যা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করে দেয়।

তিল্‌সিৎ[৯] চুক্তি ও নেপোলিয়নের চুক্তিভঙ্গ

ইরান সরকার দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও উপনিবেশবাদবিরোধী আলেম সমাজের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের আশ্রয় নিলে তাঁদের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণকে নিজেদের পিছনে সমবেত করে বিরাট শক্তিতে পরিণত করতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র সরকার ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী সরকারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শাহী দরবার যখন নেপোলিয়নের প্রতি আশার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ঠিক এমনি সময় রুশ বাহিনী ফরাসী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং এর ফলে রুশ সরকার ফরাসী সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। বলা চলে যে, ফিঙ্কেন্‌স্টেইনে ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নেপোলিয়নের স্বাক্ষরের কালি

www.pathagar.com

শুকাবার আগেই নির্মান[১০] নদীর তীরে তিল্‌সিৎ নামক স্থানে (হিজরী ১২২২ সালেই) তিনি রাশিয়ার জারকে আপন ভাইয়ের ন্যায় বক্ষে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু এ চুক্তিতে তিনি ইরান-ফ্রান্স মৈত্রীর কথা বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করলেন না।

নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের পরপরই ফাৎহ্ আলী শাহর নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যেন রাশিয়ার সাথে সন্ধি করেন।

ফাৎহ্ আলী শাহ্ ফ্রান্স-রাশিয়া চুক্তি সম্পর্কে অবগত হবার পর নেপোলিয়নকে ইরান-ফ্রান্স চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আস্‌কার খান আফ্‌শার্-কে[১১] তাঁর নিকট পাঠান। কিন্তু আস্‌কার খান আফ্‌শার্ ফ্রান্সে পৌঁছার পর সেখানে বৃটিশদের তাবেদার একটি ফ্রিম্যাশনারী লজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ এজেন্টদের দলে শামিল হয়ে যান। তাই তিনি নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাতে অর্থহীন জবাব ছাড়া কিছুই পেলেন না। ফলে ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র সব আশা-ভরসা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু এবারেও তিনি সমস্যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধান এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা না করে পুনরায় উপনিবেশবাদী শক্তির ছত্রছায়া লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এবার তিনি বৃটেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

যেহেতু ইউরোপের তিন বৃহৎশক্তি বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পর ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল সেহেতু রুশ-ফরাসী চুক্তি কার্যতঃ একটি বৃটিশবিরোধী চুক্তি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছিল। বৃটিশ সম্রাট এ চুক্তিকে নিজের জন্য বিরাট হুমকি হিসেবে গণ্য করেন। এ কারণে এ সময় থেকেই বৃটেনের পক্ষ হতে রুশ-ফরাসী মৈত্রীর বিরুদ্ধে ইরানকে ব্যবহারের ধারা শুরু হয়। এভাবেই বৃটেন পুনরায় ইরানের শাহী দরবারের দিকে মনোযোগ প্রদান করে।

টীকা ঃ

(১) আয়ুষ্কাল ১৭৬৯-১৮২১ খৃস্টাব্দ। শাসনকাল ১৮০৪-১৮১৫ খ্রষ্টাব্দ। (المنجد)

(২) নেপোলিয়ন তখনো সম্রাট হননি, বরং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরে অবশ্য তিনি ১৭৯৮-৯৯'র যুদ্ধে মিসর দখলে সক্ষম হন। (المنجد)

(৩) ইতিমধ্যে ১৮০৪ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের সম্রাট হন। (المنجد)

(৪) ১৮০৫ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

(৫) ژوبر

(৬) Finkenstein

(৭) মোতাবেক ১৮০৭ খৃস্টাব্দ।

(৮) ژنرال گاردان

(৯) Tilsit

(১০) نیمن

(১১) عسکر خان افشار

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইরানে বৃটেনের লক্ষ্য

বৃটেন বেশ পূর্বেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশসমূহে তার উপনিবেশবাদী লক্ষ্য চরিতার্থ করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই বৃটিশ উপনিবেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং বৃটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দাবী করতেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না। বস্তুতঃ বৃটেনের জন্য তার উপনিবেশগুলোর গুরুত্ব এতই বেশী ছিল যে, সেগুলো তার হাতছাড়া হবার মানে ছিল বিশ্বশক্তি হিসেবে বৃটেনের নিশ্চিত পতন। এছাড়া উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হলে বৃটেন উপনিবেশবাদী প্রতিযোগিতায় পরাজিত ও ধরাশায়ী হয়ে পড়ত এবং একটি দুর্বল, শক্তিহীন ও গুরুত্বহীন জাতিতে পরিণত হত। এ কারণে বৃটেন ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধের ব্যাপারে নাক গলানোর পরিবর্তে তার সমগ্র শক্তিকে নিজ উপনিবেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত করাকে অগ্রাধিকার দিত।

এশিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশাল ভারতবর্ষ। এ কারণেই বিশেষভাবে ভারতের নামকে যুক্ত করে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়েছিল এবং এ কোম্পানীর মাধ্যমে বৃটেন প্রচুর অবৈধ স্বার্থ হস্তগত করেছিল। তাই এশিয়ায় বৃটিশ নীতির সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের সীমান্তের হেফাজত করা এবং এখানে তার উপনিবেশিক প্রভাব পুরোপুরি টিকিয়ে রাখা। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইরানে বৃটেন বহুবিধ স্বার্থ হাসিল করতে পারত বিধায় এবং দেশটি ভারতের প্রতিবেশী হওয়ায় বৃটেনের জন্যে ইরানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই ইরানে বৃটেন নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো হাসিলের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ঃ

(১) ইরানকে এতখানি দুর্বল করে রাখা যাতে দেশটি কোনদিন ভারতে হামলা চালানো বা ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে না পারে।[১]

(২) ইরান যাতে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হতে না পারে এবং ইরানের সহায়তা নিয়ে তাদের কেউ ভারতে হামলা চালাতে না পারে—সে লক্ষ্যে ইরানের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন।

(৩) ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি যাতে দেশ দু'টি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের কেউই ভারতকে নিয়ে ভাববার অবকাশ না পায়।

(৪) ইরানের ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের প্রতিরক্ষার জন্যে ইরানকে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা।

বৃটিশরা ইরানে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজার বংশের গোটা শাসনামলে এবং তার পরেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এর লক্ষ্য ছিল প্রথমতঃ কাজার সরকারকে স্বীয় আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসা, দ্বিতীয়তঃ ইরানের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব বিস্তার ও নাক গলানো এবং এভাবে ইরানী পররাষ্ট্রনীতিকে বৃটেনের এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তোলা

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ ইরানে কোন স্বাধীন ও শক্তিশালী সরকার গড়ে ওঠা বা ক্ষমতায় আসার পথে বাধা সৃষ্টি করা। এ কারণেই কাজার বংশের গোটা শাসনকালে, বিশেষ করে ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র শাসনামলে[২] বৃটিশ সরকার ইরানে বহু প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং তাদের মাধ্যমে ইরানের সাথে বহু চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়। আর সর্বাবস্থায়ই বৃটেন ইরানের সাথে তার সম্পর্ক রক্ষা ও এখানে তার তৎপরতাকে, কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই, এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতি-কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করে।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা ইরানে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে এখানকার পণ্যবাজার হস্তগত করার চিন্তায় লিপ্ত হয়। এজন্য তারা বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইরানে তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। ইরানে বৃটেনের এসব প্রচেষ্টা প্রধানতঃ দু'টি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তা হচ্ছে ঃ

(১) ইরানে বৃটিশদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্যে যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা হস্তগত করা এবং একটি দেশে অন্য দেশের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে বাণিজ্য শুল্কসহ যে সব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় ইরানে বৃটিশ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া।

(২) ইরানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হস্তগত করা।[৩]

কাজার বংশের শাসনামলে ইরান-বৃটেন সম্পর্ক

ইরানে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি তাদের যে নগ্ন চেহারা প্রদর্শন করে এবং যে সব জঘন্য অন্যায়-অপরাধের আশ্রয় নেয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে এখানে কাজার বংশের শাসনামলে ইরান-বৃটেন সম্পর্কের ওপর আংশিক হলেও দৃষ্টিপাত করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে, ইরান ও বৃটেনের মধ্যে যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়, বরং ইরানের ওপর বৃটেন যে সব চুক্তি চাপিয়ে দেয় তার অন্ততঃ কয়েকটির বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করা জরুরী।

হিজরী ১২১৫ সালে[৪] নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে একমাত্র ইউরোপীয় দেশটি নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে সে ছিল বৃটেন। এমতাবস্থায় এ সময় বৃটেন ফ্রান্সের পক্ষ থেকে পুরোপুরি হুমকির সম্মুখীন হয়। এ হুমকির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, নেপোলিয়ন ইউরোপের অন্যান্য দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের বন্দরগুলোতে বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করে। অন্যদিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী নীতির দ্বারা এশিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশগুলো বিশেষতঃ ভারত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। হিজরী ১২১৫ সালে[৫] রুশরা ইংরেজদের সাথে গাঁটছড়া ছিন্ন করে শত্রুতা-নীতি অবলম্বন করে এবং ভারত দখলের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। যেহেতু দেশটি এ সময় ইউরোপে বৃটেনের কোন মিত্র ছিল না সেহেতু এশিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যাদেরকে সম্ভব মিত্র হিসেবে পাবার চেষ্টা করে। আর এ সময় মৈত্রীর জন্যে বৃটেনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল ইরাক।

ইরানের তৎকালীন বাদশাহ্ ফাৎহ্ আলী শাহ্ সমকালীন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত ও অসচেতন ছিলেন। তিনি ইরানের ইউরোপীয় শত্রু ও মিত্র দেশগুলোর মূল লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এ কারণে তিনি খুব সহজেই ইউরোপীয় দেশগুলোর কূটনীতিক ও প্রতিনিধিদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

www.pathagar.com

বৃটেন ইরানের মৈত্রীকে নিজের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে হিজরী ১২১৫ সালে[৬] স্যার জন ম্যাল্‌কম্‌কে[৭] ইরানে পাঠায়। তিনি ইরানে প্রবেশ করে শাহ্‌ ও তাঁর পারিষদবর্গকে উৎকোচ প্রদান করে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে[৮] ইরানের সাথে একটি রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হন।[৯] এ চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন তার দু'টি উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। প্রথমতঃ নেপোলিয়ন ভারতে হামলার যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন তা বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়তঃ ইরানে বৃটিশ পণ্যসামগ্রী রফতানীর জন্যে অনুমতি আদায়।

ইরান ও বৃটেনের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হবার পর বেশী দিন না যেতেই রাশিয়ায় ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটে। জার প্রথম পল নিহত এবং 'প্রথম আলেকজান্ডার' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জার প্রথম আলেকজান্ডার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বৃটেনের প্রতি পূর্বতন রুশ সরকারের নীতি পরিবর্তন করেন এবং দেশটির প্রতি শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ফ্রান্সের দিক দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বৃটেনের সাথে আগের মত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৃটেনও এ আগ্রহে সাড়া দেয় এবং দু'দেশের মধ্যে এক যোগসাজশ ও গোপন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমঝোতা অনুযায়ী বৃটেন ইরানে রুশ হামলায় সম্মতি জানায়। এ প্রেক্ষিতে রুশ বাহিনী তৎকালীন ইরানের অন্তর্ভুক্ত জর্জিয়ায় হামলা চালায়। সাথে সাথে জার প্রথম আলেকজান্ডার জর্জিয়ার রাশিয়াভুক্তির ঘোষণা দেন।

জর্জিয়ায় রুশ হামলার ফলে ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে উপর্যুপরি অনেকগুলো যুদ্ধের সূচনা হয়। এর পরিণতিতে ইরানের বিশাল এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেশটিকে দু'টি লজ্জাকর ও অপমানজনক চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

ইরানী ভূখণ্ড জর্জিয়ায় রুশ হামলা শুরু হবার পর ইরানের শাহী দরবার ইংরেজদের শরণাপন্ন হয় এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি অনুযায়ী তাদের নিকট থেকে সাহায্য চায়। এ লক্ষ্যে ইরান ভারতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু যেহেতু বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে গোপন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেহেতু ইরানকে সাহায্য করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য বৃটিশরা প্রতারণামূলক বাহানার আশ্রয় নেয়। বেশ কিছুদিন টালবাহানা করার পর বৃটিশরা বলে যে, স্যার জন ম্যাল্‌কম ইরানের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের হামলা প্রতিহত করা, রুশ হামলা নয়। এমতাবস্থায় তথাকথিত মিত্র বৃটেনের নিকট থেকে সাহায্য লাভের ব্যাপারে হতাশ হয়ে ফাৎহ্‌ আলী শাহ্‌ নেপোলিয়নের দিকে হাত বাড়ান। ফলে ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জেনারেল গর্ডনকে ইরানে পাঠানো হয়।[১০] ফলে ইংরেজদের টনক নড়ে এবং বৃটিশ নেতারা পুনরায় ইরানের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদানে বাধ্য হন। বৃটিশ সরকার ইরান ও ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টির জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। বৃটেন স্যার জন ম্যাল্‌কমকে পুনরায় প্রতিনিধি হিসেবে ইরানে প্রেরণ করে। কিন্তু ততদিনে ইরান সরকার বৃটিশদের ওপর হতাশ ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে এবং রুশ দখল থেকে স্বীয় ভূখণ্ড ফেরৎ পাবার লক্ষ্যে ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। এ কারণে স্যার জন ম্যালকমকে শাহের দরবারে প্রবেশ ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়। তিনি শাহের দরবারে প্রবেশাধিকার না পেয়ে ব্যর্থ, হতাশ, ভগ্নমনোরথ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ইরান থেকে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

কিন্তু ইরান সরকার অনেক আশায় বুক বেঁধে ফ্রান্সের সাথে ফিঙ্কেন্‌স্টেইন্‌ চুক্তি সম্পাদন করলেও রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে তিল্‌সিৎ চুক্তি সম্পাদন[১১] এবং ইরানের সাথে সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার সে আশা হতাশায় পর্যবসিত হয়। ফলে ইরানে বৃটিশ কূটনীতিকদের সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এবারে বৃটেন স্যার হার্‌ফোর্ডজোন্সকে[১২] প্রতিনিধি হিসেবে ইরানে পাঠায়। তিনি ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন এবং শাহ্‌কে বৃটেনের প্রতি আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন এবং হিজরী ১২২৪ সালে[১৩] ইরান ও বৃটেনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে বৃটেন বৈদেশিক হামলার মোকাবিলায় ইরানকে সাহায্য দেয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে। এতে বলা হয় ঃ "যদি কোন ইউরোপীয় বাহিনী ইরানের আলা হযরত শাহানশাহ্‌র রাজত্বের সীমারেখার আওতাভুক্ত কোন জায়গার ওপর হামলা করে থাকে বা করে তাহলে গ্রেট বৃটেন সম্রাটের সরকার ইরানের আলা হযরত বাদশাহ্‌কে একদল সৈন্য দ্বারা সাহায্য করবেন বা তার পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা দেবেন।" অবশ্য এটা ছিল পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং ইরানও বৃটেনকে অনুরূপ সাহায্য দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ চুক্তিটি "সাধারণ চুক্তি"[১৪] নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইরান ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন এবং স্যার হার্‌ফোর্ডজোন্স ইরান সরকারের সাথে যে আলোচনা শুরু করেন তা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্যার জন ম্যাল্‌কম হিজরী ১২২৪ সালে[১৫] পুনরায় ইরানে আগমন করেন। তিনি একদল বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টাকে সাথে নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র পুত্র যুবরাজ আব্বাস মীর্যার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর এ বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টারা ইরানী সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন ও সামরিক প্রশিক্ষণ দানের কাজে মনোনিবেশ করে।

শাহ্ নতুন করে বৃটেনের ব্যাপারে আশান্বিত হন এবং মীর্যা আবুল হাসান ইল্‌চীকে[১৬] তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বৃটিশ সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। মীর্যা আবুল হাসান ইল্‌চী সেখান থেকে দেশে ফিরে আসার সময় তাঁর সাথে বৃটিশ সরকার আরেকজন প্রতিনিধিকে ইরানে পাঠায়। তাঁর নাম ছিল স্যার গুরাভ্‌জলী[১৭]। ইরানে প্রেরিত পূর্ববর্তী দুই বৃটিশ প্রতিনিধির সূচিত আলোচনা অব্যাহত রাখা এবং ইরানের সাথে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে তাঁকে ইরানে পাঠানো হয়।

ঐ সময় ইরানী ভূখণ্ডে রুশ আগ্রাসনের কারণে বৃটেনের নিকট থেকে ইরানের আশু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৃটেনের নতুন প্রতিনিধি এজন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপই গ্রহণ করলেন না। তিনি ইরান সরকারের সাথে দীর্ঘ তিন বছর যাবত টালবাহানা করলেন। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১২২৭ সালে[১৮] যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে রুশ বাহিনীর জয়লাভের পর ইরান ও বৃটেনের মধ্যে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১২টি দফা বিশিষ্ট এ চুক্তিটি "বিস্তারিত চুক্তি"[১৯] নামে খ্যাতিলাভ করে। স্যার গুরাভ্‌জলী এ চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য চুক্তিপত্রটি বৃটেনে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে এ চুক্তিতে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং চুক্তিটি ১১ দফায় পুনর্বিন্যস্ত করে ইরানে ফেরৎ পাঠানো হয়। অতঃপর হিজরী ১২২৯ সালে[২০] ইরানের শাহ্ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এভাবে তিনি এক লজ্জাজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কার্যতঃ ইরানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ভূলুণ্ঠিত করেন।

বৃটেন ও তুর্কামান্‌চাই[২১] চুক্তি

বৃটিশরা একদিকে রাশিয়ার সাথে গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল, অন্যদিকে ইরানের সাথে প্রকাশ্য মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করল। ফলে ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই বৃটিশ সরকার নেপোলিয়নের বিপদ থেকে বেঁচে গেল। বস্তুতঃ ইরান ও বৃটেনের মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তির মূল ভিত্তি ছিল বৃটেনের উপনিবেশবাদী স্বার্থের সংরক্ষণ। তাই যদিও এ চুক্তিতে ইরানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা

www.pathagar.com

রক্ষার ব্যাপারে বৃটেন কিছুটা দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কার্যতঃ তা পালন থেকে বিরত থাকল এবং এরূপ কোন চুক্তির অস্তিত্বই যেন ভুলে গেল।

বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ইরানে দীর্ঘ দশ বছর যাবত বৃটেনের উজির মোখ্তার[২২] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ইরানের শাহী দরবারের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, বরং তিনি ইরান সরকারের সাথে শত্রুতা ও উপনিবেশবাদী রুশ সরকারের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করেন। অবশেষে তিনি আব্বাস মীর্যার সেনাবাহিনী থেকে বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টাদের প্রত্যাহার করে নেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের আচরণ এতই আপত্তিকর ও অপমানজনক ছিল যে, শাহ্ বহুবার তাঁর বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের নিকট অভিযোগ করেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানান।

ইতিমধ্যে ইরান দ্বিতীয় বারের মত রুশ হামলার শিকার হয়। কিন্তু ইরান ও বৃটেনের মধ্যে সম্পাদিত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে ইরানকে সামান্যতম সাহায্য করা থেকেও বৃটেন বিরত থাকে। বরং বৃটিশ কূটনীতি সর্বত্রই রাশিয়ার অনুকূলে ও ইরানের প্রতিকূলে পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় ইরান সরকার তার ভূখণ্ডের এক বিশাল এলাকার ওপর রুশ দখলকে মেনে নিয়ে তুর্কামান্চাই চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়।

টীকা ঃ

(১) বৃটেন এটা ভালভাবেই জানত যে, ইরানের বাদশাহ্গণ ভারতকে প্রভূত ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের উৎসরূপে গণ্য করতেন। সুলতান মাহ্মুদ, নাদির শাহ্ প্রমুখ বাদশাহ্গণ যখনই নিজেদেরকে ভারত আক্রমণের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করতেন তখনি তাঁরা ভারতে হামলা চালাতেন। এ কারণে বৃটিশ সরকারের ভয় ছিল যে, ইরানের কাজার বংশীয় বাদশাহ্গণও যখনই যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হবেন তখনি তাঁদের পূর্বসূরিদের নীতি অনুসরণ করে ভারতে হামলা করে বসতে পারেন।

(২) হিজরী ১২১১-১২৫০ সাল মোতাবেক ১৭৯৬ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ।

(৩) বৃটিশরা সব সময়ই তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রির বাজার লাভের জন্য চেষ্টিত ছিল। এ কারণে তারা ইরানের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা চালানো এবং রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনের পাশাপাশি সর্বত্র ও সব সময় চেষ্টা করত যাতে ইরানে তাদের পণ্য রফতানীর ব্যবস্থা করতে পারে। ফলে হিজরী ১২১৬ সাল মোতাবেক ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পর ইরানে আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের শতকরা ৯০ ভাগ হয়ে দাঁড়াল বৃটিশ পণ্য। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ইরানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য, বিশেষ করে বস্ত্র রফতানীর পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে ইরানের বিভিন্ন শহরে তাদের বাণিজ্য দফতর খোলার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তারা ক্রেতাদের নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রি শুরু করে দেয় এবং এভাবে ইরানী ব্যবসায়ীদেরকে বাজার থেকে উৎখাত করে। এমন কি ইরানী ব্যবসায়ীরা যদি বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সাথে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন তাতেও তারা সফল হতে পারতেন না। কারণ তাঁরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে পণ্য সংগ্রহ করতেন। কিন্তু বৃটিশ ব্যবসায়ীরা সরাসরি তাদের কারখানা থেকে পণ্য নিয়ে এসে সরাসরি ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করত। এ কারণে ইরানী ব্যবসায়ীদের পক্ষে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে এ যুগে ইরানের ব্যবসায়ী মহলকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে কাজার সরকার যেকোন ধরনের বিদেশী পণ্যের অবাধে ইরানে প্রবেশের অনুমতি দানের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে; সেহেতু দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকারীদের কোনরূপ সহায়তা দিত না। ফলে অবাধ ও ব্যাপকভাবে বিদেশী পণ্য আমদানীর পরিণতিতে দেশী শিল্পের বিকাশ

www.pathagar.com

ও তার উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হত। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ইরানের শাহী সরকারকে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে অথবা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে নামমাত্র শুল্কে ইরানে তাদের পণ্য নিয়ে আসত এবং সর্বোচ্চ হারে মুনাফার পাশাপাশি দেশী শিল্পের বিকাশ ও জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখত। এভাবে কাজার বংশের শাসনামলে যে বৈদেশিক অর্থনৈতিক আধিপত্য শুরু হয় ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

(৪) মোতাবেক ফার্সী ১১৭৯ সাল তথা ১৮০০ খৃস্টাব্দ।

(৫) ১৮০০ খৃস্টাব্দ।

(৬) ১৮০০ খৃস্টাব্দ।

(৭) Sir John Malcom.

(৮) মোতাবেক হিজরী ১২১৫ সাল।

(৯) বৃটেনের জন্য তখন ছিল একটি সঙ্কটকাল। এ কারণে ঐ সময় ইরানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারাটা তাদের জন্য এমনই আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, এজন্য বৃটিশ সরকার স্যার জন ম্যাল্‌কমের প্রশংসা করে।

(১০) হিজরী ১২২২ সাল মোতাবেক ১৮০৭ খৃস্টাব্দ।

(১১) একই বছর অর্থাৎ হিজরী ১২২২ সাল মোতাবেক ১৮০৭ খৃস্টাব্দ।

(১২) سر هارفورد جونز

(১৩) মোতাবেক ১৮১০ খৃস্টাব্দ।

(১৪) عهدنامه مُجمَل

(১৫) মোতাবেক ১৮১০ খৃস্টাব্দ।

(১৬) میرزا ابو الحسن ایلچی

(১৭) سر گوراوزلی — অথবা স্যার গুরউজ্‌লী।

(১৮) মোতাবেক ১৮১২ খৃস্টাব্দ।

(১৯) عهدنامه منفصل

(২০) মোতাবেক ১৮১৪ খৃস্টাব্দ।

(২১) ترکمانچای

(২২) وزیر مختار — দূতাবাসে মন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কূটনীতিক।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইরানে রাশিয়ার লক্ষ্য

কাজার বংশের শাসনামলে ইরানে রাশিয়ার অনেকগুলো লক্ষ্য ছিল এবং রাশিয়া তাতে উপনীত হবার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। লক্ষ্যগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে উপনীত হওয়া ঃ নব্য রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পিটারের[১] বিখ্যাত উপদেশের আলোকে রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠী রুশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ, তার উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলায় পরিপূর্ণ শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী হওয়া এবং একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবার জন্যে পারস্য উপসাগর, ওমান সাগর ও ভারত মহাসাগরের গরম পানিতে পৌঁছা ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম পন্থা হিসেবে মনে করত। বস্তুতঃ এটাই ছিল রুশ শাসকগোষ্ঠীর এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। বলা বাহুল্য যে, রাশিয়ার জন্য পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্য সহজতম পথ ছিল ইরান। তাই ইরানকে অন্ততঃ তাবেদার করে রাখা ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য।[২]

দুই ঃ উত্তর ইরানের অংশবিশেষ দখল ঃ অন্যান্য উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের ন্যায় রাশিয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। রাশিয়ার জারদের আন্তর্জাতিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল এশিয়া ও ইউরোপ—এ উভয় মহাদেশে স্বীয় আধিপত্য সম্প্রসারিত করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৩] আর ঐ যুগে রাশিয়া তার এশীয় প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ইরানের সাথে দীর্ঘ সীমান্তের অধিকারী ছিল। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সে যুগে ইরানে যেমন কোন শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ছিল না, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ও কোন যোগ্য লোক অধিষ্ঠিত ছিলেন না। যদিও তৎকালীন ইরানী ভূখণ্ড জর্জিয়া ও দাগেস্তানে রুশদের হামলার পিছনে ভূখণ্ড দখল একমাত্র কারণ ছিল না, কিন্তু এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভূখণ্ড গ্রাস, সাম্রাজ্যের আয়তন প্রসারিত করা ও দ্বিগ্বিজয় তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, রাশিয়া তার দক্ষিণ দিকে প্রভাব বিস্তার এবং উত্তর ইরান দখল করার জন্যে ইরানের ওপর উপর্যুপরি অনেকগুলো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। আর এসব যুদ্ধের পরিণতিতেই গোলেস্তান ও তুর্কামান্‌চাই চুক্তির মাধ্যমে ইরানের বিশাল এলাকা গ্রাস করে নিয়েছিল।

তিন ঃ ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতে পৌঁছা ও বৃটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি ঃ রাশিয়ার ভূখণ্ডগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং ইউরোপীয় মহাদেশে বৃটেনের সাথে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে রুশরা ভারতের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে। রাশিয়ার পক্ষে ভারত দখল করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন তার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেনকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশেই কুপোকাৎ করা সম্ভব হত, অন্যদিকে ভারতের বিশাল পণ্যবাজারও হস্তগত করতে সক্ষম হত। ফলে তার ভৌগলিক সম্প্রসারণলিপ্সা অন্ততঃ এশিয়ার এ অংশে বাস্তবায়িত হত। এর ফলে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া আরব সাগরে উপনীত হবার লক্ষ্য অর্জনেও সফল হত।

- ৬

www.pathagar.com

আর রাশিয়ার পক্ষে ভারতে প্রবেশ মাত্র দু'টি পথে সম্ভবপর ছিল। তা হচ্ছে, ইরান ও আফগানিস্তান। এ কারণে রুশরা এ উভয় অঞ্চলের প্রতিই লোলুপদৃষ্টি রাখত। এ কারণেই তারা উত্তর আফগানিস্তানে এবং উত্তর ইরানে অর্থাৎ জর্জিয়াসহ উত্তর ইরানের অন্যান্য এলাকায় সামরিক অভিযান চালাত।[৪]

রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন ও রুশ-ইরান যুদ্ধের সূচনা

জর্জিয়ার রুশভুক্তি ও রুশবাহিনীর গান্‌জাহ্‌ দখল ঃ ইরানে কাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অগা মোহাম্মদ খান কাজারের মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ফাৎহ্‌ আলী শাহ্‌র সিংহাসনে আরোহনের পর জর্জিয়ার প্রাদেশিক শাসক গোরগীন খান[৫] ইরানের শাহের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেন এবং রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। যেহেতু স্বয়ং রাশিয়া দীর্ঘদিন থেকেই ইরানের ঐ এলাকার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সেহেতু গোরগীন খানের আনুগত্য ঘোষণা ও জর্জিয়াকে রুশভুক্ত করার আবেদনের প্রেক্ষিতে রুশসম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার হিজরী ১২১৫ সালে[৬] এক ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জর্জিয়াকে রুশভুক্ত করে নেন। কিন্তু এরপর খুব শীঘ্রই গোরগীন খান মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইয়েরা এবং জর্জিয়ার জনগণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা রাশিয়ার আনুগত্য করতে রাজি না হওয়ায় রুশ সরকার সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জর্জিয়াকে দখল করে নেয়। এরপর হিজরী ১২১৭ সালে[৭] জর্জিয়াস্থ রুশবাহিনীর অধিনায়ক সিসিয়ানোভ[৮] গাঞ্জার প্রশাসকের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানান। তিনি বলে পাঠান যে, যেহেতু গানজাহ্‌ জর্জিয়ারই অংশবিশেষ সেহেতু তাঁকে রুশদের অধীনতা মেনে নিতে হবে। কিন্তু গান্‌জাহ্‌র প্রশাসক সিসিয়ানোভের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানান। জবাবে সিসিয়ানোভ গান্‌জায় হামলা চালান এবং শহরটি দখল করে নেন।

ঐ সময় ইরাভন ও কারাবাগের শাসকদ্বয় ইরানের শাহের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সিসিয়ানোভ এ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করেন এবং জায়গা দু'টি দখল করে নেন। ফলে রুশ অধিকৃত এলাকার সীমা আরাস্‌ নদী[৯] পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে পরবর্তী যুদ্ধ সংঘটিত হয় আচ্‌মিয়াযিনে[১০]। এ যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন যুবরাজ আব্বাস মীর্যা। এতে ইরানী বাহিনী সাফল্য লাভ করে। কিন্তু এরপর আস্‌লান্‌দুযে[১১] দু'পক্ষের মধ্যে যে চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে ইরানের সকল আশা নিরাশায় পরিণত হয়। এ যুদ্ধে রুশরা বিরাট বিজয় অর্জন করলে আব্বাস মীর্যা সন্ধির প্রস্তাব দেন। রুশরা এ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং গোলেস্তানের সন্ধি সম্পাদিত হয়।

গোলেস্তানের সন্ধি

হিজরী ১২২৮ সালে[১২] সম্পাদিত গোলেস্তান চুক্তি ইরানের ইতিহাসে সর্বাধিক লজ্জাকর ও অপমানজনক চুক্তিসমূহের অন্যতম। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ইরানী প্রতিনিধি হাজী মীর্যা আবুল হাসান খানে ইল্‌চী (যিনি ছিলেন বৃটেনের তাবেদার) এবং ইরানের বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার গুরাভ্‌যেলী ব্যাপকভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচেষ্টা চালান। ১১টি দফা সম্বলিত এ চুক্তির তিনটি দফায় রুশদের ভূখন্ডগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লালসা চরিতার্থ করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ঃ

www.pathagar.com

(১) উত্তর ইরানের জর্জিয়া, দাগেস্তান, বাকু, দারবান্দ্, শের্ভন্, কারাহ্বাগ, শাক্কী, গান্জাহ্ মুকান্,[১৩] এবং তালেশ্ মালভূমির[১৪] অংশবিশেষ রাশিয়াকে প্রদান করা হয়।

(২) কাস্পিয়ান সাগরে ইরানের নৌ-অধিকার হাতছাড়া হয় এবং ইরানে রুশ ব্যবসায়ীদের জন্য প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। এভাবে ইরানে রাশিয়ার অর্থনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(৩) রুশরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, "মহামান্য শাহের (ফাৎহ্ আলী শাহ্র) যে কোন পুত্রই ইরানের যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হোন না কেন, কখনো যদি মহান রুশ সরকারের নিকট সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেন তা প্রদানে রুশ সরকার অস্বীকৃতি জানাবেন না।"

ঐ সময় আব্বাস মীর্যা ছিলেন ইরানের যুবরাজ। যদিও বাহ্যতঃ চুক্তির এ ধারাটি তাঁর যুবরাজ পদের প্রতি রুশদের সমর্থন হিসেবে সংযোজিত হয়েছিল, কিন্তু কার্যতঃ এর একমাত্র অর্থ ছিল ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশদের হস্তক্ষেপের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা, অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় দফা রুশ-ইরান যুদ্ধ

ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে গোলেস্তান চুক্তি সম্পাদন এবং দ্বিতীয় দফা যুদ্ধ শুরু হবার মধ্যবর্তী সময়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ করার মত ঘটনাবলী চোখে পড়ে তা হচ্ছে, ইরানে কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা এবং ইরান ও তুরস্কের ওসমানী সরকারের মধ্যে যুদ্ধ। বাহ্যিক বিচারে এ যুদ্ধ ইরানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এছাড়া এ সময় আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

এ সময়ের মধ্যে রুশরা উত্তর ইরানের দখলীকৃত এলাকাসমূহের মুসলমানদের ওপর এমন অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচার চালায় যে, তাদের আর্তচীৎকার অহরহ ইরানী জনগণের কানে এসে পৌঁছতে থাকে। ফলে ইরানের মুসলিম জনগণের অন্তরে রুশদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ইরানের ইসলামী ভূখন্ডের একটি বিরাট অংশের বিচ্ছিন্নতা ও কাফেরদের দেশের সাথে তার সংযুক্তি এবং রুশ কাফেরদের আধিপত্যের অধীন মুসলমানদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের খবর ইরানের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে গুরুতররূপে আহত করে। এছাড়া বিভিন্ন শহরের বহু সংখ্যক মার্জা'[১৫] ও আলেম দখলদার ও হানাদার দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ বলে ফতোয়া দেন। এর ফলে ইরানের মুসলিম জনগণের মধ্যে বিরাট ভাবাবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[১৬] ইতিমধ্যে আলেম ও মার্জা'গণের দেয়া এতদসংক্রান্ত ফতোয়াসমূহ "রিসালায়ে জিহাদিয়াহ্"[১৭] নামে সংকলিত হয় এবং জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে শত্রু কবলিত ইসলামী ভূখন্ড উদ্ধারের জন্যে জিহাদের প্রতি আগ্রহ ও এর অপরিহার্যতার প্রতি বিশ্বাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইরানের মুসলিম জনগণ রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে যুদ্ধ শুরু করার জন্য একটি উপলক্ষ্য প্রয়োজন ছিল। আর এ ধরনের উপলক্ষ্যে সৃষ্টির সুযোগ গোলেস্তান চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। অবশ্য প্রথমে ইরানের শাসকগোষ্ঠীও বিষয়টি লক্ষ্য করেনি।

গোলেস্তান চুক্তিতে দু'দেশের মধ্যকার সীমান্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল না। এ কারণে রুশরা ইরাভনের নিকটবর্তী ইরানী চারণভূমি হিসেবে পরিগণিত সীমান্তবর্তী এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে। তারা আরো বহু জায়গায় এ ধরনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটায় ও সীমালংঘন করে। কিন্তু যুবরাজ আব্বাস মীর্যা দৃশ্যতঃ রুশদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি ইরানে

www.pathagar.com

নিয়োজিত রুশ রাষ্ট্রদূত ইয়ারমোলোভ[১৮]-এর সাথে আলোচনা করেন এবং এর ফলে সংকট ও উত্তেজনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

এদিকে মারজা'গণ ও ওলামায়ে কেরাম দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ওপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে ইরাক,[১৯] ইস্ফাহান ও তেহরান থেকে দলে দলে লোক সংগ্রহ করে জিহাদের লক্ষ্যে আজারবাইজানের দিকে রওয়ানা হন। এমতাবস্থায় রুশ রাষ্ট্রদূত ইরানের শাহের সাথে সাক্ষাতের জন্যে তাঁর দরবারে আগমনের অনুমতি চাইলে শাহ্ সে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে রুশরা ইরানে হামলা চালাবার ছুতা পেয়ে যায় এবং তারা ইরানে হামলা চালায়। এভাবে দ্বিতীয় দফা ইরান-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আব্বাস মীর্যা হঠাৎ করে এমনভাবে রুশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যা তাদের নিকট ছিল অভাবনীয়। আলেম সমাজ ও মারজা'গণের ফতোয়ায় উদ্বুদ্ধ আবেগে উদ্দীপিত মুসলিম জনগণের সহযোগিতায় ইরানী বাহিনী, ইতিপূর্বে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ভূখন্ডের বেশ কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু ইরানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা ও আব্বাস মীর্যার বাহিনীর সামরিক ভিত্তির দুর্বলতার কারণে, বিশেষ করে যুদ্ধপরবর্তীকালে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী বাহিনী গঠনে তাঁর ব্যর্থতার ফলে, এবং সবশেষে কতক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শাসকগোষ্ঠীর কোন কোন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতিতে রুশ উপনিবেশবাদের জুলুম-আগ্রাসনের পুরোপুরি মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি।

যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে দখলদার রুশদের জুলুম-অত্যাচারে ওষ্ঠাগতপ্রাণ বাকু, শাক্কী, শেরভন্ ও অন্যান্য এলাকার জনসাধারণ বিদ্রোহ শুরু করে। শুধু তা-ই নয়, রুশদের অবর্ণনীয় পৈশাচিকতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, সুযোগ পাবার সাথে সাথে দাগেস্তানের জনগণ রুশদেরকে পাইকারীভাবে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফলে সেখানে ইরানী বাহিনীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। এদিকে আব্বাস মীর্যা কারাহ্বাগে নিজেই সৈন্য চালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন; তিনি শূশী দখল করার পর তিফলিসে গিয়ে উপনীত হন। যেহেতু শূশীর অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়েছিল সেহেতু রুশরা তিফ্লিসে অনেক বেশী সৈন্য জমায়েত করার সুযোগ পেয়ে যায়। অন্যদিকে একই সময় রুশ ও ওসমানীদের মধ্যকার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বিখ্যাত রুশ সেনাপতি প্যাস্কোভিচের[২০] নেতৃত্বে আরেক দল নতুন সৈন্য ইরান অভিমুখে রওনা হয়। শেষ পর্যন্ত রুশ বাহিনী গানজাহ্ অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হিজরী ১২৪২ সালে[২১] আমীর খান সার্দর্[২২] ও মোহাম্মদ মীর্যার পরিচালনাধীন ইরানী বাহিনীর একাংশের মুখোমুখী হয়। আমীর খান সার্দর্ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হন। অন্যদিকে মোহাম্মদ মীর্যা সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু পথে তিনি রুশদের হাতে বন্দী হন। তবে অচিরেই ইল্ শাহ্সুন্[২৩] যাযাবর গোত্রের একজন নেতা তাঁকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এদিকে গান্জার প্রশাসক রুশবাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যান এবং শহর পতনের সাথে সাথে অন্যত্র পালিয়ে যান।

গান্জাহ্ যুদ্ধ

আমীর খান সার্দর্ ও মোহাম্মদ মীর্যার নেতৃত্বাধীন ইরানী বাহিনীর পরাজয় এবং গান্জাহ্র পতনের খবর পেয়ে আব্বাস মীর্যা গান্জাহ্ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু তিনি গান্জায় উপনীত হবার আগেই রুশ সেনাপতি প্যাস্কোভিচ এগিয়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইতোমধ্যে ইরানের

www.pathagar.com

শাহী সরকারের প্রধানমন্ত্রী[২৪] আসেফুদ্দাওলাহ্ কাজার[২৫] বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইরানী বহিনীর মধ্যে চরম অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আব্বাস মীর্যা সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হননি। এ রাজনৈতিক সমস্যার পরিণতিতে রুশবাহিনীর সাথে যুদ্ধে ইরানী বাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

রুশ সেনাপতি প্যাস্কোভিচ গান্জার বিজয়ের পর কোন বড় ধরনের বাধা ছাড়াই ইরাভন্ দখল করে নেন। এরপর তিনি আরাস্ নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত আব্বাস আবাদ দখল করেন এবং আজারবাইজানের দিকে অনগ্রসর হন। এখান থেকে তিনি খুই[২৬], মারান্দ্[২৭] ও তাব্রীযের দিকে রওয়ানা হন।

রুশবাহিনী যখন তাব্রীযে উপনীত হয় তখন তাব্রীযের কর্তৃত্ব ছিল আসেফুদ্দাওলাহ্র হাতে। কিন্তু আসেফুদ্দালাহ্ ছিলেন বিজাতীয়দের গোলাম, তেমনি ছিলেন ভীরু কাপুরুষ। বিশ্বাসঘাতক আসেফুদ্দাওলাহ্ রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ সৃষ্টির পরিবর্তে [illegible] বশতঃ, বরং অধিকতর সঠিকভাবে বলতে গেলে, দুশমনদের নিকট দেশ বিক্রির মানসে, একটি বাসগৃহে আশ্রয় নেন ও আত্মগোপন করে থাকেন। ফলে তাব্রীয খুব সহজেই রুশবাহিনীর পদানত হয়। রুশবাহিনী তাব্রীয দখলের পর সেখানে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালায়।

এ অবস্থায় আব্বাস মীর্যা আশা-ভরসা ও মনের বল হারিয়ে ফেলেন। তথাপি তিনি উত্তর ইরানের তুর্কামানচাই এলাকায় প্যাস্কোভিচের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। অগত্যা আব্বাস মীর্যা সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হন। প্যাস্কোভিচ কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

দু'পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য যখন আলোচনা চলছিল ঠিক সে মুহূর্তে ইরানী বাহিনীর পরাজয়ের খবর সারা ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাস মীর্যার ভাই খোরাসান প্রদেশের শাসক শুজাউস্ সাল্তানাহ্[২৮] নিজের জন্য সুনাম সৃষ্টি এবং আব্বাস মীর্যাকে বেকায়দায় ফেলে অপমানিত করার লক্ষ্যে রণাঙ্গনের দিকে রওনা হন। অন্যদিকে ফাৎহ্ আলী শাহ্ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এড়াবার চিন্তায় মশগুল ছিলেন। এমতাবস্থায় শুজাউস্ সাল্তানাহ্ যুদ্ধে রওনা হলে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন এবং তাঁকে কায্ভীন্ অভিমুখে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

রুশ সেনাপতি প্যাস্কোভিচ ছিলেন আপদমস্তক অহঙ্কারে নিমজ্জিত। শুজাউস্ সাল্তানাহ্র রওনা হবার খবর পেয়ে তিনি আলোচনা স্থগিত করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, পাঁচ দিনের মধ্যে শান্তিচুক্তি প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালা না হলে তিনি তেহরানে অভিযান চালাবেন। আব্বাস মীর্যা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শাহের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সম্মত করান। ফলে হিজরী ১২৪৩ সালের ৫ই শাবান[২৯] ইরান রাশিয়ার সাথে লজ্জাজনক তুর্কামান্চাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এতে ইরানের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন হাজী মীর্যা আবুল হাসান খান এবং ফাৎহ্ আলী শাহ্র প্রধানমন্ত্রী আল্লাহিয়ার খান আসেফুদ্দাওলাহ্।

তুর্কামান্চাই চুক্তির বিষয়বস্তু

ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত তুর্কামান্চাই চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। ইরানী পক্ষ ইরাভন্ ও নাখ্জাওয়ানের[৩০] জমিদার শাসিত এলাকাসমূহ[৩১] রাশিয়ার এখতিয়ারে ছেড়ে দিতে এবং তালেশ্ ও মুকান্ থেকে ইরানী বাহিনী সরিয়ে নিতে সম্মত হয়।

www.pathagar.com

২। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইরান কিস্তিতে রাশিয়াকে ৫০ লাখ তুমান্[৩২] প্রদানে সম্মত হয়।

৩। কাস্পিয়ান সাগরে এবং তার উপকূলে রুশ বাণিজ্য জাহাজসমূহকে অবাধে চলাচলের অনুমতি দেয়া হয়।

৪। ইরান ও রাশিয়া বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয় এবং রুশরা প্রয়োজন মনে করলে ইরানী ভূখণ্ডের যে কোন এলাকায় কন্স্যুলেট অফিস ও বাণিজ্য প্রতিনিধি দফতর খোলার অধিকারপ্রাপ্ত হয়।

৫। রাশিয়া যুবরাজ আব্বাস মীর্যার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং শাহের মৃত্যুর পর তিনি যাতে ক্ষমতাসীন হতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাতে অঙ্গীকার করে।

৬। উভয় পক্ষ পরস্পর বন্দী মুক্তকরণে সম্মত হয়।

৭। রাশিয়ার কন্স্যুলেটসমূহকে বিচারকার্য চালাবার অধিকার (ক্যাপিচুলেশন) দেয়া হয়।

হিজরী ১২৪৩ সালে সম্পাদিত অপমানজনক তুর্কামান্চাই চুক্তির পরে শীঘ্রই ইরান রাশিয়ার সাথে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। এ চুক্তিতে ইরানের সকল বাজার কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ও বিধি-নিষেধ ছাড়াই রুশ ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

টীকা ঃ

(১) بطر — Peter. রুশ ইতিহাসকাররা তাঁকে Peter the Great— (মহামতি/মহান পিটার) বলে উল্লেখ করে থাকেন।

(২) পিটার তাঁর বিখ্যাত উপদেশবাণীতে বলেন ঃ

"কনস্টান্টিনোপল (قسطنطنيه —ইস্তাম্বুল) এবং ভারতের যত বেশী সম্ভব নিকটবর্তী হওয়া (জরুরী)। যে কেউ এ এলাকার অধিকারী হবে কার্যতঃ সে সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হবে।

"অতএব, এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে অনবরত যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে হবে; শুধু তুর্কী সাম্রাজ্যে নয়, বরং ইরানেও। আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৃষ্ণ সাগরের আশেপাশে জাহাজ তৈরীর কারখানা গড়ে তোলা এবং ক্রমান্বয়ে বাল্টিক সাগরের ন্যায় এ সাগরকে দখল করে নেয়া অপরিহার্য প্রয়োজন। তেমনি ইরানকে দুর্বল করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে হবে এবং সম্ভব হলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের সাথে সাবেক বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরপর সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার রূপ ভারত পর্যন্ত অগ্রযাত্রা করতে হবে।"

(رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان-ص-۲۳)

যদিও অনেকে পিটারের উপদেশ (উইল)—কে বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন, তথাপি রুশ রাষ্ট্রনেতাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ ব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তাঁরা পিটারের নামে প্রচলিত উক্ত উপদেশকেই নিজেদের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ঠিক এর ভিত্তিতেই চলেছিলেন।

(৩) রুশদের বলকানের দিকে অভিযান, পূর্ব ইউরোপ হামলা এবং মধ্য এশিয়া বা এশিয়া মাইনরে ব্যাপক হামলার পিছনে তাদের এ আধিপত্যবাদী নীতিই কার্যকর ছিল।

(৪) রুশরা যে ভারতের ওপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করত এবং ঐ অঞ্চলটি হস্তগত করার জন্য কিরূপ সচেষ্ট ছিল তা বুঝার জন্য রাশিয়ার জার প্রথম পলের পক্ষ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী রাশিয়ার কাজ্জাক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রিন্স উরলোভ (پرنس اورلوف) বরাবরে প্রেরিত নির্দেশনামার প্রতি দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট। প্রথম পল তাঁর এ নির্দেশনামায় বলেন ঃ

www.pathagar.com

"বৃটেন আমাদের মিত্র সুইডেন ও ডেনমার্কের ওপর হামলা চালানোর জন্য যুদ্ধজাহাজ ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছে। অতএব, আমাদেরকেও তাদের ওপর হামলা করতে হবে। কিন্তু আমাদের এ হামলা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিচালনা করতে হবে যে, সেখানে আমাদের হামলা যেন বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, অথচ সেখানে হামলা চালানোকে যেন ইংরেজরা তেমন একটা সম্ভব মনে করতে না পারে। উরেন্‌বার্গ (اورنبورغ) থেকে ভারত তিন মাসের পথ, আর মস্কো থেকে উরেন্‌বার্গ হচ্ছে এক মাসের পথ। মোট পথের পরিমাণ চার মাস। আমি সেখানকার উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী এ সেনাবাহিনীকে তোমার অধিনায়কত্বে অর্পণ করলাম; দায়িত্ব পালন করতে পারলে তোমাদের সকলের জন্যেই অনেক সুযোগ—সুবিধার ব্যবস্থা হবে। আর আমাদের জন্যে তা অনেক ধন—সম্পদ নিয়ে আসবে। তেমনি আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর জন্য চমৎকার বাজারের ব্যবস্থা হবে। অন্যদিকে দুশমনের বক্ষে তা মারণ আঘাত হানতে সক্ষম হবে।

"তেমনি আমরা আরো একটি দায়িত্বও পালন করব। তা হচ্ছে ভারতের জনগণকে মুক্তি দান। আর ভারতের জনগণ আজকে যেমন ইংরেজদের অনুগত হয়ে আছে তেমনি পরে তারা আমাদের অনুগত হয়ে থাকবে। তেমনি আমাদেরকে ঐ বিশাল ভূখন্ডের সকল ব্যবসা—বাণিজ্যকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে হবে।"

(৫) گرگین خان

(৬) ১১৭৯ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

(৭) ১১৮১ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৮০২ খৃষ্টাব্দ।

(৮) سیانف

(৯) رود ارس — নদীটি বর্তমান আজারবাইজান রাষ্ট্র এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মধ্যসীমান্ত।

(১০) اچمیازین

(১১) اصلاندوز

(১২) ১১৯১ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৩) مرقان

(১৪) علیای طالش

(১৫) مرجع অর্থাৎ مرجع تقلید (মারজায়ে তাক্‌লীদ)। ন্যায়বান, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী যুগসচেতন ও যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানে সক্ষম মুজতাহিদ ফকীহ্ সাধারণ মুসলিম জনগণ যাঁকে অনুসরণ করে।

(১৬) এ যুগে যেসব দ্বীনী নেতা জিহাদের ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ অগা সাইয়েদ আলী তাবাতাবায়ী, শেখ মোহাম্মাদ নাজাফী, মোল্লা আহ্‌মাদ নারাকী, আয়াতুল্লাহ্ মোজাহেদ প্রমুখ খ্যাতনামা মুজতাহিদ ও মারজা'গণ।

(১৭) رساله جهادیه

(১৮) یرملوف

(১৯) ঐ সময় বর্তমান ইরাকের বেশীর ভাগ এলাকাই ইরানের অংশ ছিল।

(২০) پاسکوویچ

(২১) ১২০৫ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ।

(২২) امیر خان سردار

www.pathagar.com

(২৩) ابل شاهسون

(২৪) صدر اعظم Chancellor.

(২৫) آصف الدولة قاجار — পুরো নাম আল্লাহিয়ার খান আসেফুদ্দাওলাহ্ কাজার
(اللهیار خان آصف الدولة قاجار)

(২৬) خوی

(২৭) مرند

(২৮) شجاع السلطنه

(২৯) মোতাবেক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী।

(৩০) نخجوان– বর্তমান আজারবাইজান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভূখণ্ডগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন; ইরান ও আর্মেনিয়ার মাঝে অবস্থিত।

(৩১) خانات –তখন ঐ এলাকার প্রায় পুরোটাই জমিদারদের মাধ্যমে শাসিত হত।

(৩২) ৫ কোটি রিয়াল। ঐ সময় হাজার দিনারে এক রিয়াল হত।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোহাম্মদ শাহ্ ও নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামল

ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র পুত্র যুবরাজ আব্বাস মীর্যা মসনদে বসার পূর্বেই হিজরী ১২৪৯ সালে[১] মারা যান। যেহেতু ফাৎহ্ আলী শাহ্ আব্বাস মীর্যাকে খুবই ভালবাসতেন সেহেতু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহাম্মদ মীর্যাকে যুবরাজ পদে মনোনীত করেন। এর এক বছর পর হিজরী ১২৫০ সালে[২] ফাৎহ্ আলী শাহ্ ইন্তেকাল করেন। তখন মোহাম্মাদ মীর্যার বয়স ছিল কম; কায়েম মাকাম ফারাহানীর[৩] প্রচেষ্টায় তিনি পিতামহের সিংহাসনে বসতে সক্ষম হন এবং মোহাম্মাদ শাহ্ হিসেবে পরিচিত হন। কায়েম মাকাম ফারাহানী তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও প্রধানমন্ত্রী[৪] হিসেবে দেশ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই মোহাম্মাদ শাহ্ কায়েম মাকাম ফারাহানীকে হত্যা করেন এবং হাজী মীর্যা অগ্বাসীকে[৫] তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

হাজী মীর্যা অগ্বাসী ছিলেন ইরাভনের অধিবাসী এবং মোহাম্মাদ শাহ্‌র আধ্যাত্মিক নেতা। মোহাম্মাদ শাহ্ নিজেকে তাঁর মুরীদ হিসেবে গণ্য করতেন এবং পুরোপুরি তাঁর প্রভাবাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন।

মোহাম্মদ শাহ্ ১৪ বছর রাজত্ব করেন এবং হিজরী ১২৬৪ সালে[৬] মারা যান।

আফগানিস্তান অভিযান ও হেরাত অবরোধ

ইরান-রাশিয়া যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর ফাৎহ্ আলী শাহ্ পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করেন। এ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর যে ব্যর্থতা ও কাপুরুষতা প্রমাণিত হয়েছিল তিনি তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে তিনি আফগানিস্তানে অভিযান চালান এবং হেরাত দখল করেন। এ সময় রুশরাও তুর্কিস্তান ও মধ্য এশিয়ায়[৭] নিজেদের আধিপত্য ও রাজত্ব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল। ফলে নানা কারণে তারা ইরানীদের আফগানিস্তান অভিযানে সায় দেয়। এ কারণগুলো ছিল ঃ

প্রথমতঃ ইরানের শাহী দরবার আফগানিস্তানের দিকে দৃষ্টি দিলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেশের পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব সীমান্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবে। ফলে উত্তর ইরানের রুশ দখলকৃত এলাকা সম্পর্কে শাহী দরবারের পক্ষে চিন্তা করার অবকাশ থাকবে না এবং সেখানে রুশ নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নির্ঝঞ্ঝাট হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া চাচ্ছিল মধ্য এশিয়ায় তাদের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতার দিকে বৃটিশদের মনোযোগ হ্রাস পাক। এ জন্য রাশিয়া বৃটিশদের মনোযোগ অন্য কোন সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করতে এবং ভারতের সীমান্তে[৮] ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বৃটিশদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল, ইরানের এ পদক্ষেপের ফলে রাশিয়ার পক্ষে তার উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল।

ফলতঃ রুশদের উৎসাহ ও উস্কানির ফলে ফাৎহ্ আলী শাহ্ যুবরাজ আব্বাস মীর্যাকে দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে তেহ্‌রানে ডেকে নিয়ে আসেন এবং হেরাত অভিযানে পাঠান।

www.pathagar.com

ঐ যুগে হেরাতকে ভারত উপমহাদেশের প্রবেশদ্বার এবং ইরানের অংশ হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু বাস্তবে তা ইরানের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ঐ সময় হেরাতের শাসক ছিলেন কাম্‌রান মীর্যা[৯]; তিনি ইরান সরকারের আনুগত্য করতেন না। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তিনি সিস্তানেও[১০] হামলা করতেন। আব্বাস মীর্যা হেরাত অভিযানে রওনা হয়ে প্রথমে খোরাসানে[১১] উপনীত হন। সেখানে তিনি তাঁর পুত্র মোহাম্মদ মীর্যাকে দায়িত্বে রেখে স্বয়ং হেরাত অভিমুখে অগ্রসর হন।

ফাৎহ্ আলী শাহ্ এ সময় গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর ভয় ছিল যে, তিনি হয়তো যুবরাজের অনুপস্থিতিতে মারা যাবেন এবং এর ফলে দেশে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই তিনি আব্বাস মীর্যাকে তেহ্‌রানে ডেকে পাঠান। এমতাবস্থায় আব্বাস মীর্যা পুত্র মোহাম্মদ মীর্যাকে হেরাত অভিযানে পাঠিয়ে নিজে তেহ্‌রানে ফিরে আসেন। মোহাম্মদ মীর্যার পর কায়েম মাকাম ফারাহানীও বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে হেরাত অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে আব্বাস মীর্যা মারা যান। তাই মোহাম্মদ মীর্যাকে যুবরাজ মনোনীত করা হয়। এমতাবস্থায়, যে কারণে আব্বাস মীর্যা তেহ্‌রানে ফিরে গিয়েছিলেন সেই একই কারণে মোহাম্মদ মীর্যার জন্যও তেহ্‌রানে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য আর অনুকূল থাকলো না। অগত্যা মোহাম্মদ মীর্যা কামরান মীর্যার সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী কামরান মীর্যা প্রতি বছর ইরানের শাহ্‌কে কর প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

কিন্তু ফাৎহ্ আলী শাহ্‌র মৃত্যু ও মোহাম্মদ শাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণের পর হেরাতের শাসক কামরান মীর্যা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন। চুক্তির শর্ত লংঘন করে তিনি কর প্রদানে বিরত থাকেন। এ পরিস্থিতিতে একদিকে রুশরা মোহাম্মাদ শাহ্‌কে হেরাত আক্রমণের উস্কানি দিতে থাকে, অন্যদিকে ইংরেজরা তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তেহ্‌রানস্থ্ বৃটিশ কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিদের চেষ্টা সত্ত্বেও মোহাম্মদ শাহ্ হেরাত অভিযান পরিচালনা করেন এবং শহরটি অবরোধ করেন।

মোহাম্মদ শাহ্ হেরাত অবরোধ করলে ইংরেজরা প্রথমে কাবুলের আমীর দোস্ত্ মোহাম্মদ খানকে[১২] ইরানের বিরুদ্ধে কামরান মীর্যাকে সাহায্যের জন্য উস্কানি দিতে থাকে। কিন্তু এতে তারা সফল হলেন না; দোস্ত মোহাম্মাদ খান ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হলেন না। অগত্যা ইংরেজরা তাদের রাষ্ট্রদূতকে হেরাতের পাশে যুদ্ধ শিবিরে অবস্থানরত মোহাম্মাদ শাহ্‌র নিকট পাঠিয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। অথচ একই সময় বৃটিশ সামরিক অফিসাররা হেরাতে কামরান মীর্যার সেনাবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কামরান মীর্যার প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছিলেন।

শান্তি আলোচনা শুরু হবার উপক্রম হতেই রাশিয়া তার তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং তেহ্‌রানস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতকে হেরাতে মোহাম্মদ শাহ্‌র নিকট পাঠায়। রাশিয়া ইরানী বাহিনীকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে হেরাত দখলে উৎসাহিত করে। মোহাম্মদ শাহ্ এতে প্রভাবিত হন এবং হেরাত দখলের সিদ্ধান্ত নেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত যখন স্বাভাবিক পন্থায় শাহ্‌কে হেরাত আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হলেন না তখন হুমকির আশ্রয় নিলেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত হুমকি দিলেন যে, শাহ্ হেরাত দখল থেকে বিরত না থাকলে বৃটিশ বাহিনী সামরিক হস্তক্ষেপ করবে; এ হুমকি দিয়ে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে মোহাম্মদ শাহ্‌র শিবির থেকে বেরিয়ে যান।

কিছুদিন পর বৃটিশ বাহিনী ইরানের খার্ক দ্বীপ[১৩] দখল করে নেয় এবং হুমকি দেয় যে, ইরান হেরাত অবরোধ তুলে না নিলে বৃটিশ বাহিনী ইরানী ভূখণ্ডে প্রবশ করবে। মোহাম্মদ শাহ্ যখন দেখলেন

www.pathagar.com

যে, তাঁর পক্ষে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং রুশদের পক্ষ থেকেও কার্যতঃ কোন সাহায্যপ্রাপ্তির আলামত নেই, তখন তিনি হেরাত অবরোধ তুলে নেন এবং অত্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তেহ্‌রানে ফিরে আসেন।

আর্‌যানাতুর্‌ রুমের[১৪] চুক্তি

মোহাম্মদ শাহের শাসনামলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ওসমানী সরকারের সাথে আর্‌যানাতুর্‌ রুমের চুক্তি সম্পাদন।

ইতিপূর্বে ওসমানী তুর্কী সাম্রাজ্য ও ইরান সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ধরনের বিরোধ চলে আসছিল। এ বিরোধ কাজার বংশের শাসনামল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফাৎহ্‌ আলী শাহ্‌র শাসনামলে আব্বাস মীর্যা ওসমানী সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডে অভিযান চালিয়েছিলেন। যদিও এ অভিযানে ইরানী বাহিনী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হাসিল করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ থেকে ইরান কোনরূপ লাভবান হতে পারেনি। অবশেষে উভয় দেশ সন্ধি করতে রাজী হয়।

মোহাম্মদ শাহের আমলে ইরান এবং ওসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উভয় দেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বহুবার পরস্পরের ভূখণ্ডে হামলা চালায়। দু'দেশের মধ্যে শত্রুতা মারাত্মক আকার ধারণ করলে রাশিয়া ও বৃটেন মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ইরানী ও ওসমানী সরকারের প্রতিনিধিগণ বৃটিশ ও রুশ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আর্‌যানাতুর্‌ রুম্‌ শহরে আলোচনা শুরু করবেন।

এ আলোচনায় ইরানী পক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন মীর্যা তাকী খান ফারাহানী[১৫] যিনি পরে নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে ইরানের সদ্‌রে আ'যম (প্রধানমন্ত্রী) হন। তিনি প্রায় তিন বছরকাল আর্‌যানাতুর্‌ রুম্‌ শহরে অবস্থান করেন এবং ওসমানী সরকারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত হিজরী ১২৬২ সালের ১৬ই জমাদিউস্‌সানী তারিখে[১৬] আর্‌যানাতুর্‌ রুম্‌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ইরান সরকার বিরোধীয় কিছু এলাকার ওপর থেকে স্বীয় দাবী প্রত্যাহার করে নেয়। বিনিময়ে ওসমানী সরকারও খোর্‌রম শহর[১৭] ও আর্‌বান্দ্‌ নদীর বাম তীরের[১৮] ওপর ইরানের অধিকার স্বীকার করে নেয়। তেমনি আর্‌বান্দ্‌ নদীতে ইরানের নৌ-চলাচলের অধিকারও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়। এছাড়া ওসমানী সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকায় ইরানী বণিকদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারেও ওসমানী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

উপনিবেশবাদীদের উদ্যোগে ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব

বৃটিশ ও রুশ উপনিবেশবাদী শক্তি ইরানকে এবং ইরানী জনগণকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা ইরানী জনগণের দ্বীনী ও মাজহাবী ঐক্যকে নিজেদের জন্যে একটা বিরাট বিপদ বলে মনে করত। এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বাতিল ফির্কাহ্‌ তৈরীর মাধ্যমে ইরানের জনগণের ইসলামী ঐক্যকে বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর ফলশ্রুতিতেই মোহাম্মাদ শাহের শাসনামলে বাবিয়্যাৎ[১৯] ও নাসিরুদ্দিন শাহের আমলে বাহাই[২০] ধর্মের উদ্ভব ঘটে; উভয় মতবাদই উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামল

"দেশের উত্তরাঞ্চলে যেতে চাই, কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আপত্তি করছেন। দক্ষিণ যেতে চাই, কিন্তু রুশ রাষ্ট্রদূত আপত্তি করছেন। মুর্দাকে গোসল দেয়া যার কাজ তার হাতে তুলে দাও এ রাজত্ব যে রাজত্বে বাদশাহ্ তাঁর রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণে সফর করার অধিকার রাখেন না।"

— নাসিরুদ্দীন শাহ্

নাসিরুদ্দীন শাহ্

হিজরী ১২৬৪ সালে[২১] মোহাম্মদ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর ষোল বছর বয়স্ক পুত্র নাসিরুদ্দীন মীর্যা[২২] ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর সময় তিনি তাব্রীযে ছিলেন। সেখান থেকে তেহ্রান রওনা হবার পূর্বেই তিনি মীর্যা তাকী খান ফারাহানীকে সদ্‌রে আ'যম বা প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করেন। যেহেতু মীর্যা তাকী খান অত্যন্ত সুযোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু তাঁর সহায়তায় নাসিরুদ্দীন শাহ্ সিংহাসনের অন্যান্য দাবীদার ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তেহ্রানে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

নাসিরুদ্দীন শাহ্ সুদীর্ঘকাল ইরানে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল প্রায় ৫০ বছর। তাঁর এ দীর্ঘ রাজত্বকালে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এখানে তার মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

আমীর কবীরের প্রধানমন্ত্রিত্ব ও তাঁর পদক্ষেপসমূহ

মীর্যা তাকী খান ফারাহানী যিনি আমীর কবীর[২৩] নামে সমধিক প্রসিদ্ধ — ইরানের ইতিহাসে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। ১২৬৪ হিজরীর ২১শে জিলকাদ[২৪] নাসিরুদ্দীন শাহ্‌র ক্ষমতাসীন হবার দিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত হন। কিন্তু তাঁর পিতা কার্‌বালায়ী কোর্‌বান[২৫] ছিলেন একজন বাবুর্চী মাত্র। আমীর কবীর প্রথমে তাঁর পিতার সাথে কায়েম মাকাম ফারাহানীর (মোহাম্মাদ

www.pathagar.com

শাহ্‌র হাতে নিহত সদ্‌রে আ'যম) প্রশাসনে স্থান লাভ করেন। আর যেহেতু কর্মজীবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায় সেহেতু তাঁকে কায়েম মাকাম ফারাহানীর সচিব পদে মনোনীত করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে মীর্যা মোহাম্মদ খান যাঙ্গানের[২৬] সহকারী পদে নিযুক্ত করা হয়। মোহাম্মদ শাহের শাসনামলে আমীর কবীরকে বেশ কয়েকবার রাজনৈতিক গুরুদায়িত্ব দিয়ে রাশিয়ায় এবং ওসমানী সাম্রাজ্যে পাঠানো হয়। এসব সফরে তিনি এ দু'টি দেশের ঘটনাবলী ও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান যা তাঁকে ইরানে পরিবর্তন সাধনের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

মীর্যা তাকী খান আমীর কবীর

মীর্যা তাকী খান আমীর কবীর প্রধানমন্ত্রী হবার পর শাহের সহোদরা বোনকে বিয়ে করেন এবং এর ফলে শাহের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। আমীর কবীরের প্রধানমন্ত্রিত্বের শুরুর দিকে ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ছিল। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বল্পকালের মধ্যেই সকল বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১। ইতিপূর্বে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই শাহী দরবার থেকে লোকদেরকে অসংখ্য খেতাব দেয়া হত এবং খেতাবপ্রাপ্ত লোকেরা তা অবৈধ স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করতেন; আমীর কবীর সে সব খেতাব ও উপাধি প্রদানকে সীমিত করে দেন।

২। তিনি ঘুষ প্রতিরোধ করেন এবং সরকারী কর্তাব্যক্তিরা সরাসরি জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে যে অতিরিক্ত আয়ের অধিকারী হতেন তিনি তা বন্ধ করে দেন।

৩। তিনি দেশের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, দরবারের ব্যয় সীমিত করেন এবং পারিষদবর্গ ও শাহ্‌যাদাদের বেতনের হার হ্রাস করে দেন।

৪। তিনি কর ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলিত করেন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেন।

৫। তিনি বিভিন্ন পেশার কাজ ও শিল্পের কাজ শেখার জন্য একদল লোককে ইউরোপে পাঠান ও কৃষি উন্নয়ন সাধন করেন।

৬। তিনি শিক্ষিত সৈনিক, ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দান, তাঁদেরকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করে তোলা এবং উপকারে আসতে পারে এমন গ্রন্থের অনুবাদ ও দৈনিক

www.pathagar.com

পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে একটি 'দারুল ফুনূন'[২৭] প্রতিষ্ঠা করেন।

৭। তিনি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৮। তিনি ইরানে রাশিয়া ও বৃটেনের প্রভাব হ্রাস ও সীমিত করে ফেলেন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের দরজা বন্ধ করে দেন।

আমীর কবীরের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে দেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশ উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ পারিষদবর্গ, ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী এবং ইরানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিজেদের জন্য স্বার্থহানিকর বিবেচনাকারী বৈদেশিক শক্তিবর্গ এতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নাসিরুদ্দীন শাহের মাতা মাহ্দ আলীয়া[২৮] রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন; আমীর কবীর তাঁর হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিধায় তিনিও তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় আমীরের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট দেশী-বিদেশী সকল অপশক্তি মাহ্দ্ আলীয়ার সহায়তায় আমীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে শাহ্কে সন্দিহান করে তোলার চেষ্টা করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত হিজরী ১২৬৮ সালে[২৯] শাহ্ আমীর কবীরকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের ফরমান জারী করেন এবং তাঁকে কাশানে[৩০] পাঠিয়ে দেন। মাহ্দ্ আলীয়া ও ইংরেজদের ভাড়াটে এজেন্ট অন্যতম সভাসদ মীর্যা অগা খান নূরী[৩১] ভয় করছিলেন, খুব শীঘ্রই হয়তো আমীর কবীর সম্পর্কে শাহের সিদ্ধান্ত বদলে যেতে পারে এবং শাহ্ তাঁকে পুনরায় পূর্ব পদ ফিরিয়ে দিতে পারেন। তাই তাঁরা আমীরের পদচ্যুতির ফরমান নিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না, বরং তাঁকে হত্যার জন্যেও শাহের নিকট থেকে ফরমান আদায় করলেন। শেষ পর্যন্ত একই বছর কাশানের ফীন্[৩২] নামক রাজকীয় গোসলখানায় ঘাতক পাঠিয়ে রগ কেটে তাঁকে হত্যা করা হয়। এভাবে উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের এ মহানায়ক বীরপুরুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্যারিস চুক্তি ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতা

আমীর কবীরকে হত্যা করার পর অগা খান নূরী প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর শুধু আমীর কবীরের অনুসৃত কর্মধারা অনুসরণ থেকেই বিরত থাকেননি, বরং তিনি এমন নীতি অনুসরণ করতে থাকেন যার ফলে ইতিপূর্বে দেশে যে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি বিরাজ করছিল তার সবকিছুই ফিরে আসে। ইরানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে পশ্চাদপদতার দিকে ঠেলে দেয়ার পর তিনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে হিজরী ১২৭৩ সালে[৩৩] সম্পাদিত প্যারিস চুক্তির পরিণতিতে আফগানিস্তান ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বাধীন আফগানিস্তানের নামে কার্যতঃ তা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

এতেমাদুদ্দাওলাহ্[৩৪] উপাধি ধারণকারী মীর্যা অগা খান নূরীর প্রধানমন্ত্রিত্বের যুগে ক্রিমিয়ায়[৩৫] এবং বলকান উপদ্বীপে বৃটেন, ফ্রান্স ও ওসমানীদের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছিল। এ সময় কাবুলের শাসক দুস্ত্ মোহাম্মদ খান ইংরেজদের তাবেদারে পরিণত হন ও হেরাত দখলের চিন্তা শুরু করেন।

দুস্ত্ মোহাম্মদ খান হেরাত দখলের জন্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় হেরাতের শাসক মোহাম্মদ ইউসুফ মীর্যা খোরাসানের প্রাদেশিক শাসক হোসামুস্ সাল্তানাহ্র[৩৬] নিকট সাহায্য চান।

www.pathagar.com

কিন্তু ইরানী বাহিনী হেরাত পৌছার পর বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এবং হেরাতের ওপর হামলা চালায়। হোসামুস্ সালতানাহ্ খুব সহজেই হেরাত অবরোধ করে ফেলেন এবং দুস্ত মোহাম্মদ খান ও ইংরেজরা বাধা দেয়া সত্ত্বেও তিনি হেরাত দখলে সক্ষম হন।

ইংরেজদের জন্যে হেরাত হাতছাড়া হওয়া ছিল গোটা আফগানিস্তান হাতছাড়া হওয়ার সমার্থক। এ কারণে তারা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দক্ষিণ ইরানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং খার্ক দ্বীপ দখল করে নেয়। এরপর তারা খোর্‌রম শহর এবং বু-শহরও[৩৭] দখল করে নেয়।

ইংরেজদের এ পদক্ষেপে ইরানের শাহী দরবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে দীর্ঘদিন থেকে মীর্যা আগা খান নূরী ইংরেজদের সাথে খারাপ হয়ে যাওয়া তাঁর সম্পর্ককে পুনরায় ঘনিষ্ঠ করার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার চেষ্টা করে আসছিলেন; তিনি প্যারিসে তাঁর প্রতিনিধিকে ইংরেজদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন। ফলে ইরান ও বৃটেনের মধ্যে প্যারিস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিতে ইরান আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়ার এবং হেরাত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার ও শহরটির ওপর আর কোন দাবী না রাখার অঙ্গীকার করে। এ চুক্তিতে ইরান আরো অঙ্গীকার করে যে, ভবিষ্যতে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টি হলে ইংরেজদের রায়কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে।

নাসিরুদ্দীন শাহের আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

দারুল্ ফুনুন প্রতিষ্ঠা ঃ কাজার বংশের শাসনামলের, বিশেষ করে নাসিরুদ্দীন শাহের যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ইরানে ইউরোপীয় দেশসমূহের আদলে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নাসিরুদ্দীন শাহের যুগে প্রতিষ্ঠিত এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাদ্‌রাসায়ে দারুল্ ফুনুন। আমীর কবীর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁরই প্রস্তাবে এবং চেষ্টা-সাধনায় হিজরী ১২৬৬ সালে[৩৮] এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় এবং হিজরী ১২৬৭ সালে[৩৯] সমাপ্ত হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানটি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ততদিনে আমীর কবীর পদচ্যুত হয়েছেন।

মাদ্‌রাসায়ে দারুল্ ফুনুনে ডাক্তারী, ওষুধ তৈরী, অঙ্কশাস্ত্র ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়া হত এবং সামরিক প্রশিক্ষণও দেয়া হত। বিদেশী শিক্ষকগণ এখানে শিক্ষাদান করতেন এবং সমাজের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরা এখানে পড়াশুনা করতো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যাপারে আমীর কবীর যে পরিকল্পনা করেছিলেন পরে তা অনুসৃত হয়নি। তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, কিছুতেই এখানে কোন বৃটিশ বা রুশ শিক্ষক গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে এখানে সকল দেশের শিক্ষকই গ্রহণ করা হয়। এর পরিণতিতে ছাত্রদের মন-মানসে তাবেদারী ও ফিরিঙ্গীদের মোকাবিলায় আত্মপরাজিতের ভাবধারা গড়ে উঠতে থাকে।

পত্রিকা প্রকাশ ঃ নাসিরুদ্দীন শাহের আমলে ইউরোপীয়দের অনুকরণে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয় এবং যা ইরানী জনগণের চিন্তা-চেতনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে তা হচ্ছে পত্রিকা প্রকাশ।

ইরানের প্রাচীনতম পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন মীর্যা সালেহ্ শীরাযী। এ পত্রিকাটি মাসে মাত্র একবার প্রকাশিত হত। এরপর আমীর কবীরের নির্দেশে "ভেগ্বাইয়েয়ে এত্তেফাগ্বীয়ে"[৪০] নামক

www.pathagar.com

পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হত এবং বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী সংবাদ এতে স্থান লাভ করত। কিছুদিন পরে "ভেখাইয়েয়ে এত্তেফাগ্বীয়ে"-এর নাম পরিবর্তন করে "রুযনমে দাওলাতে আলীয়েয়ে ইরান"[৪১] রাখা হয়। এ যুগে সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে 'দৈনিক শারাফ',[৪২] 'মের্‌আতুস্‌ সাফার'[৪৩] ও 'মেশ্‌কাতুল্‌ হাযার'[৪৪]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে ও তার পরে ইরানে এবং অন্যত্র বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ইস্‌লাম্‌বুল[৪৫] থেকে প্রকাশিত দৈনিক আখ্‌তার[৪৬]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এটি একাদিক্রমে[২৩] বছর যাবত প্রকাশিত হয়। এ যুগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল মীর্যা মেল্‌কাম খান মা'রুফ[৪৭] কর্তৃক প্রকাশিত 'দৈনিক কানুন',[৪৮] কোলকাতা থেকে মোআইয়েদুল ইসলাম[৪৯] কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক হাব্‌লুল্‌ মাতীন[৫০] যা নাজাফের[৫১] আলেম সমাজের খেদমতেও প্রেরিত হত এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত 'হিকমাহ'[৫২] ও 'পার্‌ভারেশ'[৫৩]।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন আসাদ আবাদী (আফগানী)[৫৪]

পরবর্তীতে আমাদের আলোচনা থেকে আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পাবে যে, কাজার বংশের শাসনামলে, বিশেষ করে নাসিরুদ্দীন শাহের আমলে ইরানী জনসাধারণ সমকালীন খ্যাতনামা মহান মারজা' ও আলেমগণের নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে জনসাধারণের চিন্তাজগতে পরিবর্তন সাধন এবং তাদের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনের প্রতি আগ্রহসৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ যুগে ইরানের ও বিশ্বের মুসলিম জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিতে যেসব আলেম ব্যক্তিত্ব সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ জামালুদ্দীন হোসেনী আসাদ আবাদী অন্যতম যিনি 'জামালুদ্দীন আফগানী' নামে সমধিক পরিচিত।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন আসাদাবাদী (আফগানী)

সাইয়েদ জামালুদ্দীন ইরানের হামেদানের[৫৫] আসাদ আবাদ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বছর বয়স হবার পর তিনি ঐ যুগের ইরানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসায়, বিশেষ করে কায্‌ভীন ও তেহরানে পড়াশুনা করেন। প্রাথমিক ও প্রস্তুতি পর্যায়ের পড়াশুনা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চতর পর্যায়ের দ্বীনী জ্ঞানার্জনের জন্য নাজাফে গমন করেন। সেখানে তিনি সমকালীন খ্যাতনামা মার্‌জায়ে তাকলীদ হাজ্বী শেখ মোর্তাযা আনসারীর নিকট জ্ঞানার্জন করেন এবং বিচারবুদ্ধিভিত্তিক[৫৬] ও উদ্ধৃতিভিত্তিক[৫৭] উভয় ধরনের জ্ঞানে প্রভূত দক্ষতা হাসিল করেন।

www.pathagar.com

সাইয়েদ জামালুদ্দীন তাঁর যৌবনের শুরুতেই বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং এর সমাধানের চিন্তা করতে থাকেন। শিক্ষাজীবনের সমাপ্তির পর তিনি নাজাফ থেকে ভারতে চলে যান এবং সেখানকার জনসাধারণকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে উপনিবেশবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করেন এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৫৮] কিন্তু ভারতে ইংরেজদের সর্বাত্মক আধিপত্যের কারণে তিনি ভারত ত্যাগে বাধ্য হন। সেখান থেকে তিনি ওসমানী সাম্রাজ্যে চলে যান। সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন, কিন্তু ওসমানী সুলতানের দরবারের আলেমদের হিংসা-বিদ্বেষের সম্মুখীন হন। তাই সেখান থেকে তিনি মিসরে যান। মিসরে তিনি এক উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের চিন্তাগত ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হন এবং "আঞ্জুমানে মাখ্ফী'[৫৯] নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

সাইয়েদ জামালুদ্দীনের পদক্ষেপসমূহ মুসলিম জনগণের মধ্যে বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর ফলে বৃটিশ সরকার এতই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে, লর্ড ক্রোমার[৬০] তাঁর সরকারের নিকট এ মর্মে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যে, সাইয়েদ জামালুদ্দীনের কর্মতৎপরতা প্রতিহত করা না হলে খুব শীঘ্রই মিসরের জনগণ বিদ্রোহ শুরু করবে।[৬১] এর ফলে বৃটেনের চাপের মুখে মিসর সরকার তাঁকে মিসর ত্যাগে বাধ্য করে। তবে তিনি মিসরের জনমনে যে চিন্তা-চেতনাগত পরিবর্তন সৃষ্টি করেন পরবর্তীকালে মুফ্তী মোহাম্মদ আব্দুহ্[৬২] সা'দ্ যোগ্‌লুল[৬৩] প্রমুখ তাঁর শিষ্যগণ সে ধারা অব্যাহত রাখেন। এর ফলেই পরবর্তীকালে মিসরীয় জনগণের বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

মিসর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর সাইয়েদ জামাল কিছুদিন ভারতে অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে চলে যান ইউরোপে। প্যারিসে তিনি মুফ্তী আব্দুহ্র সহযোগিতায় দৈনিক 'উর্ওয়াতুল্ উস্কা'[৬৪] প্রকাশ করেন। সেখানে থাকাকালেই তিনি প্যারিসের এক দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আর্নেস্ট-রেনেঁ-র[৬৫] জবাব দিতে থাকেন।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন নাসিরুদ্দীন শাহের আমন্ত্রণে ইরানে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, শাহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁর সংস্কারমুখী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন। কিন্তু শাহানশাহী প্রকৃতি ও মেজাজ কোনরূপ সংস্কারের সমর্থক ছিল না। অন্যদিকে সাইয়েদ জামালও প্রকাশ্যেই ইরানী জনগণের দুর্ভাগ্য-দুর্দশার জন্য শাহ্কে দায়ী করতে থাকেন। তিনি সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ মনে করতেন শাহের সংস্কার। এ কারণে তাঁকে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন দ্বিতীয় বারের মত ইরানে এলে তাঁকে তেহ্রানের অদূরে রেইশহরে[৬৬] হযরত শাহ্ আবদুল আযীমের[৬৭] মাযারে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে সরকারী নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈঠক করার পদক্ষেপ নেন। এসব বৈঠকে তিনি জনগণকে শাহের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করতে থাকেন। শাহ্ যখন দেখতে পেলেন যে, সাইয়েদ জামালুদ্দীনের ইরানে অবস্থান তাঁর (শাহের) জন্য বিরাট ক্ষতি ডেকে আনবে, তখন তিনি সাইয়েদ জামালকে — ঐ সময় ভীষণ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও — ইরান থেকে বহিষ্কার ও নির্বাসিত করার নির্দেশ দেন।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন তাঁর জীবনের শেষদিকটা তুরস্কে কাটান। এ সময় তুর্কী সাম্রাজ্যের ওসমানী সুলতান আবদুল হামীদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপরে পরোক্ষভাবে নযর রাখা হত।

www.pathagar.com

মীর্যা রেযা কেরমানী নাসিরুদ্দীন শাহ্‌কে হত্যা করলে[৬৮] সুলতান আবদুল হামীদ সাইয়েদ জামালুউদ্দীনের ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সুলতানের নির্দেশে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[৬৯]

সাইয়েদ জামালুদ্দীনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মনীতি ও তৎপরতাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১। বিশ্বের সকল মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা।

২। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

৩। অপপ্রচার ও বস্তুবাদী চিন্তাধারাসমূহের মোকাবিলায় ইসলামী মূল্যবোধের সমর্থন ও যথার্থতা প্রমাণ।

৪। উপনিবেশিক শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় দ্বীনী নেতৃত্ব ও মারজা'গণের প্রভাবকে কাজে লাগানো।

টীকা ঃ

(১) মোতাবেক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ।

(২) মোতাবেক ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ।

(৩) قائم مقام فراهانی — 'কায়েম্ মাকাম' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি কোন পদাধিকারীর অর্পিত ক্ষমতাবলে হুবহু ঐ পদাধিকারীর দায়িত্ব পালন করেন এবং পূর্ণ এখতিয়ার ভোগ করেন যতক্ষণ না মূল পদাধিকারী তাঁর দায়িত্ব ফিরিয়ে নেন। কায়েম মাকামকে "ভারপ্রাপ্ত শাসক/নেতা/...." বলা যেতে পারে। তবে ভারপ্রাপ্ত যেখানে সাধারণতঃ যথাস্থানে মূল পদাধিকারীর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করেন সেখানে মূল পাদাধিকারীর উপস্থিতিতেও একজন কায়েম মাকাম থাকতে পারেন।—অনুবাদক

(৪) صدر اعظم — Chancellor.

(৫) حاج میرزا آقاسی

(৬) মোতাবেক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ।

(৭) অতীতে তুর্কিস্তান বলতে যে ভূখণ্ডটিকে বুঝাতো তা বর্তমানে তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তুর্কমানিস্তান নামে পাঁচটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। একে মধ্য এশিয়া (Central Asia) বা এশিয়া মাইনর (Asia Minor)ও বলা হয়। অবশ্য বৃহত্তর তুর্কিস্তান বলতে এক সময় চীনের তুর্কীভাষী সিনকিয়াংকেও এর অন্তর্ভুক্ত বুঝাতো। এ কারণে সিনকিয়াং বা জিংজিয়াং "চীনা তুর্কিস্তান' নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে আরবী ও ফার্সীতে 'তুর্কিয়াহ্/তুর্কিয়ে' (ترکیه) বলতে বর্তমান তুরস্ককে (Turkey) বুঝায়। কিন্তু ওসমানী শাসন আমলে 'তুর্কিয়াহ্' বলতে অনেক সময় গোটা ওসমানী সাম্রাজ্যকে বুঝাতো যাতে আরব জাহান ও ইউরোপের বিশাল এলাকাও শামিল ছিল।—অনুবাদক

(৮) উল্লেখ্য, বর্তমান পাকিস্তান তখন বৃটিশ ভারতের অংশ ছিল।

(৯) کامران میرزا

(১০) سیستان – ইরানের বেলুচিস্তানের পাশে অবস্থিত। বর্তমানে এ দু'টো এলাকা নিয়ে ইরানের একটি প্রদেশ গঠিত যার নাম সিস্তান-বেলুচিস্তান।

(১১) خراسان –উত্তর-পূর্ব ইরানে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম প্রদেশ। প্রাদেশিক রাজধানী মাশ্‌হাদ।

www.pathagar.com

(১২) دوست محمد خان – জীবনকাল ১৭৯৩-১৮৬৩। (المنجد)

(১৩) جزیرهٔ خارك – দ্বীপটি পারস্য উপসাগরের পূর্ব-উত্তর অংশে অবস্থিত; বর্তমানে ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল-জেটি এখানে রয়েছে।

(১৪) ارزنة الروم

(১৫) میرزا تقی خان فراهانی – তিনি ইতিহাসে 'আমীর কবীর' নামে সমধিক পরিচিত।

(১৬) মোতাবেক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন।

(১৭) خرمشهر – দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের বন্দরনগরী; পারস্য উপসাগরের অদূরে আরবান্দ্ নদীর তীরে অবস্থিত।

(১৮) اروند رود – ইরান ও ইরাকের মধ্যে অবস্থিত। আরবরা একে 'শাতিল আরব' বলে। মোহনার দিকে যেতে বাম তীরে অর্থাৎ পূর্ব তীরে ইরানের খুজিস্তান প্রদেশ অবস্থিত।

(১৯) بابیة - بیت باب–সাইয়েদ আলী মোহাম্মদ শীরাযী (হিজরী ১২৩৬-১২৬৬/১৮২০-১৮৫০ খৃষ্টাব্দ) এ ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা। সে হিজরী ১২৬০ সালে মোতাবেক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নিজেকে হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সাথে মিলিত হবার দরজা (باب) বা মাধ্যম হিসেবে দাবী করে। পরে সে তার ওপর আসমানী কিতাব নাজিল হবার দাবী করে। এরপর সে নিজেকে ইমাম মাহ্দী বলে দাবী করে। ১২৬৬ হিজরীর ২৭শে শাবান তাব্রীযে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। (فرهنگ فرق اسلامی)

(২০) بهائیت – বাবিয়াহ্ মতের প্রবক্তা আলী মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্য মীর্যা হোসেন আলী ওরফে বাহাউল্লাহ্ (হিজরী ১২৪৬-১৩৩০/১৮৩০-১৯১২ খৃষ্টাব্দ) ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত বাহাই ধর্ম প্রচার করে। বাহাই মতে ১৯ সংখ্যাটি পবিত্র। (فرهنگ فرق اسلامی)

(২১) মোতাবেক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ।

(২২) ناصر الدین میرزا

(২৩) امیر کبیر– মহান নেতা —The Great Leader

(২৪) ২৩শে অক্টোবর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ।

(২৫) کربلائی قربان

(২৬) میرزا محمد خان زنگنه

(২৭) دار الفنون — কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পুরো নাম مدرسهٔ دار الفنون

(২৮) مهد علیا

(২৯) মোতাবেক ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ।

(৩০) کاشان – তেহরান থেকে সোজা দক্ষিণে প্রায় ২০০ কিলোমিটার ব্যবধান।

(৩১) میرزا آقا خان نوری

(৩২) فین

(৩৩) মোতাবেক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ।

(৩৪) اعتماد الدوله — সরকারের বা দেশের আস্থাভাজন।

www.pathagar.com

(৩৫) کریمہ – Cremea-বর্তমানে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। আগে তাতার মুসলমানরা এখানে সংখ্যাগুরু ছিল; বর্তমানে রুশরা সংখ্যাগুরু।

(৩৬) حسام السلطنة – (উপাধি) "রাজত্বের ক্ষুরধার তলোয়ার।"

(৩৭) و شهر – পারস্য উপসাগরের পূর্ব-উত্তর উপকূলীয় বন্দর; একই নামের প্রদেশের রাজধানী।

(৩৮) মোতাবেক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।

(৩৯) মোতাবেক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ।

(৪০) وقایع اتفاقیه – "আকস্মিক ঘটনাবলী"।

(৪১) روزنامہ دولت علیۂ ایران — "দৈনিক মহান ইরান সরকার।"

(৪২) شرف — "মর্যাদা/আভিজাত্য।"

(৪৩) مرآت السفر — "সফরের আয়না।"

(৪৪) مشكوة الحضر — "জনপদের দীপাধার।"

(৪৫) اسلامبول।

(৪৬) اختر – "নক্ষত্র"।

(৪৭) میرزا ملکم خان معروف — (ইরানী)।

(৪৮) قانون. – "আইন-বিধান'; লন্ডন থেকে প্রকাশিত হত।"

(৪৯) مؤيد الاسلام — 'ইসলামের সমর্থক'।

(৫০) حبل المتين — "সুদৃঢ় রজ্জু" (কুরআন)।

(৫১) نجف — "ইরাকে অবস্থিত ধর্মীয় শহর"।

(৫২) حکمه — "জ্ঞান/দর্শন।"

(৫৩) پرورش — "পরিচর্যা/লালন।"

(৫৪) سید جمال الدين اسدآبادی – তাঁর জীবনকাল ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। (المنجد) তিনি ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (১২ বছর) আফগানিস্তানে ছিলেন। প্রথমে দুস্ত মোহাম্মাদ খানের সভাসদ হন দুস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র শীর আলী ও মোহাম্মদ আ'যমের মধ্যে সিংহাসনের দাবী নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে জামালুদ্দীন মোহাম্মদ আ'যমের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাঁর মন্ত্রী হন। চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে মোহাম্মদ আ'যম হেরে গেলে জামালুদ্দীন আফগানিস্তান ত্যাগ করেন (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) (دائرة المعارف الاسلامية) দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকায় তিনি জামালুদ্দীন আফগানী নামে পরিচিত হন।

(৫৫) همدان – তেহরান থেকে ৩৪৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে; একই নামের প্রদেশের রাজধানী।

(৫৬) علوم معقول বা علوم عقلی — যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, আকায়েদ, ইল্‌মে কালাম ইত্যাদি।

(৫৭) علوم منقول বা علوم نقلی – হাদীস, ইতিহাস ইত্যাদি।

(৫৮) তিনি একাধিক বার ভারত সফর করেন। সম্ভবতঃ প্রথমবার ভারত সফরের পর আফগানিস্তানে গমন করেন। — অনুবাদক।

(৫৯) انجمن مخفی– "গোপন সমিতি"। মূলে এ "নামে" কথাটি আছে। কিন্তু ৬১নং টীকার বক্তব্য থেকে মনে হয় এটা হবে "একটি গোপন সমিতি"। —অনুবাদক

www.pathagar.com

(৬০) لرد كرومر

(৬১) লর্ড ক্রোমার লন্ডনে প্রেরিত তাঁর প্রতিবেদনে সাইয়েদ জামালুদ্দীন থেকে তাঁদের বিপদ সম্পর্কে লিখেন ঃ

"... আমি আমার মুরুব্বীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, স্বদেশী দল সমিতি (انجمن حزب الوطنى) যদি আরো এক বছর টিকে থাকে এবং পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বর্তমানে এর যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তাও টিকে থাকে এবং সাইয়েদ জামালুদ্দীন মিসেরে-আরাম আয়েশে ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন তাহলে শুধু কায়রোতে বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিই ধ্বংসের কবলে নিপতিত হবে না, বরং এ আশংকাও অমূলক নয় যে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নেতৃত্ব এই অদ্ভুত সমিতির পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে শুধু ইতিহাসের স্মৃতিতে পরিণত হবে এবং কার্যতঃ বিশ্বের বুকে তার আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।"

(৬২) مفتى محمد عبده – জীবনকাল ১৮৪৯-১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। (المنجد)

(৬৩) سعد زغلول - জীবনকাল ১৮৫৭-১৯২৭ খৃষ্টাব্দ। (المنجد)

(৬৪) عروة الوثقى – "সুদৃঢ় রজ্জু" (কুরআন মজীদ)।

(৬৫) ارنست رنان

(৬৬) شهر رى — বর্তমানে তেহরান শহরের সাথে অঙ্গীভূত।

(৬৭) عبد العظيم – আহ্‌লে বাইতের শীর্ষস্থানীয় অলি-আল্লাহ্। মাশ্‌হাদ ও কোমের পরে তাঁর মাজার ইরানের তৃতীয় জিয়ারতকেন্দ্র।

(৬৮) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

(৬৯) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লবের[১] পটভূমি

নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলো ইরানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ-লুন্ঠন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যেতে থাকে। এতে একদিকে ইরানের অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছে, অন্যদিকে গণআন্দোলনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এ যুগে একদিকে রুশ ও বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ইরানে অবাধ লুটতরাজের নীতি অনুসরণ করে চলছিল, অন্যদিকে ইরানের শাহী সরকার শুধু অযোগ্যই ছিল না, জুলুম-অত্যাচার ও জঘন্য অপরাধের আশ্রয়ও নিচ্ছিল। একই সংগে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা ও জ্ঞান ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সবকিছু মিলে ইরানী সমাজকে ধীরে ধীরে এক সাধারণ ও সার্বজনীন পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিল এবং তা স্বৈরাচারী সরকার ও বিজাতীয় উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ ও বিপ্লব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বসম্পন্ন স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিপ্লব এবং বিজাতীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অপরিহার্যতার ধারণা চৈন্তিক ও আদর্শিক দিক থেকে ঐ যুগে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতায় উপনীত হয়নি, তথাপি দুই ভাগে বিন্যাসযোগ্য কতগুলো মৌলিক কারণ মোযাফফারুদ্দীন শাহের[২] শাসনামলে সাংবিধানিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই কারণগুলো ছিল চৈন্তিক ও অর্থনৈতিক কারণ। এছাড়াও আরো কতিপয় কারণ বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে। এসব কারণ মোযাফ্ফারুদ্দীন শাহের আমলে অবাধ ও নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করার দাবীর উদ্ভব ঘটায় এবং ঘটনাবলীকে সাংবিধানিক বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করে।

নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের চৈন্তিক পটভূমি

নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানে যে সাংবিধানিক গণবিপ্লব সংঘটিত হয় তার চৈন্তিক ভিত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) আভ্যন্তরীণ চৈন্তিক ভিত্তি (আর তা হচ্ছে ইসলামের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী শিক্ষার প্রেরণা)। (খ) বহিরাগত চৈন্তিক ভিত্তি (অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আইনানুগতা ও স্বাধীনতাপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব)।

(ক) আভ্যন্তরীণ চৈন্তিক ভিত্তি

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইরানী জনগণ ইসলামের ন্যায়বিচারকামী চিন্তা-চেতনা এবং ন্যায়বিচার-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়। এ কারণেই তারা ইসলামী বাহিনীর মোকাবিলায় কোনরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি ছাড়াই এ ঐশী আদর্শের মূল্যবোধসমূহকে গ্রহণ করে নেয়। বস্তুতঃ তাদের কাছে রাষ্ট্র বা হুকুমতের মানে ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং ঐশী মূল্যবোধে উপনীত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুতির মাধ্যম স্বরূপ।

ইসলামের আবির্ভাব—পরবর্তীকালীন ইতিহাসের গোটা সময়টা জুড়েই ইরানের মুসলিম জনগণ

www.pathagar.com

সব সময় ও সর্বাবস্থায় আলেম সমাজ ও মারজায়ে তাক্লীদগণকে পসন্দ করেছে এবং তাঁদের কথামতই চলেছে। কাজার বংশের শাসনামলের মাঝামাঝি থেকে জনসাধারণের সাথে দ্বীনী নেতৃবৃন্দ ও আলেম সমাজের অধিকতর সুশৃঙ্খল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী প্রশ্নে সক্রিয় গোষ্ঠী হিসেবে আলেম সমাজের জন্য সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও তদারকীর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ইরানের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে ইস্ফাহানে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, নাজাফের (বর্তমানে ইরাকভুক্ত) দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং এসব দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় বড় মারজা'র আবির্ভাব ঘটে। এ কারণে তাদের সাথে জনসাধারণের যোগাযোগ এবং তাঁদের প্রতি জনগণের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, জনসাধারণ তাদের আস্থাভাজন দ্বীনী নেতৃবৃন্দকে তাদের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম সমাধান নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এরপর ইরানের মুসলিম জনগণ আলেম সমাজের পথনির্দেশে এবং ইসলামের আশা-আকাঙক্ষার অনুপ্রেরণায় পদে পদে স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিয়া মাজহাবের অনুসারীরা ইসলামী হুকুমত সম্পর্কে শুরু থেকেই যে ধারণা পোষণ করে আসছিল তার ভিত্তিতে তারা সব সময়ই 'ইসলামী হুকুমত নয় এমন রাষ্ট্র ও সরকার'কে খোদাদ্রোহী[৩] ও জালেম রাষ্ট্র ও সরকার হিসেবে গণ্য করে এসেছে। এ কারণে মূলগতভাবেই তারা তাদের ঈমান-আকিদা ও রাজা-বাদশাহ্র প্রতি স্বীয় আনুগত্যের মধ্যে এক ধরনের সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা ও সাংঘর্ষিক অবস্থা অনুভব করতে থাকে। কুরআন মজীদ মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দিয়েছে যে, মুসলমানদের কখনো কাফেরদের হুকুমতের অধীনে থাকা উচিত নয় এবং কাফেরদের আনুগত্য করা উচিত নয়। এ কারণেই বিজাতীয় কাফেরদের সহায়তাদান বা তাদের কর্তৃত্বকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে কাফেরদের অধীনে থাকাকেও, ইসলামের সীমারেখা থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার (বেরিয়ে যাওয়ার) সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে সব সময়ই প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে স্বীয় মুসলমানিত্বের দাবী অনুযায়ী এবং ইসলামী চৈন্তিক পটভূমির প্রেক্ষিতে স্বৈরাচার ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে থাকে।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, মোযাফফারুদ্দীন শাহের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের যে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের পরিণতিতে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তার পিছনে মূল কারণ ছিল সাধারণ জনগণের ইসলামী চেতনা ও জাগরণ এবং আলেম সমাজের নেতৃত্ব।

(খ) বহিরাগত চৈন্তিক ভিত্তি

১। **ইউরোপের অনুসরণে আইনের শাসনের আহ্বান ঃ** নাসিরুদ্দীন শাহের সুদীর্ঘ শাসনকালের পুরোটাই দুর্নীতি-অনাচার ও বিজাতীয়দের নিকট দেশ বিক্রির কলঙ্কে কালিমালিপ্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, এ যুগে ইরানী জনগণের চিন্তাজগতে এমন কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয় যা সাংবিধানিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং ইরানী জনগণের মধ্যে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে যাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ও সরকারকে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ও শর্তাধীন করে দেয়া হবে।

নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে, সফর বা শিক্ষাব্যপদেশে পাশ্চাত্যে গমন এবং ইরানে অবস্থানরত ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে ইরানী জনগণের একাংশ ইউরোপ

www.pathagar.com

সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হয়। তারা ইউরোপের নাগরিক ও সামাজিক জীবনের কিছু উন্নতি-অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে পাশ্চাত্যের অগ্রগতি ও ইরানের পশ্চাদপদতার কারণ উদ্‌ঘাটনের চিন্তায় মনোনিবেশ করে। এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তারা এ অভিমতে উপনীত হয় যে, ইউরোপীয়দের এ উন্নতি-অগ্রগতির মূল কারণ হচ্ছে তাদের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা যা আইন ও সংবিধানের ওপর ভিত্তিশীল, অন্যদিকে ইরানের এ পশ্চাদপদতার জন্যে দায়ী হচ্ছে আইন ও সংবিধানের অনুপস্থিতি এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পন্ন স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা।

এ প্রেক্ষাপটে কতক বুদ্ধিজীবী আইন ও সংবিধান ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালাতে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও এখতিয়ারসম্পন্ন রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার সমালোচনা করতে থাকেন। অবশ্য যাঁরা আইনের শাসনের দাবীতে শাহের বিরোধিতা করেন এবং আইন ও সংবিধানের শ্লোগান দেন তাঁদের সকলেই এতে আন্তরিক ছিলেন কিনা সে ব্যপারে সন্দেহের অবকাশ ছিল। কারণ এ চিন্তাধারার অগ্রগামী প্রবক্তাদের মধ্যে মীর্যা মেল্‌কাম খানের ন্যায় কতিপয় বিজাতীয়দের উচ্ছিষ্টভোগীও শামিল ছিলেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক কানুন'-এর সম্পাদক-প্রকাশক মেল্‌কাম খান ছিলেন ইরানে ফ্রিম্যাসনারী লজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তবে আইনের শাসন প্রবর্তনের দাবীদার বুদ্ধিজীবীগণের এ দাবী তোলার পিছনে যে উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল থাক না কেন এবং তাঁদের চরিত্র ও প্রকৃতি যা-ই থাক না কেন, সার্বিকভাবে স্বৈরতন্ত্রের প্রতি তাঁদের বিরোধিতা ইরানী জনগণের চিন্তাজগতে পরিবর্তন সাধনে খুবই সহায়ক হয় এবং জনগণের মধ্যে সৃষ্ট এ চৈন্তিক পরিবর্তন সাংবিধানিক বিপ্লবের অন্যতম চৈন্তিক ভিত্তিতে পরিণত হয়।

২। জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় ঃ ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হলে তা ইরানী জনগণের চিন্তা-চেতনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে এবং তাদের চিন্তাজগতে এক পরিবর্তন আনয়ন করে। ইরানের শাহী দরবারের সদস্যদের দৃষ্টিতে রুশরা এত শক্তিমান হিসেবে প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও এবং পূর্ববর্তী কয়েক বছরে রুশরা ইরানী ভূখণ্ডের অনেক জায়গা দখল করে নিতে সক্ষম হলেও এ সময় জাপানের ন্যায় এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশের নিকট ধরাশায়ী হল; ইরানী জনগণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের এ বিজয়ের কারণ হিসেবে জাপানের শাসকগোষ্ঠীর যোগ্যতা এবং রাশিয়ার নিকট ইরানের অপমানজনক পরাজয়ের জন্য ইরানে ক্ষমতাসীন বাদশাহ্‌দের অযোগ্যতাই দায়ী বলে মনে করতে থাকে।

৩। ১৯০৫-এর রুশবিপ্লব ঃ রাশিয়ার জনসাধারণ জারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে আসছিল ১৯০৫ সালে তা সফল হয়। যদিও গণবিদ্রোহ দমনের জন্য জারের সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তথাপি শেষ পর্যন্ত জারের পক্ষে জনগণের দাবীর মুখে অটল থাকা সম্ভব হয়নি, বরং তাঁকে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবী মেনে নিতে হয়। যেহেতু ইতিমধ্যেই ইরানী জনগণ শাহী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল, সেহেতু রাশিয়ার এ ঘটনার খবর ইরানে পৌঁছার সাথে সাথে ইরানী জনগণের সংগ্রামী চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে গণদাবীর বিজয় সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়। ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো এবং বণিক শ্রেণী ও পেশাজীবীদের মাধ্যমে ইরানী জনগণ সব সময়ই রাশিয়ার ঘটনাবলী ও রুশ জনগণের চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হত। বিশেষ করে কাফকাজ পার্বত্য অঞ্চলে, আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, বাকু শহরে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী চিন্তাধারার যে প্রাধান্য ছিল তা ইরানী জনগণের চিন্তাজগতে সৃষ্ট পরিবর্তনকে ব্যাপকতর করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে ইরানী জনগণের মন-মগজে নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক শাহী

www.pathagar.com

ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়ার চিন্তা গভীরে প্রোথিত হয় এবং তারা আইন ও সংবিধানভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা ও পরামর্শ পরিষদ বা পার্লামেন্টের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।[৪]

সাংবিধানিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি

সাংবিধানিক বিপ্লবের চৈন্তিক পটভূমি ইরানী জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা আনয়ন করে এবং তাদের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তাতে সমকালীন অর্থনৈতিক পটভূমিও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর লুটপাট ও তাদের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতির কারণে কাজার বংশের শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যাও কাজারীদের সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা ও হতাশার সৃষ্টি করে এবং স্বৈরাচারী সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। ইরানী জনগণের ওপর এ অর্থনৈতিক সমস্যাবলী চেপে বসার জন্যে কতগুলো দেশী ও বিদেশী উপাদান দায়ী ছিল সেগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) দেশী উপাদানসমূহ

বলা বাহুল্য যে, স্বৈরাচারী শাহানশাহী বা রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান হচ্ছেন রাজা বা শাহ্, যিনি তাঁর দুর্নীতিপরায়ণ পারিষদবর্গের মাধ্যমে জনসাধারনের ওপর নিঃশর্ত আধিপত্য চাপিয়ে দেন। আর ইরানে কাজার বংশের রাজত্ব এ ধরনের স্বৈরাচারী শাসনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল। শাহ্ তাঁর খামখেয়ালী, স্বার্থপরতা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এবং বিজাতীয়দের ভয়ে যে সব ফরমান জারি করতেন ইরানী জনগণকে ন্যূনতম আপত্তি ছাড়াই তা কার্যকর করতে হত। অধিকন্তু শাহ্ ও তাঁর পারিষদবর্গের বিলাস-ব্যসনের সকল ব্যয়ভার বহন করে তাদেরকে শাহ্প্রীতির প্রমাণ দিতে হত।

শাহী দরবারের ব্যয়ভার ছিল বিপুল অঙ্কের। এমন কি মোটা অংকের কর ধার্য করে এবং শাহ্যাদাদের ও পারিষদবর্গের নিকট বিভিন্ন প্রদেশের শাসনক্ষমতা বিক্রি করে দিয়েও দরবারের ব্যয়ভারের পুরো অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব হত না। ফলে শাহ্ উপনিবেশবাদী দেশগুলোর নিকট ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হতেন এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতেন।

ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শাহের আয়ের প্রধান উৎস ছিল দু'টি ঃ জনসাধারণের নিকট থেকে কর আদায় এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃত্ব বিক্রি।

১। কর ঃ কাজার বংশের শাসনামলে ইরানের প্রতিটি শহর ও গ্রামের ওপর নির্দিষ্ট অঙ্কের কর ধার্য করে দেয়া হত এবং জনসাধারণ তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধে বাধ্য থাকত। করের পরিমাণ প্রতি বছর নতুন করে নির্ধারিত হত এবং তা প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেত। প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কর পুনঃনির্ধারণ করা হত। গ্রামবাসীরা ফসলের মওসুমে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ কর হিসেবে প্রদান করতে বাধ্য থাকত। কিন্তু সাধারণতঃ আশানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্ভব হত না, ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা নির্ধারিত পরিমাণ ফসল সরকারী তহবিলে প্রদান করতে সক্ষম হত না। এমতাবস্থায় তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত।

শাহ্কে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানকারী অন্য শ্রেণীটি ছিল বণিক শ্রেণী। কর প্রদান ছাড়া তাদের পক্ষে অর্থনৈতিক তৎপরতা চালানোর কোন উপায় থাকত না। শাহী দরবারের ব্যয়ভার বৃদ্ধির সাথে

www.pathagar.com

সাথে বণিকদের ওপর ধার্যকৃত করের পরিমাণও অনবরত বেড়ে চলত। অথচ অবাধে বিদেশী পণ্যের আগমনের ফলে দেশী ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুনাফা তেমন একটা উল্লেখ করার মত ছিল না। ফলে তাদের ওপর উপর্যুপরি চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

২। প্রদেশ বিক্রি ঃ কাজার বংশের গোটা শাসনামলে প্রাদেশিক শাসনক্ষমতা বিক্রির একটি নিয়ম ছিল। এ নিয়ম অনুযায়ী শাহ্ প্রতি বছর একবার দেশের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনক্ষমতা শাহ্যাদা ও পারিষদবর্গের নিকট বিক্রি করে দিতেন। প্রতিটি প্রদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হেঁকে নিলামে চড়ানো হত। যিনি কোন প্রদেশের শাসনক্ষমতা লাভের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানে রাজী হতেন তিনি এ নিলামে বিজয়ী এবং সে প্রদেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী হতেন। প্রতিযোগিতার কারণে ক্রেতারা মূল্য বৃদ্ধি করতেন এবং নিলামে বিজয়ী হয়ে কোন প্রদেশের শাসনক্ষমতা লাভের পর ঐ প্রদেশের জনগণের নিকট থেকে এ অর্থ আদায়ের পিছনে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা নিয়োগ করতেন। ফলতঃ প্রাদেশিক শাসকগণও জনসাধারণের ওপর মোটা অঙ্কের করের বোঝা চাপিয়ে দিতেন এবং বিভিন্ন পন্থায় তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে প্রাদেশিক শাসনক্ষমতা ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থ আদায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।[৫]

কাজার বংশের শাসনামলে জনসাধারণের ওপর অর্থনৈতিক চাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নাসিরুদ্দীন শাহের যুগের শেষ দিকে ও মোযাফফারুদ্দীন শাহের গোটা শাসনামলে এ চাপ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। অনেক ব্যবসায়ীই দেউলিয়া হবার উপক্রম হন। শহর-গ্রাম নির্বিশেষে ক্ষুধা-দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে এবং খাদ্যাভাবে দলে দলে লোক মারা যেতে থাকে। জনসাধারণকে এ দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য চিন্তা করবে এমন কেউ ছিল না। এ যুগে বহুবার দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এর ফলে গ্রাম থেকে অসংখ্য লোক শহরে চলে যেতে বাধ্য হয়। এমন কি অনেকে বিদেশেও চলে যায়। এভাবে সার্বজনীন দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ওঠায় দেশের বিভিন্ন শহরে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশ্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সে সব বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল জনগণের ওপর সৃষ্ট চাপেরই বহিঃপ্রকাশ এবং একই সাথে সমকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে যে ব্যাপক গণরোষ রূপ পরিগ্রহ করছিল তারও বহিঃপ্রকাশ।

(খ) বৈদেশিক উপাদানসমূহ

ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লবের পটভূমি নির্মাণে যে সব বৈদেশিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে ঃ

১। ইরানের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বিদেশীদের অর্থনৈতিক আধিপত্য ঃ পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইরানে বিজাতীয়দের প্রভাব ও আধিপত্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কাজার বংশের শাসনামলে এবং সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রাক্কালে ইরানের অর্থনীতি, বিশেষ করে ইরানের বাণিজ্যিক অর্থনীতি ছিল রাশিয়া ও বৃটেনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে দেশ দু'টি পরস্পরের সাথে সর্বাত্মক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বৃটিশ ও রুশ কোম্পানীসহ অন্যান্য বৈদেশিক কোম্পানী ইরানের অধিকাংশ শহরেই শাখা গঠন করেছিল এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত ছিল। এর ফলে ইরানী ব্যবসায়ীদের জন্য মারাত্মক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু তাঁদের পক্ষে বিদেশী বড় বড় পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না, সেহেতু

www.pathagar.com

দিনের পর দিন তাঁদের টানাপোড়েন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তাঁরা দেউলিয়াত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরান বিদেশে যে পরিমাণ পণ্য রফতানী করত বৃটেন ও রাশিয়া তার কয়েক গুণ বেশী পণ্য ইরানে রফতানী করত। অন্যদিকে ইরানে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিদেশী পণ্য এসে ইরানী বাজার দখল করে ফেলায় দেশী উৎপাদনকারীগণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। ফলে ইরানের অর্থনীতিতে এতটাই অসুস্থ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সে অসুস্থতার প্রভাব এখনো (ইসলামী বিপ্লবের পরেও) পুরোপুরি কাটিয়ে ওটা সম্ভব হয়নি। আর একদিকে জনসাধারণ, অন্যদিকে ব্যবসায়ী শ্রেণী—উভয়ই তাঁদের সকল অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য কাজার বংশীয় বাদশাহ্দের অযোগ্যতা ও বহিঃশক্তির তাঁবেদারিকে দায়ী মনে করে।

২। **বৃটিশদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা ঃ** নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে বৃটিশ ও রুশ উপনিবেশবাদী শক্তি ইরানে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষই ইরানের শাহী দরবারকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করে। এ লক্ষ্যে উভয় পক্ষই শাহী দরবারে তাদের গুপ্তচর ও ভাড়াটে এজেন্টদের ব্যবহার করা ছাড়াও অন্যান্য দুর্নীতিপরায়ণ পারিষদবর্গকে উৎকোচ প্রদান করে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। এমনকি তারা শাহ্কেও উৎকোচ প্রদান করে দরবারকে নিজেদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করত। শাহ্ দৃশ্যতঃ দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের চিন্তা করতেন এবং এ অজুহাতে পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের জন্য কিছুদিন পর পরই ইউরোপীয় দেশসমূহে সফর করতে যেতেন।

শাহ্ তাঁর প্রথম বারের ইউরোপ সফরেই খুবই আনন্দিত হন। এ কারণে সব সময়ই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শনাদি দেখা বা কোন কোন সময় চিকিৎসার নাম করে ইউরোপ সফরের চিন্তায় মশগুল থাকতেন। অন্যদিকে পারিষদবর্গের বিলাসিতার কারণে সব সময়ই রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হয়ে থাকত। তাই শাহের ইউরোপ সফরের খরচ যোগানোর জন্যে বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হত। যেহেতু বিদেশীরা শাহী দরবারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল, সেহেতু তারা এ সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করার নামে এগিয়ে আসত। তারা ইরানস্থ তাদের তাবেদারদের দালালীর বদৌলতে এবং একদল বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় সামান্য কিছু অর্থ সরবরাহ করে শাহের ইউরোপ সফরের খরচ নির্বাহ করত। বিনিময়ে ইরান সরকারের নিকট থেকে নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিত।[৬]

এখানে বৃটিশ ও রুশদেরকে প্রদত্ত কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। এর মধ্যে বৃটিশদেরকে প্রদত্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আলেম সমাজের প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে বাতিল করা হয়।

রয়টারকে প্রদত্ত সুবিধা ঃ একটি দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কিভাবে আরেকটি দেশকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া যেতে পারে তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইরানের পক্ষ থেকে রয়টারকে প্রদত্ত সীমাহীন সুবিধা। নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী মীর্যা হোসেন খান সেপাহ্সালারের প্রচেষ্টায় ইরান সরকার এবং ব্যারন জুলিয়াস দ্য রয়টার[৭] নামক এক বৃটিশ ইয়াহুদীর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ একচেটিয়া চুক্তিটি বাতিলযোগ্য ছিল না। এ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ইরান সরকার রয়টারকে ইরানের যেকোন স্থানে রেললাইন ও ট্রামলাইন স্থাপন; স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর (হীরা, আকিক ইত্যাদি বাদে; যেকোন খনি থেকে খনিজসম্পদ উত্তোলন; বনসম্পদের ব্যবহার এবং জমিতে সেচের

www.pathagar.com

জন্য খাল ও নালা খননের জন্য সত্তর বছরের এবং ইরানের শুল্ক বিভাগ পরিচালনা ও ইরানে যেকোন ধরনের পণ্য রফতানীর জন্য ২৫ বছর মেয়াদে অধিকার প্রদান করে।

রয়টারকে এ সুবিধা প্রদানের খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশের সবত্র অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকলেই এ খবরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কারণ এ ধরনের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ইরান সরকার কার্যতঃ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেই বিজাতীয়দের পদতলে বিসর্জন দিচ্ছিল। বস্তুতঃ কোনরূপ যুদ্ধ ও রক্তপাত ছাড়াই ইরান বৃটিশদের উপনিবেশে পরিণত হতে যাচ্ছিল।

বিদেশীদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম রুশরা এ চুক্তি বাতিল করার দাবী জানায়। কারণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উপনিবেশিক শক্তি বৃটিশরা এভাবে ইরানে একচেটিয়া সুবিধা লাভ করায় রুশরা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও রয়টারকে সুবিধা দানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে অবশ্য সকলের বিরোধিতা আন্তরিক ছিল না। যারা রয়টারকে সুবিধা দানের বিরুদ্ধে প্রকৃতই এবং নিঃস্বার্থভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বনামখ্যাত মুজতাহিদ হাজী মোল্লা আলী কানী[৮]। রয়টারকে অবৈধ সুবিধা দানের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র সর্বাত্মক প্রতিবাদ শুরু হলে শেষ পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন শাহ্ এ চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং এ চুক্তি সম্পাদনের পিছনে সক্রিয় বৃটিশদের ইরানী দালাল[৯] প্রধানমন্ত্রী মীর্যা হোসেন খান সিপাহ্সালারকে অপসারণ করেন। আর রয়টার যখন দেখলেন যে, সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র ইরানের যে সীমাহীন সম্পদ তাঁর হস্তগত হয়েছিল তা হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তিনি শাহের সাথে এক নতুন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে 'শাহানশাহী ব্যাংক'[১০] নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং ৬০ বছরের জন্য তা থেকে যে কোন ধরনের সুবিধা লাভের অধিকার রয়টারকে প্রদান করা হয়।

ট্যালবোট চুক্তি (তামাক ব্যবসার একচেটিয়া স্বার্থ) ঃ নাসিরুদ্দীন শাহ্ হিজরী ১৩০৬ সালে[১১] প্রধানমন্ত্রী আমিনুস্ সুলতানসহ ইউরোপে বেড়াতে যান। এ সফরকালে মেজর জেরাল্ড এফ, ট্যালবোট নামে একজন পুঁজিপতি শাহের সাথে পরিচয় করেন। শাহের সাথে সাক্ষাতের পর ট্যালবোট যখন জানতে পারেন যে, শাহের হাত একদম খালি ও তিনি দারুণ অর্থসঙ্কটে আছেন তখন তিনি সমগ্র ইরানে ৫০ বছরের জন্য তাঁকে তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার প্রদানের প্রস্তাব দেন। শাহ্ মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে এবং আমিনুস্ সুলতান, অন্যান্য শাহ্যাদাগণ ও পারিষদবর্গের দালালীর কারণে এতে সম্মতি দেন। ফলে এ ব্যাপারে ইরান সরকার ও ট্যালবোটের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। [১২]

এ চুক্তি অনুযায়ী ইরানে তামাক ব্যবসার একচেটিয়া অধিকারের বিনিময়ে ট্যালবোট ইরানের শাহী দরবারকে (লাভ-লোকসান নির্বিশেষে) বার্ষিক ১৫ হাজার পাউন্ড এবং লাভের একচতুর্থাংশ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

ট্যালবোটকে এভাবে একচেটিয়া সুবিধা দানের খবর ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র ইরানে এচুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সমাজের বিভিন্ন মহল এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী সহসাই নিজেদেরকে বিজাতীয়দের হাতের পুতুলে পরিণত হতে এবং নিজেদের স্বার্থকে চরমভাবে বিপন্ন ও পর্যুদস্ত হতে দেখতে পান। তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানান এবং রুখে দাঁড়ান। দ্বিতীয় যে শ্রেণীটি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাঁরা হলেন আলেম সমাজ ও মারজায়ে তাক্‌লীদগণ। এ চুক্তিটির

www.pathagar.com

প্রকৃতি ছিল উপনিবেশবাদী ও দেশবিক্রিমূলক। তাই তাঁরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ছাড়াও রুশরা এ চুক্তির বিরোধিতা করতে থাকে। কারণ তারা ট্যালবোটকে দেয়া এ সুবিধাকে ইরানে বৃটেনের অধিকতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের হাতিয়ার বলে মনে করে এবং এর ফলে ইরানে রাশিয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বিপন্ন ও সঙ্কুচিত দেখতে পায়।

ট্যালবোট কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ইরানে এসে তৎপরতা শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের কোম্পানীর কাজ শুরু করার জন্যে প্রস্তুতি পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করে পরবর্তী পর্যায়ের কাজে হাত দেন। এদিকে ইরানের বিভিন্ন শহরে এ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। অনুরূপ অন্য যে কোন প্রতিবাদ ও সংগ্রামের ন্যায় এবারেও প্রথম কাতারে থাকলেন আলেম সমাজ। তাঁরা দেশের প্রতিটি শহরে সরকার বিরোধী ও তামাকচুক্তি বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশের অগ্রভাগে থাকেন এবং এ চুক্তিটি যে দেশের ও জনগণের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক, বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা তুলে ধরে চুক্তিটি বাতিলের দাবী জানান।

এ সময় একদিকে ইরানী আলেম সমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে এ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমেই অধিকতর ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে, অন্যদিকে এ ব্যাপারে করণীয় জানতে চেয়ে নাজাফের মারজা'গণের নিকট [১৩] বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ্ শীরাযীর[১৪] নিকট চিঠিপত্র লেখা হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন হোসেনী আসাদাবাদীর পক্ষ থেকে তাঁর বরাবরে লেখা চিঠি বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ব্যাপকতাকে তুলে ধরে। ফলে মারজা'গণ সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন।

ঐ সময় তেহ্রানে সরকারবিরোধী ও তামাকচুক্তি বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর্জা হাসান অশ্তিয়ানী[১৫]। তিনি ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ মীর্যা শীরাযীর প্রতিনিধি। নাসিরুদ্দীন শাহ্ ও আমীনুস্ সুলতান যখন দেখতে পান যে, গণরোষ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং তাঁরা এক বিরাট ও কঠিন সমস্যায় মুখোমুখি, তখন তাঁরা মীর্যা হাসান অশ্তিয়ানীকে কাছে টানার ও অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংগ্রামী আলেম মীর্যা হাসান অশ্তিয়ানী কিছুতেই নতি স্বীকার না করে বরং আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলেন। অবশেষে সমকালীন ইরানী জনগণের প্রকৃত নেতা মার্জায়ে তাক্লীদ আয়াতুল্লাহ্ মীর্যায়ে শীরাযী একটি ছোট্ট ফতোয়া জারী করে আন্দোলনের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দেন। এ ফতোয়াটি এরূপ ঃ-

"বর্তমানে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের যে কোন ধরনের ব্যবহার হযরত ইমামে জামান (ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল।"

তৎকালীন ইরানী জনগণের অবিসংবাদিত দ্বীনী নেতা মীর্যায়ে শীরাযীর পক্ষ থেকে এ ফতোয়া জারীর পর জনগণ তামাক-সুবিধা দানকারী চুক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোকে শরীআতী ও দ্বীনী কর্তব্য বলে গণ্য করে। ফলে তারা সর্বত্র হুক্কা ভেঙ্গে ফেলে এবং প্রচুর পরিমাণে তামাক ও তামাকজাত পণ্য অগ্নিদগ্ধ করে ফেলে। এমন কি শাহী হেরেমের নারীরা পর্যন্ত শাহের কল্কিতে তামাক পরিবেশন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রমান্বয়ে শাহের ঈমান-আকিদা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। ফলে নাসিরুদ্দীন শাহ্ নিজের অবস্থানকে টলটলায়মান দেখতে পান। সিংহাসন হারানোর আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তিনি গণদাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ট্যালবোট কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার সাথে সম্পাদিত তামাকচুক্তি বাতিল করে দেন।

www.pathagar.com

ট্যালবোট কোম্পানীর সাথে সম্পাদিত তামাক-সুবিধা চুক্তি বাতিলের ঘটনাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১) ইতিপূর্বে ইরানী জনগণ স্বৈরাচারের দানবকে অপরাজেয় মনে করত। তাই এ ঘটনায় তার পরাজয় ও নতি স্বীকারের ফলে জনমনে তার সম্পর্কিত অপরাজেয়তার ধারণা দূরীভূত হয় এবং জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সমন্বিত ও সুনির্দিষ্টভাবে গণজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের পক্ষে স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নেয়া এবং স্বৈরতন্ত্রকে জনগণের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা সম্ভবপর।

২) জনগণের মধ্যে সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীন ঐক্যের মাধ্যমে একটি উপনিবেশিক শক্তিকে প্রদত্ত সুবিধা বাতিল ও উপনিবেশিক শক্তিকে পিছু হটিয়ে দেয়ার ঘটনা জনগণকে এ শিক্ষা দেয় যে, সুসংগঠিতভাবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে শুধু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নয়, বরং উপনিবেশিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধেও বিজয়ী হওয়া সম্ভব।

৩) যেহেতু আলেম সমাজ ও মার্‌জায়ে তাক্‌লীদের প্রচেষ্টা ও সক্রিয় নেতৃত্বের ফলে এ সংগ্রাম বিজয়ী হয় সেহেতু ইরানী জনগণ আলেম সমাজের শক্তি ও গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষাও বেশী মাত্রায় অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অতঃপর জনগণের নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের ভূমিকা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়।

৩। ইরানে রুশদেরকে দেয়া সুযোগ-সুবিধা ঃ রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে তুর্কামান্‌চাই চুক্তি সম্পাদনের পর যদিও বাহ্যতঃ ইরানকে একটি স্বাধীন দেশ বলেই মনে হত, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিল, ঐ সময় থেকে ইরানে রুশদের ব্যাপক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়। ইরানস্থ্ রুশ রাষ্ট্রদূত যখন যেকোন পদক্ষেপই নিতে চাইতেন তা নিতে পারতেন এবং তার বিরুদ্ধে ইরানের শাহী দরবারের পক্ষে কোনরূপ কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন সম্ভব ছিল না।

যেহেতু রুশরা বৃটিশদেরকে নিজেদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত এবং তাদের অন্যতম দ্বন্দ্বক্ষেত্র ছিল ইরান, সেহেতু যখনই বৃটিশ সরকার ইরানের নিকট থেকে কোন সুবিধা আদায় করে নিত তখন রুশরা হয় তা বাতিল করাবার জন্যে চেষ্টা করত নতুবা ইরানের নিকট ইংরেজদেরকে প্রদত্ত সুবিধার সমমানের কোন সুবিধা নিজেদের জন্যে দাবী করত। এভাবে রুশরা ইরানে বহু সুবিধা হস্তগত করে। এর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

উত্তর ইরানে মৎস্য আহরণ সুবিধা ঃ ইরানে আগা মোহাম্মদ খান কাজারের শাসনামল থেকেই রুশরা ইরানের উত্তর উপকূলে (কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে) সুবিধা লাভ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। তুর্কামান্‌চাই চুক্তির বদৌলতে রুশরা ইরানে, বিশেষ করে উত্তর ইরানের শহরগুলোতে অবাধ যাতায়াতের অধিকার লাভ করে। নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলে যখন বিদেশীদেরকে ও শাহী দরবারের মধ্যকার বিদেশী এজেন্ট ইরানীদেরকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেয়ার ধারাক্রম শুরু হয় তখন শাহ্ উত্তর ইরানের মৎস্য সম্পদ আহরণের পুরো এলাকাই প্রধানমন্ত্রী মীর্যা হোসেন খানের নিকট ইজারা দেন।[১৬] আর মীর্যা হোসেন খান ইজারানামা স্বাক্ষরিত হবার পর স্তেপান্ লিয়ানাজোভ[১৭] নামে একজন রুশের সাথে চুক্তি করে পুরো মৎস্য আহরণ সুবিধাটাই তাঁর নিকট বিক্রি করে দেন।

নাসিরুদ্দীন শাহ্ মীর্যা হোসেন খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করার পর মৎস্য সম্পদ আহরণের অধিকার কামরান মীর্যা নায়েবুস্ সাল্‌তানাকে[১৮] প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু লিয়ানাজোভের

www.pathagar.com

সাথে মীর্যা হোসেন খানের চুক্তির মেয়াদ তখনো শেষ হয়নি সেহেতু তিনি কামরান মীর্যার সাথে একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন এবং ইরানের মৎস্য সম্পদ আহরণের মেয়াদ বর্ধিত করে নেন।

এমন কি নাসিরুদ্দীন শাহের মৃত্যুর পর মোযাফফারুদ্দীন শাহের শাসনামল পর্যন্ত ইরানের মৎস্য সম্পদ আহরণের অধিকার আগের মতই বিদেশীদের হাতে থেকে যায়। হিজরী ১৩১৪ সালে[১৯] স্তেপান্ লিয়ানাজোভ মারা গেলে আমীনুস্ সুলতান স্তেপানের পুত্র গিওর্গি লিয়ানাজোভের[২০] সাথে আরো পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করেন। কিন্তু হিজরী ১৩৩৪ সালে[২১] রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হলে লিয়ানাজোভ পরিবারের পক্ষে আর ইজারার অর্থ প্রদান সম্ভবপর হয়নি। ফলে উক্ত চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

ইরানে কাজ্জাক[২২] বাহিনী গঠন ঃ রুশরা সব সময়ই ইরানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এ কারণে নাসিরুদ্দীন শাহ্ ইউরোপ সফর করে আসার পর তারা তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। ইতোমধ্যে বৃটিশদের সাথে মীর্যা হোসেন খানের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাদের ব্যাপারে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি রুশদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর সহযোগিতায় তারা শাহ্কে ইরানে একটি কাজ্জাক বাহিনী গঠনে সম্মত করাতে সক্ষম হয়। শাহ্ ইতিপূর্বে কাফ্কাজে ও ইরাভনে রুশ সৈন্যদের দেখেছিলেন এবং তাদের সামরিক পোশাক ও সাজসজ্জা তাঁর খুবই পসন্দ হয়েছিল। তাই তিনি ইরানে কাজ্জাক বাহিনী গঠনে সম্মত হন। তদনুযায়ী হিজরী ১২৯৬ সালে[২৩] দু'দেশের সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার দোমোন্তোভিচের[২৪] নেতৃত্বে কয়েক জন কাজ্জাক সৈন্য ইরানে আগমন করে এবং তাদের নিয়ে ইরানী সেনাবাহিনীর কাজ্জাক ইউনিট গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাব যে, এই চুক্তির বদৌলতে রুশরা ইরান সরকারের খরচে ইরানের মাটিতে তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাখতে সক্ষম হয়, আর যখনি তাদের কোন স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তখনি তারা এ কাজ্জাক বাহিনীকে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজে লাগিয়েছে।

ইরানের বুকে রাশিয়ার সামরিক বাহু হিসেবে পরিগণিত কাজ্জাক বাহিনী বহু ধরণের অপরাধমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হত। তারা সব সময় ইরানের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখত ও ইরানী জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। দৃশ্যতঃ ইরানের খেদমতের কাজে নিয়োজিত এই কাজ্জাক বাহিনী মোহাম্মদ আলী শাহের শাসনামলে[২৫] সাংবিধানিকতাপন্থীদের হয়রানি করে ও পার্লামেন্ট ভবনে কামানের গোলা-বর্ষণ করে খুদে স্বৈরাচারের জন্ম দেয়।

রাশিয়ান ক্রেডিট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুবিধা ঃ বৃটিশরা ইরানের নিকট থেকে যে সব সুবিধা আদায় করেছিল তার মধ্যে শাহানশাহী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা অন্যতম। রুশরা এক্ষেত্রেও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় পিছনে পড়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে তারা ইরানে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যে নাসিরুদ্দীন শাহের নিকট অনুমতি চায়। শেষ পর্যন্ত শাহ্ চাপের মুখে রুশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। এভাবে ইরানে রুশ ক্রেডিট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যা ছিল রাশিয়ার পরিসম্পদ মন্ত্রণালয়েরই একটি শাখা মাত্র। এ ব্যাংক ইরানে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পিছনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। ব্যাংকটি ইরানের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে রুশপন্থী বানাবার প্রচেষ্টা চালায়।

ইরান-রাশিয়া শুল্কচুক্তি ঃ মোযাফফারুদ্দীন শাহ্ও তাঁর পিতার মতই সদাসর্বদা ইউরোপ সফরের জন্যে লালায়িত ছিলেন। ফলে তিনি সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য করে ফেলেন। তাই প্রথমে তিনি

www.pathagar.com

ইউরোপ সফরের জন্যে ইংরেজদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজরা প্রার্থিত অঙ্কের ঋণ প্রদানের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। তাই শেষ পর্যন্ত শাহী দরবার ঋণের জন্য রাশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। রুশরা ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে শুল্কচুক্তি সম্পাদনের শর্তে প্রার্থিত ঋণ প্রদানে সম্মত হয়। তারা ঋণ পরিশোধে সহায়তার জন্যে ইরানের শুল্ক আদায়ের দায়িত্ব তাদেরকে দেয়ার কথা বলে। শাহ্ এ শর্ত মেনে নেন এবং শেষ পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে হিজরী ১৩১৯ সালে[২৬] এ ব্যাপারে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তেহরানে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি অনুযায়ী ইরান সরকার কার্যতঃ উত্তর ইরানের শুল্কসংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন ধরনের অধিকার হাতছাড়া করে। এ চুক্তি অনুযায়ী ইরান সরকার তার শুল্কহার পরিবর্তনের এবং আমদানী-রফতানী পণ্যের শুল্কের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার হারায়, তেমনি রাশিয়ার পূর্বাহ্নিক সম্মতি ছাড়া ইরান সরকার কোন নতুন শুল্কনীতি প্রণয়ন করতে পারত না।

এ চুক্তির বদৌলতে কার্যতঃ ইরানী অর্থনীতির শাহ্রগ রুশদের হাতের মুঠোয় চলে যায়। কিন্তু এ চুক্তির সবচেয়ে বড় আঘাত পড়ে ইরানের শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওপর। কারণ দেশী পণ্য নামমাত্র শুল্কে আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ঐ সময় বেলজিয়ামের মেসিওনোজ্[২৭] কোম্পানী ইরানে ব্যাপক তৎপরতা চালাত। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীটি ইরানে অন্যতম রুশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। রুশ-ইরান শুল্কচুক্তির ফলে কোম্পানীটির তৎপরতা ব্যাপক-বিস্তৃত হয়। আমরা পরে দেখতে পাব যে, এর ফলে ইরানের বণিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিবাদ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং সাংবিধানিক বিপ্লবের অন্যতম ভিত্তি প্রস্তুত করে।[২৮]

বিদেশ থেকে গৃহীত ঋণ

ইরানে নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামল থেকে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ শুরু হয়। এসব বৈদেশিক ঋণের জন্য গ্যারান্টিস্বরূপ দেশের জাতীয় আয়ের অর্থনৈতিক উৎসসমূহকে বিদেশীদের নিকট বন্ধক দিতে হয়। অথচ উপনিবেশবাদী দেশসমূহের নিকট থেকে গৃহীত এ ঋণের একটি দীনারও দেশের উন্নয়ন ও আবাদের জন্য ব্যয় করা হত না, বরং এ অর্থের পুরোটাই শাহ্ ও তাঁর পারিষদবর্গের আমোদ-ফুর্তি ও ভোগ-বিলাসের কাজে ব্যয় হত।

উচ্চহারে সুদে বিদেশ থেকে মোটা অংকের ঋণ গ্রহণের ফলে একদিকে দেশের অর্থনীতিতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও স্থবিরতার সৃষ্টি হয়। আর এটাও স্বৈরাচার ও উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে অন্যতম প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

টীকা ঃ

১) **انقلاب مشروطه**—আরবী শব্দ **مشروطه** মানে শর্তযুক্ত বা শর্তাবদ্ধ। যেহেতু ইতিপূর্বে শাহ্ ছিলেন নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি আইনের উর্ধ্বে এবং দেশের মালিক ও জনগণের মনিবরূপে পরিগণিত হতেন; তাঁকে কতিপয় নিয়ম-কানুনের আওতায় নিয়ে আসা এবং জনগণ ও আলেম সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট (مجلس ملی) —জাতীয় মজলিস)-কে ক্ষমতায় অংশীদার করার শর্ত শাহ্ মেনে নিতে বাধ্য হন,

www.pathagar.com

সেহেতু এ বিপ্লবকে انقلاب مشروطه বা শুধু مشروطه বলা হয়। যেহেতু এ ফরমান ও শর্তাবলীর ভিত্তিতে প্রণীত "মৌলিক বিধিমালা" পূর্ণাঙ্গ সংবিধান না হলেও কার্যতঃ সংবিধানের ভূমিকা পালন করে সেহেতু আমরা একে "সাংবিধানিক বিপ্লব" হিসেবে অনুবাদ করেছি। —অনুবাদক

২) مظفر الدين شاه — নাসিরুদ্দীন শাহের পুত্র; রাজত্বকাল ১৮৯৫ থেকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ।(المنجد)

(৩) طاغوت

(৪) অবশ্য রাশিয়ান লেখকগণ ইরানে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের এবং দক্ষিণ রাশিয়ার শহরসমূহের স্বাধীনতাকামীদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ে তাদের অতিশয়োক্তির ন্যায় এ বিষয়েও অতিশয়োক্তি করেছেন। তবে মোদ্দা কথা এই যে, রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রবিরোধী চিন্তাধারা ও সাংবিধানিক বিপ্লব ইরানী জনগণের দৃষ্টিকে স্বৈরাচারবিরোধিতা ও সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রতি নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অন্যতম পার্শ্বকারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলে।

(৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাদেশিক শাসকবর্গের নিকট থেকে শাহ্ যে অর্থ গ্রহণ করতেন তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি এলাকার জন্যে নির্ধারণ করে দেয়া কর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। বিভিন্ন এলাকার ওপর যে কর চাপিয়ে দেয়া হত জনসাধারণকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হত। অন্যদিকে প্রাদেশিক শাসকবর্গ জনগণের নিকট থেকে যা আদায় করতেন তা শাহী কর থেকে ভিন্নতর একটি করের ন্যায় ছিল। এ আদায়ের দ্বারা প্রাদেশিক শাসক ঐ প্রদেশের শাসনক্ষমতা ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থের পূরণ করতেন মাত্র।

(৬) সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মীর্যা হোসেন খান সিপাহ্‌সালার (سپهسالار তাঁর নামের অংশ), আইনের শাসনের দাবীদার বুদ্ধিজীবী মীর্যা মেল্‌কাম খান যিনি ছিলেন 'দৈনিক কানুন'-এর প্রকাশক এবং মীর্যা আলী আস্‌গার খান আমীনুস্ সুলতান। এতেমাদুস্ সাল্‌তানাহ্ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট থেকে প্রাপ্ত উৎকোচের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ সাদ্‌রে আ'যম (প্রধানমন্ত্রী) মীর্যা হোসেন খান পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড নিয়েছিলেন, মেল্‌কাম খানও একই পরিমাণ নেন, হাজী ইয়াহিয়া খান মুঈনুল মুল্ক বিশ হাজার পাউন্ড, মুনীরুদ্দাওলাহ্ বিশ হাজার পাউন্ড, ইকবালুল্ মুল্‌কও কিছু পান এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরাও কিছু লাভ করেন।

(৭) بارون جوليوس دو رويتر

(৮) حاج ملا على كنى

(৯) এ সুবিধা দানের ক্ষেত্রে বৃটিশদের এজেন্ট অপর যে ব্যক্তি সর্বাধিক চেষ্টা করেন তিনি ছিলেন মীর্যা মেল্‌কাম খান। এ উভয় ব্যক্তিই নিজেদেরকে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ও আইনপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে দাবী করতেন।

(১০) بانك شاهانشاهى

(১১) মোতাবেক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

(১২) এ ব্যাপারে শাহ্ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আরো যাঁরা ট্যালবোটের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁরা হচ্ছেন নায়েবুস্ সাল্‌তানাহ্ (শাহের প্রতিনিধি), যিল্লুস্ সুলতান এবং মুশীরুদ্দাওলাহ্ ও এতেমাদুস্ সাল্‌তানাহ্।

(১৩) ঐ যুগে ইসলামী জাহানের সবচেয়ে বড় দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্রে ছিল (বর্তমানে ইরাকের অন্তর্ভুক্ত) নাজাফ। এ কারণে ইরানের মারজা'গণের অনেকেই সেখানে থেকে জ্ঞানসাধনা অব্যাহত রাখতেন। - অনুবাদক

(১৪) পুরো নাম মোহম্মদ হাসান শীরাযী; জন্ম ইরানের শীরাযে; মীর্যায়ে শীরাযী নামে সমধিক পরিচিত। জীবনকাল ১৮১৪ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। (المنجد)

www.pathagar.com

(১৫) میرزا حسن آشتیانی

(১৬) হিজরী ১২৯৩ সাল মোতাবেক ১২৫৪ ফার্সী সাল ও ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) استپان لیانازوف

(১৮) کامران میرزا نایب السلطنه

(১৯) মোতাবেক ফার্সী ১২৭৫ সাল এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

(২০) گیورگی لیانازوف

(২১) মোতাবেক ১২৯৪ ফার্সী সাল —১৯১৬ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ রুশবিপ্লবের সূচনাকাল।

(২২) قزاق —কাজ্জাকিস্তানের অধিবাসী।

(২৩) মোতাবেক ১২৫৭ ফার্সী সাল—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

(২৪) دومونتویچ

(২৫) রাজত্বকাল ১৯০৬-১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। (المنجد)

(২৬) মোতাবেক ১২৮০ ফার্সী সাল —১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

(২৭) مسیو نوز

(২৮) এ চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পর চুক্তির বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে বৃটিশরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অতঃপর তারা শাহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অনুরূপ আরেকটি শুল্কচুক্তি সম্পাদন করে এবং দক্ষিণ ইরানের শুল্ক ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম ও সাংবিধানিক বিপ্লব

ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, নাসিরুদ্দীন শাহের শাসনামলের শেষ দিকে সামগ্রিকভাবে ইরানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি এমন এক রূপ পরিগ্রহ করে যে, জনসাধারণ স্বৈরাচার ও উপনিবেশবাদ সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিক্ষিপ্তভাবে শাহী স্বৈরশাসনের, বিশেষভাবে শাহ্ ও তাঁর পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। নাসিরুদ্দীন শাহ্ দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল রাজত্ব করেন এবং অত্যন্ত কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিয়ে কোন মতে জনগণের ঘৃণা-বিদ্বেষ-আক্রোশের প্রকাশ্য বিস্ফোরণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁর মৃত্যুর[১] পরে তাঁর ৪৫ বছর বয়স্ক পুত্র মোযাফফরাদ্দীন শাহ্ ইরানের মসনদে আরোহন করেন।

মোযাফ্‌ফারুদ্দীন শাহ্

মোযাফফরাদ্দীন শাহ্ ইরানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী আমীনুস্ সুলতানকে অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনায় অক্ষমতার কারণে বরখাস্ত করেন এবং আইনুদ্দাওলাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।[২] আইনুদ্দাওলাহ্ ও অন্যান্য পারিষদবর্গের সহিংস দমননীতি, দারিদ্র্যের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুতর অচলাবস্থা সৃষ্টির ফলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা চরম আকার ধারণ করে এবং এক বিরাট বিদ্রোহ ও বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। গোটা দেশ একটি বিশালায়তন বারুদের গুদামে পরিণত হয়; বিস্ফোরণের জন্য শুধু একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগ হওয়া বাকী ছিল।

www.pathagar.com

তেহরানে ও দেশের অন্যান্য শহরে সরকারের তাঁবেদারদের জুলুম-অত্যাচার বিপ্লবকে আসন্ন করে তোলে। অবশ্য শাহী সরকারের নিকট থেকে রুশরা যে সব সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছিল, তার কতক ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে আনার জন্যে শাহের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজরাও একটি গণবিদ্রোহ কামনা করছিল এবং এজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা করছিল; সম্ভবতঃ সার্বিক পরিস্থিতিতে এ বিষয়টিও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। সর্বত্র ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে, জনগণের সংগ্রামের গতি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ধাপে ধাপে গণবিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যায়।

যদিও সূচনায় গণআন্দোলনের চরিত্র ছিল স্বৈরতন্ত্র ও জুলুম-নির্যাতন বিরোধী এবং তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারের ক্ষমতাকে সংকুচিত করা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা; আর আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আলেম সমাজ ও সম্মানিত মারজা'গণ। কিন্তু এই সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তখন কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কাঠামো ছিল না। সেহেতু আন্দোলনে যোগদানকারী পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সাংবিধানিক পরিকল্পনাকে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার আলোকে বিন্যস্ত করেন যা বাহ্যতঃ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না এবং এ কারণে তা আলেম সমাজকে গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। অন্যদিকে আন্দোলনের শুরুর দিকে জনসাধারণের দাবী-দাওয়া খুব সীমিত থাকলেও সাংবিধানিকতাপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রচারের ফলে এবং আরো কতক কারণে জনসাধারণ সাংবিধানিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

যে সব ঘটনা গণআন্দোলন ও গণবিদ্রোহে শক্তি ও গতি সঞ্চার করে তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

১। মাসিউনুযের ঘটনা ঃ রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে শুল্কচুক্তি সম্পাদিত হবার পর রুশদের নীতি কার্যকরকরণে নিয়োজিত একদল বেলজিক নাগরিক ইরানে আগমন করেন। তাঁরা রাশিয়ার পক্ষ থেকে শুল্ক ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত হন। এঁদের মধ্যে মাসিউনুয্ নামে এক ব্যক্তিকে রুশদের পক্ষ থেকে ইরানের শুল্ক বিভাগের প্রধান হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়। মোযাফফরাদ্দীন শাহের তৃতীয় ইউরোপ সফরের প্রাক্কালে মাসিউনুয্ ইরানের জন্য নতুন শুল্কহার প্রবর্তন করেন, যা ছিল পুরোপুরি ইরানী বণিকদের স্বার্থবিরোধী। এ কারণে ইরানী বণিকগণ মাসিউনুয্কে বরখাস্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টির একটি উপলক্ষ্য খুঁজছিলেন।

ইতোমধ্যে মাসিউনুযের একটি আপত্তিকর ছবি ইরানী বণিকদের হস্তগত হয়। এতে দেখা গেল, মাসিউনুয্ এক নাচের আসরে আলেমের পোশাক পরিধান করে বসে আছেন এবং নাচ উপভোগ করার সাথে সাথে হুক্কা টানছেন। এ ছবি জনগণের সামনে প্রকাশ করা হলে জনসাধারণ চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং মাসিউনুযের পদচ্যুতি ও বহিষ্কার দাবী করে। এদিকে শাহ্ ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন। যুবরাজ জনগণকে শান্ত হবার আহ্বান জানান এবং আশ্বাস দেন যে, শাহের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাদের দাবী পূরণ করা হবে।

২। ব্যাংকের ঘটনা ঃ তেহরান বাজারের মাঝখানে একটি পরিত্যক্ত কবরস্থানের পাশে একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ ছিল। ইরান সরকার ক্রেডিট ব্যাংক ভবন নির্মাণের জন্য জায়গাটি রুশদেরকে প্রদান করে। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হতে না হতেই আলেম সমাজ ও জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য এগিয়ে আসেন। ঘটনাক্রমে ঐ ধ্বংসস্তূপের নীচে মাটি খননকালে সদ্যমৃত মানুষের হাড় বেরিয়ে আসে। বুঝাই যাচ্ছিল যে, গোপনে অতি সম্প্রতি কেউ সেখানে লাশ দাফন করেছিল। এরপর আরো কয়েকটি লাশ পাওয়া গেল; এসবের মধ্যে মহিলাদের লাশও ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ভবন নির্মাণে নিয়োজিত কর্মকর্তারা অত্যন্ত অবহেলার সাথে সবগুলো লাশকে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন।

তখন ছিল রমযান মাস। তৎকালে ঐ নির্মীয়মান ব্যাংক ভবনের নিকটবর্তী এক মসজিদে শেখ মোহাম্মাদ ওয়ায়েয নামে একজন আলেম নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত করতেন। লাশ কূপে ফেলার খবর শুনে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন ঃ "এখন একমাত্র যা করার আছে তা হচ্ছে আমরা একটু কষ্ট করে মৃতদেরকে দেখতে যাব, আর তাদের জন্য ফাতেহা পড়বো তারপর তাদেরকে বিদায় জানাবো।" তিনি এ কথা বলেই বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে এলেন এবং কবরস্থানের দিকে যাত্রা করলেন। জনসাধারণও তাঁর পিছন পিছন গেল। এর ফল যা হতে পারে তা জানাই ছিল; জনসাধারণ নির্মীয়মান ব্যাংক ভবনে হামলা চালিয়ে ভবনটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

৩। বণিকদের প্রহার ও বাজার ধর্মঘট ঃ ব্যাংক ভবন ধ্বংসের ঘটনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য গণপ্রতিবাদমূলক ঘটনার বিস্তার ঘটতে থাকায় স্বৈরাচারী শাহের স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী আইনুদ্দাওলাহ্ পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় মনে মনে ভাবছিলেন, সাধারণ মানুষকে একটি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে; তাহলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। এ সময় রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণে আমদানী হ্রাস পাওয়ায় মিছরীর দাম বেড়ে যায়।[৩] প্রধানমন্ত্রী এটাকে ছুতা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিপূর্বে মাসিউনুযের ঘটনায় যেসব ব্যবসায়ী অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতে তেহরানের স্বৈরাচারী নগর প্রশাসক অলাওদ্দাওলাহ্[৪] তাঁদেরকে ডেকে এনে মিছরীর দাম বাড়ানোর বাহানায় লাঠিপেটা করেন। ব্যবসায়ীদের নিকট এ খবর পৌঁছার সাথে সাথে প্রতিবাদে তাঁরা বাজার ধর্মঘটের ডাক দেন। ফলে তেহরানের সকল বাজার বন্ধ হয়ে যায়। বাজার বন্ধ করে দিয়ে সবাই বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে সমবেত হন।

এতে সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জুম্‌আ-ইমামের মধ্যস্থতায় মতৈক্য হয় যে, জনসাধারণ তখনকার মত সমাবেশ না করে চলে যাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরদিন মসজিদে শাহে[৫] জমায়েত হবে।

উক্ত জুম্‌আ-ইমাম ছিলেন একজন ভন্ড আলেম এবং শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠ সমর্থক। অন্যদিকে তিনি সাংবিধানিক আন্দোলনের নেতা আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী[৬], আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনী[৭] প্রমুখ আলেমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন। তাই আন্দোলন বানচালের জন্য তিনি ষড়যন্ত্র আঁটেন। পরদিন সমাবেশের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি গোপনে মসজিদে একদল নিজস্ব লোককে প্রস্তুত করে রাখেন। জনসাধারণ এবং আলেমগণ এসে উপস্থিত হবার পর সাইয়েদ জামাল নামক একজন ওয়ায়েয বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত করে রাখা লোকেরা তাঁর বক্তব্যের একটি অংশকে ছুতা হিসেবে ব্যবহার করে হৈচৈ ও চিৎকার শুরু করে দেয় এবং পাশের লোকদের ধাক্কা দিতে থাকে। এই সুযোগে তাদেরই কেউ কেউ চাবুক হাতে নিয়ে জনসাধারণের ওপর হামলা চালায়। ফলে সমবেত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঐ দিন রাতেই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ীর বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হন।

ছোট হিজরত[৮]

আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ীর বাসগৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি, আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনী এবং অন্যান্য সংগ্রামী আলেমগণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ পরদিন তেহরান ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রেই শহরে হিজরত করবেন এবং হযরত শাহ্ আবদুল আযীমের (রহঃ) মাজারে আশ্রয় নেবেন।[৯]

www.pathagar.com

আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ মোহাম্মদ তাবাতাবায়ী

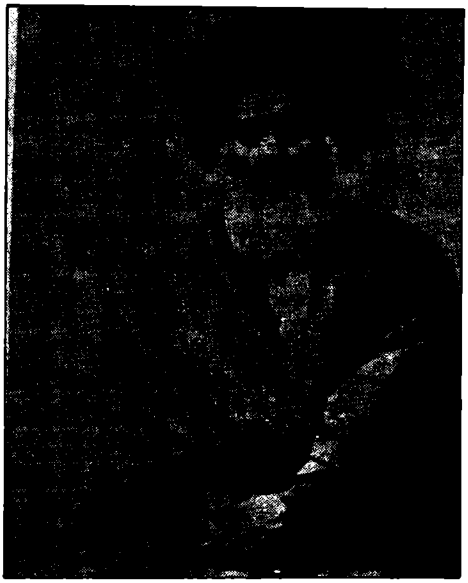
আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ বেহ্বাহনী

সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরদিন একদল আলেম ও মাদ্রাসাছাত্র এবং প্রায় দু'হাজার সাধারণ নাগরিক রেই শহর অভিমুখে রওয়ানা হন। প্রধানমন্ত্রী আইনুদ্দাওলাহ্ প্রথমে এ হিজরত প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল এবং হিজরতে বাধা দেয়া হলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটার তথা তেহরান শহর অচল হয়ে পড়ার ও বাজার ধর্মঘটের সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং বাধাদান থেকে বিরত থাকেন। ফলে হিজরতকারীরা রেই শহরে গিয়ে পৌছেন। এ হিজরত 'ছোট হিজরত' নামে পরিচিত।

হিজরতকারীরা কিছুদিন হযরত শাহ্ আবদুল আযীমের (রহঃ) মাজারে অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা ওসমানী সরকারের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে শাহের নিকট তাঁদের দাবী-দাওয়া পৌছে দেন।[১০]

শাহের বরাবরে পেশকৃত তাঁদের দাবীগুলো ছিল ঃ

ক) কোমের পথ থেকে সামরিক টহলযান সরিয়ে নিতে হবে;

খ) হাজী মোহাম্মাদ রেযা মুজতাহিদকে রাফ্সান্জান্ থেকে কের্মানে ফিরিয়ে দিতে হবে;

গ) খান্ মার্ভী মাদ্রাসার[১১] মোতাওয়াল্লীগিরি হাজী শেখ মোর্তাযাকে ফিরিয়ে দিতে হবে;

ঘ) ইরানের প্রতিটি শহরে আদালতখানা (ইসলামী বিচারালয়) প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

ঙ) সারা দেশে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে;

চ) বেলজিক নাগরিক মাসিউনুয্কে শুল্ক বিভাগের প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে;

ছ) মন্ত্রিসভা থেকে আলাওদ্দাওলাহ্কে বহিষ্কার করতে হবে, এবং

জ) শাহী তহবিল থেকে দেয় বেতন ও পেনশন-ভাতা হ্রাস করা যাবে না।

www.pathagar.com

শাহ্ ওলামায়ে কেরামের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে জানার পর তাঁদেরকে জানাতে বললেন যে, তাঁদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া হল। শাহ্ তাঁদেরকে তেহরানে ফিরিয়ে আনতে এবং তাঁদের দাবী-দাওয়াসমূহের বাস্তবায়ন করতে আইনুদ্দাওলাহ্কে নির্দেশ দেন।

বলা বাহুল্য যে, এ সময় পর্যন্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। দাবীনামাতেও তার উল্লেখ নেই।

বড় হিজরত[১২]

শাহ্ আলেম সমাজের দাবী মেনে নিলেন এবং তাঁর নির্দেশে তাঁদেরকে সসম্মানে তেহরানে ফিরিয়ে আনা হল। কিন্তু আইনুদ্দাওলাহ্ কিছুতেই তাঁদের দাবী-দাওয়া কার্যকর করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারণে তিনি আজ-কাল করে সময় কাটাতে থাকেন। সেই সাথে বিভিন্ন কৌশলে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি এবং কতক আলেম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দাবীনামা বাস্তবায়নের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন।

এমতাবস্থায় আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ীসহ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেমগণ আইনুদ্দাওলাহ্র অসদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে শাহ্কে জানাবার জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে সফল হননি। এমতাবস্থায় তাঁরা শাহের বরাবরে এবং আইনুদ্দাওলাহ্র নিকট পত্র পাঠালেন, কিন্তু এসব পদক্ষেপের কোনটিতেই কাজ হল না। এমন কি প্রধানমন্ত্রী আইনুদ্দাওলাহ্ আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ীর লেখা পত্র শাহের নিকট পৌঁছাবার অনুমতি পর্যন্ত দিলেন না। শুধু তাই নয়, আইনুদ্দাওলাহ্ আরো এক ধাপ এগিয়ে আলেমদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ নেন।

ইতিপূর্বে আইনুদ্দাওলাহর নির্দেশে কয়েকজন আলেমকে গ্রেফতার করে নির্বাসিত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মীর্যা হাসান রুশ্দীয়াহ" এবং শেখ মোহাম্মাদ ওয়ায়েয্ অন্যতম। শেখ মোহাম্মদ ওয়ায়েয্ মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করতেন। বিশেষভাবে তাঁর বক্তৃতাই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদেরকে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সময়ে তিনি তাঁর বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করেছিলেন। এ কারণে আইনুদ্দাওলাহ্ তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করতে যায়। তাঁকে রাস্তায় পেয়ে সেখানেই গ্রেফতার করে।

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা শেখ মোহাম্মদ ওরায়েয্কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে একটি দ্বীনী মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যেতে হচ্ছিল। তারা শেখ মোহাম্মাদকে মাদ্রাসার নিকটে এক পুলিশ-বক্সে আটক করে রাখে। তাঁর গ্রেফতারীর খবর ছড়িয়ে পড়লে একদল সাধারণ মানুষ এবং কিছুসংখ্যক মাদ্রাসাছাত্র উক্ত পুলিশ-বক্সের চারদিকে এসে সমবেত হয়। এরা সবাই পুলিশ-বক্সে হামলা চালিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনে। জনতা পুলিশ-বক্সে হামলা চালালে নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার তাঁর সদস্যদেরকে গুলী চালাবার নির্দেশ দেয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এমতাবস্থায় একজন মাদ্রাসাছাত্র উক্ত কমান্ডারের সামনে ছুটে গিয়ে তাকে তিরস্কার ও গালিগালাজ করেন। জবাবে কমান্ডার তাঁর বুকে গুলী করে। ফলে উক্ত তরুণ মাদ্রাসাছাত্র সাইয়েদ আবদুল হামীদ সাথে সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

উপস্থিত জনতা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শহীদ আব্দুল হামীদের লাশ তুলে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ মিছিলের আয়তন বিশাল থেকে বিশালতর হতে থাকে।

www.pathagar.com

পুনরায় মসজিদে মসজিদে গণসমাবেশ হতে থাকে। কিন্তু আইনুদ্দাওলাহ্‌র নির্দেশে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা লোকদেরকে জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে ওলামায়ে কেরাম পুনরায় তেহরান থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে এবার রেই শহরের পরিবর্তে কোমে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ হিজরত 'বড় হিজরত' নামে পরিচিত।

আলেমদের সাথে সাথে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরাও তেহরান ত্যাগ করে কোমে হিজরত করেন, ফলে তেহরানের সকল বাজার বন্ধ হয়ে যায় এবং শহরে এক অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষাও বেশী ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ তাদের অনেক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই সমাধানের জন্য আলেম সমাজের দ্বারস্থ হত। তাই তাঁরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ায় তেহরানের জনগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে শুরু করে। এমন কি মহিলারাও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসেন।

বড় হিজরতের পর তেহ্‌রানের অবস্থা

তেহরানের আলেমগণ এবং তাঁদের সাথে বহু সংখ্যক শহরবাসী কোমের উদ্দেশে তেহরান ত্যাগ করলে একদিকে যেমন সমগ্র তেহরান শহরে গণঅসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে অসহায় জনসাধারণের ওপর হামলার সম্ভাবনায় এক ধরনের উদ্বেগও বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ উপনিবেশবাদের গোপন হাত সাধারণ গণমানুষের এ আতঙ্ককে আরো বৃদ্ধি করে। এমতাবস্থায় প্রায় ২০ হাজার লোক বৃটিশ দূতাবাস সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অবস্থান ধর্মঘট করে। আর এর ফলেই সাংবিধানিক আন্দোলনের ইতিহাস কলঙ্কলিপ্ত হয়। কারণ বৃটিশ দূতাবাসে অবস্থান গ্রহণকারীরা বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সরকারের নিকট তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে।

তাদের দাবীগুলো ছিল ঃ

১। তেহরানত্যাগী আলেমদেরকে তেহরানে ফিরিয়ে আনতে হবে,

২। কাউকে গ্রেফতার বা নির্যাতন করা হবে না— এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে,

৩। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে,

৪। আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং

৫। গণহত্যাকারীদের বিচার করতে হবে।

সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ও হিজরতকারীদের নতুন দাবী

সংগ্রামী আলেমদের তেহরান থেকে কোমে হিজরত এবং অনেক লোকের বৃটিশ দূতাবাসে অবস্থান গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে থাকে। জনসাধারণ হিজরতকারী এবং অবস্থান ধর্মঘটীদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তেহরানের জনগণ এবং তাদের দাবী-দাওয়ার সমর্থনে সব জায়গা থেকে শাহের নিকট টেলিগ্রাম পাঠানো শুরু হয়। এর ফলে হিজরতকারীদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় তাঁরা আরো কিছু নতুন দাবী প্রকাশ করেন। এ দাবীনামা হচ্ছে ঃ

১। হিজরতকারী আলেমদের তেহরানে ফিরিয়ে নিতে হবে,

২। আইনুদ্দাওলাহ্‌কে অপসারণ করতে হবে,

www.pathagar.com

৩। দারুশ শুরা[১৪] উদ্বোধন করতে হবে,

৪। হত্যাকারীদের কেছাছ্ করতে হবে[১৫] এবং

৫। যাঁদেরকে নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

শাহের ফরমান জারী ও আলেমদের তেহ্রান প্রত্যাবর্তন

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এ পর্যন্তও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সাংবিধানিকতার দাবী পেশ করা হয়নি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে মানুষের মুখে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশ্য এ দাবীর মূল কোথায় এবং কা'দের ও কোন্ ধারার লোকদের পক্ষ থেকে কি উদ্দেশ্যে এ দাবী ছড়িয়ে দেয়া হয় তা আলোচনার দাবী রাখে; পরে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে।

দেশের এখানে-সেখানে গণআন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ এবং শাহের সাথে ঘনিষ্ঠ কিছু দেশী লোকের মাধ্যমে শাহ্ জনগণের দাবী সম্পর্কে জানতে পারেন। এর ভিত্তিতে প্রথমেই তিনি আইনুদ্দাওলাহ্কে অপসারণ করেন এবং তাঁর স্থলে মুশীরুদ্দাওলাহ্কে[১৬] প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরপর তিনি দারুশ শুরা গঠনের ফরমান জারি করেন। বস্তুতঃ এ ফরমানের মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় পরামর্শসভা[১৭] গঠন করা। যেহেতু বিভিন্ন কারণে জনসাধারণ এ নামটির ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, তাই শাহ্কে নতুন ফরমান জারি করতে হয়।

শাহের পক্ষ থেকে এ ফরমান জারি হবার পর ইল্কাজার গোত্রের গোত্রপতি আয্দুল মুল্ক[১৮] ওলামায়ে কেরামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কোমে প্রেরিত হন এবং তিনি তাঁদেরকে সসম্মানে তেহরানে ফিরিয়ে আনেন। এর কয়েক দিন পর মাদ্রাসায়ে নেযাম-এ[১৯] মজলিসের[২০] উদ্বোধন করা হয়। মজলিসের নির্বাচনবিধি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে নির্বাচনবিধি প্রণয়নের কাজ শেষ করা হয় এবং হিজরী ১৩২৪ সালে[২১] তেহরানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একই বছরে (পুনর্গঠিত) মজলিসের উদ্বোধন করা হয়।

সংবিধান[২২] প্রণয়ন

নবগঠিত মজলিসে একদিকে পাশ্চাত্যপন্থীরা অনুপ্রবেশ করে, অন্যদিকে শাহী দরবার এবং বিজাতীয়দের তাঁবেদার আরো কিছু লোক এতে প্রবেশ করে। ফলে সংবিধান বা মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মজলিসে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টিভঙ্গির ধারক-বাহকদের বেশীর ভাগই ছিলেন আলেম। তাঁরা ইসলামী মানদণ্ডের আলোকে সংবিধান প্রণয়নের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী ও আধুনিকতার অনুসারী; তাঁরা সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা চিন্তা ও পশ্চিমা মডেল থেকে সাহায্য নিতে চাচ্ছিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সংবিধানের খসড়া প্রণীত হয়। মুশীরুদ্দৌউলাহ, নাসেরুলমুল্ক, মোহ্তাশামুস্ সাল্তানাহ্ এবং মুনীরুল মুল্ক সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন ও বিন্যস্তকরণের কাজ আঞ্জাম দেন। একই বছর অর্থাৎ হিজরী ১৩২৪ সালে[২৩] সংবিধানের খসড়া মজলিসে উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। এরপর শাহ্ তাতে স্বাক্ষর করেন। সংবিধান স্বাক্ষরের দশ দিন পর শাহ্ মারা যান।

www.pathagar.com

ইরানের প্রথম সংবিধান

ইরানের এ প্রথম সংবিধানটি ৫১টি ধারায় বিন্যস্ত হয়েছিল। অবশ্য কার্যত ঃ তা একটা ৫১ ধারাবিশিষ্ট সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব[২৪] ছাড়া আর কিছু ছিল না। কারণ, এতে দেশের পরিচালনা সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে, মোযাফফারুদ্দীন শাহের মৃত্যুর পরে সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। এতে সদস্য ছিলেন সানিউদ্দাওলাহ্[২৫], ওসুকুদ্দা ওলীহ্,[২৬] সা'দুদ্দাওলাহ্[২৭], মোশারুল মুল্ক[২৮], মুস্তাশারুদ্দাওলাহ্[২৯], তাকীযাদে,[৩০] হাজ্ আমীনুয যার্ব[৩১] এবং হাজ্ সাইয়েদ নাসরুল্লাহ। মজলিসে পশ্চিমাপন্থীদের প্রভাব এবং ধর্মীয় নেতাদের উদাসীনতা (হয়তোবা আলেমরা তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন) এ দুই কারণে সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়নে পশ্চিমাপন্থী ও রক্ষণশীলদের পছন্দই প্রাধান্য লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিপ্লবী আলেম শেখ ফযলুল্লাহ নূরী[৩২] মজলিসের আইন-কানুন প্রণয়নের ওপর মুজতাহিদ আলেমগণের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিধি যুক্ত করার জন্যে দাবী তোলেন এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালায় একটি ধারা যোগ করা হয় যাতে 'মজলিসে ইসলামের বরখেলাফ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় তা দেখার জন্য সকল যুগেই পাঁচজন সমকালীন মুজতাহিদ আলেমের তদারকী'র ব্যবস্থা রাখা হয়। বস্তুতঃ শেখ ফয্লুল্লাহ্ নূরীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে চাপাচাপি করা না হলে এ ধারাটি যুক্ত হতো না। সেক্ষেত্রে সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা অধিকতর পশ্চিমা রং ধারণ করত।

টীকা ঃ

(১) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

(২) এখানে উল্লেখ্য যে, নাসিরুদ্দীন শাহের মৃত্যুর পরও আমীনুস্ সুলতান স্বল্পকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এরপর মোযাফফারুদ্দীন শাহ্ তাঁকে বরখাস্ত করে আমীনুদ্দাওলাহ্কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। শাহ্ কিছুদিন পর আমীনুদ্দাওলাহকে বরখাস্ত করে আমীনুস্ সুলতানকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরপর তিনি আমীনুস্ সুলতানকে পুনরায় বরখাস্ত করেন। তাঁর বরখাস্তের পর আইনুদ্দাওলাহ্ (عين الدوله) দ্বিতীয় বারের মত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

(৩) ইরানীরা চিনির পরিবর্তে মিছরি দিয়ে চা খেতে অভ্যস্ত। মিছরির টুকরা গালের মধ্যে দিয়ে চিনি বিহীন চা পান করে এবং মুখের মধ্যে ধীরে ধীরে মিছরি গলে চায়ের সাথে মিশ্রিত হয়। এভাবে মিছরি দিয়ে চা খাওয়ার কারণে সেখানে চিনির চেয়ে মিছরির প্রচলন বেশী। — অনুবাদক

(৪) علاء الدوله

(৫) বর্তমান নাম মসজিদে ইমাম।

(৬) ایت الله سید محمد طباطبائی — আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোহাম্মদ তাবাতাবায়ী। (খ্যাতনামা মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা তাবাতাবায়ী নন, তিনি পরবর্তীকালীন ভিন্ন ব্যক্তি।)

(৭) ایت الله سید عبد الله بهبهانی— আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ বেহ্বাহনী।

(৮) مهاجرت صغری— সম্ভবতঃ কম দূরত্বে হিজরত এবং কম সংখ্যক লোক এতে অংশ নেয়ায় এ নাম দেয়া হয়ে থাকবে। — অনুবাদক

www.pathagar.com

(৯) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে এটাই বুঝানো যে, তেহ্‌রানে তাঁদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নেই, তাই তাঁরা দেশের অন্যতম প্রধান ধর্মকেন্দ্র ও জিয়ারতগাহে আশ্রয় নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, স্বৈরাচারী শাহী সরকারও মাশ্‌হাদস্থ হযরত ইমাম রেযা (আঃ)-এর মাযার, কোমের হযরত মাসুমাহ্ (সালামুল্লাহি আলাইহা)-এর মাযার এবং রেই শহরস্থ হযরত শাহ্ আবদুল আযীমের (রঃ) মাযারে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার দুঃসাহস দেখাত না। কারণ, সেক্ষেত্রে হয়ত সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তাকর্মীরাই গ্রেফতারীর আদেশ অমান্য করত অথবা গ্রেফতার করা হলে সর্বাত্মক গণবিদ্রোহের নিশ্চিত আশংকা ছিল। — অনুবাদক

(১০) এ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, শাহ্ ছিলেন পারিষদবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও গণবিচ্ছিন্ন। ফলে দেশে বা বিশ্বে কি হচ্ছে তা জানার জন্যে তাঁকে পারিষদবর্গের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হত। সকল স্বৈরাচারী ও রাজা-বাদশাহ্‌র অবস্থাই এরূপ। —— অনুবাদক

(১১) مدرسهٔ خان مروی

(১২) مهاجرت كبرى

(১৩) میرزا حسن رشدیه

(১৪) دار الشورى– পরামর্শ সভা।

(১৫) অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড দিতে হবে।

(১৬) مشير الدوله

(১৭) مجلس شورای ملی

(১৮) عضد الملك

(১৯) مدرسهٔ نظام

(২০) বলা বাহুল্য যে, এ মজলিস ছিল মনোনীত, তবে মোটামুটি দেশের জনমান্য ব্যক্তিদের এতে মনোনীত করা হয়েছিল। —— অনুবাদক

(২১ ফার্সী ১২৮৫ সাল মোতাবেক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ।

(২২) قانون اساسی — আভিধানিক অর্থ 'মৌলিক আইন'। পরে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, এটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ছিল না।

(২৩) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ।

(২৪) قطعنامه — Resolution.

(২৫) صنيع الدوله

(২৬) وثوق الدوله

(২৭) سعد الدوله

(২৮) مشار الملك

(২৯) مستشار الدوله

(৩০) تقی زاده

(৩১) حاج امين الضرب

(৩২) شيخ فضل الله نورى - পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যপন্থীরা তাঁকে হত্যা করে। (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মোহাম্মদ আলী শাহের স্বৈরাচারী শাসনামল

মোযাফফারুদ্দীন শাহের মৃত্যুর পর[১] মোহাম্মদ আলী শাহ্ ইরানের মসনদে আরোহণ করেন। মোহাম্মদ আলী শাহ্ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে—যুবরাজ থাকাকালে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেও, সাংবিধানিকতার প্রতি তাঁর সম্মতি ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দৃশ্যতঃ তিনি সাংবিধানিকতার দাবীর পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি অন্য রাজা-বাদশাহ্দেরই ন্যায় স্বৈরাচারী ছিল। এর ফলে তাঁর পক্ষে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া এবং মজলিসের (পার্লামেন্টের) সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই ক্ষমতাসীন হবার পর তিনি সাংবিধানিকতার আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। আর এ কাজে তিনি রাশিয়ার পক্ষ থেকে উৎসাহ ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করেন।

রুশরা কতগুলো কারণে ইরানের সংবিধানিক বিপ্লবের বিরোধী ছিল। তা হচ্ছে ঃ

১। তৎকালীন কাজার বাদশাহ্গণ ও শাসকগোষ্ঠীর অন্য সদস্যগণ পুরোপুরি তাঁদের তাবেদার ছিলেন। তাই শাহী দরবারের ক্ষমতাহ্রাসের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছিল।

২। রাশিয়া এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, বৃটিশরা সাংবিধানিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও মজলিসের সদস্যদের মধ্যে তাদের যে প্রভাব রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে সরকার ও মজলিসকে সপক্ষে টানতে সক্ষম হবে এবং তাঁদেরকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উস্কে দেবে। ফলে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই ইরানে রুশ অবস্থানকে বিপন্ন করে ফেলতে সক্ষম হবে এবং এর ফলে এত বড় বিশাল দেশের পণ্যবাজার রুশদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে।[২]

সাংবিধানিক আন্দোলনের শুরুতে ইংরেজরা তার সমর্থক ছিল। কারণ তাদের উদ্দেশ্যে ছিল ইরানে ব্যাপকতর প্রভাবের অধিকারী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। তারা জানত, ইরানে একটি সংরক্ষণশীল আন্দোলন গড়ে উঠলে তা রুশ প্রভাবকে সহ্য করতে চাইবে না। কিন্তু খুব শীঘ্রই ইংরেজ ও রুশদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি হয় (এবং এর ফলে দু'দেশের মধ্যে ১৯০৭ খৃস্টাব্দের বিখ্যাত চুক্তি সম্পাদিত হয়)। ইতিমধ্যে ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, বিপ্লব যদি দৃঢ়মূল হয়ে যায় এবং কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায় তাহলে এ বিপ্লব নিঃসন্দেহে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে; সেক্ষেত্রে তা তাদের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমন কি তা হয়ত ভারতেও তাদের স্বার্থকে বিপন্ন করতে পারে। এ কারণে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিপ্লবের অগ্নি নির্বাপিত করা এবং এর রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যকে রক্ষার জন্যে শাহ্ ও মজলিসের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে। কারণ শাহ্ ও মজলিসের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে একদিকে যেমন রুশরা ইরানে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, অন্যদিকে বিপ্লবের অগ্নিও নির্বাপিত হবে এবং বিপ্লবের রক্ষণশীল নেতৃত্বে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্যেও ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রুশরা যেভাবে সাংবিধানিকতার বিলুপ্তি কামনা করত বৃটিশরা তা করত না। বরং তারা শাহ্ ও সাংবিধানিকতার দাবীদারদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে

www.pathagar.com

সারা দেশে গণবিদ্রোহ সৃষ্টির বিপদ দূরীভূত করতে চাচ্ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল কোনরূপ সংঘাতের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীতই বিপ্লবের গভীরতা ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করা।[৩]

অন্যদিকে রুশরা সাংবিধানিকতার বিলোপের পিছনে মরিয়া হয়ে লেগে যায় এবং এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে তারা মোহাম্মদ আলী শাহ্‌কে উৎসাহিত করতে থাকে। পরে যেমন আমরা দেখতে পাব, এর ফলে দেশে অনেকগুলো ব্যাপকভিত্তিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এসব গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের ন্যায় রুশরাও বুঝতে পারে যে, সাংবিধানিকতার বিলুপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে সংঘাতের ফল হবে বিপরীত। তাই রুশ-বৃটিশ চুক্তির[৪] পরে দুই পক্ষ এ মর্মে সমঝোতায় উপনীত হয় যে, উভয় পক্ষ নিজ নিজ এজেন্টদেরকে সাংবিধানিক গণআন্দোলনের শীর্ষদেশে (নেতৃত্বে) নিয়ে আসবে এবং সবাই তেহরান অভিমুখে যাত্রা করবে। তেহরান পৌঁছার পরই তারা সাংবিধানিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার নাম করে একদিকে যেমন গণরোষকে নির্বাপিত করবে, অন্যদিকে বহিঃশক্তির তাঁবেদার নন এমন নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণকে প্রতিহত করবে।

সাংবিধানিকতা ও সংবিধানপন্থীদের প্রতি শাহের উপেক্ষা

একদিকে শাহের প্রকৃতি ছিল স্বৈরাচারী, অন্যদিকে রুশরা তাঁকে স্বৈরাচারী কায়দায় শাসন পরিচালনার জন্যে উৎসাহিত করছিল। ফলে মোহাম্মদ আলী শাহ্ প্রথমে সাংবিধানিকতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও পরে এর বিরোধিতা শুরু করেন।

শাহ্ সাংবিধানিকতার প্রতি প্রথম উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তাঁর অভিষেক (রাজমুকুট পরিধান) অনুষ্ঠানে। তিনি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মজলিস সদস্যদের দাওয়াত করেননি। এর কিছুদিন পর সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হল। কিন্তু তিনি এতে স্বাক্ষর করলেন না। শেষ পর্যন্ত যখন দেশের বিভিন্ন শহরে গণঅভ্যুত্থান এবং ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হল, সেই সাথে নাজাফের ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে পত্র আসতে লাগল, তখন তিনি সংবিধানের ঐ সম্পূরক বিধিমালায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কিন্তু এর পরেও তিনি সংবিধানপন্থীদেরকে দমন করার পন্থা খুঁজতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এমন এক ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করবেন সাংবিধানিক আন্দোলনের বিরোধিতা এবং স্বৈরতন্ত্রের সমর্থন ও সহায়তার ব্যাপারে যাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আমিনুস্ সুল্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব ও তাঁর হত্যাকাণ্ড

মোহাম্মদ আলী শাহ্ আতা বাক্[৫] নামে খ্যাত মীর্যা আলী আস্গার আমিনুস্ সুল্তানকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সংবিধানপন্থীরা, বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন এবং এ সিদ্ধান্তকে জাতীয় জীবনের জন্য একটি চরম বিপর্যয়কর সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা শাহের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শুরু করেন।

আমীনুস্ সুল্তান তখন ইউরোপ সফরে ছিলেন। শাহের আহ্বান পেয়ে তিনি ইরানের পথে রওয়ানা হলেন। ইউরোপে অবস্থানরত মীর্যা মেল্কাম খান এবং তালেবোভ[৬] মজলিসের সদস্য সা'দুদ্দাওলাহ্[৭] বরাবরে পত্র লিখে আমীনুস সুল্তানের হাতে দিলেন এবং এতে তাঁর পক্ষে সমর্থন দান

www.pathagar.com

ও সমর্থন সংগ্রহের জন্যে সা'দুদ্দাওলাহ্‌র নিকট সুপারিশ করলেন। এদিকে একদল বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমীনুস্ সুল্‌তানকে দেশে প্রবেশ করতে দেবেন না, বরং তাঁকে হত্যা করবেন। কিন্তু এতে তাঁরা সফলকাম হলেন না। আমীনুল্ সুল্‌তান তেহরান পৌঁছার সাথে সাথেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হল।

আমীনুস্ সুলতান একদিকে সংবিধানপন্থীদের এবং অপরদিকে শাহের ব্যাপারে দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। কারণ যদিও তিনি স্বভাবগতভাবেই স্বৈরাচারের সমর্থক ছিলেন, তথাপি প্রকাশ্যেই মজলিসের বিরোধিতাকে তিনি নিজের জন্যে কল্যাণকর মনে করেননি। তাই একই সাথে তিনি শাহ্ ও মজলিস সদস্যদের সাথে প্রতারণা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি একদিকে সংবিধানপন্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকেন এবং নিজেকে সংবিধানপন্থীদের সমর্থক হিসেবে দেখাতে থাকেন, অন্যদিকে তিনি শাহ্‌কে বলতেন ঃ "আমি মজলিস সদস্যদের সাথে এমন আচরণ করছি যাতে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান এবং নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে মশগুল হয়ে পড়েন। কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁদের সাথে থাকাই শ্রেয় যাতে তাঁরা হতাশ হয়ে না পড়েন এবং যদ্দিন আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারছি তদ্দিন অধিকাংশ (মজলিস সদস্য)কে হাতে রেখে চরমপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে।"

আসলে আমীনুস্ সুল্‌তানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বীয় পদ ও পদমর্যাদাকে রক্ষা করা। তিনি দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা এবং বৃটিশদের পথনির্দেশের ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শাহ্ ও সংবিধানপন্থীদের মধ্যে আপোষরফা করতে হবে। এতে তিনি সফল হলেন। তিনি সংবিধানপন্থীদের সমর্থনে শাহের নিকট থেকে একটি বক্তব্য লিখিয়ে নিতে সক্ষম হলেন, এরপর তা পাঠ করে শোনানোর জন্যে মজলিস অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু মজলিস সদস্যদের সামনে শাহের লেখা বক্তব্য পাঠ করে শোনানোর পর মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি গুলীবিদ্ধ হন ও প্রাণত্যাগ করেন।

মজলিসে কামানের গোলাবর্ষণ ও স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আমীনুস্ সুল্‌তানের হত্যাকাণ্ডের পর সাংবিধানিকতার বিরোধীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় ও কিছুদিনের জন্য তারা পিছু হটে যায়। শাহ্ পুনরায় সাংবিধানিকতার সমর্থনে শপথ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে সা'দুদ্দাওলাহ্‌র প্রস্তাবক্রমে এবং শাহের ও পারিষদবর্গের ইঙ্গিতে তেহরানে ও দেশের অন্যান্য শহরে সাংবিধানিকতাপন্থীদের বিরুদ্ধে যেসব তৎপরতা শুরু হয়েছিল তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর দুশান পাহাড়ে[৮] যাবার পথে শাহ্‌কে হত্যার চেষ্টা করা হয়, তবে এতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি।

দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছিল শাহ্‌কে হত্যার ঐ প্রচেষ্টা স্বয়ং শাহের পক্ষ থেকেই সাজানো হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সাংবিধানিকতার প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্য ও আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধানপন্থীদের দমনের জন্য অজুহাত তৈরি করা।

হিজরী ১৩২৬ সালে[৯] একদিন একদল সৈনিক রাস্তায় নেমে আসে ও সাধারণ মানুষকে প্রহার করতে শুরু করে। ঠিক একই সময় শাহ্ তাঁর (ঘোড়ার) গাড়ীতে সওয়ার হয়ে শহর দেখতে বের হলেন। তিনি তেহরানের কয়েকটি রাস্তা ও বাহারিস্তান স্কোয়ার হয়ে গরম হাওয়ার অজুহাতে বাগে শাহ্[১০] গিয়ে উঠলেন।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে শাহের বাগেশাহ্ গমনের উদ্দেশ্য ছিল মজলিস সদস্য ও সংবিধানপন্থীদের দমন করা। এজন্য তিনি সেখানে বিশ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু সংবিধানপন্থীরা বিষয়টি নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করেননি। যখন তাঁরা শাহের মতলব বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন আর শাহের মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট লোকজন যোগাড় করে আনা সম্ভব ছিল না।

এরপর রুশ কমান্ডার লিয়াখোভের[১১] নেতৃত্বে কাজ্জাক বাহিনী চলে আসে ও মজলিস ভবনের দিকে এগিয়ে যায়। কাজ্জাক বাহিনী মজলিস সদস্যদের ও সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। তখন সেখানে মাত্র গুটিকয় সশস্ত্র মুজাহিদ ছিলেন; তাঁরা পাল্টা গুলীবর্ষণ করতে শুরু করেন। ফলে পুরোদমে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু কাজ্জাক বাহিনীকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ও প্রস্তুতি তখন সংবিধানপন্থীদের ছিল না সেহেতু ঘন্টাখানেক পর তাঁরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হন। তাঁদের একাংশ চলে যান আমিনুদ্দাওলাহ্ পার্কের দিকে; অন্যরা এদিকে সেদিকে সরে যান।

সেদিনই সংবিধানপন্থীদের বাড়ীঘরে লুটতরাজ চালানো হল ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাঁদেরকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

কাজ্জাক বাহিনী যখন বুঝতে পারল যে, আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী ও আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনীসহ একদল সংবিধানপন্থী আমিনুদ্দাওলাহ্ পার্কে সমবেত হয়েছেন, তখন তারা সেখানে হানা দিল এবং তাঁদেরকে গ্রেফতার করে বাগেশাহ্ নিয়ে গেল।

বাগেশাহ্ আনার পর আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী, আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনী ও জুমআ ইমাম খুয়ীকে[১২] কাজ্জাক সৈন্যরা ইচ্ছামত প্রহার করে। এরপর তারা শাহের নির্দেশে জাহাঙ্গীর খান সোওরে ইসরাফীল[১৩] ও মালেকুল্ মোতাকাল্লেমীনকে[১৪] অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। অন্যদিকে আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী ও আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনীকে নির্বাসিত করা হয়। তাকীযাদেহ্সহ কয়েকজন মজলিস সদস্যকে গ্রেফতারের জন্য পূর্ব থেকেই মওকা খোঁজা হচ্ছিল; এমতাবস্থায় তাঁরা বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় নেন ও প্রাণে বেঁচে যান। এসবের ফলশ্রুতিতে মজলিস বন্ধ হয়ে যায় এবং ইরানের বুকে পুনরায় স্বৈরতন্ত্র চেপে বসে।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে গণঅভ্যুত্থান

ইরানের বিভিন্ন শহরে খবর পৌঁছে গেল যে, সংবিধানপন্থীদের বিরুদ্ধে চরম দমন অভিযান চালানো হয়েছে এবং মজলিস ভবনে কামানের গোলা বর্ষণ করা হয়েছে। তখন ইরানের সর্বত্রই জনগণ আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারা স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সমগ্র ইরানেই গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি শহরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে তুলে ধরব। উল্লেখ্য, প্রায় সকল শহরের জনগণই অভ্যুত্থান করার পর তেহরান দখলের লক্ষ্যে যাত্রা করেছিল।

১। তাবরীযের[১৫] অভ্যুত্থান ঃ তেহরানের ঘটনার খবর তাবরীযের সংবিধানবিরোধীদের নিকট পৌঁছার আগেই সংবিধানপন্থীদের নিকট পৌঁছে যায়। এর ফলে তারা তাদের প্রতিপক্ষের আগেই পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়। তাব্রীযে সাংবিধানিকতার সপক্ষে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ইতোমধ্যে তাবরীযে সাত্তার খান[১৬] ও বাকের খান[১৭] নামে দু'জন বীরপুরুষ জনগণের কাতারে শামিল হন ও জনগণ তাঁদেরকে নেতৃত্বে আসীন করে। তাঁরা তাব্রীযের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে সক্ষম হন এবং সংবিধান বিরোধীদের ওপর জয়লাভ করেন।

www.pathagar.com

সার্দারে মিল্লী সাত্তার খান

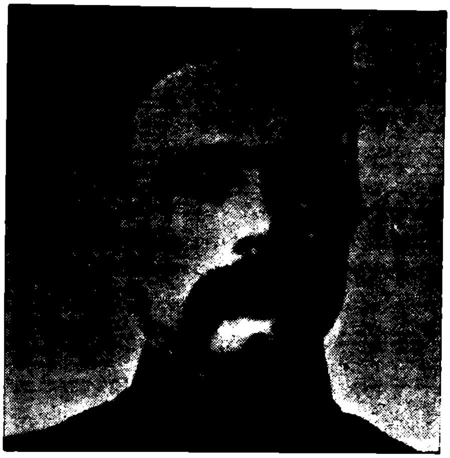
সালারে মিল্লী বাকের খান

মুক্তিকামী জনতার হাতে তাব্রীযের পতনের খবর পেয়ে মোহাম্মাদ আলী শাহ্ সেখানকার সংবিধানপন্থীদের দমনের উদ্দেশ্যে কুখ্যাত স্বৈরাচারী আইনুদ্দাওলাহ্র নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আইনুদ্দাওলাহ্ তাব্রীয পৌঁছে শহরটি অবরোধ করেন। এক মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। শাহী বাহিনী শহরে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে শহরে মারাত্মক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এমন কি শহরবাসীরা ঘাস খেয়ে পর্যন্ত জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাব্রীযের জনগণ আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। অবশেষে আইনুদ্দাওলাহ্ অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন।

২। **গীলানের গণঅভ্যুত্থান ঃ** ইরানের অন্যান্য শহরের ন্যায় গীলানের জনগণও শাহের বিরুদ্ধে এবং সংবিধানপন্থীদের সমর্থনে অভ্যুত্থান করে। ইতিমধ্যে সেপাহ্দরে আ'যাম্ উপাধিধারী মোহাম্মাদ ওয়ালী খান তাঙ্কাবোনী[১৮] নামে একজন সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী সামন্ত জমিদার এখানে মাঠে নামেন। তাঙ্কাবোনের বিখ্যাত জমিদার ওয়ালী খান পূর্ব থেকে সাংবিধানিকতার গোঁড়া বিরোধী ছিলেন। তিনি সাংবিধানিক বিপ্লবের পূর্বে আইনুদ্দাওলাহ্র সাথে গীলানে এসে ব্যাপক সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি এবারের গণঅভ্যুত্থানের সময় তাব্রীযে ছিলেন। সেখানে থাকাকালেই বুঝতে পারেন যে, এবার স্বৈরতন্ত্র টিকে থাকতে পারবে না। তাই তিনি নিজের চেহারা বদলে ফেলেন; তিনি বিদ্রোহী সেজে তাঙ্কাবোনে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের জমিদারী রক্ষা করা। তিনি তাঙ্কাবোনে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও সাংবিধানিকতার সপক্ষে লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করতে থাকেন।

গীলানের জনগণ তেহরান অভিযানের জন্য একটি গণবাহিনী প্রস্তুত করে। কিন্তু মোহাম্মদ ওয়ালী খান যে উপনিবেশিক শক্তির তাবেদার ছিলেন জনগণ তা জানতো না। তাই তাঁরই পীড়াপীড়িতে জনগণ সরল বিশ্বাসে তাঁকে এ বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নির্বাচিত করে।

এ ঘটনার সমসময়ে ইফ্রাম খান আর্মানীর[১৯] নেতৃত্বে কাফ্কাজ অঞ্চল ও আর্মেনিয়ার একদল মুহাজির রাশ্ত্ শহর[২০] নিয়ন্ত্রণ করছিল; তারাও এসে মোহাম্মদ ওয়ালী খানের বাহিনীতে যোগদান

www.pathagar.com

করে তেহরান অভিযানে অগ্রসর হয়।

৩। বাখ্তিয়ারীদের অভ্যুত্থান ঃ তেহরানের ঘটনা এবং বিভিন্ন শহরে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হবার খবর পেয়ে ইল্ বাখ্তিয়ারী[২১] গোত্রের লোকেরাও তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অবশ্য বাখ্তিয়ারীদের কেউ কেউ আইনুদ্দাওলাহ্র বাহিনীতে যোগদান করেছিল এবং তাব্রীয অবরোধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এ গোত্রের অধিকাংশ লোক তাদের গোত্রপতি সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্র[২২] নেতৃত্বে শাহের বিরুদ্ধে এবং সাংবিধানিকতার পক্ষে অভ্যুত্থানে অংশ নেয়।

এ সময় ইস্ফাহানে[২৩] সংঘটিত কতগুলো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এবং দু'জন সংগ্রামী আলেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইস্ফাহানের জনসাধারণ শাহী সরকারের নিয়োজিত নগর প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাখ্তিয়ারীরা পরিস্থিতি অনুকূল বিবেচনা করে ইস্ফাহানে অভিযান চালায় এবং সরকারী বাহিনীর সাথে দু'দিনব্যাপী সংঘর্ষের পর শহরটি দখল করতে সক্ষম হয়। সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্ সাংবিধানিকতার সমর্থনে সেখানে প্রাদেশিক সমিতি গঠন করেন।

বাখ্তিয়ারীদের নেতা খানে বাখ্তিয়ারীর[২৪] এক ভাই ছিলেন; তাঁর নাম ছিল আলী কুলী খান[২৫] যিনি সার্দর্ আস্আদ[২৬] বাখ্তিয়ারী নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ সময় তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। তিনি ঐ যুগের আলোকদীপ্ত চিন্তাধারাসম্পন্ন[২৭] ব্যক্তিত্ববর্গের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি ইরানের ঘটনাবলীর খবর পেয়ে বাখ্তিয়ারীদের উদ্দেশে চিঠি লিখে তাদেরকে প্রতিরোধ আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। এরপর তিনি নিজেও ইরানের পথে রওয়ানা হয়ে আসেন। ইস্ফাহানের পতনের পর আলী কুলী খান ইরানে পৌঁছে বাখতিয়ারীদের সাথে যোগদান করেন এবং তাদের অধিনায়ক হিসেবে তেহরান অভিযানে এগিয়ে যান।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামে ইরানের আলেম সমাজ, বিশেষ করে নাজাফে অবস্থানরত ওলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে যেমন কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে, তেমনি পরেও আলোচনা করা হবে।

তেহরান বিজয় ঃ রুশ-বৃটিশ চক্রান্ত

মোহাম্মদ আলী শাহের বিরুদ্ধে ইরানের বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হচ্ছিল এবং ক্রমে তা চরম আকার ধারণ করছিল। এ সময় দ্বীনী কেন্দ্রগুলোতে[২৮] অবস্থানরত মারজা'গণ বিভিন্ন ঘোষণা প্রকাশের মাধ্যমে স্বৈরচারবিরোধী সংগ্রামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জনসাধারণকে এতে উৎসাহিত করছিলেন। ফলে বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুত্থানে সাংবিধানিকতার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং জনসাধারণ তাদের সংগ্রামে আরো বেশী দৃঢ়তার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কিন্তু একই সাথে রুশ ও বৃটিশদের ষড়যন্ত্র ও গোপন তৎপরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

উভয় উপনিবেশিক শক্তি ইরানের বিভিন্ন শহরে গণঅভ্যুত্থান লক্ষ্য করে এবং শাহ্ বিরোধী জিহাদে নেতৃত্বদানের জন্য দ্বীনী কেন্দ্রগুলো থেকে মারজাগণের ইরান অভিমুখে রওনা হবার খবর পেয়ে বুঝতে পারে যে, এ অভ্যুত্থানের অগ্নি নির্বাপিত করা না হলে তার পরিণতিতে তাদের ভাগ্যে বিরাট বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং গণবিপ্লব অধিকতর দৃঢ়মূল হতে পারে।

অনেক আগে থেকেই উত্তর ইরানের সামন্ত জমিদারদের মধ্যে রুশদের এবং বাখ্তিয়ারী গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ছিল। তাই এ দুই উপনিবেশিক শক্তি তেহরান অভিমুখে

www.pathagar.com

গণবাহিনীসমূহের অভিযাত্রা রোধের কোন পথ দেখতে না পেয়ে তাদের প্রভাবাধীন সামন্ত জমিদার ও গোত্রপতিদের মাধ্যমে ঘটনাবলীর গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর যেহেতু জনসাধারণ এই সব জমিদার ও গোত্রপতির প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, সেহেতু তারা এদেরকে স্বীয় আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছিল। এর ফলে রুশ ও বৃটিশদের পক্ষে তাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করা সহজতর ছিল। এ প্রেক্ষিতে রুশরা গণবাহিনীসমূহে তাদের অনুগত অধিনায়কদের সাথে এবং বৃটিশরাও আলী কুলী খান ওরফে (সার্‌দর্‌ আস্‌আদ্‌) সহ বাখ্‌তিয়ারী নেতাদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ দুই উপনিবেশবাদী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের এজেন্টদের সাথে প্রস্তুতিপর্বের পদক্ষেপসমূহের ব্যাপারে যোগাযোগের ফলে তাদের উদ্বেগ অনেকখানি হ্রাস পেলেও পরবর্তীতে সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না। ফলে সর্বাবস্থায় এ আশঙ্কা থেকেই যায় যে, উক্ত সামন্ত জমিদার ও গোত্রীয় নেতারা হয়ত গণআন্দোলনের অগ্নি নির্বাপিত করতে সক্ষম হবেন না এবং এমন কিছু ঘটে যাবে যা রাশিয়া ও বৃটেনের কাম্য নয়। এ কারণে এবারের গণআন্দোলনের পুরো সময়টাই রুশ ও বৃটিশরা তেহরান অভিমুখী গণঅভিযানসমূহের প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা চালায়। এ সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাতে ওয়ালী খান তান্কাবোনী ও সার্‌দর্‌ আস্‌আদ্‌ এ প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু তাঁদের জন্যে সমস্যা ছিল যে, তেহরান অভিযান স্থগিত রাখার ঘোষণা দিলে জনসাধারণ তাঁদেরকে হত্যা করত। এ কারণে বহু ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গণবাহিনীসমূহকে তেহরান অভিযান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বরং জনসাধারণের দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফলে তেহরানযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশ ও রুশরা এটাকে তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করলেও অগত্যা তাদেরকে এটাই মেনে নিতে হয়।

তেহরান বিজয় ও মোহাম্মদ আলী শাহের পতন

বিপ্লবী জনগণের তেহরান প্রবেশে বাধা সৃষ্টির রুশ-বৃটিশ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর তেহরানমুখী গণবাহিনীসমূহ হিজরী ১৩২৭ সালে[২৯] তেহরানে প্রবেশ করে। শাহের সেনাবাহিনী দুই দিন যাবত গণবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় এবং বিপ্লবী জনতার হাতে তেহরানের পতন ঘটে। শাহ্‌ জনতার হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রুশ দূতাবাসে আশ্রয় নেন।

তেহরান বিজয়ীরা বাহারিস্তানে[৩০] পরামর্শসভা (শূরা) আহ্বান করেন। সভা মোহাম্মদ আলী শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পুত্র ১২ বছর বয়স্ক আহ্‌মাদ মীর্যাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এছাড়া শূরার পক্ষ থেকে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী পরিচালকমণ্ডলী[৩১] গঠন করা হয়। ২২ সদস্যবিশিষ্ট এ পরিচালকমণ্ডলী সাময়িকভাবে দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন।

অস্থায়ী পরিচালকমণ্ডলী ক্ষমতাচ্যুত শাহের তেহরানে অবস্থানকে বিপজ্জনক গণ্য করেন। এমতাবস্থায় রুশ ও বৃটিশ দূতাবাসের সম্মতিক্রমে তাঁকে শর্তাধীনে দেশ থেকে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌ সরকারী তহবিলের স্বর্ণ, মণিমুক্তা ইতাদি এবং সরকারী দলিল-দস্তাবেজসমূহ ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে দেশের সরকারের (পরিচালকমণ্ডলীর) পক্ষ থেকে তাঁকে বার্ষিক এক লাখ তুমান[৩২] অবসর ভাতা দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এরপর ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌ দেশান্তরিত হন।[৩৩]

www.pathagar.com

আলেম সমাজ ও সাংবিধানিক বিপ্লব

দেশের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার পর দেশবাসী ইসলামী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থান ঘটায়। এর ফলে স্বৈরতন্ত্রের দানব গণদাবীর সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং এ আন্দোলনে সমর্থন বা নেতৃত্বদানকারী সমকালীন আলেম সমাজ ও মারজাগণের অধিকাংশই মনে করতেন যে, যদিও সাংবিধানিকতা ইসলামী মানদন্ডের বিচারে কোন দ্বীনী বিষয় নয়, তথাপি সাংবিধানিক সমাজব্যবস্থায় ইসলামের অনেক আকায়েদী[৩৪] ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হবে, তেমনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বৈরতন্ত্রের উৎখাতের ফলে ইসলামী আইন-কানুন অনেকাংশে বাস্তবায়ন করা যাবে। তাঁরা তাঁদের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। সংবিধান প্রণয়নের ঘটনায়, বিশেষ করে সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়নের সময় তাঁরা সংবিধানকে এ লক্ষ্যের অভিসারী করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও পশ্চাত্যপন্থী সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠীর এবং বিজাতীয় তাবেদারদের প্রভাব ও অনুপ্রবেশের ফলে তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। এমতাবস্থায় তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সাংবিধানিক আন্দোলন বিপথগামী হয়েছে ও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এ কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাংবিধানিক আন্দোলনে সমর্থনদান থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং দৃঢ়তার সাথে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে এ থেকে দূরে সরে থাকেন।

এর ভিত্তিতে সাংবিধানিক আন্দোলনে ওলামায়ে কেরামের হস্তক্ষেপ ও অংশগ্রহণকে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে দু'টি যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১। আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে ছোট স্বৈরতন্ত্রের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ঃ এ যুগে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এককভাবে আলেম সমাজ। তাঁরা এ সময় সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলনকে দিকনির্দেশনা প্রদান ও পরিচালনা করেন। তাঁরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম করেন। আন্দোলনের বিজয় ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁদের এ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। সংবিধান প্রণয়ন, সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রথম মজলিস গঠন পর্যন্ত তাঁরা এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ যুগে নাজাফে অবস্থানরত সম্মানিত মারজা'গণ, বিশেষ করে অখুন্দ্ খোরাসানী[৩৫] সাংবিধানিকতার সপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। মারজা'গণ সাংবিধানিকতা ও মজলিসের সমর্থনে এবং মোহাম্মদ আলী শাহের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের পক্ষে বহু পত্র লেখেন ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমন কি আয়াতুল্লাহ্ নায়ীনী[৩৬] সাংবিধানিকতার সমর্থন করে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি তৎকালীন

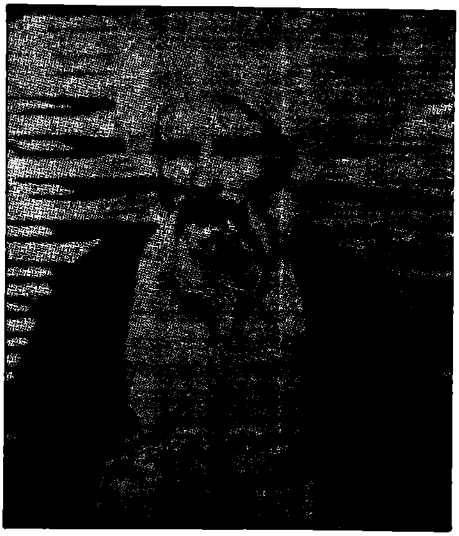

আয়াতুল্লাহ্ অখুন্দ্ খোরাসানী

www.pathagar.com

সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ, কল্যাণকর ও শিক্ষণীয় গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হত। গ্রন্থটি ঐ সময় পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হয় এবং বেশ দীর্ঘদিন যাবত সমাজে এর গুরুত্ব স্বীকৃত থাকে।

২। ছোট স্বৈরতন্ত্রের পতন ও তেহরান বিজয়ের পরবর্তী যুগ ঃ এ যুগে ইসলাম ও পূর্ববর্তী সাংবিধানিকতার বিরোধী বিভিন্ন ধারার বুদ্ধিজীবীগণ, সামন্ত জমিদারবর্গ এবং বিজাতীয়দের তাবেদার ব্যক্তিরা সাংবিধানিকতার আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেন। এমন কি তারা এ আন্দোলনের নেতৃত্বের মর্যাদায় পর্যন্ত উন্নীত হতে সক্ষম হন। এর ফলে ওলামায়ে কেরাম সাংবিধানিকতার প্রতি সমর্থন দান থেকে বিরত থাকেন। আয়াতুল্লাহ্ নায়ীনী যখন দেখতে পেলেন যে, সাংবিধানিকতার আন্দোলনে বিকৃতি প্রবেশ করেছে তখন তিনি সাংবিধানিকতা সম্পর্কে লিখিত তাঁর গ্রন্থের

আয়াতুল্লাহ্ মীর্যা হোসেন নায়ীনী

আয়াতুল্লাহ্ শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী

কপিগুলো বাজার থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বস্তুতঃ এযুগে সাংবিধানিকতা তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। এ সময় অনেক প্রতিবাদী সংগ্রামী আলেমের বিরুদ্ধে দমননীতির আশ্রয় নেয়া হয়। অনেক আলেম এ বিকৃতি ও পথচ্যুতি দর্শনে হতাশ হয়ে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হুজরায় বা গৃহকোণে একাকিত্বের জীবন বেছে নেন।

তেহরান বিজয় ও শেখ ফয্লুল্লাহ্ নূরী

তেহরান বিজয়ীরা যেসব অপরাধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল, শরয়ী শাসন[৩৭] প্রতিষ্ঠার দাবীদার স্বনামখ্যাত আলেম শেখ ফয্লুল্লাহ্ নূরীকে গ্রেফতার ও হত্যা।

শহীদ শেখ ফয্লুল্লাহ্ নূরী ছিলেন তেহরানের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ মীর্যা শীরাযীর নিকট অধ্যয়নকারী তাঁর কৃতি শিষ্যগণের অন্যতম।[৩৮]

যে সব বড় বড় আলেম মোযাফফারুদ্দীন শাহের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তেহরানের অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে মিলে অভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোযাফফারুদ্দীন শাহের স্বৈরতন্ত্রের ওপর বিরাট আঘাত হানেন। স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে যে সব শীর্ষস্থানীয় আলেম তেহরান থেকে কোমে হিজরত করেন শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সাংবিধানিক আন্দোলনে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন অব্যাহত রাখেন। সংবিধান প্রণয়নের জন্যে মজলিস গঠন এবং সংবিধানের সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে তিনি মজলিসে প্রণীত আইন-কানুন ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ওপর পাঁচ জন মুজতাহিদ আলেমের নজর রাখা সংক্রান্ত একটি বিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হন। বস্তুতঃ এটা ছিল মজলিস প্রণীত আইন-কানুনের ইসলামীকরণের পদক্ষেপ। ঐ সময় নাজাফের ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে সমকালীন সম্মানিত মারজা' অখুন্দ্ খোরাসানী এবং হাজী শেখ আব্দুল্লাহ্ মাযেন্দারানী টেলিগ্রাম করে শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কিন্তু সাংবিধানিক বিপ্লবের বিজয়ের পরে তিনি যখন মজলিসে এবং বিপ্লবের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করলেন তখন তিনি তার বিরোধিতা শুরু করেন এবং শরয়ী সাংবিধানিকতা[৩৯] প্রবর্তনের দাবী তোলেন। তিনি বলেন, সাংবিধানিক বিপ্লব তার মূল অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ইসলাম বিরোধী লোকেরা সাংবিধানিকতার ছদ্মাবরণে ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে পশ্চিমা চিন্তাধারা প্রবর্তন করতে চাচ্ছে। তাই তাঁর কথা ছিল, তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সংবিধানের ইসলামীকরণ করতে হবে। তিনি রেই শহরে হযরত শাহ্ আবদুল আযীমের মাযারে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট নিজ বক্তব্য পৌঁছাতে থাকেন। সেখানে থাকাকালে বিশেষভাবে সাংবিধানিক বিপ্লবের বার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

"এত যে নৈশভোজের বাজার বসিয়েছ, এত যে শান্তির সানাই বাজাচ্ছ, এত যে আতশবাজির ছড়াছড়ি করছ, এত যে রাষ্ট্রদূতদের আগমন ঘটছে, ... এত যে "হুররা"[৪০] ধ্বনি তোলা হচ্ছে, এত যে "জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ" লেখা পোস্টার আর বিলবোর্ড লাগানো হয়েছে, "সাম্য জিন্দাবাদ" আর "ভ্রাতৃত্ব ও সমতা জিন্দাবাদ" লেখা হয়েছে, এত কিছুর পাশে, অন্ততঃ একটাতে লিখতে ঃ "শরীআত জিন্দাবাদ", "কুরআন জিন্দাবাদ", "ইসলাম জিন্দাবাদ"...

শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী যে সব কারণে সাংবিধানিকতার বিরোধিতা করেন, তা তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করেন। তিনি এ ধরনের একটি লেখায় তাঁর দাবী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর এ লেখাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেন ঃ

"একটি দাবী হচ্ছে এই যে, মজলিসের গঠনতন্ত্রের[৪১] "সাংবিধানিকতা" কথাটির পরে "শরীআতী" কথাটি লেখা হোক। আরেকটি হচ্ছে এই যে, মজলিসের গঠনতন্ত্রে এ মর্মে একটি ধারা যোগ করা হোক যে, মজলিসে প্রণীত আইন-কানুন পবিত্র শরীআতের সাথে সঙ্গতিশীল হতে হবে এবং প্রতিটি যুগে ন্যায়নিষ্ঠ মুজতাহিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা (কমিটি) মজলিসে শূরার কার্যাবলী তদারক করবেন।...... আরেকটি দাবী হচ্ছে এই যে, যেহেতু মজলিসের মৌলিক গঠনতন্ত্র ও পরিচালনাবিধি[৪২] পশ্চিমা সরকারগুলোর গঠনপ্রকৃতি সংক্রান্ত আইন-কানুনের অনুকরণে লিখিত হয়েছে, সেহেতু এর শরয়ী ও ইসলামী বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওলামায়ে কেরামের মতামতের ভিত্তিতে এতে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনী আনতে হবে।"

www.pathagar.com

সাংবিধানিকতা ও সাংবিধানিকতাপন্থীদের প্রতি মরহুম শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীর বিরোধিতা সাংবিধানিকতাপন্থীদের তেহরান বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তেহ্রান বিজয়ীরা ক্ষমতার মসনদ দখলে সক্ষম হবার এবং বিপ্লবের শহীদগণের রক্তের উত্তরাধিকারী হবার পর স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অনেককেই ছেড়ে দেয়। তাদের অনেককে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদেও অধিষ্ঠিত করে। ক্ষমতাচ্যুত শাহ্কেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তিনি বহাল তবিয়তে রাশিয়ায় চলে যান। শুধু তা-ই নয়, বরং তাঁর জন্যে অবসরভাতাও ধার্য করা হয়। কিন্তু তারা এত কিছু করলেও শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীর অস্তিত্ব সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা তাঁর সন্ধান করে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং মাত্র এক বৈঠকের এক সংক্ষিপ্ত বিচার প্রহসনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরী গ্রেফতার হবার পূর্বে তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত ও ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য বহু চেষ্টা করেন। এমন কি কেউ কেউ তাঁকে কোন দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণের বা তাঁর বসতবাড়ীর ছাদে রুশ পতাকা উত্তোলনের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন, "আমার বয়স যখন সত্তর বছর পার হয়ে গেছে আর ইসলামের জন্যে আমার দাড়ি সাদা করেছি, তখন কুফরের পতাকাতলে আশ্রয় নেব?"

যে সংক্ষিপ্ত আদালতে শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীর বিচার করা হয় তাতে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে ইপ্রাম খান আর্মানী অন্যতম। এ আদালতের সভাপতি ছিলেন পাশ্চাত্যের নিকট আত্মবিক্রয়কারী আলেম নামধারী এক ব্যক্তি যাঁর নাম ছিল শেখ ইবরাহীম যান্জানী। এ আদালত তেহরানের শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদগণের অন্যতম শেখ ফযলুল্লাহ নূরীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, অথচ স্বৈরাচারীদের স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্যে ছেড়ে দেয়। এভাবে কার্যতঃ এ তথাকথিত আদালত তেহরান বিজয়ীদের চেহারায় ঘৃণ্য কলঙ্ক লেপন করে।

নাজাফের ওলামায়ে কেরাম সাংবিধানিকতার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীর মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। তাঁরা একে একটি অন্যায় পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন।

যদিও জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে তেহরান বিজয়ীরা খুব সহজেই মোহাম্মাদ আলী শাহের স্বৈরতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। তাঁরা বিজয়ী হবার পর এক বিশেষ ধারায় অগ্রসর হন। ওদিকে মজলিসের পরবর্তী মেয়াদগুলোতে যেসব লোক মজলিসের সদস্য হন তাঁদের অধিকাংশের প্রকৃতি, শাসকগোষ্ঠীর সদস্যবর্গের ব্যক্তিত্ব, সরকারের শাখা-প্রশাখাসমূহ, প্রাদেশিক শাসকবর্গ ইত্যাদি মিলে নব্যস্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। অধিকতর খারাপ পরিণতি ছিল এই যে, এসব কিছু মিলে ইরানে উপনিবেশিক শক্তির সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র তৈরী করে।

বস্তুতঃ ইতিহাসের ঘটনাবলী এ সাক্ষ্যই দেয় যে, উপনিবেশিক পশ্চিমা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অনুপ্রবেশের ফলে ইরানের সকল ক্ষেত্রে উপনিবেশিক শক্তির ঘৃণ্য আধিপত্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, সাংবিধানিকতাপন্থীদের তেহরান বিজয়ের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। পশ্চিমপন্থীরা শেখ ফযলুল্লাহ্ নূরীকে হত্যার মাধ্যমে বিপ্লবের হেফাজতের নামে নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় মহলের হস্তক্ষেপের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে, তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করে। অথচ এই ধর্মীয় চিন্তাধারার আলোকে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইরানী জনগণ সাংবিধানিক বিপ্লব করেছিল। এই পাশ্চাত্যপন্থীরা সাংবিধানিকতার ময়দান ও ক্ষমতা দখলের পর ধর্ম ও রাজনীতি পৃথকীকরণের শ্লোগান

www.pathagar.com

তোলে। যারা নিজেদেরকে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের ধারক-বাহক বলে দাবী করত (যদিও তারা নিজেদের মেধা-প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে নয়, বরং জনগণের শক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের বদৌলতে বিজয়ী হয়েছিল) তাদের কেউ কেউ সচেতনভাবে এবং কেউ কেউ অজ্ঞতা বশতঃ ও অজ্ঞাতসারে ইরানের বুকে পশ্চিমা আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আর সরলমনা জনসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে এই লুটেরাদের খপ্পরে পতিত হয়। মরহুম জালাল আলে আহ্‌মাদ[৪৩] তাঁর এক লেখায় শেখ ফযলুল্লাহ নূরীর হত্যাকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে ঐ হত্যাকাণ্ডের পিছনে উপনিবেশবাদী অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "গার্বযাদেগী"তে[৪৪] লিখেছেন, "আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো ঐ মহান ব্যক্তিত্বের লাশকে এমন একটি পতাকার ন্যায় মনে করি যা দীর্ঘ দু'শ' বছরের সংঘাতের পরে পশ্চিমাদের বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ এদেশের ভবনশীর্ষে উত্তোলিত হয়েছে।"[৪৫]

টীকা ঃ

(১) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ।

(২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠী জাপানের সাথে যুদ্ধে পরাজয়ের পর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ইরান থেকে হাত গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

(৩) তৎকালে ইরানে নিয়োজিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত শাহ্‌ এবং সংবিধানপন্থীদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে রিপোর্ট পাঠান তাতে তিনি বলেন ঃ

"অনেক দেরীতে আমার নিকট এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, মোহাম্মদ আলী শাহ্‌ সাংবিধানিকতা অপসন্দ করেন এবং মজলিসকে ভেঙ্গে দেয়া ও সাংবিধানিকতাকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র ও উস্কানি সৃষ্টিতে লিপ্ত রয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইরানে এমন একটি বিপ্লব সংঘটিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা সাধারণ নিরাপত্তা ও আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করবে এবং ইরানে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে পূর্বাপেক্ষাও অচল করে দেবে সেহেতু আলা হযরত শাহের নিকট সাক্ষাতের জন্যে সময় চেয়েছি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছি যে, মজলিসের সাথে আলা হযরতের শত্রুতামূলক আচরণ স্বয়ং আলা হযরত এবং ইরানের জন্যে খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে, অতএব, উত্তম কর্মপন্থা এই যে, আলা হযরত মজলিসের সাথে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করুন এবং মজলিসের বিরোধিতার পরিবর্তে তাকে শক্তিশালী করুন যাতে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় এবং সমস্যাবলী দূরীভূত করা হয়। দৃশ্যতঃ শাহ্‌ আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং মজলিসের সাথে তাঁর বিরোধিতার কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত যে, তাঁর অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি মুখে যা বলেন তা থেকে ভিন্ন। এ কারণে শীঘ্রই হোক বা দেরীতেই হোক, ইরানে এমন একটি সংকটের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে যে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। স্বৈরতন্ত্রীরা সাংবিধানিকতাকে অচল ও অকেজো করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে; আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করেও বুঝতে পারিনি যে, এত প্রচুর অর্থ কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।" (দেখুন ঃ -ملکزاده جلد ۱ : انقلاب مشروطیت) ۳ ص ۸۷)

(৪) ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ।

(৫) اتابک— তুর্কী পরিভাষা। 'আতা' মানে পিতা এবং 'বাক্' মানে 'বড়' বা 'মহান'। পারিভাষিক অর্থে শাহ্‌যাদাদের প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বা মন্ত্রীদের 'আতাবাক্' বলা হয়। আভিধানিক অর্থে 'আতাবাক্' মানে 'দাদা'। (فرهنگ عمید)

www.pathagar.com

(৬) طالبوف

(৭) سعد الدوله — তিনি মজলিসের সদস্য ছিলেন এবং এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মজলিস থেকে সরে দাঁড়ান এবং সংবিধানপন্থীদের সাথে শত্রুতা ও শাহের সাথে সহযোগিতা শুরু করেন।

(৮) دوشان تپه

(৯) ফার্সী ১২৮৭ সাল মোতাবেক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ।

(১০) باغ شاه — "শাহের বাগান।" এটা একটি নির্দিষ্ট জায়গার নাম; শাহের মালিকানাধীন যে কোন বাগান নয়। তাছাড়া এটা শুধু বাগান নয়, বরং প্রাসাদসহ বাগান। — অনুবাদক

(১১) لیاخوف

(১২) خوئی — 'খু' নামক স্থানের অধিবাসী হিসেবে পদবী।

(১৩) جهانگیر خان صور اسرافیل

(১৪) ملك المتكلمین

(১৫) تبریز — তেহরান থেকে পশ্চিমে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে) অবস্থিত। তেহরান থেকে দূরত্ব ৫৯৭ কিলোমিটার। অন্যতম প্রাদেশিক রাজধানী।

(১৬) ستارخان — তিনি سردارملی (জাতীয় সেনাপতি) নামে সুপরিচিত।

(১৭) باقر خان — তাঁর উপাধি سالارملی (জাতীয় সেনাপতি)।

(১৮) محمد ولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم)

(১৯) یپرم خان ارمنی বা یفرم خان ارمنی — "আর্মানী" মানে আর্মেনিয়ার অধিবাসী।

(২০) رشت — তেহরান থেকে ৩২৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; গীলান প্রদেশের রাজধানী।

(২১) ایل بختیاری

(২২) صمصام السلطنه — উপাধি; অর্থ ঃ "রাজ্যের বা রাজার ক্ষুরধার তরবারী"।

(২৩) اصفهان — তেহরান থেকে ৪৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাদেশিক রাজধানী।

(২৪) خان بختیاری — "খান" ছিল জমিদারদের উপাধি।

(২৫) علی قلی خان

(২৭) منور الفکر — Having erlightened thinking.

(২৮) عتبات — মাশহাদ্, কোম, নাজাফ, সামেরা প্রভৃতি। তবে ঐ সময় ইরানের বেশীর ভাগ মারজা।' ইরাকের নাজাফে অবস্থান করতেন। — অনুবাদক

(২৯) ফার্সী ১২৮৮ সাল মোতাবেক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

(৩০) তেহরানের বাহারিস্তান স্কোয়ারের নিকটে তৎকালীন মজলিস ভবনে।

(৩১) هیئت مدیریهٔ موقت — কার্যতঃ তা ছিল একটি অস্থায়ী মন্ত্রী পরিষদ।

(৩২) দশ লাখ রিয়াল।

(৩৩) কথা হয় যে, পনর দিনের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে এবং মোহাম্মাদ আলী শাহ্ ইরান ত্যাগ করবেন। রাশিয়ার কাজ্জাক সৈন্যদের প্রহরায় তিনি রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে চলে যান। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি সিংহাসন

www.pathagar.com

পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পুনরায় ইরানে ফিরে আসার চেষ্টা করেন। তিনি ইরানে হামলা চালান। উত্তর-পূর্ব ইরানের খোরাসান ও গোর্‌গান্‌ এলাকায় তাঁর সৈন্যদের সাথে সাংবিধানিকতার সমর্থক বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত শাহের বাহিনী পরাজিত হলে তিনি পুনরায় রাশিয়ায় ফিরে যান। অন্যদিকে তাঁর এ পদক্ষেপের কারণে ইরান সরকার তাঁর অবসর-ভাতা বন্ধ করে দেয়।

(৩৪) عقایدی— ঈমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত।

(৩৫) ایت الله آخوند خراسانی— আয়াতুল্লাহ্‌ অখুন্দ্‌ খোরাসানী।

(৩৬) ایت الله میرزا حسین نائینی— আয়াতুল্লাহ্‌ মীর্যা হোসেন নায়ীনী।

(৩৭) حکومت مشروعه

(৩৮) নাযেমুল ইসলাম কেরমানী (ناظم الاسلام کرمانی) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "হাজীশেখ ফযলুল্লাহ্‌ যদি মাত্র কয়েক মাস দ্বীনী কেন্দ্রে (অর্থাৎ নাজাফে ঃ অনুবাদক) অবস্থান করেন তাহলে তিনি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এক নম্বর ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। চরিত্র ও কর্মনীতি, জ্ঞানের স্তর এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর বিচারে তিনি অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর।"

(৩৯) مشروطهٔ مشروعه

(৪০) Hurrah.

(৪১) نظامنامه مجلس

(৪২) نظامنامه اساسی مجلس

(৪৩) جلال آل احمد —প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

(৪৪) غربزدگی — "পাশ্চাত্য"-Westernization.

(৪৫) غربزدگی-جلال آل احمد-ص۷۸

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সাংবিধানিক শাসনামল

মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর থেকে রেযা খানের ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের অবস্থা

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইরানের গণআন্দোলনসমূহের ব্যাপারে রাশিয়া ও বৃটেন সব সময়ই যেসব নীতি অনুসরণ করে এসেছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল গণআন্দোলনসমূহের গভীর ও দৃঢ়মূল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি; আর যেসব আন্দোলনে জনসাধারণ এবং নিষ্ঠাবান, আন্তরিক ও সত্যপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রধান ভূমিকা পালন করেন তার প্রতিরোধ। অবশ্য বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ দুই উপনিবেশিক শক্তি নিজ নিজ বিশেষ কর্মনীতি অনুসরণ করে। এক শক্তি স্বৈরাচারী শাহীতন্ত্রকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে তার স্বার্থোদ্ধার সম্ভব বলে মনে করত, অপর শক্তি সাংবিধানিকতার কাঠামোর আওতায় এক ধরনের সংরক্ষণবাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তার স্বার্থ নিহিত আছে মনে করে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই তাদের এ নীতির মূলকথা ছিল রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ গণমানুষ ও আলেম সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধ এবং ইরানের ওপর তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরো অধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্তকরণ। আর মোহাম্মদ আলী শাহের পতন এবং তেহরান বিজেতাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর গণআন্দোলনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও বিপ্লবের সুসংহত হওয়াকে প্রতিরোধের জন্য যে কোন দিক থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।

মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর রাশিয়া ও বৃটেনের তৎপরতা

রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে সম্পাদিত ১৯০৭ সালের চুক্তি সত্ত্বেও এ উভয় উপনিবেশিক শক্তির মধ্যে পারস্পরিক গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগের মতই অব্যাহত থাকে। এ কারণে মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর ইরানের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষতঃ মজলিস সদস্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য উভয় শক্তিই ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে।

মোহাম্মদ আলী শাহের পতন পরবর্তী যুগে রুশ ও বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি স্বীয় তাঁবেদার ও অনুচরদের মজলিসে অনুপ্রবেশ করানো এবং তাদের মাধ্যমে স্বীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। স্বৈরাচারের পতন পরবর্তীকালীন ঘটনাবলী, ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেশের শাসকগোষ্ঠীর অ-বিপ্লবী চরিত্র, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাবেদারী ও সেবাদাসগিরি বৈশিষ্ট্য—এ দুই উপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। এ কারণেই প্রথম মজলিসে যেখানে প্রধানতঃ এমন লোকেরা সদস্য ছিলেন যাঁরা বহিঃশক্তির তাঁবেদার ছিলেন না, সেখানে দ্বিতীয় মজলিসে ও তার পরবর্তী মজলিসসমূহে উপনিবেশিক শক্তিদ্বয়ের তাবেদারদের অনুপ্রবেশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

নতুন শাসকগোষ্ঠীর তৎপরতার ওপর এক নজর

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইরানবাসী আশা করেছিল যে, তেহরান বিজেতারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর জনগণের মাথার ওপর চেপে বসা স্বৈরাচার ও উপনিবেশবাদের অবশেষসমূহের আপদকে ঝেটিয়ে বিদায় করবেন। কিন্তু তাঁরা তা তো করলেনই না, বরং, ইতোমধ্যেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা নিজেরাই স্বৈরাচার ও উপনিবেশবাদের পুনঃপ্রত্যাবর্তন ও অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র তৈরি করেন। এর কারণ ছিল, মূলগতভাবেই সাধারণ গণমানুষ এবং সমাজের দুর্বল-বঞ্চিত-মুস্তায্আফ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত হবে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ তেহরান বিজতাদের প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতো না।

জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংঘটিত এ বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ায় রক্ষণশীলরা, এমন কি বিপ্লববিরোধীরাও। আর তারা, এমন কি সাধারণ মানুষকে সান্ত্বনা দানের জন্যও প্রদেশগুলোতে প্রেরিত প্রশাসকদেরকে মোটামুটি গণমুখী লোকদের মধ্য থেকে মনোনীত করতে প্রস্তুত ছিল না। বরং প্রায় সকল প্রাদেশিক শাসকের পদেই সাবেক স্বৈরাচারীদের মনোনীত করে। শুধু তাই নয়, জনগণ যাদেরকে তাদের অতীত অপকর্মের জন্য গ্রেফতার করে, নতুন শাসকগোষ্ঠী বিজাতীয় শক্তির ইঙ্গিতে তাদেরকে মুক্তি দিতেও দ্বিধা করেনি।

সাংবিধানিক আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী কসাই চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন নাসিরুদ্দীন শাহের পুত্র এবং তাঁর সময়কার ইস্ফাহানের জালেম স্বৈরপ্রশাসক যিল্লুস্ সুলতান[১]; মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর ইংরেজদের ছত্রছায়ায় তিনি ইরানে ফিরে আসেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁকে গ্রেফতার করলে সারদর্ আস্আদ তাঁকে মুক্ত করে দেন।[২] অথচ জনসাধারণ তাঁকে গ্রেফতার করার পর এ আশায়ই সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল যে, তাঁর বিচার হবে এবং তাতে নিঃসন্দেহে মৃত্যুদণ্ড হবে।

এ ধরনের আরেকজন স্বৈরাচারী প্রশাসক ছিলেন আলাওদ্দাওলাহ্। মোযাফফারুদ্দীন শাহের আমলে তেহরানের তৎকালীন প্রশাসক আলাওদ্দাওলাহ্ বণিকদের প্রহার করেছিলেন এবং সে অপরাধে গণআন্দোলনের মুখে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এমন কি মোহাম্মদ আলী শাহ্ পর্যন্ত তাঁর আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আলাওদ্দাওলাহ্‌কে কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদানে সাহসী হননি। কিন্তু নব্য শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফারস্[৩]-এর প্রশাসক পদে মনোনীত করে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই বলে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, এ ধরনের স্বৈরাচারীরা ও সাবেক শাসকরাই যদি জনগণের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে তাহলে বিপ্লবের ও এত রক্তপাতের কি প্রয়োজন ছিল!

১৯০৭-এর রুশ-বৃটিশ চুক্তি প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে ১৯০৭ সালে স্বাক্ষরিত রুশ-বৃটিশ চুক্তির ওপর সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত অপরিহার্য।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ও ইতালীর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান শক্তি জার্মানী মিলে এক ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এর ফলে জার্মানীর সম্প্রসারণবাদী নীতির মূল লক্ষ্য (টার্গেট) ফ্রান্স আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ফ্রান্স ১৮৯৩ সালে রাশিয়ার সাথে এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। এ সময় বৃটেনও জার্মানীর পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। তাই বৃটেন তার পূর্ববর্তী নীতির বিপরীতে ইউরোপ মহাদেশে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় ফ্রান্স যেহেতু

www.pathagar.com

বৃটেন ও রাশিয়া উভয় দেশের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিল, সেহেতু ফ্রান্সের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। আর যেহেতু জার্মানীর হুমকি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ছিল তাদের পরস্পর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হওয়া, সেহেতু শেষ পর্যন্ত ১৯০৭ সালে বৃটেন ও রাশিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির অংশবিশেষ ছিল আফগানিস্তান, তিব্বত, ওসমানী সাম্রাজ্য এবং ইরান সম্পর্কে রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যকার বিরোধ ও মতানৈক্যের সমাধান করা। এ চুক্তিতে বৃটেন ও রাশিয়া এ মর্মে পারস্পরিক মতৈক্যে উপনীত হয় যে, ইরানকে দু'টি প্রভাবাধীন এলাকা ও একটি নিরপেক্ষ এলাকায় বিভক্ত করা হবে। এ চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ ইরানকে বৃটেনের ভাগে দেয়া হয়, উত্তর ইরান থাকে রাশিয়ার ভাগে এবং মধ্য ইরান নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

১৯০৭ সালের এ রুশ-বৃটিশ চুক্তির সংবাদ ইরানে এসে পৌঁছলে ঐ সময় এর বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ সময় ইরানে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ও বিরোধ, মোহাম্মদ আলী শাহের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ইত্যাদির কারণে এভাবে ইরানকে প্রভাবাধীন অঞ্চলভিত্তিতে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে রাশিয়া ও বৃটেন পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ইরান দখল করে নেয়। এভাবে ইরান পূর্বাপেক্ষাও বেশী মাত্রায় বিজাতীয় শক্তিবর্গের লুটপাটের শিকারে পরিণত হয়।

আহ্‌মাদ শাহের রাজত্ব ও আয্‌দুল মুল্‌কের[৪] প্রতিনিধিত্ব

তেহরান বিজয়ের পর মজলিসের দ্বারা গঠিত 'অস্থায়ী পরিচালকমণ্ডলী' মোহাম্মদ আলী শাহের ক্ষমতাচ্যুতির পর তাঁর সিংহাসনে তাঁর ১২ বছর বয়স্ক পুত্র আহ্‌মাদ মীর্যাকে অধিষ্ঠিত করেন। অস্থায়ী পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ রুশ দূতাবাসে গিয়ে আহ্‌মাদ মীর্যাকে শাহী দরবারে নিয়ে আসেন এবং বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে ইরানের শাহ্ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তখন ছোট্ট বালক মাত্র তাই তাঁর পক্ষে কার্যতঃ দেশশাসন করা সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে ইল্ কাজার গোত্রের প্রধান আয্‌দুল মুল্‌ক্‌কে শাহের প্রতিনিধি (নায়েব) হিসেবে মনোনীত করা হয়। আয্‌দুল মুল্‌কের মনোনয়নের পর অস্থায়ী পরিচালকমণ্ডলী ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং সেপাহ্‌দারে আ'যম্ মোহাম্মদ ওয়ালী খান তান্কাবোনী (খ্যাতনামা জমিদার ও রুশ এজেন্ট) প্রধানমন্ত্রী হন।

রাজনৈতিক দল গঠন

আয্‌দুল মুল্‌ক্ শাহের প্রতিনিধি বা নায়েবুস্ সাল্‌তানাহ্[৫] থাকাকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় আম্মীউন্[৬] এবং এতেদলীউন্[৭] নামে দুটি বিখ্যাত দল গঠিত হয়। আম্মীউন্ দলের সদস্যরা নিজেদেরকে ডেমোক্রাট হিসেবে দাবী করতেন এবং তথাকথিত কট্টর বিপ্লবী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁরা বাহ্যতঃ বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ দলটির কতিপয় সদস্য শুরু থেকেই ইংরেজদের তাবেদার ছিলেন। এ দলের শীর্ষস্থানীয় ও নামী-দামী নেতাদের অন্যতম ছিলেন সাইয়েদ হাসান তাকীযাদেহ্[৮]; তিনি আলেমদেরকে কোণঠাসা করার জন্য বহু চেষ্টা করেন এবং দ্বীন ও রাজনীতির পৃথকীকরণের শ্লোগান তোলেন। এ দলের অন্য বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে ছিলেন সালমান মীর্যা, ওয়াহিদুল মুল্‌ক্[৯] এবং সাইয়েদ রেযা মোসাভাৎ[১০]। তেহরান

www.pathagar.com

বিজেতাদের মধ্য থেকে সাইয়েদ আস্আাদ এ দলের সমর্থন করতেন। পরে তিনি এ দলেরই সমর্থনে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

অন্যদিকে আম্মীউন্ দলের প্রতিপক্ষের লোকেরা মিলে এতেদলীউন্ দল গঠন করেন। এতেদলীউন্ ছিল রক্ষণশীল নীতির সমর্থক। এ দলের খ্যাতনামা নেতাদের অন্যতম ছিলেন হাজী মীর্যা আলী মোহাম্মদ দাওলাৎ আবাদী[১১] এবং আলী আকবর দেহ্খোদা[১২]। আয়াতুল্লাহ্ তাবাতাবায়ী ও আয়াতুল্লাহ্ বেহ্বাহনী এ দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ইরানের প্রতি রাশিয়ার চরমপত্র

মজলিসের মধ্যে ভণ্ড-প্রতারকদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তখনো মজলিস মোটামুটি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের হেফাজতের ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। এ কারণেই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সামরিক বাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে মজলিস মার্কিন বিশেষজ্ঞ মর্গ্যান শুস্টার[১৩] এবং সুইডিশ বিশেষজ্ঞ ইয়াল্মার্সন্‌কে[১৪] ইরানে দাওয়াত করে।

মর্গ্যান শুস্টার ও তাঁর সঙ্গীরা হিজরী ১৩২৯ সালে[১৫] তেহরানে আগমন করেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কাজে লেগে যান। তাঁরা দেশের নবতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের অবস্থা পর্যালোচনার পর দেশের শুল্ক বিভাগের ওপর থেকে রুশদের অনুগত বেলজিকদের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটান।[১৬] অন্যদিকে সুইডিশ বিশেষজ্ঞগণ ইরানের সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের কাজে হাত দেন।

বলা বাহুল্য যে, মার্কিন ও সুইডিশ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নতুন সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা রুশ ও বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের সাধারণ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাই এসব পদক্ষেপকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তারা ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। বিশেষভাবে মর্গ্যান শুস্টারকে ইরান থেকে বহিষ্কার করার জন্য তারা অজুহাত বের করার চেষ্টা করতে থাকে এবং শীঘ্রই এ ধরনের একটা অজুহাত পেয়ে যায়।

ঐ সময় মর্গ্যান শুস্টার ও তাঁর সহকর্মীরা ক্ষমতাচ্যুত শাহের ভাই শুআউস্ সাল্তানাহ্‌র"[১৭] ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। শুআউস্ সাল্তানাহ্ শুধু যে মোহাম্মদ আলী শাহের ভাই ছিলেন তা-ই নয়, বরং তিনি সাংবিধানিক আন্দোলন দমনের কাজে শাহ্‌কে পুরোপুরি সহায়তা দিয়েছিলেন।

রুশরা এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য হিসেবে কাজে লাগায়। বাহ্যতঃ শুআউস সাল্তানাহ্ রুশ ক্রেডিট ব্যাঙ্কের নিকট ঋণী ছিলেন এবং রুশদের দাবী অনুযায়ী, কার্যতঃ শুআউস্ সালতানাহ্‌র সকল ধন-সম্পদের মালিক ছিল রুশ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক। তাই রুশরা শুস্টারের এ পদক্ষেপকে সীমালংঘনমূলক বলে আখ্যায়িত করে এবং ইরান সরকারের নিকট তাঁকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে চরমপত্র প্রদান করে।

যদিও ঐ সময় ইরানের শাসনক্ষমতায় আপোষকামীরা চেপে বসার ফলে সাধারণভাবেই উপনিবেশিক শক্তিকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ গণমানুষ চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় এবং সরকার ও রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছিল ও এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করছিল, তেমনি প্রথম মজলিস ও দ্বিতীয় মজলিসের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল, তথাপি তখনো কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে বিজাতীয় বিরোধী ও

www.pathagar.com

সংগ্রামী চেতনা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা রাশিয়ার এ চরমপত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং রুশ দাবীর সামনে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মজলিসের রায় এ চরমপত্রের বিপক্ষে চলে যায়। কিন্তু সরকারে উপনিবেশবাদী শক্তির অনুচরদের অনুপ্রবেশ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন অংশে একটিও সংগ্রামী সূত্র অবশিষ্ট ছিল, তাকে ছিন্ন বা অকেজো করার জন্য অন্য একটি অংশকে ব্যবহার করা হত। এক্ষেত্রেও তা-ই হল। নায়েবুস্ সাল্তানাহ্ নাসেরুল মুল্ক্[১৮] —যিনি আয্দুল্ মুল্কের পরে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন—তিনি ছিলেন একজন আপোষকামী, সাহসহীন ও বৃটিশপন্থী লোক;[১৯] তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, মজলিস রুশ চরমপত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং চরমপত্রটি মেনে নেন। জনসাধারণের বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টির সামনে তিনি বিজাতীয়দের দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং মর্গ্যান শুস্টারকে ইরান থেকে বহিষ্কার করেন। এভাবে ইরানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সমর্থক ও উন্নয়নকামী নিষ্ঠাবান লোকদের সর্বশেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

আহ্মাদ শাহ্ ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে এক পক্ষে থাকল জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ও ইতালী, অপর পক্ষে থাকল রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স। যেহেতু ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী, অন্যদিকে তৎকালে ইরানে কোন শক্তিশালী সরকারও ছিল না, ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইরান এ যুদ্ধের অন্যতম সংঘাতকেন্দ্রে পরিণত হয়। যদিও বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই উত্তর ইরানে রুশ বাহিনী ও দক্ষিণ ইরানে বৃটিশ বাহিনী অবস্থান করছিল, তথাপি ওসমানীদের যুদ্ধে যোগদানের ফলে পরিস্থিতিতে নতুন উপাদান যুক্ত হয়। ওসমানী সাম্রাজ্য এ যুদ্ধে জার্মানীর সাথে যোগদান করে এবং উভয় দেশ মিলে পশ্চিম ইরানের কয়েকটি এলাকায় প্রবেশের এবং মিত্রশক্তির ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তখন ইরানে রুশ ও বৃটিশ সৈন্যদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ইরানের ওপর বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরে ইরানের বিভিন্ন এলাকায় জনগণ ও দখলদার বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দক্ষিণ ইরানেই যুদ্ধ তীব্রতর আকার ধারণ করে। বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ ইরান দখল করার লক্ষ্যে বুশেহ্র বন্দরে হামলা চালায়। কিন্তু শহরের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দক্ষিণ পোর্ অভাযের[২১] জনগণের নেতা রইস আলী দেল্ভারী[২২] বেশ কিছুদিন বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন এবং তাদের ওপর তীব্র আঘাত হানেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন।

বৃটিশ বাহিনী বুশেহ্র দখল করার পর সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে আরো বেশী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মীর্যা মোহাম্মদ খান বারাযজনী[২৩] শেখ হোসেন খান চহ্কুতাহী[২৪] এবং যায়ের্ খাযার্ খান আহ্রামী[২৫] বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে দাশ্তেস্তান, তাঙ্গেস্তান[২৬] ও দাশ্তী[২৭] এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ইতোমধ্যে একদল সশস্ত্র পুলিশ[২৮] ও শীরায থেকে প্রেরিত একদল সৈন্যের যোগদান এবং আয়াতুল্লাহ্ মাহাল্লাতীর[২৯] সহযোগিতার ফলে এ প্রতিরোধ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ছিল উন্নততর যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী। সেই সাথে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা ও

www.pathagar.com

অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। ফলে বৃটিশ বাহিনী এ দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং শীরায অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু পথে তাদেরকে প্রথমে নাসেরুদ্দীভান্ কযেরুনীর[৩০] নেতৃত্বাধীন বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এরপর আয়াতুল্লাহ্ লারীর[৩১] সমর্থনপুষ্ট এবং ছাওলাতুদ্দাওলাহ্‌র[৩২] নেতৃত্বাধীনে কাশ্‌কয়ী[৩৩] উপজাতির লোকেরা বৃটিশ বাহিনীকে বাধা দেয়। দু' পক্ষে বেশ কয়েক দফা যুদ্ধ হয় এবং কাশ্‌কয়ী উপজাতির যোদ্ধারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ও দখলদার বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এসব যুদ্ধে আলেম সমাজ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ইংরেজরা এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একদিকে যেমন যথেষ্ট সময় ব্যয় করে, অন্যদিকে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও ব্যাপক সৈন্যক্ষয় ছাড়াও তাদের তাঁবেদার ও দালালদের কাজে লাগায়। এভাবেই তারা দক্ষিণ ইরানের ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের এ সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া দখলদার বাহিনী ঐ এলাকায় রোগব্যাধির বিস্তার ও দুর্ভিক্ষ এবং ইরানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিশৃঙ্খল অবস্থাকেও নিজেদের স্বার্থে খুব ভালভাবেই কাজে লাগায়।

এ সময় ইরানের সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন মোস্তফীউল্ মামালেক[৩৪]। যদিও প্রথমে তিনি এ যুদ্ধে ইরানের নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু যুদ্ধরত দু'পক্ষের কেউই ইরানের এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত করেনি, বরং উভয় পক্ষই ইরানী ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকেই ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত দু'টি পক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর ইরানে প্রবেশের ফলে বিরাজমান সঙ্কটের কতখানি অবনতি ঘটেছিল এবং তা জনজীবনের দুঃসহ অবস্থাকে কতখানি বৃদ্ধি করেছিল।

ওসমানী সরকার যুদ্ধে যোগদানের পর ইসলামী বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান জানায়। ইরানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা রাশিয়া ও বৃটেনকে ইরানী জনগণের প্রধান শত্রু মনে করতেন তাঁরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তেহরান থেকে কোম[৩৫] অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখান থেকে কের্‌মানশাহ্‌র[৩৬] দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁরা নেযামুস্ সাল্‌তানাহ্ মফী-র[৩৭] নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি।

এ সময়টাতে ইরানের ভূখণ্ডে ইরান সরকারের কর্তৃত্ব দুর্বলতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এমনি এক সময় জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ইরানে আসেন এবং শাহের সাথে সাক্ষাত করে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান। এতে আহ্‌মাদ শাহ্ ও তাঁর পারিষদবর্গ দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁরা ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; বুঝতে পারছিলেন না কোন্ পক্ষে যাবেন এবং কোন্ পক্ষের পরামর্শে কান দেবেন। তাঁরা শুধু দিশেহারা অবস্থায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন; কার্যতঃ কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

বিশ্বযুদ্ধের তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ততদিনে কার্যতঃ ইরানের স্বাধীনতা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে উত্তর ইরান থেকে রুশবাহিনী দেশে ফিরে যায়। যদিও রাশিয়ার জার সরকারের সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ায় উত্তর ইরান অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে হলেও দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত থাকে, কিন্তু শীঘ্রই বৃটিশ সৈন্যরা এসে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে। এরপর বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা একদম নির্বিঘ্নে ইরানের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও গলাধঃকরণে লিপ্ত হয়

www.pathagar.com

এবং ইরানের ওপর তাদের বিশেষ নীতি চাপিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে তারা ইরানে তাদের হাতের পুতুল একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে নতুনরূপে তাদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পদক্ষেপ নেয়।

ওসুকুদ্দাওলাহ্‌র[৩৮] মন্ত্রিসভা

সাংবিধানিক বিপ্লবের পরে ইরানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইংরেজদের যে সব সেবাদাস সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাসান ওসুক্ যিনি ওসুকুদ্দাওলাহ্ নামে খ্যাত। তিনি ইরানের প্রথম মজলিসে বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব করেন। এর মধ্যে আইনুদ্দাওলাহ্‌র মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন। হিজরী ১৩৩৬ সালে[৩৯] তিনি দ্বিতীয় বারের ন্যায় প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

বিজাতীয়দের সেবাদাস পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধি হিসেবে ওসুকুদ্দাওলাহ্ সাংবিধানিকতাকে বিপথগামীকরণ এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান লোকদের কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। শহীদ শেখ ফয্‌লুল্লাহ্ নূরীর হত্যাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর ইসলামবিরোধী ও পাশ্চাত্যপন্থী মন-মানসিকতা প্রমাণের জন্য এই একটি ঘটনাকেই যথেষ্ট গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর আমলেই ১৯১৯ খৃস্টাব্দে ইরান ও বৃটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা কার্যতঃ ইরানকে বৃটেনের অছিগিরির অধীনে নিয়ে যায়। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ইরানের বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এসব প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম ছিলেন প্রথম কাতারে। এ ধরনের গোলামী চুক্তি স্বাক্ষরের অপরাধে সর্বত্র ওসুকুদ্দাওলাহ্ দেশদ্রোহিতা এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের চুক্তির ঘোরতর বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ হাসান মোদাররেস।[৪০] তিনি এমনভাবে এ চুক্তির বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ফাঁস করে দেন যে, শেষ পর্যন্ত আহ্‌মাদ শাহ্ বহু চাপ সত্ত্বেও এ চুক্তিতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতি জানান।

ওসুকুদ্দাওলাহ্‌র ও তাঁর স্বাক্ষরিত দেশদ্রোহিতামূলক চুক্তির বিরুদ্ধে অন্য যেসব দ্বীনী ব্যক্তিত্ব আপোষহীন বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন শেখ মোহাম্মাদ খিয়াবানী।[৪১]

শেখ খিয়াবানীর অভ্যুত্থান

ওসুকুদ্দাওলাহ্ স্বাক্ষরিত চুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়লে ইরানের বিভিন্ন শহরের জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এসব শহরের মধ্যে তাবরীয ছিল অন্যতম। সেখানকার জনগণ খ্যাতনামা আলেম শেখ মোহাম্মাদ খিয়াবানীর নেতৃত্বে ওসুকুদ্দাওলাহ্‌র পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শেখ খিয়াবানী তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ক্রমান্বয়ে সমগ্র আজারবাইজান[৪২] এলাকার জনগণ খিয়াবানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সেখানকার অভ্যুত্থান ইরানের অন্যান্য শহরেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

ওসুকুদ্দাওলাহ্ সমস্যার মোকাবিলায় নিজেকে অক্ষম মনে করে ইস্তিফা দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু শেখ খিয়াবানীর নেতৃত্বে তাবরীযের জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উপনিবেশবাদী বৃটেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই ইরান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে শেখ খিয়াবানীর আন্দোলন ও অভ্যুত্থান দমনের লক্ষ্যে সেখানে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য করে। ঐ সময় তাবরীযের প্রশাসক পদে মনোনীত মোখবেরুদ্দাওলাহ্[৪৩] এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তাব্রীযে অভিযান চালান এবং শহরটি দখল করতে সক্ষম হন। তাবরীয দখল করার পর তিনি সেখানকার জনগণের ওপর চরম দমন অভিযান শুরু করেন। শেখ খিয়াবানীও অত্যন্ত নৃশংসভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন।

এভাবে জনগণের অংশগ্রহণ এবং ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নির্ভেজাল আন্দোলন আরো একবার উপনিবেশবাদী শক্তির ইঙ্গিতে স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও অবদমিত হয়ে যায়।

শেখ মোহাম্মাদ খিয়াবানী

টীকা ঃ

(১) ظل السلطان — (অর্থ ঃ সুলতান বা বাদশাহ্র ছায়া)।

(২) আর যিল্লুস্ সুলতানও মুক্তি পাবার পর সাংবিধানিকতার প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ করতে থাকেন এবং সরকারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অর্থ সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত বিশেষ কমিশনের তহবিলে এক লাখ তুমান (দশ লাখ রিয়াল) চাঁদা দেন।

(৩) فارس — দক্ষিণ ইরানের অন্যতম প্রদেশ; রাজধানী শীরায।

(৪) عضد الملك

(৫) نائب السلطنه

(৬) عاميون — "The Commoners"-"সাধারণ জনগণ"।

(৭) اعتداليون — "মধ্যমপন্থীগণ"।

(৮) سيد حسن تقيزاده

(৯) وحيد الملك

www.pathagar.com

(১০) سید رضا مساوات

(১১) حاج میرزا علی محمد دولت آبادی

(১২) علی اکبر دهخدا — তিনি বিখ্যাত ও বিশালায়তন ফার্সী অভিধান গ্রন্থ لغتنامهٔ دهخدا (লোগাৎনমেয়ে দেহ্খোদা)—র প্রণেতা।

(১৩) مورگان شوستر

(১৪) یالمارسن

(১৫) ফার্সী ১২৮৯ সাল মোতাবেক ১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

(১৬) এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরী। তা হচ্ছে, ঐ সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসীকে তার দাম্ভিক, স্বৈরাচারী ও বিশ্বগ্রাসী মাস্তান্ রূপ প্রদর্শন করেনি। ঐ যুগে বিশ্বের যে সব জাতি রুশ, বৃটিশ ও অন্যান্য উপনিবেশবাদীদের জুলুম-অত্যাচার ও শোষণ—লুণ্ঠনের শিকার ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তারা তখনো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়নি।

(১৭) شعاع السلطنه

(১৮) ناصر الملك

(১৯) এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ সময় রাশিয়া ও বৃটেন পরস্পর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এ কারণে নিঃসন্দেহে রাশিয়ার দেয়া চরমপত্রের প্রতি বৃটিশদেরও সমর্থন ছিল। বৃটিশ তাঁবেদার নাসেরুল মুল্কের পক্ষ থেকে রুশ চরমপত্র মেনে নেয়ার মূল কারণ ছিল এটাই।

(২০) এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয় যে, স্বাধীনতা ও সাংবিধানিকতার 'সমর্থক' (?!) হিসেবে বিখ্যাত ইপ্রাম খান আর্মানীও ছিলেন রুশ চরমপত্র মেনে নেয়ার কট্টর সমর্থকদের অন্যতম। ইতিমধ্যে সার্দর্ আস্আদ ইউরোপে গিয়েছিলেন; তিনিও চিকিৎসাশেষে দেশে ফিরে আসেন। তৎকালে সরকারী প্রশাসনে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দৃশ্যতঃ ইংরেজরা তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিল তারই ভিত্তিতে তিনি রুশ চরমপত্র মেনে নেয়ার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করেন।

(২১) پر آوازه جنوب

(২২) رئیسعلی دلواری

(২৩) میرزا محمد خان برازجانی

(২৪) شیخ حسین خان چاهکوتاهی

(২৫) زایر خضر خان اهرمی

(২৬) تنگستان — বুশেহ্র থেকে পূর্বদিকে; বর্তমান নাম আহ্রাম (اهرام)।

(২৭) دشتی — তাঙ্গেস্তান বা আহ্রাম থেকে পূর্বে অবস্থিত; বর্তমান নাম খুর্মুজ (خورموج)।

(২৮) ژاندار مری

(২৯) ایت الله محلاتی

(৩০) ناصر الدیوان کازرونی

(৩১) ایت الله لاری

(৩২) صولت الدوله

www.pathagar.com

(৩৩) قشقائی

(৩৪) مستوفی الممالك

(৩৫) قم – মাশ্‌হাদের পরে ইরানের দ্বিতীয় ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন নগরী। এখানে হযরত ইমাম রেযা (আঃ)—এর বোন হযরত মাসূমাহ্ (সালামুল্লাহি আলাইহা)—র মাযার রয়েছে। কোম ইরানের দ্বীনী জ্ঞানচর্চার নগরী। তেহ্‌রান থেকে ১৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে।

(৩৬) کرمانشاه – বর্তমান নাম শুধু 'কের্‌মান'। কের্‌মান প্রদেশের রাজধানী। তেহ্‌রান থেকে এক হাজার ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ—পূর্বে অবস্থিত। ঐ সময় তেহরানের সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম এখানে চলে এসেছিলেন। —অনুবাদক

(৩৭) نظام السلطنه مافی

(৩৮) وثوق الدوله

(৩৯) ফার্সী ১২৯৬ সাল মোতাবেক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

(৪০) ایت الله سید حسن مدرس— পরবর্তীকালে তিনি রেযা খানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শহীদ হন।

(৪১) شیخ محمد خیابانی

(৪২) آذربایجان – আজারবাইজানের উত্তরাংশ (আরাস নদীর উত্তরে কাফ্‌কাজ/ককেশাস অঞ্চলভুক্ত—যা বর্তমানে স্বাধীন দেশ) রাশিয়াভুক্ত হবার পর আজারবাইজানের দক্ষিণাংশ ইরানের হাতেই রয়েছে। বর্তমানে ইরানী অংশ পূর্ব আজারবাইজান ও পশ্চিম আজারবাইজান নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত। তাব্‌রীয্ পূর্ব আজারবাজাইনের এবং ওরুমিয়েহ্ (ارومیه) পশ্চিম আজারবাইজানের রাজধানী। —অনুবাদক

(৪৩) مخبر الدوله

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সাংবিধানিকতার পথচ্যুতির কারণ

সাংবিধানিক বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি যে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি, এ বিপ্লব তার সূচনায় যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে অগ্রসর হয়েছিল বিজয়ের পরে তা আর অব্যাহত থাকেনি।

এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সাংবিধানিক আন্দোলনের সাথে মোটামুটিভাবে তিনটি ধারা বা পক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রথমতঃ বিপ্লব-বিরোধী ধারা; এ ধারায় ছিলেন শাহ্ এবং তাঁর স্বৈরাচারী প্রশাসন তথা সরকার ও পারিষদবর্গ; দ্বিতীয়তঃ সুবিধাবাদী গোষ্ঠী, পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী, বহিঃশক্তির সেবাদাস গোষ্ঠী, জমিদার শ্রেণী প্রভৃতি; তৃতীয়তঃ স্বৈরতন্ত্র বিরোধী বিপ্লবীগণ এবং সুবিচারকামী আলেম সমাজ ও জনসাধারণ।

বিদেশী সরকারগুলো পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রথম বা দ্বিতীয় ধারাকে সমর্থন ও সহায়তা যুগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধারাটি জনসাধারণের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে; জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য, মতভেদ ও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে; আলেম সমাজকে কোণঠাসা করে; হত্যা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে এবং অন্যান্য অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং মজলিস ও অন্যান্য শক্তিকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে সাংবিধানিকতার ধারাকে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঢেলে সাজায়।

উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রুশ ও বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তিদ্বয় সাংবিধানিক বিপ্লবের সুদৃঢ় হওয়াকে নিজেদের স্বার্থের জন্য বিরাট ক্ষতির ব্যাপার বলে মনে করত; তাই তারা এ বিপ্লবের বিজয়ের শুরুতেই একে নির্বাপিত করার জন্য, অন্ততঃ পথচ্যুত করার জন্য ব্যাপক, বরং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রথমতঃ রাশিয়া সাংবিধানিকতার উৎখাত সাধন ও স্বৈরতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চিন্তায় মশগুল হয়। কিন্তু যখন তারা দেখতে পায় যে, সাধারণ জনগণ সার্বজনীনভাবে এতে অংশগ্রহণ করে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং জনগণ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সাংবিধানিক বিপ্লবকে সহায়তা ও সমর্থন দিচ্ছে তখন তারাও বৃটিশদের গৃহীত নীতি অর্থাৎ 'শাহ্ ও সংবিধানপন্থীদের মধ্যে আপোষরফা সৃষ্টি এবং একান্তই বিপ্লব বিজয়ী হলে তার সুসংহত হওয়াকে প্রতিহত করার' নীতি গ্রহণ করে। এ সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে দুই উপনিবেশিক শক্তি নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ হাসিলের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে গোপন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় ঃ

১। শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যত বেশী সম্ভব প্রভাব বিস্তার ও অনুপ্রবেশ ঘটানো ঃ সংবিধানপন্থীদের দ্বারা তেহরান বিজয় ও সরকার গঠনের মুহূর্ত থেকেই উভয় উপনিবেশিক শক্তি নতুন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যত বেশী সম্ভব স্বীয় প্রভাব বিস্তার এবং স্বীয় সেবাদাসদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ধীরে ধীরে বিপ্লবোত্তর শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং

www.pathagar.com

উপনিবেশবাদীরা তাদের তাঁবেদার সরকার গঠন করাতে সক্ষম হয়, শুধু তাই নয়, এমন কি সাবেক আমলের স্বৈরাচারীদের মধ্য থেকে পর্যন্ত সরকার প্রধান নিয়োগের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। বিজাতীয়দের পক্ষ থেকে ইরানী জনগণের ওপর, বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী যুগের ঘৃণিত ব্যক্তিদের চাপিয়ে দেয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সা'দুদ্দাওলাহ্, আইনুদ্দাওলাহ্ এবং ওসুকুদ্দাওলাহ্র ন্যায় ব্যক্তিদের সাংবিধানিক বিপ্লবোত্তর যুগে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ। বস্তুতঃ উপনিবেশবাদীদের এ সাফল্যের মানে ছিল তাদের বিজয় সমতুল্য এবং প্রকৃতই তারা সাংবিধানিকতাকে পথচ্যুত ও অবক্ষয়ের সূচনা করার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় বিজয়ী হয়েছিল।

২। **মজলিসে অনুপ্রবেশ সৃষ্টি ও স্বীয় স্বার্থ নিশ্চিতকরণের দিকে মজলিসের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ ঃ** সাংবিধানিক বিপ্লবের ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিজাতীয় উপনিবেশিক শক্তিবর্গ শুধু বিপ্লবোত্তর সরকারে অনুপ্রবেশের জন্যই চেষ্টা করেনি (যাতে অবশ্য তারা সফল হয়েছিল), বরং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবার চেষ্টা করে যাতে তাদের তাঁবেদার ও সেবাদাস ব্যক্তিরা মজলিসে সদস্য হয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে দ্বিতীয় মজলিস থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে মজলিসে বিজাতীয়দের তাঁবেদার গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারা মজবুত অবস্থানের অধিকারী হয়। এভাবে তারা বিপ্লবকে অব্যাহত রাখার পথে বাধা সৃষ্টিতে এবং যে জনগণ প্রচুর রক্তের বিনিময়ে এ বিপ্লবকে সফল করেছিল তাদের আশা-আকাঙক্ষা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। আর সাংবিধানিকতা অর্থহীন হয়ে যাওয়া এবং সাংবিধানিক বিপ্লব সম্পর্কে জনমনে হতাশা সৃষ্টির পিছনে এও ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

৩। **নির্ভেজাল গণঅভ্যুত্থান দমন ঃ** সাংবিধানিক বিপ্লবের বিজয় এবং মজলিস গঠনের পরেও সৎ, নিষ্ঠাবান ও উপনিবেশবাদ বিরোধী লোকেরাই ময়দানে সক্রিয় ছিলেন; তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন ওলামায়ে কেরাম। তাঁরা যখন শাসকগোষ্ঠীর পথচ্যুতি এবং মজলিসের অভ্যন্তরে তাঁদের প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা লক্ষ্য করেন তখন তাঁরা সংগ্রাম থেকে হাত গুটিয়ে নেননি, বরং তাঁরা পুনরায় জনসাধারণের নিকট গিয়ে হাজির হন এবং সাংবিধানিক বিপ্লবকে তার মূল উৎসের নিকট ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নির্ভেজাল গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। এ ধরনের প্রচেষ্টায় যেসব দ্বীনী ব্যক্তিত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সংগ্রামী আলেম শহীদ শেখ মোহাম্মদ খিয়াবানী এবং শহীদ মীর্যা কুচাক্ খান জাঙ্গালী[১] হচ্ছেন আদর্শ স্থানীয় দৃষ্টান্ত।

ঐ সময় উত্তর ও দক্ষিণ ইরান ছিল দুই উপনিবেশিক শক্তির স্বার্থ-এলাকা। এ কারণে তারা বিশেষভাবে দেশের ঐ দুই অংশের ওপর দৃষ্টি রাখত। তাই উল্লেখিত ধরনের নির্ভেজাল গণঅভ্যুত্থানের সম্প্রসারণের সময় ইরান সরকার তাদের দমনের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে উপনিবেশবাদীরা হয় নিজেরাই অগ্রবর্তী হয়ে গণঅভ্যুত্থান দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করত অথবা তাদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান পরিচালনার জন্য ইরান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করত। উদাহরণস্বরূপ ঃ উত্তর ইরানে রুশরা বহু হত্যা ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধের আশ্রয় নিয়েছিল এবং ছেকাতুল্ ইসলাম তাব্রীযীর[২] ন্যায় বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আলেমকে ও মাশ্হাদের আরো বেশ কিছুসংখ্যক আলেমকে শহীদ করেছিল। এছাড়া মাশ্হাদের জনসাধারণ রুখে দাঁড়ালে রুশরা এমন কি হযরত ইমাম রেযার (আঃ) হারামে (মাযার শরীফে) জনগণের ওপর হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি।

www.pathagar.com

দেশী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা

উপনিবেশিক শক্তিবর্গ ও সাবেক আমলে ক্ষমতার সাথে জড়িত স্বৈরাচারী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদিও বিজাতীয় তাঁবেদারি প্রত্যাখ্যানকারী কিছুসংখ্যক ব্যক্তিত্ব দেশের শাসন প্রক্রিয়ায় মোটামুটি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মজলিসেও প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন তথাপি কয়েকটি কারণে তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। তা হচ্ছে, একদিকে বিজাতীয়দের তাঁবেদার গোষ্ঠী মজলিসে প্রতিনিধিত্ব ও নীতি নির্ধারণের চাবিকাঠি স্বহস্তে গ্রহণ করতে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে মজলিস সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। এভাবে স্বাধীনচেতা মহলের দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি তাঁবেদার মহলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আতাবাক্ পার্কের একটি ঘটনার ফলশ্রুতিতে দুইজন জাতীয় সেনাপতি সাত্তার খান ও বাকের খানকে নিরস্ত্র করা হয়। সেখান থেকে শুরু করে মজলিসে বিভিন্ন গ্রুপের সৃষ্টি ও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ইত্যাদি মিলে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্র তৈরী করে। জাতির দুশমনরা এ বিশৃঙ্খলা ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং এসব দলের প্রতিটিই অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে বিষোদগার করতে থাকে। অবশ্য বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৎ এবং আন্তরিক লোকও যে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও দলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জনসাধারণ পূর্বাপেক্ষাও বেশী দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকেরা পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং সাধারণ গণমানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের চাইতে ব্যক্তিগত বিষয় অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকে।

আলেম সমাজের কোণঠাসা অবস্থা

সাংবিধানিক গণআন্দোলনে আলেমগণই ছিলেন জনগণের নির্ভরযোগ্য একমাত্র নেতৃবৃন্দ। এক্ষেত্রে স্বৈরাচার ও বিজাতীয় উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী ধারাটি অটল ও আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল তা হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের ধারা। কিন্তু সাংবিধানিক বিপ্লব বিজয়ী হবার পরে তাঁরা দেশশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ ও দেখাশুনা করার কাজ কমিয়ে দেন। অবশ্য এর পিছনে দু'টি প্রধান কারণ ছিল ঃ

১। ওলামায়ে কেরামকে কোণঠাসা করতে শাসকগোষ্ঠী ও পাশ্চাত্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা ঃ সাংবিধানিক বিপ্লবের ভিত্তি ছিল দ্বীন ও রাজনীতির অবিভাজ্যতা (কারণ, মূলগতভাবেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পর থেকে বিভাজ্য নয়)। অন্যদিকে ওলামায়ে কেরামের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বক্ষণিক উপস্থিতির কারণেই এ বিপ্লব সফল হতে পেরেছিল। কিন্তু বিপ্লবের বিজয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই নব্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের শ্লোগান তোলেন এবং ওলামায়ে কেরামকে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও বিপ্লবের ওপর নজর রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ঐ সময়কার দলিল-দস্তাবেজ ও তথ্যসূত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে এটাই চোখে পড়ে যে, জনসাধারণের মধ্যে ও মজলিসের অভ্যন্তরে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের চিন্তাধারার পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল। যারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ও ব্যাপকভাবে এ

www.pathagar.com

চিন্তাধারা প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটগণ, বিশেষতঃ তাঁদের অন্যতম নেতা তাকীযাদেহ্ ছিলেন অগ্রগণ্য।

২। **রাজনীতিবিদদের কাছে আলেমদের পরাজয় ঃ** ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে সাংবিধানিক আন্দোলন সফল হওয়া সত্ত্বেও সরলতা, আন্তরিকতা ও পদের ব্যাপারে নির্লোভ হবার কারণে তাঁরা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ করেননি, বরং রাজনীতিবিদদেরকে ময়দান ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে রাজনীতিবিদগণ যেসব ধোঁকা-প্রতারণা ও অনৈতিকতার আশ্রয় নিতে থাকেন নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম তাতে হতাশ হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তিরোহিত হয়ে গেলেন। সাংবিধানিক বিপ্লব নিয়ে সামান্য পর্যালোচনা করলেই বিস্ময়ের সাথে এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আলেম সমাজ উপনিবেশিক শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করার ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেয়ার পরেও সাংবিধানিক বিপ্লবের পরে পিছু হটে গেলেন কেন? নিঃসন্দেহে তাঁদের এরূপ পিছু হটে যাবার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতিবিদদের ধোঁকা-প্রতারণা ও চালবাজির নিকট তাঁদের পরাজয়।

ওলামায়ে কেরামের সামনে নব্য ক্ষমতাসীন সাংবিধানিকপন্থী রাজনীতিবিদদের আচরণ ও কর্মকান্ড ছিল সুস্পষ্ট। বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতামূলক তৎপরতা, পদ ও ক্ষমতার মোহ, বিজাতীয়দের তাঁবেদারি ইত্যাদি রাজনীতিবিদদের আচরণ ও কর্মকান্ড, বিশেষ করে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের শ্লোগান এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণের ফলে ওলামায়ে কেরাম রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং হতাশার সাথে পিছু হটে যান। এভাবে তাঁরা পূর্বাপেক্ষাও বেশী মাত্রায় রাজনীতির ময়দান রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দেন।

ইতিপূর্বে নাজাফের সম্মানিত মারজা'গণের পক্ষ থেকে সাংবিধানিকতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রদান এবং আয়াতুল্লাহ্ নায়িনী কর্তৃক সাংবিধানিকতার সমর্থনে গ্রন্থ রচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাংবিধানিক বিপ্লবের সাফল্যের পর আয়াতুল্লাহ্ নায়িনী তাঁর এ গ্রন্থটি বাজার থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, সম্মানিত মারজা'গণের নিকট সাংবিধানিকতাপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণের চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তখন আলেম সমাজ ময়দান থেকে সরে যান এবং সাংবিধানিকতাকে আর সমর্থন জানানো উচিত কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধা-দন্দ্বে পড়ে যান। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে, এরপরও যে সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সংগ্রামী আলেম মজলিসে থেকে যান ধীরে ধীরে তাঁদেরকে হয় মজলিস থেকে অপসারণ করা হয়, নয়তো নির্বাসন দেয়া হয় অথবা হত্যা করা হয়।

গণঅসন্তোষের বিস্তার

সাংবিধানিকতার পথচ্যুতি ও অবক্ষয়ে অন্য যে সব বিষয় ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার মধ্যে ক্রমান্বয়ে সর্বত্র গণঅসন্তোষের বিস্তার লাভ অন্যতম। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিজাতীয়দের হস্তক্ষেপ, ১৯০৭ সালের চুক্তি সম্পাদিত হবার পর দেশের বিভিন্ন শহরে বিদেশী সৈন্যদের উপস্থিতি, তাদের দ্বারা সংঘটিত ব্যাপক গণহত্যা ও উপর্যুপরি লুটতরাজ, তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের দ্বারা সংঘটিত পৈশাচিক কর্মকাণ্ড এবং জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ক্রমান্বয়ে জনসাধারণকে সাংবিধানিক বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ করে তোলে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, জনগণের একটি অংশ তাদের সকল

www.pathagar.com

দুঃখ-দুর্দশার জন্য সাংবিধানিকতাকে দায়ী মনে করতে লাগল। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, নব্য ক্ষমতাসীন সাংবিধানিকতাপন্থীদের দ্বারা গঠিত সরকার বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক বিচারে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগের পরিবর্তে সাবেক আমলে ক্ষমতাসীন স্বৈরতন্ত্রীদেরকে জনসাধারণের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা জনসাধারণকে কষ্টের মধ্যে ফেলে এবং সেই স্বৈরাচারী যুগের কর্মনীতি অনুসরণ করে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তারা সাবেক আমলের চেয়েও অধিকতর খারাপ কাজ করতে থাকে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সাংবিধানিক বিপ্লব সফল হবার পর ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বহুবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের জন্য দখলদারদের উপস্থিতির ফলে বাণিজ্যিক তৎপরতা ও কৃষিকার্য ব্যাহত হয় এবং এভাবে জনসাধারণের বেঁচে থাকার সর্বশেষ অবলম্বনটুকুও দেশী শাসকগোষ্ঠী ও বিদেশী দখলদারদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। জনসাধারণ আশা করেছিল যে, সাংবিধানিক বিপ্লবের পরে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হওয়া তো দূরের কথা, বরং পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। সাংবিধানিক বিপ্লবের পর স্থানীয় পর্যায়ের মোটা গর্দানওয়ালাদের গর্দান আরো মোটা হয় এবং লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানি পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে সামষ্টিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার অধিকারী ছিল না, সেহেতু তাদের পক্ষে এ ধরনের সমস্যাবলীর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা অসম্ভব ছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে, তাদের সকল সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে দেশে বিজাতীয়দের উপস্থিতি, রাষ্ট্র ও সরকারে তাদের হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদেরই তাঁবেদার ও এজেন্টদের প্রভাব, অনুপ্রবেশ ও কর্তৃত্ব। এ কারণেই জনসাধারণ সাংবিধানিকতাকেই তাদের সমস্যা ও সংকটের কারণ বলে মনে করতে লাগল। তাই তারা ক্রমান্বয়ে দুর্বৃত্ত প্রশাসক ও জমিদারদের শোষণ-লুণ্ঠনের অবসানের আশায় একটি শক্তিশালী সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান কামনা করতে থাকে। তারা আশা করতে থাকে যে, এ ধরনের একটি শক্তিশালী সরকার ক্ষমতায় বসে বিজাতীয় সৈন্যদের দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করুক এবং জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উপহার নিয়ে আসুক।

টীকা ঃ

(১) میرزا کوچك خان جنگای – 'মীর্যা কুচাক' মানে 'ছোট মীর্যা'। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে 'জাঙ্গালী' বলা হয়। তাঁর অভ্যুত্থান সম্পর্কে পরে আলোচিত হয়েছে। – অনুবাদক

(২) ثقة الاسلام تبریزی

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

রেযা খানের ক্ষমতা দখল ও ইরানে পূর্ণাঙ্গ বৃটিশ আধিপত্যের যুগ

১৯১৭ খৃস্টাব্দে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়।[১] এ বিপ্লবের পর থেকে রুশরা আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে; বিশেষ করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রতিরোধের মোকাবিলা তাদের প্রধান করণীয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ইরানে রাশিয়ার উপনিবেশবাদী নীতি কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে।

রুশরা উত্তর ইরান ছেড়ে চলে যায় ও নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়। ইংরেজরা তাদের সুদীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের শূন্যস্থান পূরণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে উত্তর ইরানে তাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এভাবে তারা উত্তর ইরানকেও স্বীয় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে।

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রুশদের ইরানত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বৃটেনের ইরান সংক্রান্ত নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এদেশে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের উদ্ভব প্রতিহত করা। কিন্তু রুশদের ইরানত্যাগের পর বিভিন্ন কারণে বৃটেনের ইরান সংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ইরানে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বৃটেনের এ নতুন নীতি গ্রহণের পিছনে যেসব কারণ নিহিত ছিল তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

১। অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে ইরানে রাজনৈতিক নিরাপত্তার অপরিহার্যতা ঃ ইরানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষতঃ তেল আবিষ্কারের পূর্বে এদেশে বৃটিশদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল তাদের দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, ইরান অত্যন্ত উন্নত মানের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ তখন তারা ইরানের এ প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তগত করাকে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে। তারা অত্যন্ত ভালভাবেই বুঝতে পারল যে, ইরানে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অবশ্যই তাদেরকে দেশটির রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, ইরানের কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন দুর্বল থাকবে ততদিন তাদেরকে (বৃটিশদেরকে) বাধ্য হয়েই ইরানের প্রতিটি এলাকায়ই কিছুসংখ্যক তাঁবেদার-এজেন্ট পোষা ছাড়াও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রাখতে হবে। নিঃসন্দেহে এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। এছাড়া প্রতিটি প্রদেশের প্রাদেশিক প্রশাসকের ওপর এ বিষয়ের দেখাশুনার ভার অর্পণ করার মধ্যেও বহু সমস্যা ছিল। অন্যদিকে বৃটিশ বণিকদের পক্ষে কেবল ততক্ষণই কোন দেশে নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে নিজেদের পণ্যসামগ্রী সর্বোচ্চ মাত্রায় বিক্রি করা সম্ভবপর ছিল যতক্ষণ সেখানে এক ধরনের রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিরাজ করত। কারণ, এই রাজনৈতিক নিরাপত্তার হচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার, ক্রেতাদেশের জনগণের আয় তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধির এবং সর্বোপরি তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

২। ইরানে বৃটিশ সামরিক উপস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যা ঃ তৎকালীন বৃহৎশক্তি বৃটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিরাট ক্ষতির শিকার হয়েছিল। বস্তুতঃ দ্বীপদেশ বৃটেন প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালসহ প্রাথমিক

- ১৫

www.pathagar.com

পণ্যের দিক থেকে খুবই দরিদ্র ছিল এবং এসব ক্ষেত্রে দেশটি তার উপনিবেশসমূহের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পরে বৃটেনের বিভিন্ন উপনিবেশে ধীরে ধীরে মুক্তিকামী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এ কারণে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৃটেনের গোটা সেনাবাহিনীকে উপনিবেশগুলোতে গণঅভ্যুত্থান প্রতিহত করার কাজে ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ ধরনের মুক্তি আন্দোলনরত উপনিবেশগুলোতেই সামরিক উপস্থিতি অধিকতর অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ঐ সময় সক্রিয় সামরিক উপস্থিতি ছাড়াই ইরানে বৃটেনের উপনিবেশিক নীতির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব, বরং অধিকতর সহজ ছিল; এমতাবস্থায় বৃটেন যদি ইরানে সামরিক উপস্থিতিও বজায় রাখতে চাইত তাহলে একদিকে তাকে এ নীতির বাস্তবায়নের জন্য বিরাট অঙ্কের ব্যয়ভার বহন করতে হত, অন্যদিকে তেমন একটা অপরিহার্য ও গুরুতর প্রয়োজন ছাড়াই দমনকার্যে ব্যবহারোপযোগী স্বীয় বাহিনীর একটি অংশকে অকর্মণ্যভাবে ইরানে বসিয়ে রাখতে হত। অধিকন্তু এর দ্বারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনকেও বৃটেনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা হত এবং তাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী চেতনা ও চিন্তা উস্কে দেয়া হত। ইরানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে বৃটেনের আগ্রহের পিছনে এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

৩। **কম্যুনিজমের মোকাবিলায় প্রতিরক্ষাব্যূহ সৃষ্টি ঃ** অক্টোবর বিপ্লবের পরে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার পক্ষ থেকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছিল। ফলে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি এশিয়া মহাদেশে কম্যুনিজমের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কায় প্রমাদ গুণতে থাকে। বৃটিশরা ভয় করছিল যে, রুশ বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর সমাধানের পর ইরানসহ বিদেশের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং ইরানের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ও ব্যাপকভাবে উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে ইরানীদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবেন। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি অবশ্য দক্ষিণ রাশিয়ার শহরগুলোর ওপর সরাসরি সামরিক হামলা চালিয়ে এবং সেখানকার সরকার বিরোধীদের সাহায্য করে নবগঠিত কম্যুনিস্ট সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করে । কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকার এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রভাব ও প্রসার রোধের অন্যতম পন্থা হতে পারে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তের এপারে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা।[২]

৪। **ইরানের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতাকামী গণআন্দোলনরূপী বিপদের আশংকা ঃ** অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তিকে ইরানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলার নীতি গ্রহণে বাধ্য করে তা হচ্ছে, ঐ সময় ধীরে ধীরে ইরানী জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে গণআন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। এসব গণআন্দোলন উপনিবেশিক শক্তি এবং দুর্বল, অক্ষম ও বহিঃশক্তির তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। এ আন্দোলনগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায়; কিন্তু এসব আন্দোলন একবার কোন না কোনভাবে বিক্ষিপ্ততা কাটিয়ে পরস্পর সুসংবদ্ধ হতে পারলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইরানে এক ব্যাপক ও সুগভীর মুক্তিআন্দোলনের জন্ম দিতে সক্ষম হত। আর তাহলে সে আন্দোলন খুব সহজেই ইরানের মাটিতে উপনিবেশবাদী নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে সক্ষম হত। এসব গণঅভ্যুত্থান ও আন্দোলনের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ খিয়াবানীর নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান, মীর্যা কুচাক খানের নেতৃত্বাধীন 'জাঙ্গালীদের' ৩ অভ্যুত্থান, কর্নেল মোহাম্মদ তাকী খান পসিয়ানের[৪] অভ্যুত্থান এবং দক্ষিণ ইরানের দাশ্‌তেস্তানী বীর যোদ্ধাদের[৫] অভ্যুত্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

এভাবে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে সব অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় তার উৎস কোথায় বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি তা ভাল করেই জানত। তেমনি তাদের স্বার্থে এসব অভ্যুত্থান দমনের অপরিহার্যতা সম্বন্ধেও তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ইরানে বৃটিশ সামরিক উপস্থিতি বজায় থাকা অবস্থায় বৃটিশরা এসব অভ্যুত্থান দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাতে অভ্যুত্থানগুলোর প্রতি জনগণের সমর্থন 'মারাত্মকভাবে' বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে ইরানের বুকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকলে ও সে সরকার দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে এসব অভ্যুত্থানকে দমন করলে জনগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়া হওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং এভাবে জনসাধারণকে প্রতারিত করা সম্ভব ছিল।

যদিও, ইতিপূর্বে আমরা যেসব অভ্যুত্থানের নামোল্লেখ করেছি সেগুলো রেযা খানের ক্ষমতা দখলের ও বৃটেনের নতুন ইরান-নীতি বাস্তবায়নের পূর্বেই সংঘটিত হয়, আর তা তৎকালীন ইরানের অকেন্দ্রীভূত শক্তির দ্বারাই দমন করা হয়, তথাপি এসব অভ্যুত্থান দমনের ক্ষেত্রে বৃটিশদের হস্তক্ষেপ ও উস্কানির বিষয়টি ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও পরবর্তীতে ইরানে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে না উঠলে এ সম্ভাবনা খুবই প্রবল ছিল যে, পরবর্তী অভ্যুত্থানগুলো আর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করা আদৌ সম্ভবপর হত না।

এখানে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হল তার ভিত্তিতে উপনিবেশবাদী বৃটিশরা ইরানে তাদের উপনিবেশবাদী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য এখানে একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের নবতর নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে দেখতে পায়। তাই এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পরবর্তীকালে তারা খাজ্‌ আলীর[৬] ন্যায় ইরানে তাদের শক্তিশালী এজেন্টদের পর্যন্ত কোরবানী করতে দ্বিধা করেনি।

ক্যু-দেতা ঃ মূল লক্ষ্যে পৌঁছার প্রস্তুতি

ইরানে বৃটিশদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি। কারণ তারা ইরানে যে লক্ষ্য হাসিল করতে চাচ্ছিল কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত না করে তা সম্ভব ছিল না। একদিকে কাজার বংশের দুর্নীতি ও অনাচার ছিল সর্বজনবিদিত, অন্যদিকে তাদের সম্পর্কে ইরানের জনগণ পুরোপুরি হতাশ ছিল। এছাড়া আহমদ শাহ্‌র অভিজ্ঞতাও ছিল খুবই কম। ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটে আহমদ শাহ্ কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজদের দাবী ও চাপের মুখে প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং বৃটিশদের লক্ষ্যকে বানচাল করে দিতে সক্ষম হন। (যেমন ঃ ১৯১৯ খৃস্টাব্দে ওসুকুদ্দাওলাহ্‌র সম্পাদিত ইরান-বৃটেন চুক্তিতে অনুমোদন স্বাক্ষরদানে তাঁর অস্বীকৃতির ফলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনা।) এসব কিছু মিলিয়ে উপনিবেশবাদী বৃটিশ সরকার এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইরানে তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করতে হবে ও সেজন্য প্রথমে যথাযথ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে বৃটেনের জন্য ইরানে নিজস্ব সেবাদাসের প্রয়োজন ছিল। এখানে তাদের সেবাদাস অনেক ছিল, কিন্তু নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত মানের সেবাদাসের প্রয়োজন ছিল এবং এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের খুঁজে পাবার জন্য পর্যায়ক্রমিক তৎপরতা অপরিহার্য ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে বৃটিশরা তাদের বিবেচনাধীন সেবাদাসদের সম্পর্কে নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার অবকাশ পেত এবং অগত্যা প্রয়োজন হয়ে পড়লে একজনকে সরিয়ে আরেকজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা সম্ভব হত।

www.pathagar.com

এ বাস্তব অবস্থার আলোকে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা তাদের মূল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অর্থাৎ রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পূর্বে কতগুলো প্রস্তুতিপর্বের পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করে। এসব পদক্ষেপের অন্যতম ছিল রাজতন্ত্রের পতন ঘটানো ব্যতিরেকেই সরকারের বিরুদ্ধে ক্যু-দেতা (সামরিক অভ্যুত্থান) ঘটানো।

কালো ক্যু-দেতা[৭]

বৃটিশরা যে ক্যু-দেতা'র পরিকল্পনা করে তা সংঘটিত করার জন্য একজন রাজনৈতিক ও একজন সামরিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার পর এ কাজের জন্য সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য হতে, তৎকালে প্রকাশিত দৈনিক 'রাদ্'[৮]-এর সম্পাদক সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ীকে বেছে নেয়া হয়। একই সময় একজন সামরিক ব্যক্তিত্বকে খুঁজে বের করার জন্যও চেষ্টা শুরু হয়। বৃটিশ সরকার এরূপ একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে জেনারেল আয়রন্‌সাইডের[৯] ওপরে। তিনি প্রয়োজনীয় গবেষণা-পর্যালোচনার পর ইরানস্থ্ কাজ্জাক বাহিনীর ইরানী অফিসারদের মধ্য থেকে রেযা খানকে বৃটেনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সার্বিক বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন।

জেনারেল আয়রন্‌সাইড রেযা খানের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হন এবং শেষ পর্যন্ত বৃটেনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সে লক্ষ্যে সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ীর সাথে সহযোগিতা করতে তাঁকে রাজি করাতে সক্ষম হন।

ফার্সী ১২৯৯ সালের বাহ্‌মান মাসে[১০] কায্‌ভীনে[১১] জেনারেল আয়রন্‌সাইডের উপস্থিতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের এ দুই নায়কের মধ্যে সাক্ষাত ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় রেযা খান এ শর্তে সম্মতি প্রকাশ করেন যে, কাজ্জাক বাহিনীর দ্বারা তেহরান দখলের পর সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ীকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। তেহরান দখলের ক্ষেত্রে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হবে না– এ ব্যাপারে রেযা খানকে নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে জেনারেল আয়রন্‌সাইড্ বলেন যে, আহমদ শাহ্ এ পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত আছেন এবং সম্ভাব্য যেকোন সমস্যা তেহরানস্থ্ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ নর্‌ম্যান[১২] কর্তৃক সমাধান করা হবে।

১২৯৯ ফার্সী সালের এস্‌ফান্দ্ মাসের[১৩] শুরুর দিকে রেযা খানের নেতৃত্বে কাজ্জাক বাহিনী তার অবস্থানস্থল কায্‌ভীন থেকে তেহরান অভিমুখে রওয়ানা হয়। যেহেতু সশস্ত্র পুলিশ[১৪] ও শহর রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য বাহিনীকে ইংরেজরা আগেই উৎকোচ দিয়ে বশ করে রেখেছিল সেহেতু কোন বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই কাজ্জাক বাহিনী তেসরা এস্‌ফান্দ্ (মোতাবেক ২২শে ফেব্রুয়ারী) তেহরান দখল করতে সক্ষম হয়।

তেহরান দখলের পর ক্যু-দেতা'র নায়করা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার গঠন করেন; সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী প্রধানমন্ত্রী হন। সাইয়্যেদ যিয়ার নির্দেশে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন তৎকালীন ইরানের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ হাসান মোদার্‌রেস।

www.pathagar.com

সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হবার কয়েকদিন পর সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী আহ্‌মাদ শাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন। আহ্‌মাদ শাহ্ এ ঘটনায় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন; এমন কি প্রাণ হারানোর আশঙ্কাও করছিলেন। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে সাইয়্যেদ যিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেন।

সাইয়্যেদ যিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন যা ইরানের ইতিহাসে "কালো মন্ত্রিসভা" হিসেবে চিহ্নিত। তবে নিজেদের এ কালো রূপ গোপন করা এবং 'জাতীয়' লেবাস পরিধান করে জনগণকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা পথ খুঁজতে থাকে এবং কার্যতঃ বাতিল হয়ে যাওয়া ১৯১৯-এর ইরান-বৃটেন চুক্তিকে এ জন্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। আয়াতুল্লাহ্ মোদাররেসের ন্যায় বীর ব্যক্তিত্ববর্গের প্রচেষ্টায় আহ্‌মাদ শাহ্ উক্ত চুক্তিতে অনুমোদন-স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে কার্যতঃ চুক্তিটি একটি বাতিল বা মৃত চুক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাইয়্যেদ যিয়ার মন্ত্রিসভা ইংরেজদের সাথে তাঁদের যোগসাজশকে জনচক্ষু থেকে আড়াল করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি বাতিল করার কথা ঘোষণা করে। বৃটেনও ইরানী জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এ চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানায়। এরপর সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী তাঁর সরকারের প্রতি বৃটিশ সমর্থনের পাশাপাশি ইরানের উত্তর দিকের শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ রাশিয়ার সমর্থন পাবার লক্ষ্যে ১৯২১ সালের ইরান-রুশ চুক্তি সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কালো মন্ত্রিসভার পতন

সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন বাহ্যিকভাবে স্বীয় ক্ষমতার দাপট দেখানোর লক্ষ্যে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে এবং জমিদার ও অভিজাত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করেন ও তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে নির্বাসিত করেন। কিন্তু এসব ঘটনা তাঁর ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য, ফলে ক্যু-দেতা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য তথা জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে রেযা খান তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পৌরসভা ও কর অফিসসমূহের আয়কে তাঁর অধীনস্থ কাজ্জাক সৈন্যদের স্বার্থে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করে দেন। এর ফলে সরকারের সমস্যা পূর্বাপেক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়।

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ইরানে তাদের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা, অন্যদিকে তাদের মনোনীত আসল সেবাদাসকে ক্ষমতায় আনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এছাড়া এ আশংকাও ছিল যে, সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীনের ব্যর্থ সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে গণবিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই বৃটিশরা তাঁকে সহায়তা করার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, রেযা খান নিজেই প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করার জন্য পাঁয়তারা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাইয়্যেদ যিয়ার বিরোধিতা করছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে এতে উস্কানি দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ক্যু-দেতা সরকারের পতন ছিল সুনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনমাস প্রধানমন্ত্রিত্ব করার পর সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী আহমাদ শাহ্‌র নির্দেশে ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং ইংরেজদের সহায়তায় ও কাজ্জাক সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে দেশত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌র প্রধানমন্ত্রিত্ব

সাইয়্যেদ যিয়ার কালো মন্ত্রিসভার পতনের পর আহমাদ শাহ্ মুশীরুদ্দাওলাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তিনি মোস্তৌফীউল্ মামালেক্‌কে প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় ইংরেজরা প্রধান সেনাপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শাহ্ এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইংরেজরা যখন বুঝতে পারল যে, এ ব্যাপারে তখনো পুরোপুরি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি, তখন তারা আর পীড়াপীড়ি করল না। শেষ পর্যন্ত কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌কে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয় ও সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ উপাধিধারী আহ্‌মদ কাওয়াম[১৫] ছিলেন সুপরিচিত বৃটিশ এজেন্টদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ইরান-বৃটেন চুক্তি স্বাক্ষরকারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওসুকুদ্দাওলাহ্‌র ভাই। তিনি ১৩০০ ফার্সী সালের ১৪ই খোর্‌দাদ থেকে তেসরা বাহ্‌মান (মোতাবেক ১৯২১ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুন থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী) পর্যন্ত ইরানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌র সরকার একটি দফাওয়ারী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এর প্রথম দফা ছিল "নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থাপনার সম্পূরণ"। সরকারের কর্মপরিকল্পনার এ দফাটির উদ্দেশ্য ছিল রেযা খানের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং বৃটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইরানে বৃটিশ বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ক্রমান্বয়ে ইরানী সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও শক্তি যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা। কারণ, ইরানের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তার সাহায্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ তথা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করাই ছিল ইরানে বৃটিশদের ঐ সময়কার লক্ষ্য।

অতঃপর বৃটিশরা যখন দেখতে পেল যে, ইরানী সেনাবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ইরান সরকার তার সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করবে এ ব্যাপারেও যখন নিশ্চিত হল, তখন তারা এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, ইরানে বৃটেনের সামরিক লক্ষ্য হাসিলের জন্যে যতখানি প্রয়োজন ইরানী সেনাবাহিনী মোটামুটিভাবে ততখানি উপযুক্ততা অর্জন করেছে। তাই বৃটিশরা "দক্ষিণের পুলিশ[১৬]" নামে তাদের পোষা বাহিনীকে ভেঙ্গে দেয়।

কর্নেল তাকী খান পাসিয়ানের অভ্যুত্থান

সাইয়্যেদ যিয়া ও রেযা খানের ক্যু-দেতা'র সময় কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ খোরাসান প্রদেশের প্রশাসক[১৭] ছিলেন। তখন খোরাসান প্রদেশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন কর্নেল মোহাম্মদ তাকী খান পাসিয়ান। সাইয়্যেদ যিয়া ক্যু-দেতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পর খবর পান যে, কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন। তাই তিনি কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌কে গ্রেফতার করে তেহ্‌রানে পাঠানোর জন্য গোপনে পাসিয়ানের নিকট নির্দেশ পাঠান। কর্নেল পাসিয়ান ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। তিনি একদিকে সাইয়্যেদ যিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, অন্যদিকে কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌কে গণবিরোধী শক্তির অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে জানতেন। এ কারণে তিনি সাইয়্যেদ যিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী কাওয়ামকে গ্রেফতার করে তেহরানে পাঠিয়ে দেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মাদ তাকী খান পাসিয়ান্

এমতাবস্থায় কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র প্রধানমন্ত্রী হবার খবর পেয়ে কর্নেল পাসিয়ান তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানান। কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রেযা খানের নিকট সাহায্য চান ও খোরাসানে সামরিক বাহিনী পাঠাতে বলেন। রেযা খান এ ব্যাপারে আশ্বাস দিলে কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্ বাখ্তিয়ারীকে খোরাসানের প্রাদেশিক প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান।

সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্ কর্নেল পাসিয়ানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি পাসিয়ানকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, পাসিয়ান তাঁকে মেনে নিলে তিনি তাঁকে পূর্বপদে বহাল রাখবেন। জবাবে পাসিয়ান জানান যে, সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্ যদি বাখতিয়ারী বাহিনীকে সাথে না নিয়ে একাই খোরাসান আসেন তাহলে পাসিয়ান তাঁর আনুগত্য করবেন এবং তাঁকে খোরাসান প্রদেশের প্রশাসক হিসেবে মেনে নেবেন।

আসলে কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ সাম্সামুস্ সাল্তানাহ্র মাধ্যমে যে আলোচনার উদ্যোগ নেন ও আপোষ প্রস্তাব দেন তার উদ্দেশ্য ছিল পাসিয়ানকে বোকা বানিয়ে ফাঁদে ফেলা। কিন্তু রাজনৈতিক আলাচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং পাসিয়ানকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় কাওয়াম পাসিয়ানকে দমনের সিদ্ধান নেন এবং খোরাসান অভিমুখে কাজ্জাক বাহিনী প্রেরণ করেন। কাজ্জাক বাহিনী প্রেরণের পাশাপাশি কাওয়াম অন্যবিধ পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। তিনি খোরাসানের গভর্নর থাকাকালে সেখানকার জমিদারদের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল; তাই তিনি তাদেরকেও পাসিয়ানের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

শীর্ভনের জমিদারদের সহায়তায় সর্দার মাগ্জ্ খান্ বেজ্নুর্দী[১৮] জাফারান্লু[১৯] ও শদ্লু[২০] গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে বেশ কয়েক গ্রুপ যোদ্ধা সংগ্রহ করতে ও তাদেরকে মাঠে নামাতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি কুচানী কুর্দীদেরও[২১] পাসিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে সক্ষম হন। পাসিয়ান এ বিদ্রোহ্ দমনের জন্য কুচানী গমন করেন এবং অল্পসংখ্যক যোদ্ধা সাথে নিয়ে কুচানের জাফর আবাদে[২২] বিদ্রোহীদের সাথে মোকাবিলা করেন।

এখানে সংঘটিত যুদ্ধে পাসিয়ানের অধীনস্থ সশস্ত্র পুলিশদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক পালিয়ে যায়। অগত্যা কর্নেল পাসিয়ান তাঁর অবশিষ্ট যোদ্ধাদের নিয়েই যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী অবশিষ্ট যোদ্ধারা নিহত হয়। এমতাবস্থায় কর্নেল পাসিয়ান একাই যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং অবরুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে বেশ কয়েকটি গুলী লাগায় তিনি আহত হন। কিন্তু এ বীর সেনাপতি যখন গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো গুণছিলেন তখন প্রতিপক্ষের কয়েক ব্যক্তি এগিয়ে যায় এবং তাঁর মাথাকে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এভাবে স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের আরো একজন বীরপুরুষ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

টীকা ঃ

(১) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, এ অধ্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে এ গ্রন্থে "রাশিয়া" ও "সোভিয়েত ইউনিয়ন" এবং "রুশ" ও "সোভিয়েত" অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে "রাশিয়া" বলতে বর্তমান "রুশ ফেডারেশন"কে নয়, বরং সাবেক "সোভিয়েত ইউনিয়ন"কেই বুঝানো হয়েছে।

(২) অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের পর রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে প্রাচ্যের জাতিসমূহের বন্ধু হিসেবে দাবী করেন এবং কম্যুনিস্ট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রটস্কি নিজে উদ্যাগী হয়ে, ইরানের সাথে জারদের স্বাক্ষরিত উপনিবেশিক চুক্তিসমূহকে সরকারীভাবে বাতিল ঘোষণা করেন। এসব পদক্ষেপ প্রথমতঃ ইরানী জনগণের নিকট কম্যুনিস্ট রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীকে মানবপ্রেমিক হিসেবে তুলে ধরে। এর ফলে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের মধ্যে আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া ঐ যুগে রুশ নেতৃবৃন্দ তখনো কম্যুনিস্ট বিশ্ববিপ্লবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন ও (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) কমিনটার্ন ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল। তৎকালীন রুশ নেতৃবৃন্দের এ মানসিকতার কারণে বৃটিশদের পক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনরূপ আপোষরফা (যা অবশ্য পরে বাস্তবে সম্ভব হয়েছিল) সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে বৃটিশরা সমস্যার একমাত্র সমাধান এটাকেই মনে করে যে, ইরানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে অন্ততঃ ইরানে রুশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রতিহত করতে হবে।

(৩) جنگلیها- – মীর্যা কুচাক খানের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধারা জঙ্গলে (বনে) ঘাঁটি তৈরী করে সেখান থেকে প্রাতিরোধ যুদ্ধ চালাতেন বিধায় সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা "জাঙ্গালী" বলে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। –অনুবাদক

(৪) کلنل محمد تقی خان پسیان

(৫) دلاوران دشتستانی

(৬) شیخ خز علی

(৭) کودتای سیاه- যেহেতু সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী তাঁর নিজস্ব কোন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে নয়, বরং ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সহযোগী হিসাবে এ ক্যু-দেতা সংঘটিত করেন বা অন্য কথায়, ইংরেজদের ঘটানো ক্যু-দেতা'য় শিখণ্ডীর ভূমিকা পালন করেন, এ কারণে এ ক্যু-দেতা'কে "কালো ক্যু-দেতা" বলা হয়।

(৮) رعد – (বজ্র)।

(৯) General Ironside. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পরও বিভিন্ন ছুতায় উপনিবেশবাদী বৃটেন ইরান থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে বিরত থাকে। ইতোমধ্যেই যেমন উল্লেখিত হয়েছে, এমনকি বৃটেন উত্তর ইরানেও তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। ইরান থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার না করার সপক্ষে যেসব বাহানার আশ্রয় নেয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল বলশেভিকবাদের বিপদ। বৃটেনের ধারণা অনুযায়ী, রুশ বিপ্লব (বলশেভিক বিপ্লব) সংঘটিত হবার পর ইরান বলশেভিকদের হুমকির সম্মুখীন ছিল। বৃটিশ বাহিনী রুশ বিপ্লবের পরে উত্তর ইরান থেকে দক্ষিণ রাশিয়ার কোন কোন এলাকায় প্রবেশ করে কম্যুনিস্ট সরকারের বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই বৃটিশ বাহিনী পুনরায় উত্তর ইরানে ফিরে আসে এবং আন্‌জালীতে (بندر انزلی – কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী বন্দর) ও রাশ্‌তে মোতায়েন হয়। রুশ সৈন্যরা দক্ষিণ রাশিয়াকে 'সরকার বিরোধী'-মুক্ত করার পর তাদের যেসব গ্রুপ পালিয়ে ইরানে এসেছিল তাদের ধাওয়া করে আন্‌জালী ও রাশ্‌তে উপনীত হয়। এমতাবস্থায় বৃটিশ বাহিনী রুশ বাহিনীর মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত শোচনীয় ও লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে শহর দু'টিকে রুশ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এ পরাজয়ের ফলে বৃটিশ বাহিনী পুরোপুরি মনোবল হারিয়ে ফেলে। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার তার এ পরাজিত বাহিনীর অধিনায়কত্বের জন্য জেনারেল আয়রনসাইড্‌কে মনোনীত করে। এ বৃটিশ জেনারেলের মূল দায়িত্ব ছিল পরাজিত বৃটিশ সৈন্যদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে এনে রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা দান এবং তাদেরকে মান্‌জিল (منجیل) এলাকা থেকে আর সামনে অগ্রসর হতে না দেয়া। জেনারেল আয়রনসাইড্ ইরানে মোতায়েনকৃত বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক পদে মনোনীত হবার পর স্বীয় তৎপরতা ও চেষ্টাসাধনা শুরু করেন। লর্ড কার্জনের নির্দেশে এবং তেহ্‌রানে নিয়োজিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত নরম্যানের সহযোগিতায় তিনিই বৃটিশদের পরিকল্পিত ক্যু-দেতা'র বাস্তব রূপায়ন ঘটান। তিনি তাঁর লিখিত 'স্মৃতি' (خاطرات) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"... খবর পেলাম যে, রেযা খান তেহ্‌রানে সাফল্যের সাথে ক্যু-দেতা সংঘটিত করেছেন।... আমার ধারণা, সারা ইরানের জনগণ এ বিশ্বাসই পোষণ করে যে, আমিই এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং পর্দার অন্তরাল থেকে এর বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান করেছি। যদি সত্য কথা লিখতে চাই ত আসলে ঘটনা ছিল এটাই।..."

এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ইরানে বৃটিশ নীতির বাস্তবায়নকারী কাজ্জাক বাহিনীর অধিনায়ক স্টারোস্‌লাস্‌কি (استاروسلسکی) এর পরিচালনায় কর্মরত যেসব সামরিক অফিসার বলশেভিক বাহিনীর সামনে টিকতে না পেরে ইংরেজদের সাথে পালিয়ে এসেছিলেন রেজা শাস্ত্-তীরী (৬০গুলী – LMG ওয়ালা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম, যিনি পরে রেযা খান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

(১০) মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। ২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাহ্‌মান (بهمن) মাস।

(১১) قزوين – তেহ্‌রান থেকে ১৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

(১২) نور من– Norman

(১৩) اسفند – ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ শে মার্চ (১৯২১)। পরবর্তী তথ্য থেকে মনে হয়, ফার্সী মাসের ১ বা দুই তারিখে (২০শে বা ২১শে ফেব্রুয়ারী) কাজ্জাক বাহিনী কায্‌ভীন থেকে রওয়ানা হয়েছিল। – অনুবাদক

(১৪) ژاندارم – Gendarme বা ژاندار مری – Gendarmerie. ইরানে এটা সাধারণ পুলিশ বাহিনী থেকে স্বতন্ত্র একটি পুলিশ বাহিনী যা সর্বদা সশস্ত্র থাকে; সাধারণতঃ মহাসড়কের নিরাপত্তা বিধান করে। – অনুবাদক

(১৫) احمد قوام – ওরফে قوام السلطنه

(১৬) پلیس جنوب – বৃটিশরা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ইরানে স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে জনশক্তি সংগ্রহ করে তাদের হাতের লাঠি হিসেবে এ বাহিনীটি তৈরী করেছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। ঐ সময় এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ইরানে রুশদের দ্বারা গঠিত কাজ্জাক বাহিনীর সাথে ভারসাম্য বিধান। কাজ্জাক বাহিনী যেভাবে উত্তর ইরানে রুশ স্বার্থ রক্ষা করত ঠিক সেভাবেই দক্ষিণ ইরানে বৃটিশ স্বার্থের হেফাজত, বিশেষতঃ পথের নিরাপত্তা বিধান করে বৃটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থের হেফাজত ও একই সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা ছিল এ বাহিনী গঠনের লক্ষ্য।

(১৭) والى – গভর্নর। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গভর্নরকে استاندار (ওস্তান্‌দর) বলা হয়। পূর্বেকার "ওয়ালী"গণের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। – অনুবাদক

(১৮) سردار معزز خان بجنوردی

(১৯) زعفران لو

(২০) شاد لو

(২১) اکراد قوچانی

(২২) جعفر آباد قوچان

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

"আমি বিপ্লবকে ইরানী জাতির বর্তমান সমস্যাবলী থেকে অনিবার্যভাবে নিরাময় ও মুক্তিলাভের একমাত্র পথ বলে মনে করি।"

- কুচাক জাঙ্গালী

মীর্যা কুচাক খান জাঙ্গালীর অভ্যুত্থান

মীর্যা বোযর্গের[১] পুত্র ইউনেস্ — যিনি "মীর্যা কুচাক"[২] নামে বিখ্যাত — ১২৯৮ হিজরী সালে[৩] রাশ্‌তে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরের শুরুতেই তিনি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে দ্বীনী ইল্‌মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি গীলানের মুক্তিকামীদের দলে যোগদান করেন এবং মোহাম্মদ আলী শাহের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে তেহরান অভিমুখে রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে রুশ চরমপত্রের ফলে মজলিস বন্ধ হয়ে যায়; এ সময় মীর্যা কুচাক খান ছিলেন চরমপত্র গ্রহণের বিরোধিতাকারীদের অন্যতম। এজন্য তাঁকে কিছুদিন আটকাবস্থায়ও কাটাতে হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকজন মজলিস সদস্য এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইরান থেকে হিজরত করেন। এ সময় মীর্যা কুচাক খান দেশের পরিস্থিতি নৈরাশ্য ব্যঞ্জক এবং দেশকে বিজাতীয়দের দখলে লক্ষ্য করে "ইসলামী ঐক্য"[৪] গড়ে তোলার চিন্তা শুরু করেন। এ চিন্তা থেকেই শেষ পর্যন্ত তিনি স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মীর্যা কুচাক খান জাঙ্গালী

মীর্যা কুচাক খান এরপর গীলানে গমন করেন এবং অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে হাত দেন। কিন্তু ইতিপূর্বে রুশরা তাঁকে ঐ এলাকা থেকে বহিষ্কার করেছিল। এ কারণে তাঁর পক্ষে গোপনে তৎপরতা চালানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও মীর্যা কুচাক খান স্বল্পকালের মধ্যেই নিজের চারদিকে বেশ কিছু সমচিন্তার লোককে জমায়েত করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন।

www.pathagar.com

"জাঙ্গালী" নামে খ্যাত মীর্যা কুচাক খানের অনুসারীরা তাঁদের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন ঃ

"আমরা সব কিছুর আগে আমাদের দেশ ইরানের স্বাধীনতা চাই; "স্বাধীনতা" কথাটির পূর্ণাঙ্গ অর্থে অর্থাৎ যে কোন বিদেশী সরকারের সামান্যতম হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আমরা দেশের মৌলিক সংস্কার চাই এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে চাই। কারণ ইরানের ওপর যত বিপর্যয়ই এসেছে সেজন্য প্রশাসনিক দুর্নীতিই দায়ী। আমরা সকল সাধারণ মুসলিম জনগণের ঐক্যের সমর্থক। এটাই হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি; এর ভিত্তিতেই আমরা সকল ইরানীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাই এবং এ কাজে তাদের সহায়তা কামনা করি।"

রাশিয়া ও বৃটেন এবং জঙ্গল আন্দোলন

বৃটিশ ও জঙ্গল আন্দোলন ঃ মীর্যা কুচাক খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত একনিষ্ঠ লোক, বিপ্লবী ও উপনিবেশবাদবিরোধী। তাঁর এ প্রকৃতির সাথে বৃটিশরা ভালভাবেই পরিচিত ছিল। এমতাবস্থায় বৃটিশদের পক্ষে জঙ্গল-আন্দোলনকে সহ্য করা বা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। এ কারণেই বৃটিশরা এ আন্দোলনকে নির্বাপিত করার জন্য সুযোগের সন্ধান করছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অব্যাহত থাকাকালে ভীষণ ব্যস্ত ও সমস্যাজর্জরিত থাকায় বৃটিশরা জাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর তারা ইরানী কাজ্জাক বাহিনীর সহায়তায় এ আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু স্বয়ং জাঙ্গালী বিপ্লবীদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি এবং কতিপয় মুনাফিকের আবির্ভাব ঘটার পূর্ব পর্যন্ত এ আন্দোলন এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সরকারী বাহিনী তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়নি।

জঙ্গল আন্দোলন ও অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ঃ জাঙ্গালীরা যখন তাঁদের অভ্যুত্থান শুরু করেন তখন রাশিয়ায় জারের শাসন চলছিল। জারের শাসনের পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জার সরকার জাঙ্গালীদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায় এবং অভ্যুত্থানকে দমনের চেষ্টা করে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের বিজয় শুরু হলে রশিয়ার সাথে জাঙ্গালীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণে জঙ্গল আন্দোলন রুশ বিপ্লবকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং রাশিয়ার নতুন নেতারাও মীর্যা কুচাক খানকে একজন উপনিবেশবাদবিরোধী বিপ্লবী হিসেবে মনে করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই রুশরা জাঙ্গালীদের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ নীতিতে পরিবর্তন সাধন করে এবং ধাপে ধাপে জাঙ্গালীদের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, শেষ পর্যন্ত তারা জাঙ্গালী আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধা করেনি।

ফার্সী ১২৯৯ সালের[৫] উর্দী ও বেহেশ্ত্ মাসে[৬] ইরানে পালিয়ে আসা রাশিয়ার বিপ্লব বিরোধীদের দমনের নাম করে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার লালফৌজ উত্তর ইরানে প্রবেশ করে অবস্থান গ্রহণ করে; তারা (বন্দর) আন্‌যালীতে ও গাযিয়ানে[৭] প্রবেশ করে। কিন্তু জাঙ্গালীরা নীতিগতভাবে ইরানের মাটিতে যে কোন বিদেশী সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধী ছিল এবং একে ইরানের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করত। এ কারণেই জাঙ্গালীরা ইরানের মাটিতে লালফৌজের অবস্থানের বিরোধিতা শুরু করে এবং লালবাহিনীর অধিনায়কের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

আন্‌যালীতে জাঙ্গালী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইসমাইল আগা জাঙ্গালী। তিনি লালফৌজের অধিনায়কের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু রুশ অধিনায়ক অন্য যেকোন কথাবার্তার আগে প্রথমেই মীর্যার

www.pathagar.com

কথা জিজ্ঞেস করে, এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এ কারণে মীর্যা কুচাক খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আন্যালী গমন করেন এবং রুশ অধিনায়কের সাথে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার দ্বিতীয় দিনে অর্জিনিক্দ্সি[৮] বাকু থেকে আনযালী এসে পৌছেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনায় দু'পক্ষের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মীর্যা কুচাক খান রাশিয়ার নতুন নেতাদেরকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান এবং অটল মনে করতেন। এ কারণে তিনি তাঁর আন্দোলনের নীতির বরখেলাফ হওয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যে লালফৌজের যে সংখ্যক সৈন্য ইরানে প্রবেশ করেছে তাদের ইরানে অবস্থানের ব্যাপারে সমঝোতাপত্রে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু রুশরা খুব শীঘ্রই প্রমাণ করে যে, তারা কখনোই কথা রক্ষা করে না; তারা কার্যতঃ সমঝোতাপত্রের ধারাগুলোকে একের পর এক পদদলিত করে।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা

রুশদের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাশ্তে ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পর সেখানে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। এ উপলক্ষ্যে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় তার শিরোনাম ছিল "জঙ্গলবাসী গেরিলাদের কণ্ঠে মযলুম ইরানের ফরিয়াদ"। এ ঘোষণাপত্রে ইরানের ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতি-অনাচার এবং ইংরেজদের অপরাধসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়। সবশেষে এ ব্যাপারে জাঙ্গালীদের অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয় ঃ

১। ইরানের লাল বিপ্লবী জনতা[৯] ইরানের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছে।

২। অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের জানমালের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।

৩। অতীতে বা সাম্প্রতিককালে যে কোন বিদেশী সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত ইরানের জন্য ক্ষতিকর যে কোন চুক্তি বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করছে।

৪। অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল গোত্র ও গোষ্ঠীকে অভিন্ন গণ্য করছে ও তাদের সকলের জন্য অভিন্ন অধিকারের সংরক্ষণের প্রবক্তা এবং এ সরকার ইসলামী নিদর্শনাদির হেফাজতকে অন্যতম অপরিহার্য দ্বীনী কর্তব্য[১০] বলে মনে করে।

হেয্বে এদালাতের[১১] লাল ক্যু-দেতা

জাঙ্গালী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাশ্ত্কে কেন্দ্র করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণার পর এ নবগঠিত প্রজাতন্ত্রকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলা ও তাকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এ মতানৈক্যের কারণেই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

রাশিয়ার লালফৌজের ইরানে প্রবেশের পর বাকু-র কম্যুনিস্ট দল হেয্বে এদালাতের কয়েকজন সদস্য রাশিয়া থেকে ইরানের গীলানে আগমন করেন। তাঁরা রাশ্তে হেয্বে এদালাত্ নামে একটি দল গঠন করেন। তাঁরা ধীরে ধীরে জনসভা অনুষ্ঠান, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি শুরু করেন এবং কার্যতঃ জাঙ্গালীদের ও রুশদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতাকে পদদলিত করেন। তাঁরা মীর্যা কুচাক খানের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

www.pathagar.com

মীর্যা কুচাক খান এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ফার্সী ১২৯৯ সালের তীর মাসে[১২] পরিকল্পিতভাবে রাশ্‌ত্‌ ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, হেয্‌বে এদালাত্‌ বেআইনী কাজকর্ম, ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং কম্যুনিজমের প্রচার বন্ধ না করা পর্যন্ত তিনি রাশ্‌তে ফিরে আসবেন না।

হেয্‌বে এদালাতের মধ্যে আহ্‌সানুল্লাহ্‌ খান ও খালু কোরবান[১৩] সহ বেশ কয়েকজন সদস্য পূর্বে মীর্যা কুচাক খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং পরে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা মীর্যাকে, তাঁদের ভাষায়, প্রতিক্রিয়াশীল বলে সমালোচনা করতে থাকেন। মীর্যা কুচাক খানের বিরুদ্ধে এঁরা সহ হেয্‌বে এদালাতের সদস্যরা পূর্ব থেকেই ক্যু-দেতার পরিকল্পনা করেছিলেন। মীর্যা রাশ্‌ত্‌ ত্যাগ করার পরপরই তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকর করার চিন্তা শুরু করেন।

ক্যু-দেতার পরিকল্পনা অনুযায়ী মীর্যাকে হত্যা বা বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তবে আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বিপ্লবের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া। মীর্যা কুচাক খান হেয্‌বে এদালাতের সদস্যদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটামুটি জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি জঙ্গলে চলে যান। এমতাবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে জাঙ্গালীদের অনেকেই নিহত বা গ্রেফতার হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

কিছুদিন পর সমাজতন্ত্রী নেতারা মীর্যার প্রতি পুনরায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। মীর্যা সব সময়ই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং সদুদ্দেশ্যের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের ফলে জাঙ্গালীদের আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাক তিনি তা চাইতেন না। তাই তিনি তাঁদের দেয়া ঐক্যের প্রস্তাব মেনে নেন এবং উভয় সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হন। আহ্‌সানুল্লাহ্‌ খান ও খালু কোরবান মীর্যার সাথে সাক্ষাতের জন্য ফুমেন্‌[১৪] গমন করেন। পারস্পরিক মান-অভিমান ও সুখ-দুঃখ বিনিময়ের পর তাঁরা এক সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করেন।

হেয্‌বে এদালাতের নেতৃবৃন্দ ও মীর্যা কুচাক খানের মধ্যে সাময়িকভাবে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পর নতুন বিপ্লবী কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এ কমিটিতে আহ্‌সানুল্লাহ খানের কোন পদ ছিল না বিধায় পদ ও খ্যাতির জন্য লালায়িত এ ব্যক্তি এক কল্পনাবিলাসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাঁর অধীনস্থ জাঙ্গালী সৈন্যদের নিয়ে তেহরান বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন।

আহ্‌সানুল্লাহ্‌ খান তাঁর অধিনায়কত্বের অধীনস্থ তিন হাজার রুশ ও ইরানী সৈন্য নিয়ে তেহ্‌রান অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু পোলে যোগাল্‌[১৫] নামক স্থানে পৌঁছার পর সায়েদুদ্দাওলাহ্‌র[১৬] নেতৃত্বাধীন কাজ্জাক সৈন্যদের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আহ্‌সানুল্লাহ্‌ খান পরাজিত হন। অবশ্য এ পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল জাঙ্গালীদের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতিতে পরিবর্তন; এ সম্পর্কে নীচে আভাস দেয়া হচ্ছে।

জাঙ্গালী আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা

ইতিপূর্বে যেমন সংক্ষেপে আভাস দেয়া হয়েছে, রুশরা প্রথমে মীর্যা কুচাক খান জাঙ্গালীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইরানে রুশ সৈন্যদের প্রবেশ এবং হেয্‌বে এদালাত্‌ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা মীর্যা ও তাঁর সহযোগীদের নিকট থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার এবং তাদের সমাজতন্ত্রী এজেন্টদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এরপর রুশরা ইরান সরকারের সাথে এক সমঝোতায়

www.pathagar.com

উপনীত হয় এবং এর ভিত্তিতে তারা জাঙ্গালীদের প্রতি তাদের সমর্থনের নীতিতে পরিবর্তন সাধন করে। তারা জাঙ্গালীদেরকে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব বলে মনে করে।

ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন দাবী করত যে, তার পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। কিন্তু অন্ততঃ সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের পর তার এ নীতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ কংগ্রেসে স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির দু'টি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এর লক্ষ্য হচ্ছে শান্তির হেফাযত এবং সকল দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্র সম্প্রসারিতকরণ।" বলা বাহুল্য যে, সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এ ঘোষণার মানে বহির্বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনসমূহের প্রতি সমর্থন বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

ইরানে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত রথ্স্টাইনের[১৭] ওপর ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর ফলে জাঙ্গালী আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা দানের ব্যাপারে ইতিপূর্বে সোভিয়েত সরকারের বহু অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করেই রাশিয়ার বিপ্লবী নীতি ইরান সরকারের সাথে আপোষের নীতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত রথ্স্টাইন মীর্যা কুচাক খান জাঙ্গালীকে পত্র লিখে তাঁর প্রতি ইরান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করে দেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত রথ্স্টাইনের পক্ষ থেকে মীর্যা কুচাক খানের বরাবরে লিখিত এ পত্র (পত্র না বলে চরমপত্র বলাই সঙ্গত) এমন এক সময় লেখা হয় যখন জাঙ্গালী আন্দোলন তার সবচেয়ে দুঃসময় ও সর্বাধিক সংকটকাল অতিক্রম করছিল। মীর্যা কুচাক খান এমন এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গৃহীত এ নতুন নীতির মুখোমুখী হন যখন বাহ্যতঃ রথ্স্টাইনের পত্রের আহ্বানে সাড়া দেয়া ছাড়া তাঁর সামনে কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। তিনি পত্র লিখে ঘোষণা করেন যে, মিঃ রথ্স্টাইনের বক্তব্যদৃষ্টে তিনি নীরবতা অবলম্বন ছাড়া কোন উপায় দেখছেন না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, মীর্যা কুচাক খান কার্যতঃ আন্দোলন থেকে হাত গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং এ কারণেই শাহাদাত বরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

আন্দোলনের পরাজয় ও মীর্যা কুচাক খানের শাহাদাত

ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, জাঙ্গালীদের আন্দোলনে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আহ্সানুল্লাহ্ খান তেহ্রান অভিযানে রওনা হয়ে পোলে যোগালের যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর খালু কোরবান সর্দার সেপাহ্ (সেনাপতি) রেযা খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর ইরান সরকারের সেনাবাহিনী রাশ্তে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় জাঙ্গালীদের সাথে সরকারী বাহিনীর আলোচনা হয়, কিন্তু আলোচনায় কোন সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকারী সৈন্যরা জাঙ্গালীদেরকে হত্যা বা গ্রেফতারের জন্য তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে।

জাঙ্গালীদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে জাঙ্গালী যোদ্ধাদের অনেকেই মনের দিক থেকে ভেঙ্গে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় ও সরকারী সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করায় তারা আরো ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে তাদের মধ্য থেকে একাংশ বিক্ষিপ্তভাবে যে যেদিকে পারে সরে যায়, আরেকাংশ আত্মসমর্পণ করে; বাকীরা নিহত হয়।

www.pathagar.com

এরূপ এক কঠিন ও মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে মীর্যা কুচাক খান প্রচণ্ড শীতের মাঝে তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গভীর জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে যাওয়া ও জঙ্গলে আত্মগোপনকারী জাঙ্গালী যোদ্ধাদের সময় সুযোগ মত ঐক্যবদ্ধ করা এবং নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কিন্তু প্রচণ্ড শীত তাঁকে সে অবকাশ দেয়নি। শীতে জমাট বেঁধে তিনি চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যান।[১৮]

দুশমনরা মীর্যা কুচাক খানের নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধার করার পর তাঁর শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কিছুদিনের জন্যে সাধারণ মানুষকে প্রদর্শনের জন্যে রেখে দেয়। এরপর ক্যু-দেতার নায়ক হিসেবে খ্যাত দু'মুখো কম্যুনিস্ট বিশ্বাসঘাতক খালু কোরবান্ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে মীর্যা কুচাক খানের মাথা নিয়ে রেযা খানকে উপহার দেন এবং এভাবে রেযা খানের প্রতি তাঁর গোলামীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

টীকা ঃ

(১) میرزا بزرگ —"বড় মীর্যা"ঃ ডাক নাম।

(২) میرزا کوچك —"ছোট মীর্যা"।

(৩) মোতাবেক ১২৫৯ ফার্সী সাল —১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

(৪) اتحاد اسلامی — সংগঠনের নাম। মীর্যা কুচাক খান বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারকের, বিশেষ করে সাইয়েদ জামালুদ্দীন হোসেনী আসাদাবাদী (যিনি জামালুদ্দীন আফগানী নামে সমধিক বিখ্যাত), সাইয়েদ আবদুর রহমান কাওয়াকেবী (سید عبد الرحمن کواکبی) শেখ মোহাম্মদ আব্দুহ্ ও রাশীদ রেযার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসব দেশের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী এবং বিজাতীয় প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা। মীর্যা কুচাক খান হিজরী ১৩৩৪ সালের শেষের দিকে মোতাবেক ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে "ইত্তহাদে ইসলামী" প্রতিষ্ঠা করেন।

(৫) মোতাবেক ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

(৬) ২১শে এপ্রিল থেকে ২১শে মে পর্যন্ত ওর্দিবেহেশ্‌ত্ মাস।

(৭) غازیان

(৮) Orginikdssi

(৯) এখানে "লাল" বলতে "কম্যুনিস্ট" নয়, বরং "রক্তদানকারী" বিপ্লবী জনতাকে বোঝানো হয়েছে।

(১০) فرایض —একবচন فرض (ফরয)।

(১১) حزب عدالت

(১২) ২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই তীর মাস। (১৯২০ খৃষ্টাব্দ)

(১৩) خالو قربان —"খালু" মানে "মামা"; সম্ভবতঃ কোন কারণে তিনি এ ডাকনামে পরিচিত হয়ে থাকবেন।

(১৪) فومن

(১৫) پل زغال

(১৬) ساعد الدوله

(১৭) روتشتین

(১৮) ফার্সী ১৩০০ সালের ১১ই অযার মোতাবেক ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

রেযা খানের ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি ও কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌র মন্ত্রিসভার পতন

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে উত্তর ইরানে তেল উত্তোলনের সুবিধা প্রদান। এতদসংক্রান্ত আলোচনা গোপনে শুরু হয়। তৎকালীন মজলিসের বেশীর ভাগ সদস্যই এতে সম্মত ছিলেন বিধায় আলোচনায় দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়। এভাবে আমেরিকাকে তেল উত্তোলনের সুবিধা প্রদানের খবর প্রকাশিত হবার পর এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে দেশটি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় সে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইতোমধ্যেই বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে সম্পদ ও সুবিধা সামগ্রিকভাবে ভাগাভাগির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখনো তা সমাপ্ত হয়নি। এ কারণে আমেরিকাকে এ সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে বৃটিশরাও বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ এভাবে আমেরিকাকে তেল উত্তোলন সুবিধা দেয়ায় রাশিয়া ও বৃটেন তাঁর বিপক্ষে চলে যায়। ফলে তাঁর অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বৃটেন কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্‌র মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছিল, কিন্তু তিনি মার্কিন স্বার্থের অনুকূল নীতি গ্রহণ করায় বৃটেন তাঁর প্রতি আর সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, বৃটিশরা তাঁর পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মুশীরুদ্দাওলাহ্‌র মন্ত্রিসভা গঠন

ফার্সী ১৩০০ সালের বাহ্মান মাসে[১] কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলে মুশীরুদ্দাওলাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। মুশীরুদ্দাওলাহ্‌র রক্ষণশীল মন্ত্রীসভায়ও রেযা খান আগের মতই যুদ্ধমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন। উল্লেখ্য, সাইয়েদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ীর নেতৃত্বে ক্যু-দেতা মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

রেযা খানের শক্তি ও প্রভাবের ফলশ্রুতিতে মুশীরুদ্দোওলাহ্‌র সরকারের কর্মপরিকল্পনায়ও ইরানের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, বরং বৃটিশদের সেবা ও স্বার্থরক্ষাই ছিল এর লক্ষ্য।

একদিকে দেশের সামগ্রিক অবস্থা ছিল চরমভাবে হতাশাব্যঞ্জক, অন্যদিকে রেযা খান সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করছিলেন।[২] এছাড়া দেশের পত্রপত্রিকাগুলো ও মজলিসের সদস্যগণ সরকারের যে সমালোচনা করছিলেন তার মোকাবিলা করার ন্যায় দৃঢ় মনোবল মুশীরুদ্দাওলাহ্‌র ছিল না। এর ফলে স্বল্পকালের ব্যবধানে ফার্সী ১৩০১ সালের খোর্দাদ মাসে[৩] তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি এতই মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, ঐ সময় আহ্মাদ শাহ্ ইউরোপে থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই মুশীরুদ্দাওলাহ্ পদত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী

মুশীরুদ্দাওলাহ্ পদত্যাগ করার পর কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অবশ্য ইতোমধ্যেই ইরানে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে তেল উত্তোলনের সুবিধা দানের ব্যাপারে বৃটিশরা সম্মতি প্রদান করে। তারা উক্ত কোম্পানীর সদস্যদের ইরানে আসার উদ্দেশ্যে দাওয়াত করার জন্য কাওয়ামকে অনুমতি দেয়। কারণ ইতিমধ্যে বৃটিশরা গোপনে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। ফলে এ কোম্পানীকে তেল উত্তোলন সুবিধা দেয়ায় কার্যতঃ বৃটিশদের স্বার্থও নিশ্চিত হয়েছিল। এ কারণে কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ এবার নির্বিঘ্নে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এছাড়া ইরানের আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে সুশৃঙ্খল ও সুস্থ করে তোলার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর একটি উপদেষ্টা-প্রতিনিধিদলকেও ইরানে আগমনের জন্য দাওয়াত করা হয়।

ফার্সী ১৩০১ সালের অযার্ মাসে[৪] মার্কিন উপদেস্টাদের ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ইরান সফরে আসেন। ডঃ মিলেস্পোর[৫] নেতৃত্বাধীনে আগত এ প্রতিনিধিদলটি দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত ইরানের রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার বিন্যাস সাধন ও পরিচালনার কাজ আঞ্জাম দেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ যুগে আমেরিকার নীতি ছিল বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও উপনিবেশবাদকবলিত জাতিসমূহের নিকট নিজেকে মানবদরদী এবং দুর্বল ও পশ্চাদপদ দেশসমূহের উন্নয়নকামী হিসেবে প্রদর্শন করে স্বীয় উপনিবেশবাদী প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য যে, কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র দাওয়াতে ইরানে আগত মার্কিন প্রতিনিধিদলও একই লক্ষ্য পোষণ করত। তাই মার্কিন উপদেষ্টাগণ ইরানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেন এবং কার্যতঃও তাঁদের চেষ্টার ফলে ইরানের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি সাধিত হয়।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ তাঁর এবারের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ও সংবাদপত্রের সমালোচনা হ্রাস করার লক্ষ্যে, সাইয়েদ যিয়াউদ্দিন তাবাতাবায়ীর নেতৃত্বে গঠিত ক্যু-দেতা সরকারের ঘোষিত সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করেন। এ পদক্ষেপ যদিও তথাকথিত স্বাধীনতার[৬] সপক্ষে একটি পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হয়, তথাপি সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে কার্যতঃ যেখানে সাধারণতঃ রেযা খানের সমালোচনা করা হত; এ পদক্ষেপের ফলে তা মোটেই হ্রাস পেলনা, বরং দিনের পর দিন রেযা খানের সমালোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি একদল মজলিস সদস্যও রেযা খানের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করেন।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ দুর্বৃত্তদের দমন এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুদ্ধমন্ত্রী রেযা খানের খেদমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মজলিস সদস্যদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কাওয়ামের এসব বক্তৃতায় কোন কাজ হল না। আয়াতুল্লাহ্ মোদার্রেস্ ১৩০১ ফার্সী সালের ১৩ই মেহের তারিখে[৭] চতুর্থ মজলিসের অধিবেশনে যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলেন ঃ "... ঘটনাক্রমে নিরাপত্তার দায়িত্ব এমন কারো হাতে যে, তার হাতে এ দায়িত্ব থাকায় আমাদের অধিকাংশই ভাগ্যবান থাকতে পারিনি। ... আপনাদের মনে কি দুর্বলতা আছে যে, এসব কথা বলছেন এবং রেখে-ঢেকে ও আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলছেন? সকলের ওপরই আমাদের[৮] ক্ষমতা আছে। আমরা রেযা খানকেও ভয় পাই না। আমাদের বাদশাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করারও ক্ষমতা আছে, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে

www.pathagar.com

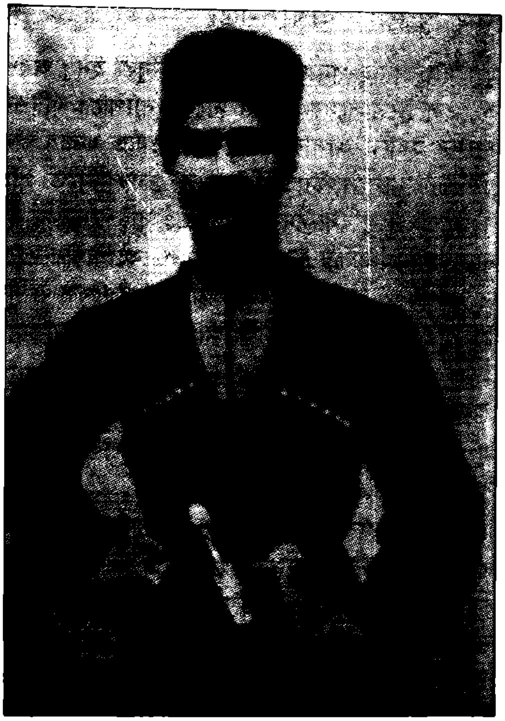
রেযা খান

ক্ষমতা থেকে নীচে নামিয়ে আনতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি, কৈফিয়ৎ তলব কতে পারি, বরখাস্ত করতে পারি। তেমনি আমরা রেযা খানের নিকটও কৈফিয়ৎ তলব করতে পারি, তাকে পদচ্যুত করে ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারি; তারপর ঘরে গিয়ে বসে থাকবে।... মজলিসের যে ক্ষমতা রয়েছে তার সামনে কোন কিছুই দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না। মজলিস সবকিছুর ওপর ক্ষমতার অধিকারী...।"

মজলিসের অভ্যন্তরে এবং জনসাধারণের মধ্যে রেযা খানের প্রতি বিরোধিতা তুঙ্গে ওঠে। একই সাথে রেযা খানের খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারী কর্মতৎপরতাও চরমে ওঠে। রেযা খান এতই সীমা অতিক্রম করে যান যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না। কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। কারণ যুদ্ধমন্ত্রী রেযা খান সারা দেশে যে তথাকথিত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বদৌলতে দেশে তাঁর ক্ষমতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং শাহ্‌ও তাঁকে অপসারণের ক্ষমতা রাখতেন না। আর শাহের সে ক্ষমতা থাকলেও বৃটিশরা এহেন পদক্ষেপ গ্রহণের বিরোধিতা করত এবং এতে শক্তহাতে বাধা দিত।

কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্ উভয়সংকটে পড়ে যান। একদিকে মজলিস সদস্যগণ, বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস ও ডঃ মোসাদ্দেক[৯] রেযা খানের বিরুদ্ধে তুমুল আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তিনি (কাওয়াম) দেখতে পান যে, তাঁর বৃটিশ প্রভুরা তাঁর চেয়েও বেশী মাত্রায় যুদ্ধমন্ত্রী রেযা খানকে সমর্থন করছেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজেকে চরম অসহায় গণ্য করেন এবং শেষ পর্যন্ত ফার্সী ১৩০১ সালের বাহ্‌মান মাসের[১০] শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন।

মোস্তুফীউল্ মামালেকের প্রধানমন্ত্রিত্ব

যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি রেযা খান ক্যু-দেতা সংগঠনের সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ দখলের জন্যে লালায়িত ছিলেন। হয়ত কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্‌র পরেই তাঁর পালা আসত। কিন্তু হঠাৎ করে কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। দেশে এক চরম উত্তেজনাকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলাকালে তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁর পদত্যাগের ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে গেল। তাই রেযা খান কাওয়ামের পদত্যাগের সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রীর পদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়া থেকে

www.pathagar.com

বিরত থাকতে বাধ্য হন। কারণ, জনসাধারণের একাংশ এবং মজলিস সদস্যদের অনেকেই রেযা খানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে পরিস্থিতি পুরোপুরি বিস্ফোরিত হত এবং দেশকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাই এহেন পরিস্থিতিতে একজন মধ্যমপন্থী লোককে প্রধানমন্ত্রী করাই ছিল সর্বোত্তম কর্মপন্থা। এ কারণে আহ্‌মাদ শাহ্ ফার্সী ১৩০১ সালের ১০ই বাহ্‌মান তারিখে[১১] মোস্তুফীউল্ মামালেক্‌কে মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দেন।

মোস্তুফীউল্ মামালেক প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হলে অনেকেই ধারণা করেন যে, যেহেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে পূর্ব-অভিজ্ঞতার অধিকারী, সেহেতু তিনি রেযা খানের খামখেয়ালীপনা ও স্বেচ্ছাচারিতার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁকে যা খুশী তা-ই করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ছিল ভুল। কারণ, না মোস্তুফীউল মামালেকের এমন ক্ষমতা ছিল, না রেযা খান এতখানি দুর্বল ছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ইচ্ছেমত চলার পথে বাধা দিতে পারতেন।

মোস্তুফীউল্ মামালেকের দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার পর এ আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, রেযা খান হয়ত তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আরো শক্তি সঞ্চয় করবেন। এ কারণে অনেক মজলিস সদস্য মোস্তুফীউল্ মামালেক্‌কে জনসেবক হিসেবে গণ্য করা সত্ত্বেও তাঁর দুর্বলতার কারণে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন। এই বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস ছিলেন অন্যতম।

আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস মোস্তুফীউল্ মামালেকের বিরোধিতা করায় কতক মজলিস সদস্য তাঁর এ ভূমিকার প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর বিরোধিতার কারণ জানতে চান। জবাবে তিনি বলেন ঃ "মোস্তুফী হচ্ছেন একটি হীরা-মণি-মুক্তাখচিত জমকালো তলোয়ারের ন্যায় যা কেবল উৎসব এবং কুর্নিশ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিনগুলোতেই ব্যবহার্য; আজকের দিনে আমাদের দেশের জন্যে ধারালো ও ইস্পাতের তৈরী তলোয়ারের প্রয়োজন। ..."

ইরানের চতুর্থ মজলিসের মেয়াদ যখন প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসে তখন আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেসের পক্ষ থেকে মজলিসে প্রধানমন্ত্রী মোস্তুফীউল্ মামালেকের নিকট কৈফিয়ৎ তলবসহ তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ফার্সী ১৩০২ সালের ২১শে খোরদাদ তারিখে[১২] মোস্তুফীউল মামালেক প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তেফা প্রদান করেন।

শাহের অভিষেক বার্ষিকী অনুষ্ঠানে রেযা খানের শক্তির মহড়া

বলা বাহুল্য যে, ইরানে বৃটিশ স্বার্থের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই বৃটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী রেযা খানের অধিনায়কত্বে ইরানী সেনাবাহিনীকে দ্রুত শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু এজন্যে ইরান সরকারের বাজেটে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও মজলিসের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে রেযা খান গায়ের জোরে সরকারের নিকট থেকে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্যে ব্যয় করতে থাকেন। আর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক, সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার ওপর কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্, মুশীরুদ্দাওলাহ্ ও মোস্তুফীউল মামলোকের সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এজন্যে দেদার অর্থ ব্যয়ে সম্মতি দেন। ফলে ইরানী সশস্ত্র বাহিনীর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। একই সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, যুদ্ধমন্ত্রী ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠক হিসেবে রেযা খানের প্রভাব, শক্তি ও দাপট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

রেযা খান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হন এবং বিরোধীদের সামনে নিজের ও তাঁর অধিনায়কত্বাধীন সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের পর্যায়ে উপনীত হন। তিনি শক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর বিরোধীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন। তদনুযায়ী, কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র পদত্যাগের প্রায় দুই মাস পূর্বে ফার্সী ১৩০২ সালের ২৪শে ফার্ভার্দীন তারিখে[১৩] আহ্মাদ শাহের অভিষেক অনুষ্ঠানের বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে রেযা খান তাঁর বিরোধীদেরকে, এমন কি শাহ্কেও, তাঁর শক্তিমান অস্তিত্ব আরো বেশী মাত্রায় প্রদর্শনের জন্য মোক্ষম স্থান ও কাল হিসেবে বেছে নেন।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শাহের অভিষেক বার্ষিকীতে উৎসব পালন করা হত। এবার এ উৎসব উপলক্ষে রেযা খানের নির্দেশে সামরিক প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিরাট ও জমকালো সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। শাহ্ ও অন্য সকলে এ কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন।

জনসাধারণের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপক সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দু' ধরনের হওয়া সম্ভব ছিল। যেসব সাধারণ মানুষ শক্তিশালী ইরানী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পিছনে রেযা খানের উদ্দেশ্য কি ছিল সে সম্পর্ক কিছুই জানত না শেষ পর্যন্ত ইরান একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর অধিকারী হতে পেরেছে দেখে তাদের পক্ষে আনন্দিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা রেযা খানের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি এবং শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের পিছনে তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধমন্ত্রী রেযা খানের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং আগের ন্যায়ই যতখানি সম্ভব তাঁর শক্তি বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে মুশীরুদ্দাওলাহ্ ঃ রেযা খানের প্রতিক্রিয়া

মোস্তুফীউল্ মামালেক প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তেফা দেয়ার পর মজলিসে রেযা খানের বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যকার ভাগাভাগি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রেযা খানের বিরোধীরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন যিনি রেযা খানের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হবেন। অন্যদিকে রেযা খানের সমর্থকরা এ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন যে, মোস্তুফীউল্ মামালেকের পদত্যাগের পরে রেযা খানকেই প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হোক।

এ অবস্থায় আহ্মাদ শাহ্ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। শাহ্ মনে মনে রেযা খানকে ভয় করতেন এবং তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। একদিকে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্যে বৃটিশ দূতাবাস থেকে কঠোরভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়, অন্যদিকে বাইরে রেযা খানের সমর্থকরা সাধারণ গণমানুষের মধ্যে এ মর্মে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে থাকেন যে, ইরানের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে সুশৃঙ্খল করার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছেন রেযা খান, অতএব তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা উচিত।

এ ধরনের চাপ ও প্রচার সত্ত্বেও আহ্মাদ শাহ্ রেযা খান ছাড়া অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হবার উপযুক্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি হিসেবে মুশীরুদ্দাওলাহ্র চেয়ে উপযুক্ত কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

www.pathagar.com

যদিও মুশীরুদ্দাওলাহ্ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় রেযা খানের জন্যে তা অন্তর্জ্বালার কারণ হয় এবং তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ও সুস্পষ্ট ভাষায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তথাপি মুশীরুদ্দাওলাহ্র প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভই রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্যে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কারণ, মুশীরুদ্দাওলাহ্ যে রেযা খানকে মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা রাখতেন না এবং তাঁর (রেযা খানের) কাজকর্ম সহ্য করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না, অতএব, প্রধানমন্ত্রী পদে দীর্ঘদিন টিকে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না– এসব বিষয় ছিল খুবই সুস্পষ্ট।

মুশীরুদ্দাওলাহ্ ফার্সী ১৩০২ সালের ২৪শে খোর্‌দাদ[১৪] অর্থাৎ মোস্তফীউল্ মামালেকের পদত্যাগের তিনদিন পর আহমদ শাহ্ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত হন। রেযা খান শাহের এ সিদ্ধান্তে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং অত্যন্ত রুক্ষ ও কর্কশ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অবশ্য তাঁকে আগের মতই যুদ্ধমন্ত্রীর পদে রাখা হয়। এ সত্ত্বেও তিনি রাগ করে কয়েক দিন পর্যন্ত এ পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বিরাট ভুল করেছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, পঞ্চম মজলিস নির্বাচন সামনে থাকা অবস্থায় তিনি যদি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী যুদ্ধমন্ত্রীর পদ নিয়ে ময়দানে উপস্থিত না থাকেন তাহলে নির্বাচনকে তাঁর স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন না। এ কারণে মন্ত্রিসভা গঠনের চারদিন পর তিনি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে হাজির হন এবং মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন।

রেযা খান এবার প্রধানমন্ত্রীর পতন ঘটানো এবং তাঁর পদ দখল করার জন্যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি গোপনে মুশীরুদ্দাওলাহ্কে এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রীকে হুমকি প্রদান করলেন। শেষ পর্যন্ত মুশীরুদ্দাওলাহ্র নবগঠিত সরকার মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় ফার্সী ১৩০২ সালের ২৯শে মেহের্[১৫] পদত্যাগ করে।

রেযা খান ধারণা করেছিলেন যে, মুশীরুদ্দাওলাহ্র পদত্যাগের পর শাহ্ আরেকবার কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ কারণে রেযা খান কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্কে দেশ থেকে নির্বাসিত করানোর ষড়যন্ত্র করেন। তিনি কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্র বিরুদ্ধে এ মর্মে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তিনি (কাওয়াম) রেযা খানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এভাবে কাওয়ামকে দেশ থেকে নির্বাসিত করার আদেশে স্বাক্ষর করতে শাহ্কে বাধ্য করেন।

রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব

একদিকে মুশীরুদ্দাওলাহ্ প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন, অন্যদিকে রেযা খান ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা অভিযোগে কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্কে দেশ থেকে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা করলেন। পাশাপাশি রেযা খানের সমর্থকরা তাঁর পক্ষে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত রাখেন এবং তাঁকে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের জন্য দাবী তোলেন।

এ পরিস্থিতিতে আহ্‌মাদ শাহ্ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি রেযা খানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত ছিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা ছাড়া শাহের জন্য গত্যন্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত আহ্‌মাদ শাহ্ ফার্সী ১৩০২ সালের তেসরা অবান্[১৬] তারিখে রেযা খানকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং কয়েকদিন পর তিনি ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেন। এভাবে তিনি কার্যতঃ দেশটাকে রেযা খানের হাতে সমর্পণ করে দেন।

www.pathagar.com

রেযা খানের প্রজাতন্ত্র

রেযা খান তাঁর উপনিবেশবাদী বৃটিশ প্রভুদের পথনির্দেশ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত ইরানের প্রধানমন্ত্রিত্ব দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু রেযা খানের ক্ষমতা-পিপাসা প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বারা যেমন তৃপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না, তেমনি ইরানে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তির লক্ষ্যও এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং রেযা খান ও বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ইরানের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। কিন্তু রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের শুরুতেই ইরানের রাজশক্তিতে পরিবর্তন সাধন এবং কাজার বংশের পরিবর্তে পাহ্‌লভী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উপস্থাপন করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, সেক্ষেত্রে দেশবাসীর মধ্য থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি হত। তাই কাজার রাজবংশের বিলুপ্তির জন্যে জনমত তৈরীর লক্ষ্যে প্রথমে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্লোগান তোলা হয়।

রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাছাকাছি সময়ে তুরস্কের পার্লামেন্ট সেখানকার রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। রেযা খানের সমর্থকরা এ ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযান শুরু করেন। রেযা খানের ইঙ্গিতে তাঁরা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকেন এবং ইরানেও তুরস্কের অনুরূপ প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী তুলতে থাকেন।

ইরানের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন এবং কাজার রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ব্যবহারযোগ্য সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল মজলিস। রেযা খান মজলিসের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারলে তাঁর এসব পদক্ষেপকে তিনি বাহ্যতঃ আইনসঙ্গত হিসেবে দেখাতে পারতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল এই যে, চতুর্থ মজলিসের মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় রেযা খান অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে পঞ্চম মজলিসের নির্বাচন ঘোষণা করেন। তাঁর সমর্থক প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন সে লক্ষ্যে তিনি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবকে পুরোপুরি কাজে লাগান।

খুব তাড়াহুড়া করে ইরানের পঞ্চম মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফার্সী ১৩০২ সালের ২২শে বাহ্‌মান[১৭] আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চম মজলিসের উদ্বোধন করা হয়। যদিও প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি রেযা খান তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেছিলেন যাতে তাঁর বিরোধীরা নির্বাচিত হতে না পারেন, তথাপি তাঁর ইচ্ছার বাইরে তাঁর বিরোধী অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েক ব্যক্তি মজলিস সদস্য নির্বাচিত হন। আর এই গুটিকয় ব্যক্তিই রেযা খানের মতলব হাসিলের পথে সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান। এই গুটিকয় ব্যক্তির মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন শহীদ আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেস।

আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেস

স্বৈরাচারী রেযা খানের বিরুদ্ধে শহীদ আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেসের সংগ্রামের ওপর আলোকপাত করার পূর্বে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী এ বিপ্লবী আলেমের গোটা জীবনের ওপর অতি সংক্ষেপে হলেও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

এই জনসেবক ব্যক্তিত্ব কখনোই স্বৈরাচার ও উপনিবেশিক শক্তির নিকট নতি স্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী রেযা খানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ সবচেয়ে বড় বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব যিনি

www.pathagar.com

সূচনাতেই বৃটিশ এজেন্ট রেযা খানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে এবং তাঁর দূরপ্রসারী লক্ষ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

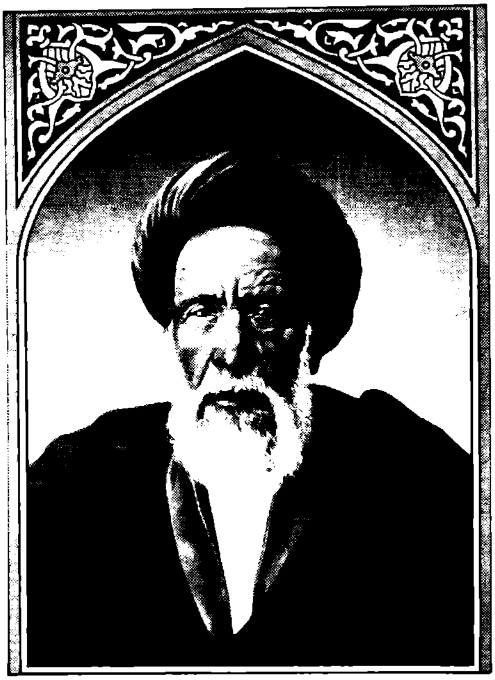

আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ হাসান মোদার্‌রেস্

শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ হাসান মোদার্‌রেস হিজরী ১২৮৭ সালে[১৮] ইরানের আর্দেস্তান[১৯] এলাকার সারাবেহ্[২০] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র আলেম। এ কারণে তাঁদেরকে খুব কষ্টকর জীবন যাপন করতে হয়। ষোল বছর বয়সে মোদর্‌রেস ইস্‌ফাহান গমন করেন এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে প্রস্তুতি পর্যায়ের দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি ইস্‌ফাহানের শ্রেষ্ঠ দ্বীনী শিক্ষকগণের নিকট জ্ঞানচর্চা করেন। ইস্‌ফাহানে পড়াশুনা সমাপ্ত করে তিনি নাজাফ গমন করেন। সেখানে তিনি আয়াতুল্লাহ্ মীর্যা শীরাযীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। নাজাফে থাকাকালে মোদার্‌রেস দ্বীনী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন; এভাবে তিনি জীবন ধারণের জন্য অর্থোপার্জন করতেন।

মোদাররেস নাজাফে পড়াশুনা করে মুজতাহিদ পর্যায়ে উন্নীত হন। এরপর তিনি পুনরায় ইস্‌ফাহানে ফিরে আসেন। তাঁর সাদাসিধা ও অতি সাধারণ জীবন যাপন ইস্‌ফাহানের জনগণকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে এবং সকলে তাঁর চারপাশে সমবেত হতে থাকে।

সাংবিধানিক বিপ্লবীদের দ্বারা তেহরান বিজিত হবার ও মোহাম্মদ আলী শাহের পতনের পর বাখ্‌তিয়ারী গণযোদ্ধারা ইস্‌ফাহানে ফিরে আসে। এরপর তারা সাম্‌সামুস্ সাল্‌তানাহ্‌র নেতৃত্বে প্রাদেশিক সমিতি গঠন করে। কিন্তু সাম্‌সামুস্ সাল্‌তানাহ্ বাখ্‌তিয়ারী একদিকে ছিলেন ধনী সামন্ত জমিদার, অন্যদিকে ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর কোন অঙ্গীকার ছিল না, বরং তিনি ছিলেন বল্গাহারা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। একারণে খুব শীঘ্রই মোদার্‌রেস তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন। বাখ্‌তিয়ারী সামন্ত সাম্‌সামুস সালতানাহ্‌র বিরুদ্ধে মোদার্‌রেসের সংগ্রাম চরমে উপনীত হলে এই বিরাট আলেম-ব্যক্তিত্বকে ইস্‌ফাহান থেকে বহিষ্কার ও অন্যত্র নির্বাসিত করার আদেশ দেয়া হয়।

আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস ইস্‌ফাহান থেকে তাঁর বহিষ্কারের সংবাদ পাবার পর তাঁর পা থেকে জুতা খুলে বগলে নিয়ে ঘোড়সওয়ার বাখ্‌তিয়ারী যোদ্ধাদের সামনে দিয়ে ইস্‌ফাহান থেকে বেরিয়ে যান।

www.pathagar.com

মোদার্‌রেসের বহিষ্কার ও নির্বাসনের পর ইস্‌ফাহানের জনসাধারণ সাম্‌সামুস্‌ সাল্‌তানাহ্‌র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মোদার্‌রেসকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বিশেষ করে শহরের ওলামায়ে কেরাম মোদার্‌রেসের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মিছিল করে তাঁর নির্বাসনস্থলের দিকে রওনা হন। এমতাবস্থায় সাম্‌সামুস্‌ সাল্‌তানাহ্‌ মোদার্‌রেসকে ইস্‌ফাহানে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন।

মোদার্‌রেস নির্বাসন থেকে ইস্‌ফাহানে ফিরে আসার পর তাঁর বিরোধীরা তাঁকে আকস্মিক গুপ্ত হামলার মাধ্যমে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। কারণ, তাঁকে লক্ষ্য করে যে গুলী বর্ষণ করা হয় তা তাঁর গায়ে লাগেনি।

আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেস সাম্‌সামুস্‌ সাল্‌তানাহ্‌র স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ক্রমেই তাঁর আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠ ইরানের অধিকাংশ শহরে ছড়িয়ে পড়ে। নাজাফে অবস্থানরত ওলামায়ে কেরাম পূর্ব থেকেই মোদার্‌রেসের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। এবার তাঁরা তাঁকে সংবিধানের সম্পূরক ধারা অনুযায়ী মজলিসের প্রণীত আইন-কানুন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ইসলামসম্মত কিনা তা তদারক করার ও সে সম্পর্কে রায় দেয়ার জন্য প্রথম কাতারের মুজতাহিদ হিসেবে নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করে তেহরানে প্রেরণ করেন। তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ মজলিসেও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য হন। এরপর, ওপরে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, রেযা খানের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও মোদার্‌রেস পঞ্চম মজলিসেও তেহ্‌রান থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে মজলিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। পঞ্চম মজলিসে তিনি স্বৈরাচারী রেযা খানের বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রাম শুরু করেন।

মোদার্‌রেস ও রেযা খানের প্রজাতন্ত্র

ইরানের পঞ্চম জাতীয় মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। রেযা খান তাঁর পদ ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে এবং কারচুপির আশ্রয় নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকজন সমর্থককে মজলিসের সদস্য পদে নির্বাচিত করিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেস রেযা খানের কুমতলব সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাই তিনি রেযা খানের তাবেদারদের মজলিসে প্রবেশ রোধের লক্ষ্যে তাঁদের নির্বাচনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মোদার্‌রেস রেযা খানের তাঁবেদারদের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং মজলিসের অধিবেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভষণ দিলেন। তিনি রেযা খানের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেন। মজলিস সদস্যগণ তাঁর ভাষণের দ্বারা প্রভাবিত হলেন এবং নূরীযাদেহ্‌[২১] ও আলী দাশ্‌তী[২২]সহ রেযা খানের অনুসারী বেশ কয়েকজনের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা মজলিসে প্রত্যাখ্যাত হল।

এরপর মজলিসের অধিবেশনে রেযা খানের পক্ষ থেকে ইরানকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে রেযা খানের অনুগত মজলিস সদস্য তাদাইয়্যোন্‌[২৩] বিলটি পাশ করিয়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। অন্যদিকে মোদার্‌রেস এ প্রজাতান্ত্রিক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই অবগত ছিলেন। একারণে তিনি বিলটির বিরোধিতা শুরু করেন এবং সকল বিরোধিতাকারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২৪]

মোদার্‌রেস রেযা খানের উত্থাপিত প্রজাতান্ত্রিক প্রস্তাবের স্বরূপ ফাঁস করে দেয়ায় মজলিসের সদস্যদের মধ্যে রেযা খানের তাঁবেদাররা তাঁর (মোদার্‌রেসের) বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একদিন

www.pathagar.com

মজলিসের অধিবেশনের বিরতির সময় মোদার্‌রেস যখন বিশ্রামকক্ষে অবস্থান করছিলেন তখন তাদাইয়্যেনের উস্কানিতে বাহ্‌রামী[২৫] নামে একজন সদস্য উত্তেজিত হয়ে মোদার্‌রেসের কানের ওপর সজোরে চপেটাঘাত করেন।

উক্ত মজলিস সদস্যের এ নির্বুদ্ধিতাসুলভ কাজের প্রতিক্রিয়া স্বয়ং রেযা খানের বিপক্ষে চলে যায়। মোদার্‌রেসকে চড় মারার খবর ছড়িয়ে পড়লে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলে রেযা খানের প্রজাতন্ত্র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং চরমে উপনীত হয়।

ফার্সী ১৩০২ সালের ২৮শে এস্‌ফান্দ তারিখে[২৬] তেহ্‌রানের মসজিদে শাহে (বর্তমানে যার নাম মসজিদে ইমাম খোমেনী) হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। তারা রেযা খানের প্রস্তাবিত প্রজাতন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা প্রদর্শন করে। তেহ্‌রানের ওলামায়ে কেরাম ও তাঁদের মধ্যমণি হিসেবে আয়াতুল্লাহ্‌ মোদার্‌রেস এ গণপ্রতিবাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। পরদিন আরো বেশি সংখ্যক লোক প্রজাতন্ত্র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে মজলিসে গমন করে এবং মজলিস সদস্যদেরকে প্রজাতন্ত্র প্রস্তাবের প্রতি তাদের বিরোধিতার কথা জানিয়ে দেয়।

জনগণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সত্ত্বেও রেযা খান ও তাঁর অনুগত মজলিস সদস্যগণ ইরানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার প্রস্তুতি অব্যাহত রাখেন। ফার্সী ১৩০৩ সালের ২রা ফার্‌ভার্‌দীন[২৭] রেযা খানের ইচ্ছা পূরণ তথা ইরানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়। এ কথা জানার পর হাজার হাজার মানুষ মজলিস ভবনের চারদিকে এসে জমায়েত হয় এবং রেযা খানের প্রজাতন্ত্র প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এ সময় রেযা খান মজলিসের অধিবেশনে অংশ গ্রহণের জন্য রওনা হন এবং মজলিসের নিকটে এসেই বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখীন হন। রেযা খানের নির্দেশে কাজ্জাক সৈন্যরা জনতার ওপর হামলা চালায়। তারা বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রহার করে এবং তাদের প্রতি গুলীবর্ষণ করে।

রেযা খান জনতার ওপরে হামলা চালানোর জন্য কাজ্জাক সৈন্যদের নির্দেশ দেয়ায় মজলিস সদস্যগণ তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। মজলিসের সভাপতি (স্পীকার) হুমকি দেন ঃ "আমাদেরকে এখানে বসেই রেযা খান সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

অন্যদিকে কোমের শীর্ষস্থানীয় মারজা'গণও প্রস্তাবিত প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি রেযা খান তাঁর প্রজাতন্ত্র প্রস্তাব নিয়ে জনসাধারণ এবং মারজা'গণের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। অন্যদিকে প্রতিবাদী মজলিস সদস্যগণ তাঁর বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব ও তাঁকে অপসারণের হুমকি দেন। সব মিলিয়ে তিনি পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল দেখতে পেলেন। এমতাবস্থায় রেযা খান ঘোষণা করলেন ঃ "দেশবাসী যখন প্রজাতন্ত্র চায় না তখন আমিও এ থেকে বিরত থাকছি।"

মজলিসের প্রতি আহ্‌মাদ শাহের টেলিগ্রাম ও রেযা খানকে অনাস্থা দেয়ার আহ্বান

এভাবে প্রজাতন্ত্র প্রস্তাব পাশ করানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে রেযা খান যখন সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করেন, আহ্‌মাদ শাহ্‌ তখন ইউরোপ সফরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি মজলিস বরাবরে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। এতে তিনি রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব অব্যাহত রাখা না-রাখা সম্বন্ধে

www.pathagar.com

মতামত দেয়ার জন্য মজলিসের প্রতি আহ্বান জানান। কার্যতঃ এটা ছিল রেযা খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেয়ার আহ্বান। অন্যথায় স্বয়ং মজলিস সদস্যরাই আস্থা যাচাই করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন।

বলা বাহুল্য যে, রেযা খান ছিলেন বৃটিশদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রধানমন্ত্রী। আসলে তাঁর ক্ষমতার কোন গণভিত্তি ছিল না। রেযা খান লক্ষ্য করলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী জনসাধারণ ও মজলিস সদস্যদের মধ্যে তাঁর অবস্থানকে খুবই দুর্বল করে ফেলেছে। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, এ অবস্থায় মজলিসে তাঁর সম্পর্কে আস্থা যাচাই করা হলে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব অব্যাহত থাকার সপক্ষে মজলিস সদস্যগণ রায় দেবেন না। এ কারণে তিনি এক অপকৌশলের আশ্রয় নিলেন।

মজলিসের অধিবেশনে রেযা খানের প্রধানমন্ত্রিত্ব অব্যাহত রাখা না-রাখা সংক্রান্ত আস্থা যাচাই প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পূর্বেই ফার্সী ১৩০৩ সালের ১৮ই ফার্ভার্দীন[২৮] রেযা খান "রাগ করে" (?) তেহরান ছেড়ে দামাভান্দের[২৯] সন্নিকটে রুদাহান[৩০] গ্রামে চলে যান। তাঁর "রাগ করার" অজুহাতটি ছিল এই যে, তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এত কষ্ট করছেন, অথচ তাঁর এ পরিশ্রমের কোন স্বীকৃতি নেই।

রেযা খান তেহরান ছেড়ে চলে যাবার পর বৃটেন এবং রেযা খানের দেশী অনুচররা তাঁর জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করে।

বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ও তার তাঁবেদারদের উদ্দেশ্য ছিল মজলিসের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং রেযা খানকে প্রধানমন্ত্রিত্বে বহাল রাখার সপক্ষে রায় দিতে মজলিসকে বাধ্য করা। দেশবাসী রেযা খানকে যথার্থভাবেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু বৃটিশদের অনুচররা তাঁর সপক্ষে প্রচার চালিয়ে তাঁকে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মূল নায়ক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। রেযা খানের সমর্থকরা প্রচার করতে থাকে যে, তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলে সামাজিক নিরাপত্তা বিনষ্ট হবে। আর তাদের এ প্রচার ও গুজব অন্ততঃ কিছু লোকের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। রেযা খানের সমর্থক দৈনিক পত্রিকাগুলো এই বলে বিলাপ করতে শুরু করে যে, অতঃপর দুর্বৃত্তরা নতুন করে দুর্বৃত্তপনা শুরু করবে এবং শহরগুলোতে ও পথে-ঘাটে আর নিরাপত্তা থাকবে না।

একদিকে এভাবে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে হৈচৈ শুরু হল, অন্যদিকে বিভিন্ন শহরে সেনাবাহিনীর স্থানীয় অধিনায়কদের নিকট গোপনে একটি লেখা পাঠানো হয় এবং ঐ লেখাকে টেলিগ্রাম হিসেবে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁরা নির্দেশমত একই ভাষায় সকল শহর থেকে মজলিস বরাবরে টেলিগ্রাম পাঠান। এসব টেলিগ্রামে রেযা খানের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়।

দেশের বিভিন্ন শহর থেকে রেযা খানের তাবেদারদের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে টেলিগ্রাম প্রেরণের পাশাপাশি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তাঁর অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচার অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে কাজ্জাক বাহিনী মজলিস ভবনের সামনে সশস্ত্র অবস্থায় কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করতে থাকে। আসলে এটা ছিল মজলিস সদস্যদের প্রতি এক পরোক্ষ হুমকি এবং তাঁদের ওপর যত বেশী সম্ভব চাপ সৃষ্টির অপপ্রয়াস।

অবশেষে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ও তাদের দেশী এজেন্টদের প্রচেষ্টা সফল হল। ফার্সী ১৩০৩ সালের ২২শে ফার্ভার্দীন[৩১] মজলিস রেযা খানের প্রতি আস্থা ভোট প্রদান করল এবং তিনি পুনর্বার মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু এ আস্থা যাচাইয়ের দিন আয়াতুল্লাহ্ মোদার্রেস মজলিসে

www.pathagar.com

হাজির ছিলেন না। কারণ, রেযা খান অত্যন্ত কৌশলের সাথে তাঁকে ঐ দিন মজলিসে হাজির হওয়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। তাঁকে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে দাওয়াত করা হয় এবং বেশ কয়েক ঘন্টা তাঁকে কাওয়ামুদ্দাওলাহ্‌র বাড়ীতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। এভাবে তাঁকে মজলিসের ঐ অধিবেশনে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া হয়।

এ সময় রেযা খানের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি এবং তাঁকে ইরানের জাতীয় হিরো হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃটিশরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালায়। এমনকি এ লক্ষ্যে বৃটিশরা ইরানের খুজিস্তান প্রদেশে তাদের এজেন্ট শেখ্ খাজ্ আলীকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেনি।

বৃটিশরা শেখ খাজ্ আলীকে ইরানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দেয়। এরপর তাদেরই নির্দেশে রেযা খান তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রেযা খান শেখ খাজ্ আলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে বৃটিশরা তাঁর ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং তাঁকে রেযা খানের নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়।[৩২] শেখ খাজ্ আলীও নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, শেখ খাজ্ আলী যে বৃটিশদের তাবেদার ছিলেন তা কারো নিকট গোপন ছিল না। এ কারণে রেযা খান যখন তাঁকে দমন করলেন তখন জনমনে ধারণা সৃষ্টি হল যে, নিঃসন্দেহে রেযা খান বৃটিশদের বিরোধী হবেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, বৃটিশরা এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রেযা খানকে ইরানের শাহের আসনে বসানোর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করছিল।

টীকা ঃ

(১) বাহ্‌মান মাস ঃ ২১শে জানুয়ারী– ১৯শে ফেব্রুয়ারী। (১৯২২ খৃষ্টাব্দ)

(২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সময় কোন কোন সংবাদপত্র রেযা খানের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করছিল। তাই তিনি মুশীরুদ্দাওলাহ্‌কে সুস্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেন যে, এসব পত্রিকার সমালোচনা বন্ধের ব্যবস্থা করতে না পারলে তাঁকে দরবারে প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেবেন।

(৩) খোর্‌দাদ মাস ঃ ২২শে মে– ২১শে জুন। (১৯২২ খৃষ্টাব্দ)।

(৪) অযার্ মাস ঃ ২২শে নভেম্বর– ২১শে ডিসেম্বর। (১৯২২ খৃষ্টাব্দ)।

(৫) دکتر میلسپو

(৬) এখানে "তথাকথিত স্বাধীনতা" বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সামরিক শাসন, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র নির্বিশেষে মানব রচিত যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ই স্বাধীনতার শ্লোগান একটি প্রতারণামাত্র। কেননা, সর্বাবস্থায় সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশের, প্রধানতঃ পুঁজিপতিদের বা সামরিক নায়কদের অথবা বাহিঃশক্তির ইচ্ছায় দেশের সকল কাজকর্ম পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এরাই স্বাধীন; সাধারণ মানুষের প্রকৃত অর্থে কোন স্বাধীনতা থাকে না এবং এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় স্থানান্তরের ফলেও এ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে না। ইরানেও সে অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল: সামরিক শাসন বাতিলের ঘোষণা দেয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থায় বা পূর্বের ও পরের ক্ষমতা-বলয়ে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। –অনুবাদক।

(৭) ৫ই অক্টোবর ১৯২২ খৃষ্টাব্দ।

(৮) অর্থাৎ মজলিস সদস্যদের।

(৯) دکتر مصدق-—— তিনি পরে ইরানের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর সময় (১৯৫৩ সালে) ইরানে তেল জাতীয়করণ করা হয়েছিল।

(১০) বাহ্‌মান মাস ঃ ২২শে জানুয়ারী ——১৯শে ফেব্রুয়ারী। (১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)। পরবর্তী তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, জানুয়ারী মাস সমাপ্ত হবার পূর্বেই কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্ পদত্যাগ করেন। —— অনুবাদক

www.pathagar.com

(১১) মোতাবেক ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১২) মোতাবেক ১১ই জুন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৩) মোতাবেক ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৪) মোতাবেক ১৪ই জুন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৫) মোতাবেক ২১শে অক্টোবর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৬) মোতাবেক ২৫শে অক্টোবর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) মোতাবেক ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

(১৮) মোতাবেক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

(১৯) اردستان — ইস্‌ফাহান প্রদেশের একটি জিলা।

(২০) سرایه

(২১) نوری زاده

(২২) علی دشتی

(২৩) تدین

(২৪) এখানে বিপ্লবী মুজতাহিদ আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দান, অন্য কথায় রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখার প্রচেষ্টা চালানোয় অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এখানে প্রথমেই নীতিগতভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নবী-রসূল বা নায়েবে রসূলের শাসন তথা ইসলামী হুকুমত ছাড়া অন্য কোন শাসন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা নেই। অতএব, এর বিপরীতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বা অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি কাম্য সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকা অবস্থায় বিভিন্ন মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বরং বাস্তব অবস্থার আলোকে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জনস্বার্থের আলোকে তথা শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগী ও তাদের দুশমনদের চরিত্র বিচার করে সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে দৃষ্টিতে মোদার্‌রেস অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে ইরানের তৎকালীন মজলিস সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল যার শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করারও অধিকার ছিল। দ্বিতীয়তঃ সংবিধান অনুযায়ী মজলিসকে ইসলাম বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রাখার সুযোগ ছিল। তৃতীয়তঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আহ্‌মাদ শাহ্ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন যদিও তাঁর সাংবিধানিক ও কার্যতঃ ক্ষমতা উভয়ই ছিল খুবই সীমিত। এর বিপরীতে বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে রেযা খান যে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন তার উদ্দেশ্য ছিল ইরানে বৃটেনের অবৈধ স্বার্থের সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের সর্বময় ক্ষমতা বৃটিশদের এজেন্ট রেযা খানের হাতে কুক্ষিগত করা। এমতাবস্থায় কথিত প্রজাতন্ত্র ছিল ইরানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বৃটিশদের পদতলে বিসর্জন দেয়ারই নামান্তর। – অনুবাদক

(২৫) بهرامی

(২৬) মোতাবেক ১৯শে মার্চ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

(২৭) মোতাবেক ২২শে মার্চ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

(২৮) মোতাবেক ৭ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

(২৯) دماوند - তেহ্‌রান থেকে সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পার্বত্য জিলা।

(৩০) رودهن

(৩১) মোতাবেক ১১ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

(৩২) পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ ধরনের পাতানো খেলার মঞ্চায়নকে একটি স্থায়ী নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। তাই এ ধরনের বহু ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

অক্টোবর বিপ্লবের পরে রুশদের ইরান-নীতি

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের সাফল্য ও ক্ষমতা লাভের পর ইরান থেকে রুশ বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেন। একই সাথে তাঁরা জারের আমলে ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া চুক্তিগুলো বাতিল ঘোষণা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, তাঁরা ইরান সম্পর্কে জার আমলের রুশ-নীতির নিন্দা করছেন এবং ইরানের সাথে নতুন করে বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাচ্ছেন।

প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল যে, বলশেভিকদের ঘোষিত এ মানবতাবাদী ঘোষণার ব্যাপারে তাঁরা আন্তরিক। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, রাশিয়ার নতুন নেতারাও ইরানকে তাঁদের প্রাচ্যভূমিতে উপনীত হবার সেতু স্বরূপ মনে করতেন। অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা জারদের ইরান-নীতির ওপরে যে আলোকপাত করেছি তার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, জার শাসিত ও কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার ইরান বিষয়ক দৃষ্টিকোণের মধ্যে বড়জোর একটা পার্থক্য ছিল, তা হচ্ছে ঃ দৃশ্যতঃ রুশ বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জারদের ন্যায় ইরানকে উপনিবেশে পরিণত করার লক্ষ্য পোষণ করতেন না, বরং তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যে কম্যুনিস্ট বিপ্লব রফতানী করা এবং বঞ্চিত জনতার মুক্তিসাধন। অপরদিকে জারদের আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট; এতে কোন রাখঢাক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইরানে জার শাসিত রাশিয়ার যে লক্ষ্য ছিল কম্যুনিস্ট রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বিপ্লবের নাম ব্যবহার করা হত মূলতঃ সেই একই লক্ষ্য হাসিলের জন্য। অন্য কথায়, বিপ্লবের আবরণে তাঁরা জারদেরই ন্যায় অভিন্ন লক্ষ্য হাসিল করতে চাচ্ছিলেন। ইরানের বহু ঘটনার ক্ষেত্রে রুশদের নীতি-অবস্থান, বিশেষ করে রেযা খানের হুকুমতকে স্বীকৃতি প্রদান, জাঙ্গালীদের আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইরানের ইতিহাসের আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বৃটেন ও আমেরিকার সাথে রাশিয়ার আপোষ, যেমন ২৮শে মোরদাদের[১] ক্যু-দেতার ক্ষেত্রে; এসব কিছু বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কম্যুনিস্ট নেতাদের সম্পর্কে আমাদের এ ধারণার সত্যতাই প্রমাণ করে।

প্রাচ্যে সার্বজনীন বিপ্লব

কম্যুনিস্ট রাশিয়ার ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের অন্যতম ছিল প্রাচ্য ভূখণ্ডে এক সার্বজনীন বিপ্লব ঘটানো। ১৯২০ খৃস্টাব্দে বাকুতে অনুষ্ঠিত "প্রাচ্যের জাতিসমূহের প্রথম কংগ্রেস"-এ সুস্পষ্ট ভাষায় এ লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। এ কংগ্রেসে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং রুশ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদের সামনে স্বীয় নীতি ঘোষণা করেন। তাঁরা প্রাচ্য ভূখণ্ডে কম্যুনিজমের বিস্তার সাধনের জন্য চেষ্টা-সাধনা চালানোকে সকল কম্যুনিস্টের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেন।

ইরান ঃ ভারতে পৌছার সেতু

ইরানের প্রতি জারদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ার কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখব রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ইরানের দিকে কোন্ দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

তাকাচ্ছিলেন এবং ইরানের ব্যাপারে কোন্ নীতি অনুসরণ করছিলেন।

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, অক্টোবর বিপ্লবের পর কম্যুনিস্ট রাশিয়ার প্রাচ্য বিষয়ক সাধারণ নীতি ছিল প্রাচ্যে এক সার্বজনীন বিপ্লব সংগঠিত করা। এ কারণে প্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে ইরানও রাশিয়ার এ নীতি-কাঠামোর আওতাভুক্ত ছিল। অবশ্য এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রুশরা ইরানেও একটি গণবিপ্লব কামনা করত। কিন্তু ইরানে তাদের লক্ষ্য কেবল গণবিপ্লবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

বিপ্লবের মাধ্যমে জারদের স্থলাভিষিক্ত বলশেভিক কম্যুনিস্টরা নিঃসন্দেহে ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার এবং ভারত উপমহাদেশকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার লক্ষ্য পোষণ করতেন। আর আমরা যদি একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব এবং স্বীকার করে নিতে বাধ্য হব যে, রুশ কম্যুনিস্ট নেতাদের এ নীতি এবং পিটারের বিখ্যাত উইলের বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সেদিন পর্যন্তও (তার বিলুপ্তি পর্যন্ত) যে নীতি অনুসরণ করেছে তাতে দু'টি লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আদর্শিক নীতি-অবস্থানের ভিত্তিতেই হোক, অথবা সুবিধা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দু'টি লক্ষ্যভিত্তিক নীতি অনুসরণ করেছে। এ লক্ষ্য দু'টি হচ্ছে ঃ

১। সারা বিশ্বে কম্যুনিস্ট বিপ্লব রফতানী।

২। প্রয়োজনবোধে স্বীয় বন্ধুদের উৎসর্গ করে এবং পাশ্চাত্য শিবিরের সাথে আপোষ করে হলেও রুশ বিপ্লবকে শক্তিশালীকরণ ও তার সংরক্ষণ।

কম্যুনিস্ট রাশিয়া ইরান সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করে তার কারণসমূহ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে হলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে বলা চলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছিল। তেমনি সমাজের অবস্থা এবং সামাজিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট নেতারা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছিলেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে, বিপ্লব রফতানী এবং বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংগঠন ছিল রাশিয়ার কৌশলগত লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্টদের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সমর্থন এ নীতির ওপরই ভিত্তিশীল ছিল। তাঁরা একই সাথে নিজেদেরকে শক্তিশালীকরণ এবং রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিতকরণকে নিজেদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এ কারণেই যখনই তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে তাঁদের আদর্শিক নীতি-অবস্থানের সংঘাত সৃষ্টি হত সে ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের আদর্শিক নীতি-অবস্থানের কথা ভুলে যেতেন এবং তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে সঙ্গতিশীল নীতি গ্রহণ করতেন।

বৃটিশ নীতির ফাঁদে রাশিয়া ঃ রেযা খানের প্রতি সমর্থন

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, তেমনি সাম্প্রতিককালে বৃটিশদের প্রকাশিত পুরনো গোপন দলিলপত্র দৃষ্টে এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, রেযা খান তাদের তাঁবেদার ছিলেন। ইতিপূর্বে যেমন একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি ইরান সম্পর্কিত তার নতুন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত রেযা খানকে তাদের পক্ষ থেকে ইরানের গোটা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের

www.pathagar.com

জন্য প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নেয়, তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে এবং তাঁর প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে। তাই এক্ষেত্রে জেনে রাখা যেতে পারে যে, রেযা খান সম্পর্কে কম্যুনিস্ট রাশিয়া কি নীতি-অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

রেযা খান সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার গৃহীত নীতি তাঁর সামাজিক ঘাঁটি সম্পর্কে রুশ নেতাদের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তিশীল ছিল। রুশ নেতৃবৃন্দ এবং রাশিয়ার মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রেযা খান ছিলেন ইরানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। একারণে রুশ নেতারা রেযা খানের ক্যু-দেতাকে সামাজিক পূর্ণতার পথে অগ্রযাত্রার একটি আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এ আন্দোলন ইরানকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে বের করে আনবে এবং এমন এক অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যেহেতু বিশ্লেষণের মার্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামন্ত শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর প্রগতিশীল, সেহেতু ইতিহাসের দাবী অনুযায়ী এ অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সমর্থন জানানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রুশদের যুক্তি ছিল এই যে, রেযা খান অধিকতর প্রগতিশীল সামাজিক ঘাঁটি থেকে উত্থিত হয়েছেন বিধায় তিনি বড় জমিদার, ভূস্বামী ও যাজক শ্রেণীর (ওলামায়ে কেরামের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন।

ইরান ও রেযা খান সম্বন্ধে রুশ নেতাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগত ভুল এবং রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভ্রান্তির পরিণতিতে, সর্বদা রুশ কম্যুনিস্ট নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ইরানী কম্যুনিস্ট নেতারাও পথচ্যুত হন। এ কারণেই পঞ্চম মজলিসের সমাজতান্ত্রিক সদস্যগণ রেযা খানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও শাহ্ মনোনীত হওয়ার প্রতি সমর্থন জানান। তাঁরা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, কার্যতঃ বৃটিশদের উদ্দেশ্যে হাসিলে সাহায্য করেন এবং ইরানী জনগণের স্বার্থের ওপর এমন মারণাঘাত হানেন যার ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবার নয়। ইরানের পঞ্চম জাতীয় মজলিসে যখন আহ্মাদ শাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে রেযা খানকে শাহ্ হিসেবে মনোনয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তখন সোলায়মান মীর্যা এবং অপর পনর জন বামপন্থী সদস্য প্রস্তাবের সমর্থনে ভোটদান করেন। এভাবে তাঁরা ইরানে পাহ্লভী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অংশীদার হন।

টীকা ঃ

(১) ২৮শে মোরদাদ, ১৩৩২ মোতাবেক ১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ। এদিন সিআইএ-র ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে ক্যু-দেতা হয়। এর বিবরণ পরে আসছে।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

কাজার বংশের শাসনাবসান ও রেযা খানের শাসনকাল

আহ্‌মাদ শাহ্ ইউরোপ সফরে থাকাকালে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রেযা খান দিনের পর দিন স্বীয় অবস্থানকে অধিকতর শক্তিশালী করছিলেন। একই সাথে আহ্‌মাদ শাহের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালিয়ে তাঁকে দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন। রেযা খানের এজেন্টরা ইরানের বিভিন্ন শহরে এ মর্মে প্রচার চালাতে থাকে যে, ইরানের প্রতি আহ্‌মাদ শাহের কোনরূপ মনের টান নেই, তাই তিনি ইউরোপে আমোদ-ফূর্তিতে ব্যস্ত রয়েছেন।

রেযা খান বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও চাপসৃষ্টির মাধ্যমে মজলিস থেকে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের সপক্ষে আস্থাভোট আদায় করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা মজবুত হয় এবং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় আহ্‌মাদ শাহ্ ইরানে ফিরে আসবেন কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তবে কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা করার পর দেশে ফিরে আসার ও সিংহাসন রক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বৃটিশরা আহ্‌মাদ শাহের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হবার পর তাঁর কাছে গিয়ে ইরানের কল্পিত বিশৃঙ্খলার কথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলে ধরে তাঁর প্রতি কৃত্রিম কল্যাণকামিতা দেখিয়ে তাঁকে বুঝায় যে, তাঁর জন্য আরো কিছুদিন দেশে না ফেরাই কল্যাণকর; বরং প্রধানমন্ত্রী রেযা খান শাহের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন, তার পরই তাঁর দেশে ফেরা মঙ্গলজনক এবং বিজ্ঞজনোচিত হবে।

এক্ষেত্রে বৃটিশরা শেখ খাজ্ আলীর অভ্যুত্থানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে। আহ্‌মাদ শাহ্ পর্দার অন্তরালের বেশীর ভাগ ঘটনা সম্বন্ধেই ওয়াকেফহাল ছিলেন না বিধায় সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করলেন যে, ইরানের আনাচে—কানাচে এমনভাবে বিদ্রোহ চলছে যে, ইরানে প্রবেশের সাথে সাথেই তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

শাহের ইউরোপে অবস্থান যত দীর্ঘায়িত হতে থাকল রেযা খানের সমর্থকরা ততই এ মর্মে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে থাকল যে, শাহ্ ইরানের ভাগ্য নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণও কমবেশী একথা বিশ্বাস করতে লাগল। শেখ্ খাজ্ আলীর বিদ্রোহ দমন এবং দেশের এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত আরো কিছু ছোটখাটো বিদ্রোহ দমনসহ অস্ত্রের জোরে সারা দেশে রেযা খান যে তথাকথিত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করলেন তার ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। একই সাথে রেযা খানের এজেন্টদের প্রচারের ফলে আহ্‌মাদ শাহ্ সম্পর্কে জনমনে হতাশা ও খারাপ ধারণা বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রধানমন্ত্রী রেযা খানের ক্ষমতা ও অবস্থান যত সুদৃঢ় হতে লাগল আহ্‌মাদ শাহের বিরোধিতা ও তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান ততই ব্যাপকতর হতে লাগল। এরপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে সামরিক অধিনায়কদের এবং কোন কোন প্রাদেশিক প্রশাসকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে টেলিগ্রাম প্রেরণ শুরু হলো। এসব টেলিগ্রামে আহ্‌মাদ শাহ্‌র শাসনক্ষমতায় অব্যাহত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবের কথা উল্লেখ করে রেযা খানকে শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত করার দাবী তোলা হলো।

www.pathagar.com

এসব ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ ও তৎপরতার পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে এ মর্মে গুজব রটিয়ে দেয়া হল যে, আহ্‌মাদ শাহ্ সম্ভবতঃ রেযাখানের এত নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনাকে উপেক্ষা করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করবেন এবং দেশের শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিস্থিতি পুনরায় অশান্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য যে, জনসাধারণ নতুন করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভবকে ভয়ের চোখে দেখছিল। এ কারণে এসব গুজবের ফলে রেযা খানের শাসনক্ষমতা অব্যাহত থাকার প্রতি জনসমর্থন আরো বেড়ে গেল। এভাবে আহ্‌মাদ শাহের অপসারণের জন্য আরো ব্যাপক ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। আহ্‌মাদ শাহের বিরুদ্ধে রেযা খান এবং তাঁর এজেন্টদের প্রচারাভিযান এমন তুঙ্গে ওঠে যে, এমনকি আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস এবং ডক্টর মোসাদ্দেকের ন্যায় ব্যক্তিগণ পর্যন্ত তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হননি।

ইংরেজদের এজেন্টরা ইরানী জনগণের মন—মগজকে রেযা খানের অনুকূলে তৈরী করে নেয়। এরপর ফার্সী ১৩০৪ সালে[১] মজলিসে একদফা বিশিষ্ট একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যাতে ইরানের শাসনক্ষমতা থেকে কাজার রাজবংশকে অপসারণ এবং অস্থায়ীভাবে রেযা খানের হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণের কথা বলা হয়। এই একদফা বিশিষ্ট প্রস্তাবে এ-ও বলা হয় যে, ইরানের শাসনক্ষমতা থেকে কাজার রাজবংশের অপসারণের পর সংবিধানের কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ[২] গঠিত হবে এবং এ পরিষদ ইরানের রাজসিংহাসনের ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মজলিস সদস্যদের মধ্যে মাত্র চারজন ছাড়া বাকী সকল সদস্যই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। বিপক্ষে ভোটদাতাদের মধ্যে আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস এবং ডঃ মোসাদ্দেক ছিলেন অন্যতম। সংখ্যাল্পতার কারণে তাঁদের এ বিরোধিতায় কোন কাজ হলো না।

মজলিসে অনুমোদিত একদফা বিশিষ্ট সিদ্ধান্তটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "একক ধারা ঃ মজলিসে শূরায়ে মিল্লী[৩] জাতির সৌভাগ্যের নামে কাজার রাজবংশের শাসনক্ষমতার বিলুপ্তি ঘোষণা করে সংবিধান ও দেশের প্রণীত আইন-কানুনের সীমারেখার আওতায় জনাব রেযা খান পাহ্‌লভীর ওপর অস্থায়ী হুকুমত অর্পণ করছে। হুকুমতের ভবিষ্যত অকাট্যভাবে নির্ণয়ের বিষয়টি প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের মতামতের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৪০ নং সম্পূরক ধারার পরিবর্তনের জন্য গঠিত হবে।"

আহ্‌মাদ শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করার দশ দিন পর ইরানে নিয়োজিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত রেযা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি স্মারক তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন যাতে রেযা খানের হুকুমতকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরদিন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত রেযা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সরকারের প্রতি সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ থেকে এভাবে রেযা খানের শাসনক্ষমতা প্রাপ্তিকে স্বীকৃতিদানের পর এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল যে, কিছুসংখ্যক সদস্য বিরোধিতা করলেও মনোনীত পদ্ধতিতে গঠিতব্য প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ রেযা খানকে শাহী মসনদ প্রদানের বিষয়টি মেনে নেবে।

শেষ পর্যন্ত একই বছর (১৩০৪ ফার্সী/১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) রেযা খানের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের অধিবেশন শুরু হয় এবং ছয় দিন আলোচনার পর রেযা খানকে ইরানের বাদশাহ্ হিসেবে মনোনীত করা হয়। এ ছাড়া ভবিষ্যতে ইরানের সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী মসনদে রেযা খান এবং তাঁর শাসনামলের কতিপয় সংস্কার ও অন্যান্য পদক্ষেপ

ইরানে পাহ্‌লভী রাজবংশের শাসনামলের সূচনা ইরানের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এ অধ্যায়ের সূচনা ও ইরানে নতুন প্রক্রিয়ায় বিজাতীয়দের অবাধ লুণ্ঠনের সূচনা সমসাময়িক। নব্য উপনিবেশবাদ নামে খ্যাত এ নতুন ধারার বিজাতীয় লুণ্ঠনের পথ করে দেন রেযা খান। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন ইরানে নব্য উপনিবেশবাদের প্রথম প্রতিনিধি।

রেযা খান ইরানের সকল ক্ষমতা হস্তগত করার ও শাহী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপগুলো ছিল ঃ সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী গঠন, রেললাইন স্থাপন, উপজাতীয়দের ধরে এনে বসতিতে প্রতিষ্ঠা, অভিন্ন পোশাক প্রবর্তন ও হিজাব (পর্দা) উন্মোচন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের তেলচুক্তি সম্পাদন। এ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী গঠন ঃ ইতিপূর্বে আমরা ইরানের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার কারণগুলো উল্লেখ করেছি, বলেছি যে, ইরানে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন ছিল বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির মৌলিক পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম। এ সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন ইরানে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ সম্ভবপর করে তোলে, অন্যদিকে গণঅভ্যুত্থানগুলো দমন করাও সম্ভব হয়, তেমনি জরুরী প্রয়োজনে বৃটিশদের সামরিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এর ব্যবহারও নিশ্চিত হয়। রেযা খান বৃটিশদের নির্দেশনা অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী গঠন করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন করেন। তেমনি রাজকীয় ক্ষমতা দখলের বছর (অর্থাৎ ১৩০৪ ফার্সী সালে/১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) সর্বজনীন সামরিক সেবার আইন পাস করেন।

দেশব্যাপী রেললাইন প্রতিষ্ঠা ঃ রেযা খানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অন্যতম ছিল রেললাইন প্রতিষ্ঠা। তিনি উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী বান্দারে তুর্কামান (তৎকালীন নাম বান্দারে শাহ্)[৪] থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী বান্দারে ইমাম খোমেনী (তৎকালীন নাম বান্দারে শাহ্‌পুর)[৫] পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করে দেশের এ দুই প্রান্তকে পরস্পর যুক্ত করেন।

এ রেললাইন নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। কিন্তু এর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল প্রয়োজনের মুহূর্তে দ্রুততম গতিতে ও স্বল্পতম সময়ে দক্ষিণ ইরান থেকে উত্তর ইরানে বৃটিশ সৈন্যদের পৌঁছানোর নিশ্চয়তা বিধান। উত্তর ইরানের দিকে রুশ বাহিনী অগ্রসর হলে বৃটিশ বাহিনী এ রেললাইনযোগে উত্তর ইরানে পৌঁছে যাবে এবং রুশ বাহিনীর ইরানে প্রবেশ ও সেখান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ বা প্রভাব বিস্তার রোধ করবে— এটাই ছিল বৃটিশ পরিকল্পনা। এ রেললাইন যে, ইরানের অর্থনৈতিক স্বার্থে নির্মিত হয়নি বরং বিজাতীয় বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির সামরিক লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল— আমাদের এ দাবীর যথার্থতার প্রমাণ এই যে, ইরানের বড় বড় শহরগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা এ রেললাইন নির্মাণের পিছনে ছিল না। এ কারণেই তৎকালে ইস্‌ফাহান ও শীরাযের ন্যায় ইরানের অতি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর ওপর দিয়ে এ রেললাইন নেয়া হয়নি। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এ রেললাইন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপজাতীয়দের বসতিতে প্রতিষ্ঠা ঃ রেযা খানের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল (যাযাবর ও তাঁবুবাসী) উপজাতীয়দেরকে জোরপূর্বক ধরে এনে বিভিন্ন শহর-জনপদে বাড়ীঘরে বসবাসে বাধ্য

www.pathagar.com

করা। এই যাযাবর উপজাতীয়রা ছিল ইরানের পশুসম্পদ লালন ও উৎপাদনকারী গোষ্ঠী। তাদেরকে বাড়ীঘরে বসবাসে বাধ্য করার ফলে তারা পশুপালন (প্রধানতঃ মেষপালন) পরিত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে ইরান পশুসম্পদ তথা গোশতের জন্যে বিজাতীয়দের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। সেই সাথে এদেরকে গৃহবাসীতে পরিণত করার পিছনে আরো দু'টি উদ্দেশ্য ছিল, তা হচ্ছে ঃ উপজাতীয়দের যোদ্ধ-জনশক্তিকে অ-যোদ্ধতে পরিণত করে এদের ওপর শাসন ও আধিপত্য সহজ করে আনা ও অভ্যুত্থান-আশঙ্কা দূরীভূত করা এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য বিক্রির জন্যে ভোক্তা শহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

অভিন্ন পোশাক প্রবর্তন ও হিজাব উৎখাত ঃ অত্র গ্রন্থের শুরুর দিকে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইউরোপের পণ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে এসব দেশের জনগণের জাতীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে হামলা শুরু করে। রেযা খান ইরানের শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদীদের বাণিজ্যিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে তাদের পক্ষ থেকে এ আগ্রাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। রেযা খান সভ্যতা, উন্নত সংস্কৃতি ও আধুনিকতা প্রবর্তনের নামে এবং সেকেলেপনা ও পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে অভিন্ন পোশাক প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সেই সাথে তিনি নারীদের হিজাব উৎখাতের (উন্মোচনের) পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইরানী জনগণকে তাদের স্বকীয় প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নেয়া এবং বিজাতীয়দের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ভোক্তায় পরিণত করা।[৬] কিন্তু ইরানের মুসলিম জনগণ রেযা খানের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে গওহর শদ্ মসজিদের[৭] গণঅভ্যুত্থানের নাম করা যেতে পারে যা দমন করতে গিয়ে স্বৈরাচারী রেযা খানের নির্দেশে বহু মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের তেলচুক্তি ঃ মোযাফ্ফারুদ্দীন শাহের শাসনামলে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী উইলিয়াম ন্যাক্স ড্যার্সি[৮]-কে ইরানের তেলখনি থেকে ৬০ বছরের জন্য তেল উত্তোলনের অধিকার দেয়া হয়েছিল। এ চুক্তি অনুযায়ী ১৯৬১ সালে উক্ত সুবিধার সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু বৃটিশরা ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে আরো পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে তেল-উত্তোলন চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির পথ খুঁজছিল। ইরানের প্রতিবেশী দেশ ইরাকের সাথে তাদের যে তেল-উত্তোলন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তারা তার মেয়াদ ৩০ বছর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। একই লক্ষ্যে তারা ইরানের সাথে নতুন একটি চুক্তি সম্পাদনের পথ খুঁজতে থাকে। অতঃপর ফার্সী ১৩১০ সালে[৯] তারা এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত করে দেয়। বৃটিশরা ইরানে উত্তোলনকৃত তেল থেকে ইরানকে যে অংশ প্রদান করত ঐ বছর তারা একতরফাভাবে তার তিন চতুর্থাংশ কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ইরানের প্রাপ্তব্য অংশ হ্রাসের কথা বলা হয়। এর ফলে দৃশ্যতঃ রেযা খান ক্রুদ্ধ হন এবং ড্যার্সির সাথে সম্পাদিত চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন ও চুক্তিনামাটিকে আগুনে নিক্ষেপ করেন।

আসলে পূর্বাহ্নিক গোপন সমঝোতা অনুযায়ী ইরানের স্বার্থরক্ষার নাম করে রেযা খান চুক্তিটিকে একতরফাভাবে বাতিল ঘোষণা করেন। রেযা খানের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বৃটিশরা প্রতিবাদ জানায়। ফলে রেযা খানের পক্ষে আরো একবার নিজেকে বৃটিশবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে প্রদর্শনী করা সম্ভব হয়।[১০]

www.pathagar.com

বৃটিশ সরকার তার দেশের কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূলে ইরানকে একটি পত্র পাঠায় এবং এতে জানিয়ে দেয় যে, ইরান যদি চুক্তিটি বাতিলের ব্যাপারে জিদ অব্যাহত রাখে তাহলে বৃটিশ সরকার তার দেশের কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্যে হেগের আদালতে ইরানের বিরুদ্ধে মামলা করবে। দৃশ্যতঃ ইরান সরকার বৃটেনের এ প্রতিবাদকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। এমতাবস্থায় বৃটেন হেগের আদালতে ইরানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হেগের আদালতে এ মামলা গ্রহণোপযোগী কোন আইন ছিল না। এমতাবস্থায় বিষয়টি লীগ অব্ নেশনসে[১১] পেশ করা হয়। আর উপনিবেশবাদীদের নিয়ন্ত্রিত লীগ অব্ নেশন্সও পূর্বাহ্নিক সমঝোতা অনুযায়ী বৃটেনের আস্থাভাজন চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করে। তাঁর প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষ একমত হয় যে, লীগ অব্ নেশন্সের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে উভয় দেশ শীর্ষপর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও নতুন একটি চুক্তি সম্পাদন করবে। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ সরকার ও রেযা খান উভয়ই এটাই চাচ্ছিলেন।

এতে বৃটিশ কোম্পানীর খুশী হবার কারণ ছিল এই যে, তার পক্ষে পূর্ণ মেয়াদে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে রেযা খানের জন্য খুশীর ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি মোযাফ্ফারুদ্দীন শাহের আমলে বৃটিশ কোম্পানীকে দেয়া সুবিধা বাতিল করে দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত বৃটেনের সাথে বিরোধের প্রদর্শনী করে ইরানের জাতীয় হিরোতে পরিণত হতে পারছেন।

এরপর ১৩১২ ফার্সী সালে[১২] নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে ইরান ও বৃটিশ কোম্পানীর মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা শেষে দু'পক্ষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে রেযা খান বৃটিশ কোম্পানীকে ১৩৭২ ফার্সী সাল[১৩] পর্যন্ত আরো ৬০ বছরের জন্যে ইরানের তেলসম্পদ উত্তোলনের অধিকার বৃটিশ কোম্পানীকে প্রদান করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ কোম্পানী নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন, নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, জমি ক্রয়-বিক্রয়, ভবন নির্মাণ, রেললাইন স্থাপন, বন্দর গড়ে তোলা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন প্রতিষ্ঠা, বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা এবং রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠারও অধিকার লাভ করে। এসব কিছুই ছিল চুক্তি বাতিল নাটকের ফলে বৃটিশপক্ষের প্রাপ্তি।

অন্যদিকে এ সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে বৃটিশ কোম্পানী ইরানকে যা দেয়ার অঙ্গীকার করে তা হচ্ছে উত্তোলিত প্রতি ব্যারেল তেলের বিনিময়ে ৪ শিলিং মূল্য।[১৪] এ ছাড়া কোম্পানী ইরানকে বছরে কিছু নগদ অর্থ প্রদানেও সম্মত হয়। অবশ্য শর্ত ছিল যে, উভয় খাতে দেয় অর্থের মোট পরিমাণ বার্ষিক সাড়ে সাত লাখ পাউন্ডের কম হতে পারবে না।[১৫]

রেযা খান ড্যার্সির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের জন্যে কৃতিত্বের দাবীদার ছিলেন। কিন্তু ব্যাপক বিশ্লেষণে না গিয়ে খুব সাদামাটাভাবে তুলনা করলেই বুঝা যাবে যে, ড্যার্সির সাথে সম্পাদিত মোযাফফারুদ্দীন শাহের আমলের চুক্তিতে ইরান তার তেলসম্পদের বিনিময়ে যে সুবিধা লাভ করত রেযা খানের সম্পাদিত চুক্তিতে ইরানের সুবিধার পরিমাণ সে তুলনায় ষোল ভাগের এক ভাগেরও কম ছিল। তাছাড়া ড্যার্সির সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে একটি শর্ত ছিল এই যে, ইরানে তেল উত্তোলনের জন্যে ড্যার্সিকে প্রদত্ত সুবিধার মেয়াদের সমাপ্তিতে ইরানে কোম্পানীর যে সম্পদ ও উপায়-উপকরণ থাকবে তা ইরান লাভ করবে। কিন্তু রেযা খানের সম্পাদিত চুক্তিতে এরূপ কিছু উল্লেখ ছিল না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ চুক্তি সম্পাদনের জন্যে যিনি দালাল হিসেবে কাজ করেন তিনি ছিলেন সাইয়েদ হাসান তাকীযাদেহ্। তাঁকে অবশ্য পরে এজন্যে প্রচণ্ড প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। সর্বজন বিদিত যে, প্রতিবাদের জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি নির্দেশপ্রাপ্ত, অতএব, অক্ষম।"[১৬]

www.pathagar.com

রেযা খান ও তাঁর দ্বিমুখী ধর্ম-নীতি

রেযা খান ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের জন্যে তৎপরতা চালানোর সময় ও শীর্ষক্ষমতায় আরোহণের পরে তা ধরে রাখার জন্য সব সময়ই বিজাতীয়দের নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর এ পুরো সময়ে তিনি ধর্মীয় বিষয়ে কোন একক নীতি অনুসরণ করেননি। বরং শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে ও পরে তাঁর ধর্ম বিষয়ক নীতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বরং সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী।

ক) সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে রেযা খানের ধর্ম-নীতি ঃ বলা বাহুল্য যে, ইরানের মুসলিম জনগণের মধ্যে ঈমান ও আকিদা সব সময়ই সুদৃঢ় ছিল। অন্যদিকে ওলামায়ে কেরাম সব সময়ই সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব, সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইরানী সমাজের এ অবস্থার কারণেই রেযা খান ইরানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও সে লক্ষ্যে কাজার রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবার সময় এ সামাজিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রাখতে বাধ্য হন। তাই এ যুগে তাঁর ধর্মবিষয়ক নীতি ছিল বাহ্যিকভাবে (কপট) ধার্মিকতা ও ধর্মের প্রতি সমর্থন এবং আলেম সমাজ ও জনসাধারণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামকে অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার। এ যুগে রেযা খান মা'ছুম ইমামগণের (আঃ) মাযার জিয়ারত করতে যেতেন, মাওলায়ে মোত্তাকিয়ান[১৭] হযরত আলীর (আঃ) নামাঙ্কিত পদক গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, (ইমামগণের) শাহাদাত বার্ষিকীতে, বিশেষতঃ হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) শাহাদাৎ বার্ষিকীতে) নিজের পক্ষ থেকে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং সাধারণ গণমানুষ অংশগ্রহণ করছে (ইমামদের স্মরণে আয়োজিত) এমন শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। আর এ ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে তিনি একদম সাধারণ মানুষের মতই নিজেকে শোকে দিশেহারা প্রদর্শনের জন্যে নিজের মাথায় ধুলা-বালি পর্যন্ত তুলে দিতেন।[১৮]

বলা বাহুল্য যে, এ যুগে রেযা খানের সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি সমাজের সর্বাধিক শক্তিশালী শ্রেণী আলেম সমাজের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, আলেম সমাজ যদি তাঁকে সমর্থন না-ও করেন অন্ততঃ তাঁর বিরোধিতা থেকে যেন বিরত থাকেন। এ কারণে তিনি বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের জন্যে বার বার কোমে ছুটে যেতেন, আর তাঁদের নিকট নিজেকে দ্বীনদার এবং শরীয়াতের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসেবে তুলে ধরতেন। তিনি এ মুনাফেকী নীতি অনুসরণ করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই সমর্থন লাভে সক্ষম হন এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তিনি সত্যি সত্যিই ইসলামের সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। তাই তারা রেযা খানের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। আর তাঁর মসনদে আরোহণের জন্যে যেসব বিষয় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাঁর আচরণ ছিল তার অন্যতম।

খ) শাহী মসনদে আরোহণ পরবর্তী যুগে রেযা খানের ধর্ম-নীতি ঃ রেযা খান ইরানের শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর পর্যায়ক্রমে তাঁর ধর্ম বিষয়ক অতীত নীতি পরিত্যাগ করেন এবং ইরানী সমাজ থেকে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও মূল্যবোধের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে আলেম সমাজকে দমন ও দুর্বল করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। অবশ্য তাঁর এ নীতি গ্রহণের পিছনেও বিশেষ কতগুলো কারণ নিহিত ছিল।

অতীতে ইরানে যেসব গণজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তা ইরানের মুসলিম জনগণের ইসলামে গভীর ঈমান থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং ওলামায়ে কেরাম এসব গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রেযা খান এ বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কিভাবে তামাক আন্দোলন,

www.pathagar.com

সাংবিধানিক আন্দোলন, শেখ মোহাম্মদ খিয়াবানীর অভ্যুত্থান, জাঙ্গালীদের অভ্যুত্থান ইত্যাদি ইরানী জনগণের ঈমান ও ধর্মানুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং দেশীয় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে ও বিজাতীয় উপনিবেশিক শক্তিসমূহের অবৈধ স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলেছিল সেসব ঘটনা তিনি স্মরণ করতেন। এ কারণে তিনি এ-ও জানতেন যে, জনগণের সংগ্রামী চেতনার মূল উৎস অর্থাৎ ইসলামের গোড়া কেটে না ফেললে, আগে হোক বা পরে হোক, তাঁর বিরুদ্ধেও এ ধরনের অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়া অনিবার্য।

ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রেযা খান ইসলাম ও আলেম সমাজের নিকট থেকে বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন ইরানে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ ও দেশটিকে ইউরোপীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করার জন্যে বৃটিশদের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট। এ হিসেবেও তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইরানী সমাজের পরিবর্তন সাধিত না হবে এবং পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় ও সমাজের ভোগবাদী প্রবণতার মোকাবিলায় প্রতিরোধ সৃষ্টির মূল উপাদান ধর্মীয় মূল্যবোধ উৎখাত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বৃটিশ প্রভুরা ইরানে তাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পুরোপুরিভাবে উপনীত হতে পারবে না।

এ প্রেক্ষিতে, শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত হবার পর রেযা খান তাঁর ইতিপূর্বেকার ধর্মবিষয়ক নীতি পরিত্যাগ করেন এবং দ্বীন ও আলেম সমাজের মোকাবিলায় স্বরূপে আবির্ভূত হন। অতীতে যেখানে তিনি নিজেকে ইসলামাশ্রয়ী হিসেবে পরিচিত করতেন সেখানে সিংহাসনে আরোহণ পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট ভাষায় ধর্মকে সভ্যতা ও আধুনিকতার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। পূর্বে তিনি নিজেকে ইসলামের হুকুম-আহ্কামের পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করতেন, কিন্তু এবার তিনি ইসলামী বিধানের সুস্পষ্ট লঙঘন করে মহিলাদের হিজাব উন্মোচনের জন্যে নির্দেশ দিলেন।

রেযা খান মনে করতেন, ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও সাধারণ গণমানুষের মধ্যে ইসলামকে দুর্বল করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রবর্তন ও প্রসার। ইতিমধ্যে তিনি তুরস্ক সফর করেন ও তুরস্কের শাসক কামাল আতাতুর্কের সাথে পরিচিত হন। এ সফর থেকে ফেরার পর রেযা খান কামাল পাশার অনুকরণে ইসলামের সকল ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি শহরের রাস্তা-ঘাটে, অলিতে-গলিতে লোক নিয়োগ করলেন যাদের দায়িত্ব ছিল চাদর[১৯] পরিহিতা মহিলাদের মাথা থেকে চাদর টেনে নামিয়ে দেয়া। অন্যদিকে সমাজের বুকে ওলামায়ে কেরামের অবস্থানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে রেযা খান নির্দেশ জারী করেন যে, ওলামায়ে কেরামকে তাঁদের বিশেষ ধরনের নিজস্ব পোশাক পরিত্যাগ করতে হবে। এ ছাড়া তাঁর নির্দেশে ধর্মীয় (শরয়ী) বিচারালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সামাজিক বিষয়াদিতে আলেম সমাজের হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু তা-ই নয়, সাইয়েদুশ শুহাদা[২০] হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) স্মরণে শোকানুষ্ঠান আয়োজনকে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা বলে গণ্য করা হয় এবং অনেক দ্বীনী আদব-কায়দাকেই কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হয়।

আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেসের শাহাদাৎ

আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস ছিলেন এমন এক নিরলস সংগ্রামী বিপ্লবী আলেম যাঁর গোটা সত্তাই ছিল ইসলামের মহব্বতে পরিপূর্ণ এবং তাঁর আশা-আকাঙক্ষা ও স্বপ্ন-কামনা সবকিছুই ছিল ইরানকে

www.pathagar.com

স্বৈরাচার ও উপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্তিদান। এ কারণেই রেযা খানের প্রধানমন্ত্রীত্বের যুগে এবং তাঁর শাহী মসনদে আরোহণের পরেও, রেযা খানের সবচেয়ে বড় দুশমন ও আপোসহীন বিরোধী রূপে একমাত্র যে ব্যক্তিটি সুপরিচিত ছিলেন তিনি হচ্ছেন শহীদ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ হাসান মোদার্‌রেস।

রেযা খান ইরানের শাহী মসনদে আরোহণের পর স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর সকল বিরোধীকে দমন করেন এবং দেশের সকল ক্ষমতা একার হাতে কুক্ষিগত করেন। শুধু তা-ই নয়, বরং ষষ্ঠ মজলিস থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে গোটা মজলিসকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান।

রেযা খান প্রথমেই মোদার্‌রেসকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তদনুযায়ী তিনি একদল লোককে তাঁকে হত্যার জন্য নিয়োগ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, মোদার্‌রেস যখন তাঁর দৈনন্দিন নিয়ম মাফিক সকালবেলা ঘর থেকে বেরোবেন তখন গোপন জায়গা থেকে গুলী করে তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সত্ত্বেও এবং অনেকগুলো গুলীবর্ষণ করা হলেও সতর্কতার কারণে মোদাররেস এ সন্ত্রাসী হামলার মুখেও অক্ষত থেকে যান।

মোদার্‌রেসকে হত্যার জন্যে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে তেহরানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে সকলে এতে শরীক হয়। রেযা খান মোদার্‌রেসকে হত্যার পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সম্পর্কহীন দেখানোর উদ্দেশ্যে এ সময় উত্তর ইরানে সফরে গিয়েছিলেন। মোদার্‌রেসকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার খবর পেয়ে রেযা খান ভণ্ডামী করে তাঁকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। এতে হত্যাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ও মোদার্‌রেস অক্ষতভাবে বেঁচে যাওয়ায় রেযা খান আনন্দ প্রকাশ করেন। মোদাররেস জবাবে রেযা খানকে যে টেলিগ্রাম পাঠান তাতে তিনি বলেন ঃ "দুশমনদের চোখকে অন্ধ করে দিয়ে মোদার্‌রেস জীবিত আছে।"

রেযা খান মোদার্‌রেসের তেহরানে অবস্থানকে তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার পথে বিরাট বাধা ও হুমকিস্বরূপ মনে করতেন। অন্যদিকে মোদার্‌রেস রেযা খানের অন্যান্য বিরোধীদের ন্যায় এমন কেউ ছিলেন না যাঁকে খুব সহজেই হত্যা করা যাবে এবং সে হত্যার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। এ কারণে রেযা খান সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁকে নির্বাসিত করবেন এবং নিজ ক্ষমতার ভিত্ পুরোপুরি মজবুত হবার পর মোদার্‌রেসকে হত্যা করবেন। অতঃপর রেযা খানের নির্দেশে ফার্সী ১৩০৭ সালের মেহের মাসে[২১] নিরাপত্তা বাহিনীর একদল সদস্য মোদার্‌রেসের বাসভবনে হামলা চালায় এবং তাঁকে আটক করে নিয়ে খফে[২২] নির্বাসিত করে।[২৩]

মোদার্‌রেস বেশ কয়েক বছর খফের কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করেন। অতঃপর রেযা খান যখন নিশ্চিত হলেন যে, মোদার্‌রেসকে হত্যা করেও পরিস্থিতি সহজেই সামাল দিতে পারবেন তখন তাঁর নির্দেশে মোদার্‌রেসকে খফ্ থেকে কশ্‌মারে[২৪] নিয়ে আসা হয়। কশ্‌মারে তাঁর অবস্থান শুরুর স্বল্পকাল পরে ফার্সী ১৩১৭ সালে[২৫] বিষ প্রয়োগ করে এ যুগশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আলেমকে হত্যা করা হয়।

সা'দ্ আবাদ[২৬] চুক্তি

বৃটিশরা কম্যুনিজমের বিপদ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এবং তাদের উপনিবেশসমূহের বিশেষ গুরুত্বের কারণে সেসব রক্ষার্থে একদিকে তাদের অনুগত কেন্দ্রীভূত আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটানোর চেষ্টা করে, অন্যদিকে এসব দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সুদৃঢ় সম্পর্ক

www.pathagar.com

গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। বৃটিশদের এ নীতির বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন এসব দেশের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে রুশদের সম্ভাব্য অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে ওঠে।

বৃটিশদের এ নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাদেরই প্রস্তাবক্রমে ফার্সী ১৩১৬ সালে মোতাবেক ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তেহরানের সা'দ্ আবাদ প্রাসাদে ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান ও ইরাকের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এ অঞ্চলে পারস্পরিক সমন্বিত নীতি গ্রহণে, একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে এবং বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করতে সম্মত হয়।

অবশ্য এ চুক্তি সম্পাদনকালে ও তার অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যথায় এ চুক্তি বৃটিশদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হতে পারত। কিন্তু ইতোমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় ঘটে এবং এসব দেশে তাঁর প্রভাব দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইরানে হিটলারের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। ফলে সা'দ্ আবাদ চুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে এক অন্তঃসারশূন্য চুক্তিতে পরিণত হয়।

রেযা খানের জার্মানীমুখী নীতি গ্রহণ

ইরানে রেযা খানের শাহী মসনদে আরোহণের সমসময়ে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশ জার্মানীকে শক্তিশালী করে তোলার নীতি গ্রহণ করে। এর কারণ ছিল এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত পরাজিত দেশ হিসেবে জার্মানী তখনো নানাবিধ দুর্যোগ মোকাবিলা করে চলছিল। বিশেষ করে দেশটির কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেখানে কম্যুনিজমের বিস্তার ঘটার আশঙ্কা বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায় বৃটিশরা জার্মানীকে কম্যুনিস্টদের খপ্পরে পড়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশটির অর্থনৈতিক সমস্যাবলী যতটা সম্ভব দূরীভূত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৃটিশরা এ অভিমতে উপনীত হয় যে, জার্মানীকে সাহায্য করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, তাদের তাঁবেদার দেশগুলোর সরকার প্রধানদেরকে নিজ নিজ দেশে জার্মানীর জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে তৎপরতার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়ার নির্দেশ দেবে। রেযা খান তাঁর প্রভু বৃটিশদের নিকট থেকে এ মর্মে নির্দেশ পাবার সাথে সাথেই তা মাথা পেতে মেনে নেন এবং জার্মানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে ইরানের দরজা খুলে দেন। কিন্তু শীঘ্রই বৃটেনের জার্মান-নীতিতে পরিবর্তন ঘটে এবং হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এমতাবস্থায় সমকালীন বৃটিশ নেতৃবৃন্দ জার্মানীর সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে ইতিপূর্বে তাদের তাঁবেদার দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়া নীতি পরিত্যাগ করেন এবং জার্মানীর সাথে তাদের সম্পর্ককে বৃটিশদের গৃহীত নতুন নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা এসব দেশ থেকে জার্মান বিশেষজ্ঞদের বহিষ্কার করার জন্যেও চাপ সৃষ্টি করেন।

এ পরিস্থিতিতে রেযা খানের ধারণা হয় যে, হিটলার খুব শীঘ্রই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৃটিশদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। এ কারণে নিজ মসনদ রক্ষার লক্ষ্যে রেযা খান তাঁর পুরনো ও সুদীর্ঘকালীন প্রভু বৃটিশদেরকে উপেক্ষা করেন এবং তাঁদের কথা অমান্য করে জার্মানীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এভাবে তিনি বৃটিশদের চাপ উপেক্ষা করে হিটলারকে খুশী করার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে তিনি হিটলারকে তাঁর নতুন প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে স্বীয় সিংহাসন রক্ষা করবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বৃটিশরা যখন দেখল যে, তাদের হাতের পুতুল রেযা খান তাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছেন তখন তারা তাঁকে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। যেভাবে তারা তাঁকে ক্ষমতার মঞ্চে নিয়ে এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁকে সরিয়ে দিল।

মিত্রশক্তির ইরান দখল

১৯৩৯ সালে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে জার্মান বাহিনী অত্যন্ত নিশ্চিন্ততার সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তার অগ্রযাত্রা শুরু করে। কারণ, এ অভিযানের ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্স কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। শুধু তা-ই নয়, কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ অভিযানে তারা হয়ত কিছুটা খুশীই হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে হিটলারের গৃহীত মধ্যপ্রাচ্য নীতি ফাঁস হয়ে গেলে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার এবং সেখানকার তেলকূপগুলো দখল করে তার ইউরোপীয় দুশমনদের ওপর তাদের উপনিবেশগুলোতে বড় ধরনের আঘাত হানা। এ কারণেই যেসব দেশ নিজেদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুশমন হিসেবে গণ্য করত তারা সহসাই তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা স্তালিনও যখন জার্মানীর হামলাকে অত্যন্ত কঠিন বিপদ হিসেবে বিবেচনা করলেন তখন তিনি এসব পুঁজিবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশের বন্ধুত্বের হাতকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করলেন। শুধু তা-ই নয়, তারা যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্যে আরো বেশী উৎসাহিত হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইরান সরকার নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইরানী ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে কোন বিদেশী সৈন্য যাবার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। কার্যতঃ ইরানের গৃহীত এ নীতি জার্মানদের জন্যেই লাভজনক ছিল। কারণ, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্যের জন্যে তৃতীয় কোন দেশ থেকে সৈন্য পাঠানোর একমাত্র পথ ছিল ইরান। তাই মিত্রশক্তি ইরানে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। ফার্সী ১৩২০ সালের তীর মাসে[২৭] মিত্রশক্তি ইরানের নিকট এ মর্মে দাবী জানায় যে, ইরানে অবস্থানরত জার্মান বিশেষজ্ঞদের শতকরা আশি ভাগকে অবিলম্বে বহিষ্কার করতে হবে এবং তাঁদের পরিবর্তে মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলোর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু রেযা খান পুনরায় ইরানের নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করেন ও মিত্রশক্তির নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকেন।

এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে আর সামান্যও বিলম্ব করা হলে খুব শীঘ্রই বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির শাহ্‌রগতুল্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলকূপগুলো জার্মানীর নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। এমতাবস্থায় ফার্সী ১৩২০ সালের তেসরা শাহ্‌রীভার তারিখে[২৮] তেহরানস্থ বৃটিশ ও রুশ রাষ্ট্রদূত দু'টো পৃথক পৃথক স্মারকলিপি পেশ করে ইরান সরকারকে জানিয়ে দেন যে, যেহেতু মিত্রশক্তির ব্যাপারে ইরান এক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নীতি গ্রহণ করেছে সেহেতু মিত্রশক্তির সশস্ত্র বাহিনী নিরুপায় হয়ে ইরানে প্রবেশে বাধ্য হচ্ছে।

রেযা খানের সশস্ত্রবাহিনী বনাম মিত্রবাহিনী

রেযা খান নিজে, তাঁর তাবেদাররা ও তাঁর উপনিবেশিক প্রভুরা দাবী করতেন যে, ইরানের জন্যে একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনী গঠন রেযা খানের একটি গৌরবজনক অবদান এবং এভাবে তিনি ইরানী জাতির জন্যে একটা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু এত সব প্রচারের ফুলঝুরি

www.pathagar.com

সত্ত্বেও মিত্রবাহিনীর ইরানে প্রবেশের খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে রেযা খানের সশস্ত্র বাহিনী কোনরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু সৈনিকরাই যে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যায় তা নয়, সেনাধিনায়করাও পলায়ন করেন। অবশ্য সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে সেনানিবাসে লুণ্ঠন চালিয়ে যা কিছু সম্ভব হাতিয়ে নেয়।

তবে বাখ্‌তারান[২৯] এলাকায় এবং দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে মোতায়েনকৃত ইরানী সৈন্যদের অংশবিশেষ বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৩২০ ফার্সী সালের পাঁচই শাহ্‌রীভার[৩০] সকাল সাড়ে আটটায় ইরানী সশস্ত্র বাহিনীর সকল ইউনিটের নিকট প্রতিরোধ বন্ধের নির্দেশ পৌঁছে। এমতাবস্থায় তারা প্রতিরোধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

এদিকে উত্তর দিক থেকে সোভিয়েত বাহিনী এবং দক্ষিণ দিক থেকে বৃটিশ বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং অচিরেই দুই বাহিনী ইরানী ভূখণ্ডের অভ্যান্তরে মিলিত হয়। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী আলী মান্‌সুরের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং যোকাউল্ মুল্‌ক ফোরুগী[৩১] নতুন প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পরপরই মিত্রশক্তি বরাবরে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে ঘোষণা করেন ঃ "ইরান তার পরিপূর্ণ সদিচ্ছা প্রকাশের লক্ষ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদসত্ত্বেও মিত্রবাহিনী ইরানী শহরগুলোতে বোমাবর্ষণ করছে। ইরান আশা করছে (ইরানের বুকে) যুদ্ধাভিযান পুরোপুরি বন্ধ করা হবে।"

রেযা খানের পদত্যাগ ও মোহাম্মদ রেযার মসনদে আরোহণ

ফার্সী ১৩২০ সালের ২৫শে শাহ্‌রীভার[৩২] বৃটিশ ও রুশ বাহিনী তেহরান অভিমুখে রওয়ানা হয়। এমতাবস্থায় রেযা খান ইরানের শাহী মসনদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রেযা খানের পদত্যাগের পরে ইরানে বৃটিশ উপনিবেশিক নীতির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার জন্যে তাঁর পুত্র মোহাম্মাদ রেযা পাহ্‌লভী ছাড়া উপযুক্ততর ব্যক্তি কেউ না থাকায় বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি তাঁকেই ইরানের শাহী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

রেযা খানের স্বৈরতন্ত্র ঃ উদ্ভবের মূল কারণ

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হলো তা থেকে রেযা খানের স্বৈরতন্ত্র উদ্ভবের পটভূমি ও মূল কারণগুলো সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। এ সত্ত্বেও এখানে তা সংক্ষেপে ও বিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত হলো ঃ

১। সাংবিধানিক বিপ্লব পরবর্তী সরকারগুলোর দুর্বলতা ও অক্ষমতা ঃ আমরা ইতিপূর্বে যেমন জেনেছি, ইরানের জনগণ স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবার আশায় সাংবিধানিক আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে, বিপ্লবের পরে ডিক্টেটরী ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি শাসকগোষ্ঠী ও প্রশাসকগণ প্রকৃতই গণমুখী ও জনপ্রিয় হবেন, প্রদেশগুলোতে জুলুম-অবিচার থাকবে না, শহরগুলোতে ও সড়কে-মহাসড়কে রাহাজানি থাকবে না এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও শোষণ-লুণ্ঠন দূরীভূত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। একের পর এক সরকার ক্ষমতায় আসে, কিন্তু তারা যে শুধু জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় তা-ই নয়, বরং বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিকে আরো বৃদ্ধি করে।

www.pathagar.com

রেযা খান জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে অনেকগুলো বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
এখানে গুলিস্তান প্রাসাদের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে।

সাংবিধানিক বিপ্লব পরবর্তীকালে দেশে চুরি-ডাকাতি এবং শাসকগোষ্ঠী ও প্রশাসকদের জোর-জুলুম প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে জনসাধারণ বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে এবং জনমনে এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় যা শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার সাথে সাথে আইনকে বাস্তবে কার্যকর করার সুসংবাদ দেবে।

২। **অর্থনৈতিক সংকট ঃ** যদিও গণআন্দোলনের পিছনে শুধু দেশের ও জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি নিঃসন্দেহে এটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইরানী জনগণ যখন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে তখন তারা আশা পোষণ করছিল যে, বিপ্লব বিজয়ী হবার পর দেশের সম্পদের উৎসসমূহের মালিকানা ও ভোগ-ব্যবহারের অধিকার সাধারণ জনগণের হাতে প্রত্যর্পণ করা হবে। জনসাধারণ ধারণা করেছিল, সাংবিধানিক বিপ্লবের পর দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূরীভূত হবে; পুরোপুরি দূরীভূত না হলেও অন্ততঃহ্রাস পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, বরং ইরানের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু ছিল ইরানের বাজারগুলোতে বিজাতীয়দের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে তা-ও অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক চাপ কোন কোন সময় এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, দেশের কোন কোন এলাকায় মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাতে বহু লোক প্রাণ হারায়। এসব

www.pathagar.com

সমস্যাও জনগণকে এমন একটি সরকারের জন্য আগ্রহী করে তোলে যে সরকার দেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের অঙ্গীকার করবে।

৩। **আলেম সমাজকে কোণঠাসাকরণ ঃ** ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, সামাজিক ও সামষ্টিক বিপদাপদ ও জাতীয় দুর্যোগকালে ইরানী জনগণের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ওলামায়ে কেরাম সাংবিধানিক বিপ্লব পরবর্তী সরকারগুলোর দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। সাংবিধানিক বিপ্লবের পরে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তাঁরা সেই দ্বিতীয় মজলিস থেকেই ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের স্লোগান তোলেন এবং পরবর্তী কয়েক বছরে বিদেশী ও বিজাতীয় শক্তির এজেন্টরা এমনভাবে ময়দান দখল করে নেয় যে এর ফলশ্রুতিতে ময়দানে আলেম সমাজের সক্রিয় উপস্থিতি হ্রাস পায়। যদিও বিভিন্ন সময় আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেস সমকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠতম আলেম-ব্যক্তিত্ব হিসেবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে গেছেন, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর ন্যায় আরো কয়েকজন আলেমের ময়দানে উপস্থিতি নিঃসন্দেহে গোটা আলেম সমাজের ময়দানে উপস্থিত থাকার সমতুল্য হতে পারেনি। রেযা খান যখন তাঁর উপনিবেশবাদী প্রভুর লক্ষ্য বাস্তবায়নের চিন্তা করছিলেন তখন ওলামায়ে কেরাম কোণঠাসা না থাকলে এবং সমাজে সক্রিয় উপস্থিতি বজায় রাখলে নিঃসন্দেহে রেযা খানের স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটত না। আমরা দেখেছি, এমন কি মাত্র একজন আলেমের অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেসের সক্রিয় উপস্থিতিই রেযা খানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে পরিগণিত হত। এ কারণেই রেযা খান আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেসের চেয়ে বেশী আর কাউকে ভয় করতেন না।

টীকা ঃ

(১) মোতাবেক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ।

(২) مجلس مؤسسان

(৩) مجلس شورای ملی— জাতীয় পরামর্শ সভা। তৎকালীন মজলিসের পূর্ণ নাম।

(৪) بندر تر کمن (بندر شاه سابق)— কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত: খোরাসান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) بندر امام خمینی (بندر شاهپور سابق)— পারস্য উপসাগরের পূর্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত: খুজিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) হিজাব পরিত্যাগ এবং পশ্চিমাদের উদ্ভাবিত ভোগ্যপণ্য বিক্রির মধ্যকার সম্পর্কটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রূপের প্রদর্শনী এবং প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার ও চোখ ধাঁধানো জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। প্রসাধনী বা তার উপকরণাদি এবং জমকালো পোশাকের বেশীর ভাগ উপাদান-উপকরণ এখনো পাশ্চাত্য থেকে আসে। এতদসংক্রান্ত আমদানীর নিখুঁত পরিসংখ্যান নেয়া হলেই পশ্চিমা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এর সম্পর্কের গভীরতা পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হতে পারে। বলা বাহুল্য যে, দরিদ্র পরিবার ও দরিদ্র দেশের নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথে এ ধরনের বিলাস সামগ্রী ও প্রসাধনীর ব্যবহার এক বিরাট বাধা। আর এ বাধা দাঁড়িয়ে আছে হিজাব পরিত্যাগ ও রূপের প্রদর্শনীর ওপর।— অনুবাদক

(৭) مسجد گوهر شاد

(৮) ویلیام ناکس دارسی— বৃটিশ পুঁজিপতি।

(৯) মোতাবেক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

(১০) স্মর্তব্য, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং তার এজেন্টরা প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সাজানো নাটকের মঞ্চায়ন করে সরলমনা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে। — অনুবাদক

www.pathagar.com

(১১) League of Nations — বর্তমান জাতিসংঘের পূর্বসূরি যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয়েছিল।

(১২) মোতাবেক ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ।

(১৩) মোতাবেক ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ।

(১৪) মূল্যের পরিমাণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।— অনুবাদক

(১৫) এই ন্যূনতম দেয় অঙ্কটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা এত বড় একটি দেশের মোট তেলসম্পদ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে দেয়ার জন্য অঙ্গীকার করা হয়।— অনুবাদক

(১৬) المامور معذور— এটা একটা আরবী বাক্য যা ফার্সীতে প্রবচনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর মানে হচ্ছে কারো হুকুমের অধীন ব্যক্তিমাত্রই অক্ষম হয়ে থাকে।— অনুবাদক

(১৭) مولای متقیان— মোত্তাকীগণের অভিভাবক; হযরত আলীর (আঃ) উপাধি।

(১৮) রেযা খান যে কিরূপ ভণ্ডামী করে নিজেকে ধার্মিক প্রমাণের চেষ্টা করতেন এবং কপট ধার্মিকতার দ্বারা জনগণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতেন। তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতিটি। রেযা খান অস্থায়ীভাবে রাজকীয় ক্ষমতা লাভের পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের শাহ্ পদে অভিষিক্ত হবার প্রায় একমাস পূর্বে ফার্সী ১৩০৪ সালের ১১ই অবান তারিখে (মোতাবেক ২রা নভেম্বর ১৯২৫ খৃস্টাব্দে) তাঁর এ বিবৃতিটি জনসাধারণকে সম্বোধন করে প্রচারিত হয়। এতে বলা হয়ঃ

"সর্বসাধারণ জনগণ! ... জেনে রাখুন যে, ... আমি সব সময়ই আমার চিন্তা-বিশ্বাস ও অন্তরের অনুভূতির শীর্ষে দুটো মূলনীতিকে স্থান দিয়ে এসেছি ...

১। ইসলামের সুস্পষ্ট শরয়ী হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন এবং

২। সাধারণ গণ-মানুষের কল্যাণ সাধন।

সাধারণ গণ-মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, যুগের পর যুগ দীর্ঘ বহু বছর যাবত ইরানে এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পরিত্যক্ত হয়ে ছিল যদিও এর বাস্তবায়ন ক্ষমতাসীনদের জন্যে অপরিহার্য ও প্রাথমিক পর্যায়ের ফরজ কাজসমূহের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও তা এমনভাবে ভুলে যাওয়ার ও পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বর্তমানে আফসোস করা ও বেদনা অনুভব করা ছাড়া তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা প্রদান করা সম্ভব নয়।

যেহেতু পাপাচারের (منکرات) বিস্তার সাধন ইসলামের অকাট্য মৌল নীতিমালার বিরোধী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে সেহেতু দৃঢ়তার সাথে আদেশ করছি যে, আজ থেকেই সমগ্র ইরানে মাদক পানীয় বিক্রির দোকানসমূহ এবং জুয়া খেলার আড্ডাগুলো তালাবদ্ধ ও বন্ধ থাকবে; প্রাদেশিক শাসকবর্গ ও দেশের সকল স্থানে প্রশাসকবর্গ এবং সেনাবাহিনীর আমীর (অধিনায়ক)গণের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলো যে, এই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এবং এই ব্যতিক্রমবিহীন আদেশটিকে অকাট্যভাবে ও পূর্ণ শক্তিতে এবং পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও কঠোরতা সহকারে বাস্তবায়ন করবেন।

পরিশেষে একদিকে নেশাখোরদের, এমন কি যারা প্রকাশ্যতঃ ও বাহ্যতঃ নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হবার ভান করছে তাদেরকেও, মানবিক বোধ, মনুষ্যত্ব, জাতীয় মর্যাদা ও জাতিত্বের গৌরবের কথা এবং সবশেষে মানবিক প্রকৃতি ও আত্মসম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, অন্যদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আদেশ করছি যে, তাঁরা যেন উপরোল্লিখিত গুণাবলীর (সংরক্ষণ) কে নিজেদের সর্বাধিক অকাট্য দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেন এবং যখনই সাধারণ মানুষের চলাচলের পথে উক্ত কাঙ্ক্ষিত অবস্থার ব্যতিক্রম কাউকে দেখতে পাবে তাকে মনুষ্যত্বের কাতার থেকে বহির্গত বলে মনে করবে এবং নির্দ্বিধায় শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর আওতাধীন কারাগারসমূহে নিয়ে আসবে যাতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এভাবে ইরানের ভবিষ্যত প্রজন্ম বিলুপ্তি ও অবনতির হাত

www.pathagar.com

থেকে বেঁচে যায় এবং তাদের সততা, আমানতদারী, সত্যবাদিতা ও সঠিক আচরণ অন্ততঃ তাদের ইতিহাসের খ্যাতনামা নেককার লোকদের সাথে তুলনীয় হতে পারে।

দেশের অস্থায়ী হুকুমত প্রধান
এবং সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রেযা।"

(১৯) چادر—ইরানী বোরকা। এটা একটা অর্ধ বৃত্তাকার আকারের কাপড় যা দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর (মুখ বাদে) ঢেকে চলাফেরা করা হয়। চাদরের নীচে সাধারণতঃ মাথা থেকে বুক পর্যন্ত আরেকটি সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করা হয় থাকে মেগ্‌নায় বা মাগ্‌নায় (مقنه) বলা হয়; এটি মাথার সাথে আটকে থাকে। এর পরিবর্তে অনেকে একরঙা রুমাল বেঁধে মাথা ঢাকেন। চাদরের নীচে ও ঘরে পরিধেয় পোশাকের ওপরে সাধারণতঃ এক-রঙা (কালো, খয়েরী, নীল ইত্যাদি অর্থাৎ চটকদার নয় এমন রঙের) কাঁধ থেকে পায়ের টাখনু পর্যন্ত বিলম্বিত একটা ফুল হাতার ঢিলাঢালা জামা পরিধান করা হয় যাকে মান্‌তু (مانتو) বলা হয়। ইরানী আলেমদের মত অনুযায়ী রুমাল ও মান্‌তু পরিধান করলেই ন্যূনতম হিজাব রক্ষা করা হয়, তবে চাদর ও মাগ্‌নায় পরা তাকওয়ার পরিচায়ক। কিন্তু সাধারণ গণমানুষ কেবল চাদর পরিধানকারিণীদেরকেই প্রকৃত ও আন্তরিক হিজাবধারিণী বলে মনে করে।—অনুবাদক

(২০) سید الشهداء — শহীদগণের নেতা হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) উপাধি।

(২১) মেহের মাস ঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর—২২শে অক্টোবর। (১৯২৮ খৃষ্টাব্দ)।

(২২) خواف — উত্তর-পূর্ব ইরানের খোরাসান প্রদেশের একটি শহর।

(২৩) উল্লেখ্য, খফের শহর পুলিশের (شهربانی) পক্ষ থেকে মোদাররেসের জন্যে মাসিক ১৫০ রিয়াল মাসোহারা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মোদাররেস সে অর্থ পুরোপুরি নিজের জন্য খরচ করেননি, বরং কিছু কিছু করে জমিয়ে কয়েক বছর পর তিনি খফ্ শহরের এক প্রান্তে সাধারণ মানুষের জন্য একটি পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ করান।

(২৪) کاشمر — খোরাসান প্রদেশের আরেকটি শহর।

(২৫) মোতাবেক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

(২৬) سعد آباد - বর্তমান তেহরানের উত্তর প্রান্তে আলবোর্জ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত একটি বিরাট এলাকা যার পুরোটা জুড়ে রয়েছে কয়েকটি প্রাসাদ এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি ভবন, পার্ক, সুইমিং-পুল, ফোয়ারা, খেলার মাঠ ও আভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট।—অনুবাদক

(২৭) তীর মাস ঃ ২২শে জুন—২২শে জুলাই। (১৯৪১ খৃষ্টাব্দ)

(২৮) মোতাবেক ২৫শে আগস্ট, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

(২৯) باختران — তেহ্‌রান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরাক সীমান্তবর্তী প্রদেশ।

(৩০) মোতাবেক ২৭শে আগস্ট, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

(৩১) ذکاء الملك فروغی

(৩২) মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মিত্রবাহিনীর দখলের পর '৫৩-র ক্যু-দেতা পর্যন্ত ইরানের অবস্থা

ফোরুগীর প্রধানমন্ত্রীত্ব ও পাহ্‌লভী রাজত্ব পাকাপোক্ত করার প্রচেষ্টা

রেযা খানের পদত্যাগ বা অপসারণের পর তাঁকে মরিশাস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীকে ইরানের শাহী মসনদে অধিষ্ঠিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী যোকাউল্ মুল্‌ক্ ফোরুগী বিভিন্ন কলাকৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা রোধ এবং যুবরাজ ও নবনিযুক্ত শাহ্ মোহাম্মদ রেযার শক্তি ও ক্ষমতার ভিত মজবুত করার চেষ্টা শুরু করেন।

রেযা খানের পদত্যাগের পরপরই মজলিসের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ফোরুগী উক্ত পদত্যাগপত্র পাঠ করে শোনান। এ সময় মজলিসে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন ঃ "(মোহাম্মদ রেযা) যখন দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তখন তিনি জনসাধারণ ও মজলিসে শূরায়ে মিল্লীকে এ কথাটি জনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন যে, দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সাংবিধানিকতার মূলনীতি ও সংবিধানকে পুরোপুরি মেনে চলবেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ "ইরানী জনগণ জেনে রাখুন যে, আমি স্রেফ একজন সাংবিধানিক বাদশাহ্ এবং আমি সংবিধানকে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলব।" নতুন আ'লা হযরত মনে করেন যে, অতীতে যদি জনগণের প্রতি সামষ্টিক বা ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় ও জুলুম হয়ে থাকে এবং তা উচ্চ থেকে নিম্ন পদ পর্যন্ত যে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাক না কেন, নিশ্চিন্ত থাকুন যে, সে সম্পর্কে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করব যাতে অন্যায় ও জুলুম দূরীভূত হয় এবং সন্তোষজনকভাবে তার ক্ষতিপূরণ করা হয়।"

রেযা খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের পতনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্ট ভয়-ভীতি ও আতঙ্কজনক পরিবেশেরও অবসান ঘটে। ফলে জনসাধারণের ক্ষতবিক্ষত ও বেদনাপূর্ণ হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে যেকোন মুহূর্তেই একটি পবিত্র দ্বীনী ও গণমুখী আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু দু'টি কারণে এ ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি।

১। গণভিত্তিক নেতৃত্বের অভাব ঃ ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, রেযা খান তাঁর পুরো একনায়কতান্ত্রিক কালো শাসনামলে শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে তাঁর বিরোধীদেরকে হয় তাঁর আনুগত্য করে চলতে বাধ্য করেন, নয়ত তাঁদেরকে শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোদার্‌রেসের ন্যায় নির্বাসনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় রেযা খানের পতনের পর যুবরাজ ও নবমনোনীত শাহ্ মোহাম্মদ রেযা খান তাঁর হুকুমতের ভিত্তি মজবুত করতে পারেননি; তখন জনগণের মধ্য থেকে কোন নেতৃত্বের উত্থান ঘটলে এবং জনগণকে অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের দিকে পরিচালনার জন্যে তাঁর প্রস্তুতি থাকলে তিনি গণসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে পাহ্‌লভী রাজবংশের পতন ঘটাতে সক্ষম হতেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তখন এ ধরনের কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। অন্য কথায় উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তা সংঘটিত হয়নি।

www.pathagar.com

২। **ফোরুগীর ধোঁকা-প্রতারণা** ঃ রেযা খান পদত্যাগের পর দেশ থেকে চলে যান। অবশ্য দেশত্যাগকালে বঞ্চিত জনগণের রক্তমূল্যে কেনা প্রভূত পরিমাণ হীরা-জহরত রাজকোষ থেকে সাথে নিয়ে যান। রেযা খানের পতন এবং হীরা-জহরত নিয়ে দেশত্যাগের খবর অতি দ্রুত দেশের শহর-বাজার-জনপদে পৌঁছে যায়। সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং সকলে তাঁর বিচার দাবী করে।

ক্ষমতাচ্যুত শাহ্ রেযা খান দেশত্যাগের উদ্দেশ্যে তেহ্রান থেকে কের্মান উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে বন্দর আব্বাস হয়ে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা বা আর্জেন্টিনায় যাওয়ার কথা ছিল; মরিশাস গমনের বিষয়টি তখনো নিশ্চিত হয়নি। তিনি কের্মান পৌঁছতেই তাঁর দেশত্যাগের খবর সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায় এবং গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এসব গণবিক্ষোভে যেসব বক্তব্য রাখা হয় বা যেসব প্রচারপত্র বিলি করা হয় তার মধ্যে একটির বক্তব্য ছিল এরূপ ঃ "এ সংবাদ কি খুবই দুঃখজনক নয় যে, শাহী ভাণ্ডারের হীরা-জহরত সম্পর্কে তদন্ত; সংস্কৃতি, পেশা, শিল্পকলা, কৃষি, শহরায়ন ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের বিশ বছরের হিসাব; লুন্ঠিত ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর ও চারণভূমির হিসাব-নিকাশ এবং আটককৃত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও কারারুদ্ধ নিরাপরাধ লোকদের, তাদের পরিবারবর্গের ও অন্যান্য লোকদের বিচার প্রার্থনার ও তাদের অধিকার প্রত্যর্পণের পূর্বে, গোটা দেশকে বিশৃঙ্খল ও দিশাহারা অবস্থায় রেখে সাবেক শাহ্ এভাবে দেশত্যাগ করে বিশ্বের কোন দূরতম প্রান্তের কোন দেশে চলে যাবেন? এতসব লোকসান, আর এত ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব কে নেবে?"

প্রধানমন্ত্রী ফোরুগী সর্বশক্তি নিয়োগে পাহ্লভী রাজত্বের হেফাজত ও জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যে চেষ্টা করেন। তিনি জনসাধারণকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে ক্ষমতাচ্যুত শাহ্ রেযা খানের নিকট থেকে তাড়াহুড়া করে একটি পত্র লিখিয়ে নেন এবং যুবরাজ ও নবমনোনীত শাহ্ মোহাম্মা রেযার নির্দেশে তাঁর পিতার আত্মসাৎকৃত অন্যান্য সম্পদ সরকারী তহবিলে জমা করেন। অধিকন্তু তিনি এ মর্মে গুজব রটিয়ে দেন যে, মোহাম্মদ রেযা তাঁর পিতার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিরোধী ছিলেন এবং তিনি অতীতে যা কিছু হয়েছে তার ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে এক কোটি রিয়াল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে প্রদান করেছেন যা শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রদানের জন্যে ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া তিনি "সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি অফিসারের জন্য ৭ কেজি চাল ও তিন কেজি মিছরি দান করেছেন"।

জনসাধারণের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফোরুগী তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় কথাবার্তা ছড়িয়ে দেন। এ ছাড়া রেযা খানের শ্বাসরুদ্ধকর স্বৈরাচারী শাসনামলে যারা তাঁর অপরাধের সহচর ছিল তাদের অনেককে শাস্তি দিয়ে গণরোষকে কিছুটা হ্রাস করতে সক্ষম হন, কিন্তু স্বয়ং একনায়কের এবং তাঁর প্রথম কাতারের এজেন্টদের বিচার করার পরিবর্তে দ্বিতীয় সারির এজেন্টদের গ্রেফতার করেন ও বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করেন। ফোরুগীর ধোঁকা-প্রতারণা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তিনি এ পন্থায় এই এজেন্টদেরকে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

উত্তর ইরানের তেল উত্তোলন সুবিধা

সায়েদ্[১]-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় গোপনে দু'জন মার্কিন বিশেষজ্ঞকে ইরানে আনা হয় এবং সরকারের অধীনে তেলবিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মে নিয়োগ করা হয়। এ সময় ডঃ মিলেস্পু-র তত্ত্বাবধানে

www.pathagar.com

কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের অধীনে ঐ দুই ব্যক্তিকে মার্কিন ও বৃটিশ কোম্পনীগুলোর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ফার্সী ১৩২৩ সালে[২] বিজনুর্দ থেকে নির্বাচিত মজলিস সদস্য জনাব তুসী[২] ফার্সী ১৩২৩ সালের প্রথম দিকে[৩] মজলিসে শূরায়ে মিল্লীর এক প্রকাশ্য অধিবেশনে সরকারের নিকট এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন ঃ "আমি জানতে চাই এবং বিস্তারিতভাবে জানাবার অনুরোধ জানাচ্ছি যে, (তেল সংক্রান্ত) আলোচনা এ পর্যন্ত কিসের ভিত্তিতে এবং কা'দের সাথে ও কোন্ পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে? বিশেষ করে যে দু'জন আমেরিকান (ইরানে) আগমন করেছেন তাঁরা কি হিসেবে ও কিসের ভিত্তিতে এসেছেন...? তাঁরা যদি নিজেদের ইচ্ছায়ই এসে থাকেন সেক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী সরকারের সাথে পূর্বাহ্নিক আলোচনা ব্যতীত আসতে পেরেছেন বলে মনে করার কোনই উপায় নেই, আর তাঁদেরকে যদি কোন বিশেষ পদে নিয়োগ দান করে আনা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দেশে এ ধরনের চাকুরিজীবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মজলিসে শূরায়ে মিল্লী অনবহিত কেন ...?"

মজলিসের একই অধিবেশনে হেয্বে তুদেহ্র[৪] একটি উপদলের মুখপাত্র ডঃ রদ্মানেস্[৫] এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবী করেন। তিনি বলেন ঃ "অধম আরজ করতে চাই যে, বিদেশী সরকারগুলোকে সুবিধা দানের ব্যাপারে আমি আমার (সরকারী পক্ষীয়) বন্ধুদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি।"

এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মজলিসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, বিভিন্ন মার্কিন ও বৃটিশ তেল কোম্পানী সরকারের নিকট প্রস্তাব দিয়েছে; এ ব্যাপারে কোন বিষয় গোপন রাখা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং সরকারের উদ্দেশ্য ছিল উক্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা এবং নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তেল সংক্রান্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। ডঃ রদ্মানেশের বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সায়েদ বলেন ঃ "এটা হচ্ছে একটা মতামত দানের বিষয় এবং এটা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট; এব্যাপারে মজলিস যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, সরকার মজলিসের মতামতেরই অণুসরণ করবে।"

ডঃ রদ্মানেশ কর্তৃক যেকোন বিদেশী সরকারকে তেল-সুবিধা প্রদানের বিরোধিতা অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তর ইরানের তেল — সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পূর্বের কথা। তিনি যদি জানতেন যে, খুব শীঘ্রই সোভিয়েত ইউনিয়নও উত্তর ইরানের তেল-সুবিধা লাভ করতে চাইবে তাহলে নিঃসন্দেহে মজলিসে এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করতেন না।

এরপর ১৩২৩ ফার্সী সালের ১৫ই শাহ্রীভার[৬] মস্কোতে নিয়োজিত ইরানী রাষ্ট্রদূত জনাব অহী[৭] তেহ্রানে খবর পাঠান যে, সেম্নান প্রদেশের[৮] খুরিয়ানের[৯] তেল সম্পর্কে আলোচনার জন্যে একটি সোভিয়েত প্রতিনিধিদল খুব শীঘ্রই তেহ্রান আসবেন। কয়েক দিন পরেই উক্ত প্রতিনিধিদল তেহরানে আসেন। প্রতি নধিদলটি উত্তর ইরানের তেলসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর সেখানকার তেল-সুবিধা চেয়ে প্রস্তাব দেন।

ইতিমধ্যে ১৩২৩ ফার্সী সালের ১৬ই শাহ্রীভার[১০] প্রধানমন্ত্রী সায়েদ্ মজলিসে শূরায়ে মিল্লীর এক রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে ঘোষণা করেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যুদ্ধের সমাপ্তি এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তেল-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি স্থগিত থাকবে। তিনি রুশ প্রতিনিধিকেও একই জবাবই দেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরান সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ জবাবকে তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে এবং আগত সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা এ জবাবকে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতির প্রবণতা বলে আখ্যায়িত করেন।

www.pathagar.com

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলকে সরকারের পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হলে, ইতিপূর্বে যে তুদেহ্ পার্টির লোকেরা যেকোন বিদেশীদেরকে তেল-সুবিধা দেয়ার বিরোধী ছিলেন, একবারে হঠাৎ করে তাঁরা মত পরিবর্তন করে ফেললেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, তেল-সুবিধা প্রদানের মূল বিষয়টির বিরোধিতা করা যায় না, বরং মূল কথা হচ্ছে কিভাবে ও কি শর্তে দেয়া হবে।

এভাবে উত্তর ইরানের তেল-সুবিধা বিদেশীদের প্রদানের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে যখন বিতর্ক চলছিল, ঠিক এ সময় প্রধানমন্ত্রী সায়েদ্ পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থলে বায়াত্[১১] প্রধানমন্ত্রী হলেন। এহেন পরিস্থিতিতে ডঃ মোসাদ্দেক মজলিসের অধিবেশনে জোর দিয়ে বললেন, সরকারের "ভারসাম্যপূর্ণ নেতিবাচক নীতি" অনুসরণ করা উচিত এবং কোন দেশকেই নতুন কোন তেল-সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি এ ব্যাপারে মজলিসে একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে মজলিস পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে। এ পরিকল্পনায় বলা হয় যে, সরকার তেল সম্পর্কে কোন দেশের সাথেই আলোচনা করতে পারবে না। কেউ এর লঙ্ঘন করলে তাকে কারাদণ্ড দেয়ার জন্যেও এতে বিধান রাখা হয়।

বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার আবেদন এবং রাশিয়া ও বৃটেনের ভিন্ন ভিন্ন নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সরকারী নেতৃবৃন্দ ও দেশের সংবাদপত্রগুলো বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট ইরান থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেয়ার আবেদন জানান। তখনো জাপানী প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু জাপান ও ইরানের মধ্যকার বিরাট দূরত্ব সত্ত্বেও প্রথমে বৃটিশ ও সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করে যে, জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার ছয় মাসের মধ্যে তারা ইরান থেকে নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহার করবে না, তবে তারা ইরানের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্বকে স্বীকার করছে। অবশ্য ইরানের আবেদনের কিছু দিন পরে বৃটেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইরান থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেবে। কারণ, বৃটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানে তার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি অব্যাহত রেখে সেখানে তার তাবেদার লোকদের ও রাজনৈতিক দলগুলোকে শক্তিশালী করতে চায়; এছাড়া ভবিষ্যতে সুবিধা লাভের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে চায়।

কিন্তু বৃটিশ নেতাদের বিপরীতে সোভিয়েত নেতারা ইরান থেকে তাঁদের সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে মোটেই তাড়াহুড়া দেখালেন না। কারণ তাঁদের পক্ষে ইরানে তাঁদের সেনাবাহিনীর অবস্থান দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে ইরানে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালানো এবং তাঁদের এদেশীয় সমর্থকদের সাহায্য করা সম্ভব ছিল। এর ফলে সমাজতন্ত্রের দিকে অভিযাত্রার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী একটি কাম্য রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং ইরানকে সোভিয়েত শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল।

স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র

ইরানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকালে তাদের সার্বিক সহায়তা লাভ করে 'আজারবাইজানের গণতান্ত্রিক দল'[১২] যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। দলটি একটি ইশতেহার প্রকাশ করে এবং তাতে ইরানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আজারবাইজানকে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন

www.pathagar.com

প্রদানের দাবী জানায়। বৃটেন সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে দক্ষিণ ইরান থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেয় এবং প্রস্তাব দেয় যে, সোভিয়েত সরকারও যেন অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের জবাব ছিল নেতিবাচক। ফলে গণতান্ত্রিক দল সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার কর্মীদের সশস্ত্র করার পদক্ষেপ রনয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এরূপ ভান করে যে, আজারবাইজানের গণতান্ত্রিক দলের এসব পদক্ষেপের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইরানী সশস্ত্র পুলিশ বা সেনাবাহিনীর ইউনিট এদের দমন করার জন্যে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে মস্কো তাতে বাধা দেয়। ফলে কিছু দিন পর গণতান্ত্রিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে আজারবাইজানের পূর্ণ স্বশাসন ঘোষণা করে। এরপর কিছুদিন না যেতেই সাইয়েদ জাফার পীশেভারী[১৩] (যিনি জাঙ্গালী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন) স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট করে সরকার গঠন করেন।

একই সময় কুর্দিস্তানে[১৪] কাজী মোহাম্মদ অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং সোভিয়েত বাহিনীর ইরান ত্যাগ

প্রধানমন্ত্রী হাকীমীর[১৫] মন্ত্রিসভার পতনের পর সাইয়েদ যিয়াউদ্দিনের বিরোধিতা সত্ত্বেও কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য উমেদার হন এবং এবারে রুশরা তাঁকে সমর্থন করায় তিনি ১৩২৪ ফার্সী সালের বাহ্মান মাসে[১৬] মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর অচিরেই তিনি উত্তর ইরানের তেলসম্পদ উত্তোলন প্রশ্নে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা এবং আজারবাইজান সমস্যা ও ইরান থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার প্রশ্নে আলোচনার জন্যে রাশিয়া সফরে গমন করেন।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ তাঁর রাশিয়া সফরকালে স্তালিন এবং তৎকালীন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোতোভের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হওয়ায় তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে কিছুদিন পর রুশরা ইরানের মজলিসে শূরায়ে মিল্লীর অনুমোদন সাপেক্ষ একটি ইরান-রুশ যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর ইরান থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং ইরানে তাদের বন্ধুদেরকে একা ফেলে যেতে বাধ্য হয়। কিছুদিন পর ইরানের কেন্দ্রীয় সরকার আজারবাইজান ও কুর্দিস্তানের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়।

ইরানে মার্কিন প্রভাবের ক্রমবিস্তার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সাথে তেমন একটা জড়িত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকা মিত্রশক্তিকে সীমিত পরিমাণ অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য প্রদান করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর আমেরিকা ইউরোপের পরস্পর বিবদমান দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হয় এবং একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং নাজীবাদের বিপদ তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়ার পর

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে আমেরিকা মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যুদ্ধে যোগদান করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে দেখা গেল এ যুদ্ধে একমাত্র যে দেশটি ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে সে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত প্রতিটি দেশের রাজধানী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এসব দেশের বড় বড় শহর এবং শিল্পকেন্দ্রগুলোও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়; বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত, আহত ও পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে না তার শিল্পকেন্দ্রগুলোকে হারাতে হয়, না তার শহরগুলো ধূলিস্যাৎ হয়, না তার অর্থনীতিতে সংকট, বিশৃঙ্খলা বা টানাপড়েন দেখা দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন যে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা যুদ্ধপরবর্তীকালে দেশটিকে খুবই দুর্বল করে ফেলে। এতে বৃটেন যতখানি দুর্বল হয় তা তার চেয়েও বেশী পরিমাণে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির কারণ হয়। ফলে আমেরিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৃটেনের সাথে প্রতিযোগিতা করে ধীরে ধীরে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার এবং নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার মত সম্ভাবনার অধিকারী হয়।

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনো একটি উপনিবেশবাদী দেশ হিসেবে গণ্য হত না। এই পরিচিতির সদ্ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের পরপদানত জাতিগুলোকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে নিজেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রবক্তা এবং উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের নিশানবরদার হিসেবে তুলে ধরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদী পদক্ষেপের নিন্দা করতে থাকে এবং প্রচার করতে থাকে যে, বিশ্বের বড় দেশগুলোর উচিত পশ্চাৎপদ দেশগুলোতে লুণ্ঠন চালানোর পরিবর্তে তাদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে সাহায্য করা।

বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক তাঁর বিখ্যাত "চার নীতি"[১৭] ঘোষিত হবার পর আমেরিকানদের প্রচারাভিযান এমনই ব্যাপকতা লাভ করে যে, অনেক দেশেরই জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সত্যি সত্যিই এর দ্বারা প্রতারিত হন এবং তাঁরা বিশ্বাস করতে থাকেন যে, আমেরিকানরা যে মুখরোচক শ্লোগান তুলছে তা পুরোপুরিই তাদের মনের কথা এবং বাস্তব ভিত্তিক। ইরানেও বৃটিশদের প্রতি জনমনে বিরাজমান ঘৃণা ও আক্রোশের প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রচার বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং সাধারণ জনমত কমবেশী আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ইরানে মার্কিন প্রভাব সীমিতকরণে বৃটিশ প্রচেষ্টা

সোভিয়েত বাহিনীর ইরানে অবস্থানকালে বৃটেনের জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। বৃটেন আশঙ্কা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ত ইরানকে বিভক্ত করে ফেলবে এবং এই শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশটি ইরানী ভূখণ্ডে অগ্রাভিযান চালিয়ে বসবে। এমতাবস্থায় বৃটেন ইরানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি। কিন্তু ইরান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পর বৃটেন ইরানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধিতা শুরু করে এবং এখানে তার ভিত মজবুত করার চেষ্টা করতে থাকে।

এ ব্যাপারে বৃটিশদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাওয়ামুস্ সাল্তানাহর ওপর চাপ সৃষ্টি। বৃটিশরা তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে কাওয়ামের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে ফার্সী ১৩২৬ সালের অযার মাসে[১৮] তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

www.pathagar.com

এ সময় শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভী মনে করছিলেন তাঁকে সিংহাসনে টিকে থাকতে হলে, যে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী তার নিকট তাঁকে আশ্রয় নিতে হবে। তাই তিনি আমেরিকাকে আশ্রয় করে তাঁর দুর্বল অবস্থানকে শক্তিশালী করার চিন্তা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিতার ন্যায়, বৃহৎশক্তিকে আশ্রয় করে দেশের পুরো ক্ষমতা নিজের মুঠোয় নিয়ে আসা। এ চিন্তার ভিত্তিতে তিনি আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। কিন্তু শাহ্ আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলায় বৃটেন ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়।

এ পরিস্থিতিতে ইরানে বৃটেনের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ইরান সফরে আসেন। তিনি ইরানে এসে সাইয়েদ যিয়াউদ্দিনের ন্যায় বৃটিশ তাঁবেদার এবং অন্যান্য তাবেদারের সাথেও সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। এদিকে ইরানে তাঁদের তাবেদার সংবাদপত্রগুলোও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। ফলে ইডেন শাহের ও শাহী দরবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারজনিত চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণ ইরানের উপজাতীয়দেরকে শাহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে মাঠে নামানো হয়। এতে মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর সিংহাসনের ভিত প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অগত্যা শাহ্ লন্ডন সফরে যেতে এবং দু'দেশের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে সম্মত হন।

শাহের বৃটেন সফরের পর ইরানের শাসকগোষ্ঠী পুনরায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর অনুগত হয়ে যায় এবং তাদের ওপর আমেরিকার প্রভাব কিছুদিনের জন্য হ্রাস পায়। কিন্তু প্রথমতঃ এটা ছিল সাময়িক ও স্বল্পকালীন অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ ইরানের শাসকগোষ্ঠীর ওপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস পেলেও এখানে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব আগের মতই অব্যাহত থাকে, বরং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র পরে হাকীমী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তিনি একদিকে মার্কিন কোম্পানী মরিস-নওসেন-এর[১৯] সহযোগিতায় প্রণীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করেন, অন্যদিকে ইরানে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং আগের চেয়েও ব্যাপক বিস্তৃত হয়। সামরিক দিক থেকেও একই অবস্থা বহাল থাকে। কারণ ইরানী সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাগণ আগের মতই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন।

গেস্-গোল্শয়িয়ান্ চুক্তি

হাকীমী কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মসূচিতে সফল হতে পারেননি। তাছাড়া তিনি মূলতঃ বৃটিশ তাঁবেদার ছিলেন। আমেরিকানরা তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করত না বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়। ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

হাকীমীর পরে হোজায়র[২০] প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তিনিও সুবিধা করতে পারেননি। কিছুদিন পর তিনি সায়েদের হাতে প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান।

সায়েদ পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বৃটিশ তেল কোম্পানীর সাথে ইরানী তেল প্রশ্নে আলোচনা শুরু করেন। বৃটিশ ও ইরানী প্রতিনিধি যথাক্রমে গেস্[২১] ও গোল্শয়িয়ান্[২২] বিস্তারিত আলোচনার পর ১৯৩৩-এর তেলচুক্তির সাথে সংযোজনের জন্যে একটি সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় স্থির হয় যে, প্রধানমন্ত্রী সায়েদ চুক্তিটি মজলিসে পেশ করবেন এবং অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সায়েদ যখন চুক্তিটি পঞ্চদশ মজলিসের শেষ অধিবেশনে পেশ করেন তখন তাঁর ধারণার বিপরীতে মজলিসে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

প্রধানমন্ত্রী সায়েদ ও তাঁর বৃটিশ প্রভুরা ধারণা করেননি যে, মজলিসের সংখ্যালঘু[২৩] বৃটিশবিরোধী সদস্যগণ এ চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করাতে সক্ষম হবেন। এতে তাঁরা ভীষণ রুষ্ঠ হন। অন্যদিকে চুক্তিটি মজলিসে পাস না হওয়ায় সর্বত্র জনমনে এর বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং এ নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ফলে ইরানী জনগণ পূর্ববর্তী চুক্তি অর্থাৎ ১৯৩৩-এর চুক্তির উপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়। এভাবে এ চুক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিরোধিতার এবং তেলসম্পদ জাতীয়করণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

প্রধানমন্ত্রী সায়েদ সম্পূরক তেলচুক্তিতে মজলিসের অনুমোদন নিয়ে তাঁর প্রভুদের যে খেদমত করতে চেয়েছিলেন তাতে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পর আলী মান্‌ছুর পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী হন।

ইতিমধ্যে ষোড়শ মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শ মজলিসের অধিবেশন বসলে প্রধানমন্ত্রী আলী মান্‌ছুর সম্পূরক তেলচুক্তি সংক্রান্ত বিলটি পুনরায় মজলিসে উত্থাপন করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু মজলিস সদস্যদের ও জনসাধারণের চাপের মুখে মজলিস বিলটিতে অনুমোদন দানে বিরত থাকে।

ফার্সী ১৩২৯ সালের ৫ই তীর[২৪] অপ্রত্যাশিতভাবে আলী মান্‌ছুরের সরকার পদত্যাগ করে। এর কয়েক ঘন্টা পর সশস্ত্র বাহিনীর স্টাফ প্রধান[২৫] রায্‌ম্ আরা[২৬] নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী আলী মান্‌ছুর যখন সম্পূরক তেলচুক্তির বিল ষোড়শ মজলিসে উপস্থাপন করেন তখন ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী তেলচুক্তিগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকে এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত সকল তেলচুক্তি বাতিলের সপক্ষে গুঞ্জন ওঠে। মজলিসের কোন কোন সদস্য তেলসম্পদ জাতীয়করণ করার জন্যেও আহ্বান জানান। এরূপ পরিস্থিতিতে রায্‌ম্ আরা প্রধানমন্ত্রী হন। মূলতঃ রায্‌ম্ অরা বিজাতীয়দের তাঁবেদারির ক্ষেত্রে অনেকটা অন্ধপ্রকৃতির ছিলেন। এ কারণে উপনিবেশবাদ বিরোধী এ নবসূচিত আন্দোলন মোকাবিলার বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই রায্‌ম্ আরাকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করা হয়।

দ্বীনী ও জাতীয় শক্তির[২৭] পারস্পরিক সহযোগিতা

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, গেস্-গোল্‌শয়িয়ান চুক্তি পঞ্চদশ মজলিসের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয় এবং এ সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ষোড়শ মজলিসের ওপর অর্পিত হয়। ইরানের তেলসম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে প্রণীত এ চুক্তির বিরোধিতা এবং বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বীনী শক্তি ও জাতীয় শক্তি গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

ঐ সময় ইরানের দ্বীনী-রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ কাশানী। তিনি জনগণের মধ্যে বিরাট প্রভাবের অধিকারী এবং খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি গেস্-গোল্‌শয়িয়ান্ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং এ ব্যাপারে ডঃ মোসাদ্দেকের মতামতের প্রতি সমর্থন জানান। ইতোপূর্বে সরকার আয়াতুল্লাহ্ কাশানীকে নির্বাসিত করেছিল; তিনি নির্বাসন থেকেই ইরানের জাতীয়

www.pathagar.com

মজলিসের উদ্দেশে একটি বাণী পাঠান। ডঃ মোসাদ্দেক ষোড়শ মজলিসের প্রথম দিককার এক অধিবেশনে এটি পাঠ করে শোনান। এ বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাণীতে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী তাঁকে বেআইনীভাবে নির্বাসিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং মনোনীত পদ্ধতিতে গড়া প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের[২৮] সকল সিদ্ধান্তকে ও চাপিয়ে দেয়া তেলচুক্তিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

তেলসম্পদ জাতীয়করণের বিষয়টি সর্বত্র মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। অন্যদিকে স্বৈরাচারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেলসম্পদ জাতীয়করণের সম্ভাবনা রোধের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। কিন্তু সরকারী চাপ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে জনবরেণ্য দুই নেতা আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও ডঃ মোসাদ্দেকের পারস্পরিক সহযোগিতাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বস্তুতঃ আয়াতুল্লাহ্ কাশানী এবং ডঃ মোসাদ্দেক— এ দুই নেতাই সুদীর্ঘ সংগ্রামী অতীতের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে বহুদিন পূর্ব থেকেই তাঁরা স্বৈরাচারী ও উপনিবেশবাদী শক্তির আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। রায্‌ম্ আরার সরকার গঠনের সময় এ দুই নেতার পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা রায্‌ম্ আরার প্রধানমন্ত্রীত্বের বিরোধিতা শুরু করেন। এবারও আয়াতুল্লাহ্ কাশানী রায্‌ম্ আরার বিরোধিতা করে একটি ঘোষণা প্রদান করেন এবং ডঃ মোসাদ্দেক তা মজলিসে পাঠ করে শোনান।

এভাবে দ্বীনী এবং জাতীয় শক্তির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত সুফল আসে। ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

তেলশিল্প জাতীয়করণের সংগ্রাম

ষোড়শ জাতীয় মজলিস গেস্-গোল্‌শয়িয়ান চুক্তিটি বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য এতদুদ্দেশ্যে গঠিত মজলিসের বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করে। ডঃ মোসাদ্দেক ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। তিনি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তিনি উইলিয়াম ড্যার্সির চুক্তি, ১৯৩৩-এর চুক্তি ও গেস্-গোল্‌শয়িয়ান সম্পূরক চুক্তির বৈধতা স্বীকার করেন না এবং এ চুক্তিগুলো কার্যকারিতা হারিয়েছে; অতএব, এসব চুক্তির বদৌলতে ইরানের তেলসম্পদের ওপর লুণ্ঠন অব্যাহত রাখা যাবে না।

১৩২৯ ফার্সী সালের ২০শে মেহের তারিখে[২৯] মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিসের সংখ্যালঘু সদস্যগণ রায্‌ম্ আরার সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং সরকারকে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকার জবাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যে, গেস্-গোল্‌শয়িয়ান্ সম্পূরক চুক্তি কার্যকর করার পক্ষপাতী এবং এ চুক্তির সমর্থনে বক্তব্য রাখবে। সরকারের বক্তব্যের পর সরকারকে অপসারণের প্রস্তাব প্রশ্নে সংখ্যাগুরু সদস্যরা নীরব থাকেন এবং তেল সংক্রান্ত বিশেষ কমিশন তার কাজ অব্যাহত রাখে।

১৩২৯ ফার্সী সালের চৌঠা অযার তারিখে[৩০] ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিসের সংখ্যালঘু সদস্যগণ সারা ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু বিশেষ কমিশন এ প্রস্তাবটি গ্রহণে অসম্মতি জানায়। ফলে তেলশিল্প জাতীয়করণের সংগ্রাম আগের ন্যায় অব্যাহত থাকে। এদিকে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম তেলশিল্প জাতীয়করণের সপক্ষে জনমত গঠনে নেমে যান এবং সরকার ও তেলশিল্প জাতীয়করণের বিরোধিতাকারী মজলিস সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। আয়াতুল্লাহ্ কাশানী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান ঃ আপনারা তেলশিল্প

www.pathagar.com

জাতীয়করণের দাবীতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবেন যতক্ষণ না বৃটিশ তেল কোম্পানীর সমর্থক মজলিস সদস্যরা অনন্যোপায় হয়ে জনগণের আনুগত্য করতে বাধ্য হন।

তেলশিল্প জাতীয়করণ রোধে রায্‌ম্ আরা ও বৃটিশ সরকারের প্রচেষ্টা

তেলশিল্প জাতীয়করণের দাবীতে সৃষ্ট আন্দোলন চরমে উপনীত হওয়ার পর বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের ইরানী এজেন্টরা জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে।

বৃটিশরা প্রথমে "নতুন স্বাধীন আরব রাষ্ট্র"[৩১] প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। তাদের প্রস্তাবিত এ নতুন রাষ্ট্রে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার বৃটিশ তাঁবেদার রাষ্ট্রনিচয় অর্থাৎ কুয়েত, ওমান, বাহ্‌রাইন ও কাতার এবং ইরানের (তেলসমৃদ্ধ) আরব অধ্যুষিত এলাকা অর্থাৎ খুজিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়। এ ছাড়াও ইরানী জনগণের ওপর আরো অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা ইংলিশ ব্যাঙ্কের[৩২] ইরান শাখা বন্ধ করে দেয় এবং ব্যাংকের দেয়া দশ লাখ পাউন্ড আমানত ব্যাংককে ফেরৎ দেয়ার জন্যে ইরান সরকারের নিকট দাবী জানায়। এ ছাড়া বৃটিশরা ইরানী ব্যবসায়ীদেরকে যে ঋণ দিয়েছিল তা ফেরৎ দেয়ার জন্যেও দাবী জানায় এবং ঋণের অর্থ উক্ত ব্যাংকে জমা দিতে বলে। অন্যদিকে দক্ষিণ ইরানে তেল উত্তোলনরত বৃটিশ কোম্পানী যেখানে প্রতি বছর ১৫ কোটি তুমান[৩৩] অর্থ বাজারে ছাড়ত ইরানের অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সে অর্থ তুলে নেয় এবং পুনরায় বাজারে ছাড়তে বিরত থাকে।

এভাবে একদিকে যেমন ইরানী জনগণের ওপর বৃটিশদের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী রায্‌ম্ আরা তেলশিল্প জাতীয়করণের উদ্যোগ নস্যাৎ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। তিনি মজলিসের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বৃটিশ তেল কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করে কথা বলেন এবং ইরানী জাতিকে অযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি দাবী করেন যে, এত বড় তেলশিল্পের পরিচালনা তো দূরের কথা, একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী চালানোর যোগ্যতাও ইরানীদের নেই। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা তো এখনো নিজস্ব জনশক্তির দ্বারা একটা সিমেন্ট কারখানাও চালাতে সক্ষম নন, আপনারা যখন কারিগরি শক্তির অভাবে দেশের কলকারখানাগুলোকে বর্তমান অবস্থায় ফেলে রেখেছেন, যার ফলে এগুলো লোকসান দিচ্ছে, এমতাবস্থায় কোন্ জনশক্তি ও কোন্ উপায়-উপকরণের দ্বারা নিজেরা তেল উত্তোলন করতে চাচ্ছেন এবং (তেলশিল্পের) জাতীয়করণ করতে চাচ্ছেন?"

ফেদাইয়ানে ইসলাম[৩৪] : রায্‌ম্ আরার বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড

ইরানের মুসলিম জনগণের উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং বিজাতীয়দের ও তাদের এজেন্টদের চাপ উভয়ই যখন তুঙ্গে উঠেছে, ঠিক তখনি 'ফেদাইয়ানে ইসলাম' নামে একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এ সংগঠন বিজাতীয় শক্তির এজেন্টদের খতম করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তরুণ সংগ্রামী আলেম শহীদ নবাব সাফাভী[৩৫]।

শহীদ নবাব সাফাভী অপর কায়েকজন মুসলিম যুবককে সাথে নিয়ে ফেদাইয়ানে ইসলাম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তেমনি পতিতালয়সহ সকল প্রকার অশ্লীলতার কেন্দ্র এবং মদের দোকান বন্ধ করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

www.pathagar.com

বিপ্লবী আলেম নবাব সাফাভীকে শাহী সরকারের জল্লাদরা শহীদ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে

ফেদাইয়ানে ইসলাম মনে করতো কেবল নির্বাচনী সংগ্রাম ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব নয়, এজন্যে প্রয়োজনবোধে বিপ্লবী কায়দায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়াও অনুসরণ করতে হবে। এ কারণে তাঁরা যেক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য করতেন বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন। আর জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁরা যেসব বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী রায্‌ম আরাকে হত্যা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ইতোপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, রায্‌ম আরা ছিলেন তৎকালীন ইরানের সবচেয়ে বড় বৃটিশ এজেন্ট। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণ করার তীব্র বিরোধিতা করেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি গণআন্দোলনকে দমন করে তাঁর প্রভুদের যত বেশী সম্ভব খেদমত করতে চাচ্ছিলেন। এমনি এক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ফেদাইয়ানে ইসলাম সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উপনিবেশিক শক্তির এ এজেন্টকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় গণআন্দোলনকে মারাত্মকভাবে দমন করার এবং আন্দোলনের সাফল্য পিছিয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৩২৯ ফার্সী সালের ১৬ই এস্‌ফান্দ্ তারিখে[৩৬] খালীলে তাহ্‌মাসোবী[৩৭] নামে ফেদাইয়ানে ইসলাম সমিতির একজন সদস্য রায্‌ম্ আরাকে গুলী করে হত্যা করেন। এভাবে তিনি ইরানী জনগণের আন্দোলন দমনের স্বৈরাচারী ও উপনিবেশবাদী পরিকল্পনা কার্যকর করার পথে বাধা সৃষ্টি করেন এবং যে আন্দোলন বিজাতীয়দের থাবা থেকে ইরানের জাতীয় সম্পদকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সে আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেন।

www.pathagar.com

জনগণের বিজয় ও তেলশিল্পের জাতীয়করণ

রায্‌ম্ আরার বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড জনগণের সংগ্রামী চেতনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে। ফলে সরকার ও মজলিসে বিজাতীয়দের উচ্ছিষ্টভোগীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। রায্‌ম্ আরার বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর দিন অর্থাৎ ফার্সী ১৩২৯ সালের ১৭ই এস্‌ফান্দ্[৩৮] মজলিস তেল কমিশনের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন প্রদান করে। ২৪শে এস্‌ফান্দ্ (১৩২৯) তারিখে[৩৯] মজলিসে শূরায়ে মিল্লীতে ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কিত একদফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৯শে এস্‌ফান্দ্ (১৩২৯) তারিখে[৪০] সিনেটেও বিলটি অনুমোদিত হয়।

এভাবে ইরানী জনগণ মজলিসের সংখ্যালঘু সদস্যদের সহযোগিতায় বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির তাবেদার সংখ্যাগুরুর মোকাবিলায় ইরানের ইতিহাসের অন্যতম প্রোজ্জ্বল গণবিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং উপনিবেশবাদ ও স্বৈরতন্ত্রকে তার সামনে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

প্রধানমন্ত্রী পদে মোসাদ্দেক

রায্‌ম্ আরার বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির আরেক সেবাদাস হোসেন আলা[৪১] প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। তিনি তেলশিল্প জাতীয়করণ আইন বাতিলের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। কিন্তু এতে সফল না হওয়ায় কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন।

হোসেন আলা'র পদত্যাগের পর মজলিস নিজস্ব উদ্যোগে ডঃ মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদানের প্রস্তাব করে। তিনি এ মর্মে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মত হন যে, তেল সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের প্রস্তাবিত ৯ধারা বিশিষ্ট বিলটি (যাতে তেলসম্পদের ওপর থেকে মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাতিল করার কথা বলা হয়েছে) পাস করতে হবে। মজলিস এ শর্ত গ্রহণ করায় মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

মোসাদ্দেক পনর মাস ইরানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে তেলশিল্প জাতীয়করণে ইরানের অধিকার ও গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা প্রমাণে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি দেশের ভিতরের ও বাইরের বিরাট ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। দেশের অভ্যন্তরে মোসাদ্দেকের বিরোধীদের শীর্ষে ছিল শাহী দরবার। দরবার সব সময়ই মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকে। এমতাবস্থায় মোসাদ্দেক শাহী দরবারের হস্তক্ষেপ হ্রাস এবং দেশের পরিস্থিতিকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করার জন্যে শাহের নিকট অনুরোধ জানান।

কিন্তু শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহলভী তাঁর নিজের শক্তি বৃদ্ধি ও সরকারের শক্তি সীমিত করার ফন্দি-ফিকিরে ছিলেন; তিনি মোসাদ্দেকের আবেদন রক্ষা করা তো দূরের কথা, তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৩৩১ ফার্সী সালের ২৫শে তীর তারিখে[৪২] প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মোসাদ্দেকের পদত্যাগের পর কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্‌কে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় এবং সরকার গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। আর এ ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

www.pathagar.com

তিরিশে তীরের[৪৩] গণঅভ্যুত্থান

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্ ক্ষমতা গ্রহণের পর জনসাধারণকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষায় বেশ কয়েকটি ঘোষণা প্রচার করেন। এর পর পরই তিনি জনগণের স্বাধীনতাকে সীমিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৪৪]

ইতিমধ্যে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র সরকারের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন এবং জনসাধারণকে কাওয়ামের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেন।

আয়াতুল্লাহ্ কাশানী প্রধানমন্ত্রী কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্কে সম্বোধন করে প্রচারিত এক ঘোষণায় বলেন ঃ "আহমদ কাওয়ামের জেনে রাখা উচিত, যেদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণ বহু বছর যাবত দুঃখ-দুর্দশা ও যন্ত্রণার পর নিজেদেরকে একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করেছে, সেদেশে সে যেন ঈমান-আকিদা ও চিন্তা-বিশ্বাসকে টুটি টিপে হত্যা করার কথা ঘোষণা না করে এবং জনগণকে পাইকারী হত্যার হুমকি না দেয়। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, এখন সকল সাধারণ মুসলিম ভাইদের জন্যে জিহাদের পথে হিম্মতে কোমর বেঁধে মাঠে নামা এবং উপনিবেশবাদী নীতির অনুসারীদের সামনে শেষবারের মতো প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, তাদের উপনিবেশবাদীদের পক্ষে আর অতীতের শক্তি ও অধিপত্য হস্তগতকরণ অসম্ভব এবং ইরানের মুসলিম জনগণ কোন বিজাতীয়দেরকেই এ সুযোগ দেবে না যে, তারা তাদের পরীক্ষিত সেবাদাসদের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতাকে নস্যাত করবে, তেমনি ইরানী জনগণ তাদের পবিত্র সংগ্রামের মাধ্যমে যে বিরাট ও গৌরবজনক সুনামের অধিকারী হয়েছে তাকে লাঞ্ছনা ও পরাজয়ে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেবে না।"

আয়াতুল্লাহ্ কাশানী দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে একইভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ "কাওয়াম যদি আগামী ৪৮ঘন্টার মধ্যে ক্ষমতা ত্যাগ না করে তাহলে আমি জিহাদ ঘোষণা করব এবং বক্তিগতভাবে কাফন পরিধান করে জনগণের সামনে থেকে সংগ্রাম করব।"

আয়াতুল্লাহ্ কাশানীর এ ঘোষণার পর ৩০শে তীর (১৩৩১)[৪৫] জনসাধারণ বাজার ও দোকানপাট বন্ধ করে রাস্তায় নেমে আসে এবং কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র সরকারের পতনের দাবীতে শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র নির্দেশে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলী বর্ষণ করা হয় এবং এতে বেশ কিছু লোক শহীদ হয়। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওসুকের[৪৬] নির্দেশে কারাভান্‌সারায়ে সাঙ্গী,[৪৭] বখ্তারান, হামেদন্ ও কায্ভীনে কাফন পরিহিত বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলী বর্ষণ করা হয় এবং এভাবে তাদের প্রতিরোধ করা হয়।

এমতাবস্থায় সরকারের প্রতিনিধিগণ ও স্বয়ং শাহ্ তড়িঘড়ি করে আয়াতুল্লাহ্ কাশানীর সাথে সাক্ষাতের জন্যে ছুটে যান এবং জনগণকে শান্ত করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এ বিপ্লবী আলেম ও ধর্মীয় নেতা তাঁদের আবেদনকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, কাওয়াম পদত্যাগ না করলে তিনি জিহাদ ঘোষণা করবেন।

শাহ্ যখন নিজের অবস্থাকেই বিপন্ন অনুভব করলেন তখন তিনি কাওয়ামুস্ সাল্তানাহ্র অপসারণের ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। জনগণের আত্মত্যাগ ও আলেম সমাজের সমর্থনে মোসাদ্দেক পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হলেন।

www.pathagar.com

টীকা ঃ

(১) ساعد —তিনি ফোরুগীর পর প্রধানমন্ত্রী হন। উল্লেখ্য, এ সময় থেকে খুব ঘন ঘন প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার পরিবর্তন হতে থাকে এবং কয়েক ব্যক্তি ঘুরে ফিরে বহুবার প্রধানমন্ত্রী হন; সায়েদ তাঁদের অন্যতম। অত্র অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার ধরা পড়বে।—অনুবাদক

(২) طوسی

(৩) মোতাবেক ১৯৪৪ খৃস্টাব্দ।

(৪) حزب توده —তুদেহ্ পার্টি; "তুদেহ্" মানে "জনগণ"। এটি রুশপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অপরাধে এ দলটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। —অনুবাদক

(৫) دکتر رادمنش

(৬) মোতাবেক ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দ।

(৭) آهی

(৮) سمنان —তেহ্রান থেকে পূর্বদিকে।

(৯) خوریان

(১০) মোতাকে ৭ই সেপ্টম্বর, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দ।

১১) بیات

(১২) حزب دموکراتیك آذربایجان

(১৩) سید جعفر پیشه وری

(১৪) کردستان —পশ্চিম ইরানের ইরাক সীমান্তবর্তী প্রদেশ।

(১৫) حکیمی —বায়াতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

(১৬) —বাহ্‌মান ঃ ২১শে জানুয়ারী—১৯শে ফেব্রুয়ারী। (১৯৪৫)

(১৭) اصل٤

(১৮) آذر —২২শে নভেম্বর—২১শে ডিসেম্বর (১৯৪৭)

(১৯) موریس-نوسن

(২০) هژیر

(২১) Gess

(২২) گلشائیان —তিনি সায়েদের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

(২৩) অর্থাৎ সরকারবিরোধী।

(২৪) মোতাবেক ২৬শে জুন, ১৯৫০ খৃস্টাব্দ।

(২৫) رئیس ستاد ارتش

(২৬) رزم آرا

(২৭) ملی —জাতীয়। এখানে "জাতীয়" বলতে "জাতীয়তাবাদী" (ملیگرا) নয় যারা জাতীয় পরিচিতিকেই ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড গণ্য করে, বরং "জাতীয়" বলতে দেশপ্রেমিক ও দেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও উন্নতি-অগ্রগতির সমর্থক বোঝানো হয়েছে।—অনুবাদক

(২৮) এখানে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের কথা বলা হয়েছে। এ পরিষদ শাহ্‌কে মজলিস ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

(২৯) মোতাবেক ১২ই অক্টোবর, ১৯৫০ খৃস্টাব্দ।

www.pathagar.com

(৩০) মোতাবেক ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ।

(৩১) دولت مستقل عربی جدید

(৩২) بانك انگلیس —এটি নামও হতে পারে বা "ইংরেজদের ব্যাঙ্ক" অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে —অনুবাদক

(৩৩) দেড়শ' কোটি রিয়াল।

(৩৪) فدائیان اسلام —ইসলামের জন্য উৎসর্গপ্রাণ। সাধারণতঃ "ফেদাইয়ান্" বা "ফেদায়ীন্" — (উভয় শব্দই বহু বচন) পরিভাষা গেরিলা যোদ্ধাদের জন্যে ব্যবহৃত হয়।—অনুবাদক

(৩৫) نواب صفوی

(৩৬) মোতাবেক ৭ই মার্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

(৩৭) خلیل طهماسبی

(৩৮) ৮ই মার্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

(৩৯) মোতাবেক ১৫ই মার্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

(৪০) ২০শে মার্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

(৪১) حسین علاء

(৪২) মোতাবেক ১৬ই জুলাই, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ।

(৪৩) ২১শে জুলাই (১৯৫২ খৃষ্টাব্দ)।

(৪৪) ২৭শে তীর (১৮ই জুলাই) তারিখে প্রকাশিত ঘোষণায় কাওয়ামুস্ সালতানাহ্ অনেক কিছু দাবী করার ও জনগণকে বহু কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাঁর বিরোধীদের তথা ইরানী জনগণের প্রতি এ ভাষায় হুমকি দেন ঃ "... আমি আপনাদের ও আপনাদের প্রতিনিধিগণের ওপর ভরসা করে এ পদ গ্রহণ করেছি এবং আপনাদের কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিধানকে আমার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছি। আমি শপথ গ্রহণ করছি যে, আপনাদেরকে সৌভাগ্যের অধিকারী করব। আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করতে দিন। আর যারা আমার কল্যাণমুখী পদক্ষেপসমূহে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে বা আমি যে পথ ধরে এগোতে চাচ্ছি তাতে বাধা দেবে অথবা জনজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করবে তাদের পরিণতি ভেবে আমার দুঃখ হয়। এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আমার পক্ষ থেকে কঠোরতম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবে। আর অতীতে যেমন প্রমাণ দিয়েছি, এক্ষেত্রে কারো দিকে না তাকিয়ে এবং বিরোধীদের কারো পদ ও অবস্থানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাথে সাথে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেব। এমনকি হতে পারে এতদূর অগ্রসর হব যে, পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু সদস্যদের সিদ্ধান্ত বা অনুমোদনক্রমে বিপ্লবী আদালত গঠন করে শত শত দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে—তা তারা সমাজের যে স্তরের লোকই হোক না কেন, নির্মম আইন-কানুনের কঠোর প্রয়োগ করে তাদের সুদিনকে দুর্দিনে পরিণত করে ছাড়ব।

"সর্বসাধারণকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, বিদ্রোহের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং হুকুমতের আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করার দিন সমুপস্থিত হয়েছে। মাঝি সাবধান! এবার অন্য হাওয়া বইছে।

"তেহরান ২৭শে তীর ১৩৩১ — প্রধানমন্ত্রী কাওয়ামুস্ সালতানাহ্"

(৪৫) ২১শে জুলাই, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ।

(৪৬) سر لشکر وثوق

(৪৭) کاروانسرای سنگی

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

রেযা খানের পতন পরবর্তী ইরানে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ধারা

রেযা খানের পতনের পরবর্তীকালে ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট ও ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

রেযা খান তাঁর একনায়কত্ববাদী ও জোর-জবরদস্তির শাসনকালে কার্যতঃ ইরানকে একটি গোরস্থানে পরিণত করেছিলেন। তাঁর এ শ্বাসরুদ্ধকর শাসনামলে কারো পক্ষেই কোনরূপ আন্দোলন বা উচ্চবাচ্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বৃটিশরা যখন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করল এবং তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেযাকে ক্ষমতায় বসাল তখন আর ইরান সেই আগেকার নীরব-নিস্তব্ধ ও উদাসীন ইরান থাকল না। রেযা খান যেখানে প্রতিবাদহীন উদাসীন ইরানীদের ওপর শাসন চালিয়েছিলেন তার পরিবর্তে ইরানীরা এক প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। সর্বত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠল এবং তার হৈহট্টগোলে দেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সর্বত্র রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তৃতা-ভাষণ ও লেখালেখির ব্যাপকতা দেখা গেল।

রেযা খানের পতনের পরে ইরানে যেসব কারণে এরূপ ব্যাপক পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১। জনসাধারণ যখন দেখলো যে, রেযা খান নিজেকে অত্যন্ত শৌর্যবীর্য ও শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রদর্শন করা সত্ত্বেও[১] এবং পরোক্ষভাবে তাঁর শাসনকে চিরস্থায়ী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সত্ত্বেও নীরবে-নিঃশব্দে ক্ষমতার মসনদ থেকে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তখন জনমনে শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়।

২। নতুন শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীর বয়স ছিল কম, ফলে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই তাঁর পক্ষে রাতারাতি তাঁর পিতার মত ডিক্টেটরে পরিণত হওয়া এবং দেশবাসীর ঘাড়ের ওপর তাঁর ডিক্টেটরী শাসন চাপিয়ে দেয়া সম্ভবপর ছিল না।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উপনিবেশিক শক্তিগুলোর ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে এবং ইরানে বিদেশী সেনাবাহিনীর প্রবেশ ঘটে। এ দু'টি বিষয় পরিস্থিতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

আয়াতুল্লাহ্ কাশানী

www.pathagar.com

রেযা খানের পতনকাল অর্থাৎ ফার্সী ১৩২০ সাল মোতাবেক ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ফার্সী ১৩৩২ সাল মোতাবেক ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে সৃষ্ট প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে আমরা সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। তা হচ্ছে ঃ ধর্মীয়, জাতীয় ও কম্যুনিষ্ট ধারার আন্দোলন। ইরানে উদ্ভূত এ আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজে ধারণা লাভের জন্যে এখানে তিনটি ধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ঃ

ধর্মীয় আন্দোলন

ইরানে ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর মূলে ছিল দেশের জনসাধরণের ইসলামী ঈমান-আকিদা ও চিন্তা-বিশ্বাস। ইসলাম হচ্ছে একটি মুক্তিকামী, স্বাধীনতার সমর্থক ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যাভিসারী দ্বীন, আর ইরানে সৃষ্ট ধর্মীয় আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আয়াতুল্লাহ্ কাশানীর ন্যায় মহান ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেমগণ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। যেহেতু ইরানের এ ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের চৈন্তিক ভিত্তি ছিল মারজা'গণের বেলায়াৎ ও শাসন-কর্তৃত্বের আকিদা,[২] সেহেতু এ সব আন্দোলন রাজতন্ত্রকে পরোক্ষভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য করত। একই কারণে এ সব আন্দোলন ইরানের বুকে রুশ, বৃটিশ ও মার্কিন নির্বিশেষে যেকোন বিদেশী শক্তির প্রভাব ও উপস্থিতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। এ কারণেই ইরানের ইসলামী শক্তি ইরানের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাকে জাতীয়তাবাদীদের চেয়েও বেশী ভালবাসা সত্ত্বেও বিশ্বের সকল মুসলিম জাতির ঐক্য সম্পর্কে চিন্তা করত এবং নিজেদের ভাগ্যকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যের সাথে অভিন্ন বলে গণ্য করত।

যদিও ইরানে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পরবর্তী বছরগুলোতে, বিশেষ করে রেযা খানের বিশবছরব্যাপী একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে ইরানের দুশমনরা প্রবলভাবে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরোধিতা করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে, তথাপি প্রায় শতকরা একশ' ভাগ ইরানী জনগণই ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারী ছিল। কারণ, ইসলামী সংস্কৃতি ইরানী জনগণের অন্তরে এমনই দৃঢ়মূল ছিল যে, দুশমনদের এত বিরোধিতা ও চাপ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করা সম্ভব হয়নি। তাই এ যুগে ইরানে উদ্ভূত ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ চৈন্তিক ও আদর্শিক বিচারে ছিল খাঁটি, অকৃত্রিম ও জনগণের নিকট গ্রহণীয় এবং রাজনৈতিক বিচারে ছিল পুরোপুরি স্বাধীন ও বিজাতীয়প্রীতির ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু এ আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপক-বিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী থাকা সত্ত্বেও সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ছিল না। কারণ, এ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেম সমাজ রেযা খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে সীমাহীন চাপের মুখে ছিলেন। এ কারণে রেযা খানের শাসনাবসানের পর প্রাপ্ত মোটামুটি উন্মুক্ত পরিবেশকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপকতর মুসলিম জনগণকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালনা করার উপযোগী করে দ্রুতগতিতে সুসংগঠিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জাতীয় আন্দোলন

ইরানের জাতীয় আন্দোলন কোন সুনির্দিষ্ট চৈন্তিক আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল ছিল না। ইরানের জাতীয়তাবাদীদের চূড়ান্ত আশা-আকাঙ্খা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল দেশের মাটি ও পানি তথা ভৌগোলিক

www.pathagar.com

অখণ্ডতা ও পানিসীমার হেফাজত করা। বস্তুতঃ প্রবল দেশপ্রেমই ছিল এ আন্দোলনের প্রেরণাদাতা; অনেক সময় এ দেশপ্রেমকে দেশপূজা[৩] হিসেবেও আখ্যায়িত করা হত। অবশ্য স্বদেশের সীমান্ত রক্ষার আকাঙ্খা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি ভালবাসা প্রতিটি মানুষেরই একটি সহজাত প্রেরণা। কিন্তু ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদীরা স্বদেশের প্রতি তাদের মহব্বতকে এতই তীব্রতা দান করেছিল যে, যদিও মূলগতভাবে দেশপ্রেম একটি চৈন্তিক আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম নয়, তথাপি তারা একে নিজেদের জন্যে আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদেরকে অ-ইরানী মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় যে জাতীয় পরিচিতিকে ধর্মের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়, এটা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশবাদীদের পক্ষ থেকে প্রচারিত চিন্তাধারাসমূহের অন্যতম। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানের জনগণকে ইরানী, তুর্কী, আরব, ভারতীয় ইত্যাদি পরিচিতি নিয়ে ব্যস্ত করে রাখা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিকে প্রতিহত করা। রেযা খানের স্বৈরশাসনের পুরো সময়টাতেই ইরানে এ চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার করা হয়। ফলে তাঁর পতনের পরেও বেশ অনেক দিন যাবত ইরানী জনগণের মধ্যকার এক দল বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে-মগজে এর প্রভাব অবশিষ্ট থাকে।

আসলে ইরানে জাতীয়তাবাদের প্রচারের পিছনে দুশমনদের উদ্দেশ্য ছিল ইরানের মুসলিম জনগণের মন-মগজে 'ইসলাম'-এর পরিবর্তে 'ইরান'-কে স্থলাভিষিক্ত করা।[৪] তবে রেযা খানের যুগে ও তাঁর পতনের পরে জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ছিল পরস্পর ভিন্নতর। রেযা খানের যুগে ইরানী জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের লক্ষ্য ছিল রেযা খানের ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত ও নিষ্কন্টক করা। এ কারণে ঐ যুগে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এ মর্মে প্রচার চালানো হয় যে, ইরানকে যিনি রক্ষা করতে ও উন্নতি-অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম তিনি হচ্ছেন একমাত্র মহামহিম শাহানশাহ্[৫]। কিন্তু রেযা খানের পতনের পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদীরা ইরানে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করে। এ আন্দোলনকারীরা মনে করত, ইরানের বিকাশ এবং উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে ইরানে বিজাতীয়দের বিশেষ করে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং ইরানের তেলসম্পদের ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে হবে।

এ জাতীয়তাবাদীরা যেহেতু রেযা খানের যুগে পরিচালিত প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত ছিল সেহেতু তারা ইরানের ভাগ্যকে ইরানী রাজতন্ত্রের ভাগ্য থেকে স্বতন্ত্র করে চিন্তা করত না এবং তারা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শাহী সরকারের বিরোধী ছিল না। বরং তাদের কাছে যেসব রাষ্ট্রব্যবস্থা আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হত তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৎকালীন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ইরানের জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এখানে যে, তারা একদিকে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরোধী ছিল অন্যদিকে তারা নীতিগতভাবে পাহ্লভী রাজবংশের শাসনক্ষমতা ও রাজতান্ত্রিক সরকারের বিরোধী ছিল না, অথচ বৃটিশরাই পাহ্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং রেযা খান ও মোহাম্মদ রেযা উভয়ই ছিলেন বৃটিশদের হাতের পুতুল এবং বৃটিশ সরকারের ইরান-নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারস্বরূপ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তাদের অন্য একটি বড় ভুল ছিল এই যে, যেহেতু স্বদেশ, দেশের মাটি, পানি, রক্ত ও বর্ণ নিজে নিজেই কোন চৈন্তিক আদর্শে ও বিশ্বদৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে না, সেহেতু তারা সাধারণতঃ পশ্চিমা দর্শন ও বিশ্বদৃষ্টিজাত চিন্তাধারায় বিশ্বাস

www.pathagar.com

পোষণ করত। অর্থাৎ চৈন্তিক দিক থেকে তারা তাদেরই বিশ্বদৃষ্টিকে গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে যাদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তাদের এ পাশ্চাত্যমুখী চিন্তাধারাই তাদেরকে ইরানের সাধারণ মুসলিম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

বস্তুতঃ ইরানে জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এমন লোকদের হাতে ছিল যারা পশ্চিমা চিন্তাধারার অধিকারী হওয়ায় ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ এবং অফিস-আদালতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, অন্য কথায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। প্রধানতঃ রেযা খানের যুগে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইসলামবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাদের মধ্যে পশ্চিমা চিন্তাধারার বিস্তার ঘটেছিল। জনগণকে সংঘবদ্ধকরণ এবং সাংগঠনিক কাঠামোর বিচারে এ আন্দোলন মোটামুটি একটা মাঝামাঝি অবস্থার অধিকারী ছিল।

অবশ্য জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ইসলামে বিশ্বাসী লোকও ছিলেন, কিন্তু এ আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁদের হাতে ছিল না। বরং আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল সেই ব্যক্তিবর্গের হাতে যাঁরা ছিলেন ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণে বিশ্বাসী।

কম্যুনিস্ট আন্দোলন

রাশিয়ার মার্ক্সবাদী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যই ছিল ইরানে সৃষ্ট কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ইরানের অভ্যন্তরে অবস্থানরত রুশ এজেন্টরা এবং তাদের দেশীয় সমর্থকগোষ্ঠী ইরানে এ চিন্তা ও মতাদর্শের প্রচার করে। যেহেতু রেযা খানের পতনের পূর্বে ইরানের ওপর বৃটিশদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রেযা খান পুরোপুরি একনায়কতান্ত্রিক কায়দায় দেশ শাসন করতেন, সেহেতু ঐ যুগে ইরানে কম্যুনিস্টদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল না। অন্য কথায়, সে সময় কম্যুনিস্টরা চেষ্টা করেও ইরানে তাদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কারণে তৎকালে তাদের পক্ষে ইরানে বিশেষ কোন আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু রেযা খানের পতনের পর ইরানে কম্যুনিস্টরা যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। একদিকে রেযা খানের পতনের মধ্য দিয়ে ইরানে একানয়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়, অন্যদিকে রুশ বাহিনীর ইরানে প্রবেশ এবং বেশ কয়েক বছর যাবত ইরানের মাটিতে তাদের অবস্থানের ফলে কম্যুনিস্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রুশদের পূর্ণ সমর্থনে ইরানে কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং রুশরা ইরানের ভিতরে ও বাইরে থেকে এদেরকে সাহায্য করতে থাকে। ফলে রেযা খানের পতনের বছর অর্থাৎ ফার্সী ১৩২০ সাল মোতাবেক ১৯৪১ খৃস্টাব্দ থেকে ফার্সী ১৩৩২ সাল মোতাবেক ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র বার বছরের মধ্যে কম্যুনিস্টরা ইরানী জনগণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

ইরানে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা বিস্তার লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় মূলতঃ সাংবিধানিক বিপ্লবের পরে, বিশেষ করে রেযা খানের শাসনামলে। কারণ, এ সময় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়। বিশেষ করে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের স্লোগান মার্ক্সবাদ প্রচারের পথ

www.pathagar.com

থেকে চৈন্তিক বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করে। ফলে রেযা খানের পতনের পর তাদের পক্ষে স্বীয় চিন্তাধারা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে ইরানের সামন্ততান্ত্রিক ও খান (জমিদার) কেন্দ্রিক সমাজে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণ-বৈষম্য ও জুলুমের শিকার ছিল বিধায় মার্ক্সবাদীদের সমতা ও সুবিচারের স্লোগান বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষতঃ তরুণ সমাজ, শ্রমজীবী শ্রেণী এবং বঞ্চিত জনগণ এসব স্লোগানে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়।

ইরানে হেয্‌বে তুদেহ্-র (Tudeh Party) মাধ্যমে কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে আর রুশরা প্রত্যক্ষভাবে এতে সহায়তা করে এবং দলটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে।

সাংগঠনিক শক্তি ও বিস্তৃতির দিক থেকে হেয্‌বে তুদেহ্ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী দল। আর এ দলটি ইরানের ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কারণ, কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হেয্‌বে তুদেহ্ (Tudeh Party) নীতিগতভাবেই ছিল ধর্মবিরোধী। যদিও জাতীয়তাবাদীরাও ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু কম্যুনিস্টরা শুধু ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণেই নয়, বরং তারা এমন এক নীতিতে বিশ্বাসী ছিল যা সমাজ থেকে ধর্মকে উৎখাতের পক্ষপাতী।

হেয্‌বে তুদেহ্‌র (Tudeh Party) সমর্থক ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আরো একটি ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য ছিল। তা হচ্ছে, জাতীয়তাবাদীরা দেশে যেকোন বিজাতীয় হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। পক্ষান্তরে হেয্‌বে তুদেহ্‌র সমর্থকরা ছিল রাশিয়ার অন্ধ সমর্থক। তারা তাদের রাজনৈতিক নীতি-অবস্থান গ্রহণের বেলায় এমন এক পন্থা অনুসরণ করত যাতে ইরানে রুশস্বার্থ সংরক্ষিত হয়, সেই সাথে ইরানে কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমিও তৈরী হয় এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের ন্যায় ইরানও একটি সোভিয়েত তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ধর্মীয় ও জাতীয় শক্তির ঐক্য এবং তেলশিল্প জাতীয়করণের আন্দোলন

ইতোপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, রেযা খানের পতনের পরবর্তীকালে ইরানে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চৈন্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব চৈন্তিক ভিত্তির ওপরেই এ আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হতে ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। যেহেতু ধর্মীয় এবং

ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক

www.pathagar.com

জাতীয় এ দুই শক্তি দেশপ্রেম এবং বিজাতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতার ক্ষেত্রে অভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল সেহেতু বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করার পর এ দুই শক্তির মধ্যে এক ধরনের মৈত্রী ও ঐক্য গড়ে ওঠে। এ সময়কার এ ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ আবুল কাসেম কাশানী। তিনি নিজে ও তাঁর পিতা ইরান ও ইরাকে বৃটিশ উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনে সুদীর্ঘ ও প্রোজ্জ্বল অতীতের অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে জাতীয় শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। তিনি তরুণ বয়সে সুইজারল্যান্ডে আইন অধ্যয়ন করেন ও আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোদাররেসের পাশে থেকে রেযা খানের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ ও সিংহাসনে আরোহণের এবং ইরানে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

যে কেন্দ্রীয় বিষয়টি ইরানের ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি ও জাতীয় শক্তিকে কাছাকাছি নিয়ে আসে ও ঐক্যবদ্ধ করে তা হচ্ছে তেলশিল্প জাতীয়করণের সংগ্রাম। এ ঐক্যজোটের তীক্ষ্ণধার রাজনৈতিক শক্তি ইরানের ষোড়শ জাতীয় মজলিসের সরকারবিরোধী সংখ্যালঘু সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং মোসাদ্দেক ও আয়াতুল্লাহ্ কাশানীসহ এ সংখ্যালঘু সদস্যগণের রাজনৈতিক চাপের মুখে প্রতিপক্ষ কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়।

একদিকে সারা দেশের জনগণ এ সংসদীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকে, অন্যদিকে ফেদাইয়ানে ইসলামের সাহসী বীর তরুণরা আন্দোলনের সাফল্যের পথ থেকে বাধাগুলোকে একে একে অপসারণ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন সফল হয়—তেলশিল্প জাতীয়করণের বিল মজলিসে অনুমোদিত হয় এবং মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী হন।

বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়

মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জনগণের সংগ্রাম অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে ও তীব্রতর হয়ে ওঠে। ইরানের ধর্মীয় ও জাতীয় শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিশ্বের ইতিহাসে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির ওপর প্রথম শক্তিশালী সফল আঘাত হানতে ও ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে সক্ষম হয়। এ ধর্মীয় ও জাতীয় শক্তির বিপক্ষে ছিল আহত উপনিবেশবাদী শক্তি ধূর্ত প্রতারক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি ইরানী জনগণের নিকট থেকে যতই আঘাতের পর আঘাতের সম্মুখীন হোক না কেন, শাহী দরবার সর্বাবস্থায়ই তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে বিরাজ করছিল এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গের মধ্যেও তাদের প্রকাশ্য ও গোপন বহু গুপ্তচর ও ভাড়াটে এজেন্ট ছিল। অন্যদিকে একই সময় নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ শুরু করেছিল। তাই ইরানে বৃটিশ অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিস্থিতিকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগানোর চিন্তায় লিপ্ত হয়।

এ পরিস্থিতিতে হেয্‌বে তুদেহ্‌র সমর্থক কম্যুনিস্ট শক্তি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও দেশদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেহেতু তুদেহ্‌পন্থীদের দৃষ্টিতে ইরানে ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তি ও জাতীয় শক্তির অবস্থান শক্তিশালী হলে তা তাদের জন্য তথা রুশদের জন্য লাভজনক হত না। সেহেতু তারা রুশদের নির্দেশে এ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে এবং বিভিন্ন পন্থায় আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাতে থাকে।

ঐ সময় ইরানের সংবাদপত্রগুলো পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সমাজের ধাঁচে (প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক যাতে বিশ্বাসী ছিলেন) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু তুদেহ্‌পন্থীরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

অপব্যবহার করতে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার ছড়াছড়ি করে ধর্মীয় ও জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে জনগণের মন-মগজকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অধিকন্তু হেয্বে তুদেহ্‌র সদস্যরা বিভিন্ন কল-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সৃষ্টি করতে থাকে। এভাবে তারা দেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানতে থাকে।

অন্যদিকে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি এবং অন্যান্য পশ্চিমা সরকার ইরানের নিকট থেকে তেল ক্রয় হতে বিরত থাকে। যেহেতু ইরান তেলশিল্পের জাতীয়করণ করেছিল এবং স্বীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর থেকে বিজাতীয় নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করেছিল, সেহেতু তারা ইরানী তেল ক্রয় হতে বিরত থেকে আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মোসাদ্দেক সরকারকে অচল করে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এমনি এক মুহূর্তে তুদেহ্‌পন্থীরা ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। এ অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার তাঁবেদার দেশগুলোও ইরান হতে তেল ক্রয়ে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার নিকট ইরানের এগার টন স্বর্ণ মওজুদ ছিল, তা-ও মোসাদ্দেক সরকারকে প্রদান করা থেকে তারা বিরত থাকে।

এত সব ষড়যন্ত্রের মুখেও ইরানী জনগণ অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং উপনিবেশবাদী শক্তি ও তাদের দোসর-অনুচরদের চাপের মুখেও প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ কাশানী এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ইরানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং সমস্ত রকমের সমস্যা, সংকট, কাঠিন্য ও শত্রুর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তারা অটল পাহাড়ের ন্যায় রুখে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনকে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়।

আন্দোলনে মতানৈক্য

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ১৩৩১ ফার্সী সালের ৩০শে তীর[৬] ইরানের মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় উপস্থিতি এবং গণআন্দোলনে ধর্মীয় নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এদিন ইরানী জনগণ প্রধানমন্ত্রী কাওয়ামুস্ সাল্‌তানাহ্‌র পদত্যাগের দাবীতে ও ডঃ মোসাদ্দেকের সমর্থনে রাস্তায় নেমে আসে এবং সশস্ত্র বাহিনীর সামনে রুখে দাঁড়ায়; তাদের অনেকে শহীদ হয়। শেষ পর্যন্ত জনগণ বিজয়ের অধিকারী হয়। উপনিবেশবাদী শক্তি ও শাহী দরবার পিছু হটে যায় এবং মোসাদ্দেক পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। গণআন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি শাহী দরবার এবং মজলিস—এ উভয় শক্তিকেন্দ্র থেকেই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করে পরিপূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হন।

কিন্তু ১৩৩১ ফার্সী সালের ৩০ শে তীর (মোতাবেক ২১শে জুলাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ) ইরানী জনগণ গৌরবময় বিজয়ের অধিকারী হলেও—যা ছিল ইরানী জাতির ইতিহাসে এক বিরাট দিকনির্দেশকারী ঘটনা—পরবর্তী ঘটনাবলী ছিল নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক এবং যেকোন জাতির জন্যে শিক্ষণীয়।

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ কারণে এবং বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের ফলে অচিরেই আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। গণদুশমনরা জানত যে, যতদিন পর্যন্ত জনগণ ইসলামের নামে আন্দোলনের মাঠে উপস্থিত থাকবে ততদিন তারা আন্দোলনকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। তাই তারা আন্দোলনের অভ্যন্তরে তাদের দু'দল ভাড়াটে এজেন্ট ও গুপ্তচরকে পরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবিষ্ট করায়। তারা উভয় নেতার সহকারী ও ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। এভাবে

www.pathagar.com

তারা উভয় নেতার মধ্যে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে সফল হয়। এসময় হেয্বে তুদেহ্-র অনুসারীরাও তাদের নেতিবাচক তৎপরতা পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আয়াতুল্লাহ্ কাশানীর চরিত্রহননে লিপ্ত হয়।

আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও ডঃ মোসাদ্দেকের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির পিছনে আরো কারণ ছিল। তাঁদের মধ্যকার মতানৈক্যের মূল কারণ আরো গভীরে নিহিত ছিল। তা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য।

মোসাদ্দেক ছিলেন পশ্চিমা চিন্তাধারার অনুসারী। এ কারণে তিনি ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে ইসলামী হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের দাবী মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ছিলেন এর বিপরীত। তাঁর পক্ষে কেবল একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবেই রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর ছিল এবং তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল দেশে ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। অন্যদিকে ইরানের যে মুসলিম জনগণ আয়াতুল্লাহ্ কাশানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল তারাও আয়াতুল্লাহ্র নিকট ইসলামী আদর্শের শাসন-কর্তৃত্ব তথা ইসলামী হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন দাবী করছিল। কিন্তু ডঃ মোসাদ্দেক পশ্চিমা চিন্তাধারার অধিকারী হওয়ায় তাঁর পক্ষে জনগণের আন্দোলনের ময়দানে উপস্থিত থাকার রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

এখানে মোসাদ্দেকের অন্য যে ত্রুটিটি চোখে পড়ে তা তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই প্রমাণ করে। তা হচ্ছে, তিরিশে তীরের[৭] যে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন (যা ছিল একটি গণবিপ্লব) তিনি সে গণঅভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক ব্যবহারে সক্ষম হননি। আসলে মোসাদ্দেক একজন বিপ্লবী নেতার জন্যে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুসারী। অন্য কথায়, ইউরোপীয় দেশগুলোতে শান্তিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে মোসাদ্দেক ইরানে তা-ই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ খৃস্টান ইউরোপের সাথে মুসলিম দেশ ইরানের পার্থক্য ছিল অনেক। তাছাড়া ইরানে তখন কোন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান ছিল না, বরং একটি সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ইরানের বুকে পশ্চিমা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করে দেশ থেকে বৃটিশ উপনিবেশবাদের মূলোৎপাটন করতে চাচ্ছিলেন।

মোসাদ্দেক তাঁর এ পশ্চিমাপন্থী ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের কারণে প্রথমতঃ শাহী দরবারের মোকাবিলায় যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেননি। তিনি যেখানে জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই দুর্নীতির আখড়া এবং স্বৈরতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ঘাঁটিকে উৎখাত করতে পারতেন, কার্যতঃ সে ব্যাপারে কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরোধী যেসব ব্যক্তি শাহী দরবারের নির্দেশে ওঠ-বস করত এবং তাঁর বিরোধিতা করত তাদের সাথে ও বিজাতীয় শক্তির নিকট আত্মবিক্রিত তুদেহ্পন্থীদের সাথে তিনি আপোসরফা করেন। তিনি তাঁদের সাথে নমনীয় আচরণ করেন। ফলে শুধু তাঁকেই নয়, বরং যে ইরানী জনগণ তাদের হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিয়ে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে স্বীয় মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে অপেক্ষা করছিল সে জনগণকেও মোসাদ্দেকের এ নমনীয়তা ও আপোসকামিতার জন্যে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হয়।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও যেসব লোক জনগণের সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং যাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও স্ব-প্রমাণিত, মোসাদ্দেক তাদেরকে নিজের নিকট থেকে বিতাড়িত করার পরিবর্তে তাদের অনেককে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদ প্রদান করেন। আয়াতুল্লাহ্ কাশানী ও তাঁর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির এটাও ছিল অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে শাহ্‌পুর বাখ্‌তিয়ার[৮] ছিলেন অন্যতম; তিনি যে বিদেশীদের ভাড়াটে এজেন্ট ছিলেন তা মোসাদ্দেকের শাসনামলেই প্রমাণিত হয়। কারণ, ঐ সময় বৃটিশদের একজন গুপ্তচরের ঘর তল্লাশী করে যেসব দলিলপত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে বাখ্‌তিয়ারের বৈদেশিক এজেন্ট হবার দলিলও ছিল। এ সত্ত্বেও মোসাদ্দেক তাঁকে শ্রম মন্ত্রণালয়ে একটি গরুত্বপুর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন। তেমনি জেনারেল যাহেদী[৯] ছিলেন এ ধরনের আরেকজন বৈদেশিক এজেন্ট এবং মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে সংঘটিত ক্যু-দেতার পর যাহেদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অথচ মোসাদ্দেক এই যাহেদীকে কোচের সাপের মতো লালন করেন এবং তাঁকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ প্রদান করেন।

এখানে স্বীকার করতে হয় যে, আয়াতুল্লাহ্ কাশানীও ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন না। ১৩৩২ ফার্সী সালের ২৮শে মোরদাদ তারিখে[১০] সংঘটিত ক্যু-দেতার পূর্বে বা পরে বিভিন্ন সময় একজন বিপ্লবী ইসলামী নেতা হিসেবে যে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়া উচিত ছিল আয়াতুল্লাহ্ কাশানী তা পারেননি। পরবর্তীকালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বিভিন্ন সময় যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমান প্রজন্মের নিকট একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আয়াতুল্লাহ্ কাশানী অনুরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেননি। তাছাড়া তাঁর চারপাশে এমন অনেক লোক ছিল যাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তা সত্ত্বেও আয়াতুল্লাহ্ কাশানী তাদেরকে বিতাড়িত করেননি।

১৯৫৩-র ক্যু-দেতা

১৩৩১ ফার্সী সালের ৩০শে তীর (মোতাবেক ২১শে জুলাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ) থেকে ১৩৩২ ফার্সী সালের ২৮শে মোরদাদ (মোতাবেক ১৯শে আগস্ট ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ) তারিখে ক্যু-দেতা সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টিকে ক্যু-দেতার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের অন্তর্বর্তীকাল বললে অত্যুক্তি হবে না। এ সময়ে আমেরিকানরা ইরানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা যখন এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো যে, রাজনৈতিক পন্থায় তাদের পক্ষে ইরানের তেলসম্পদ হস্তগত করা সম্ভব হবে না, তখন তারা ক্যু-দেতা ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বৃটিশরাও আমেরিকানদের সাথে গোপন আপোস-রফায় আসে এবং ইরানে বৃটিশ স্বার্থের একাংশকে আমেরিকানদের হাতে ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে তৎপরতা শুরু করে। ফলে নেতাদের মতানৈক্য এবং বৈদেশিক এজেন্টদের উপর্যুপরি শোরগোল ও ষড়যন্ত্র চরমে উপনীত হয়। সেই সাথে হেয্‌বে তুদেহ্‌ও যথেষ্ট পরিমাণে পানি ঘোলা করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ঘোলা পানিতে আমেরিকানদের মাছ শিকারের মুহূর্তটি সমুপস্থিত হয়। চরিত্রহীন ও নীচু স্তরের লোকদের কেনার জন্যে সিআইএ-র পক্ষ থেকে ইরানে মার্কিন ডলারের সয়লাব বইয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

প্রথমে ১৩৩২ ফার্সী সালের ২৫শে মোর্‌দাদ[১১] এক ক্যু-দেতা সংঘটিত হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এ ক্যু-দেতা ব্যর্থ হওয়ায় শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভী ইরান থেকে বিদেশে পালিয়ে যান।

ক্যু-দেতা ব্যর্থ হওয়ায় ধারণা করা হচ্ছিল যে, বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু সিআইএ দ্বিতীয় দফা ক্যু-দেতার প্রস্তুতি গ্রহণ করে যা এর তিনদিন পর অর্থাৎ ২৮শে মোর্‌দাদ[১২] সংঘটিত হয়।

২৫শে মোর্‌দাদের ক্যু-দেতা ব্যর্থ হবার পর ২৮শে মোর্‌দাদের ক্যু-দেতার অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলতে থাকে; তখনো দেশের মুসলিম জনগণের নিকট তার খবর নেই এবং তারা ময়দান থেকে অনুপস্থিত। ১৩৩১ ফার্সী সালের ৩০শে তীর[১৩] যে ধরনের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল সে ধরনের অভ্যুত্থানের খুবই প্রয়োজন থাকলেও সেরূপ কিছুই সংঘটিত হলো না। ফলে ২৮শে মোর্‌দাদ তারিখে সংঘটিত ক্যু-দেতার ফলে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ডঃ মোসাদ্দেক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জেনারেল যাহেদী প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করেন।

বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন ঃ "এমন এক সময় ডঃ মোসাদ্দেকের পতনের খবর এসে পৌঁছল যখন আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ছুটি কাটাবার জন্যে গ্রীসের দ্বীপাঞ্চলে ছিলাম ও অবকাশ যাপন করছিলাম। এ খবর পাওয়ার আনন্দে ঐ রাতে আমি খুব আরামের সাথে ঘুমোতে পারলাম।"

সফল ক্যু-দেতা এবং মোসাদ্দেকের উৎখাতের পর শাহ্ দেশে ফিরে আসেন। এ ঘটনার পর আমেরিকানরা ইরানের বুকে এমনভাবে গেড়ে বসে যে, দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত এ দেশটি সারা বিশ্বের মাঝে আমেরিকার সর্বাধিক নিশ্চিত রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত হয়। ইরানের যে তেলসম্পদের ওপর থেকে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ রহিত হয়ে গিয়েছিল পুনরায় তা আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তেল কোম্পানীগুলো নিয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামের হস্তগত হয়।

যদিও ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে হেয্‌বে তুদেহ্‌র বিরাট এক নেটওয়ার্ক ছিল তথাপি এ ক্যু-দেতার বিরুদ্ধে দলটি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও প্রদর্শন করেনি। তারা মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এত গালভরা বুলি আওড়ালেও প্রয়োজনের মুহূর্তে সামান্যতম প্রতিরোধও সৃষ্টি করেনি।

ক্যু-দেতা সংঘটিত হবার পর হেয্‌বে তুদেহ্‌র সদস্যদের মধ্যে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করে[১৪] এবং কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অনেকেই দলে দলে গিয়ে ক্যু-দেতা সরকারের খেদমতে নিয়োজিত হয়। অথচ ঐ সরকার তুদেহ্‌পন্থী বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ও তা কার্যকর করে। তেমনি হেয্‌বে তুদেহ্‌র নেতারা অতীতের ন্যায় নিয়মমাফিক দেশের বাইরে পালিয়ে যান। অন্যদিকে মোসাদ্দেক সরকারের দারুণ অর্থসংকট সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানকে তার এগার টন স্বর্ণ ফেরত দানে বিরত থাকে, কিন্তু ক্যু-দেতা সংঘটিত হবার পর তা জেনারেল যাহেদীর সরকারের নিকট হস্তান্তর করে।

ক্যু-দেতা সরকার মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করে এবং দরবারের বংশবদ আদালতে বিচার প্রহসনের মাধ্যমে তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করে।

www.pathagar.com

জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন

ক্যু-দেতার সাফল্যের পর অবশ্য জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন একেবারে নির্বাপিত হয়ে যায়নি। বেশ কিছুসংখ্যক জাতীয় ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মিলে "নেহ্যাতে মোকাভেমাতে মিল্লী"[১৫] নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

এ ছাড়া ক্যু-দেতা সরকার ইরানের তেলকূপগুলোকে আমেরিকা ও বৃটেনের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে যে আলোচনা শুরু করে (কার্যতঃ যা ইরানের ওপর ঐ দু'টি শক্তির রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠারই আলোচনা ছিল) বেশ কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ কারণে তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ফার্সী ১৩৩২ সালের ১৬ই অযার তারিখে[১৬] তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ইরান সফরের প্রতিবাদে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ তাদের ওপর গুলীবর্ষণ করলে তিনজন ছাত্র নিহত হয়।

এদিকে যাহেদীর সরকার কনসোর্টিয়ামের সাথে তেলচুক্তি সম্পাদন করলে আয়াতুল্লাহ্ কাশানী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ চুক্তির প্রতিবাদে তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন।

কিন্তু এসব পদক্ষেপের কোনটিতেই কোন লাভ হয়নি। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় এবং দিনের পর দিন ইরানের বুকে তার শক্তি, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ অধিকতর পাকাপোক্ত হতে থাকে; ইরানী জাতি ক্রমেই মার্কিন দাসত্বের শৃঙ্খলে আরো বেশী পাকাপোক্তভাবে বন্দী হয়ে পড়তে থাকে। এ বন্দীত্ব বছরের পর বছর অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্মান[১৭] এ শৃঙ্খল টুকরো টুকরো হয়ে যায় ও চিরতরে খসে পড়ে।

টীকা ঃ

(১) এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রেযা খান নিজের জন্যে رضا شاه كبير (রেযা শাহে কাবীর—মহান মহামতি রেযা শাহ– Reza Shah the Great) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।– অনুবাদক

(২) অর্থাৎ রসুল (সঃ)-এর প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী এবং একই সাথে মা'ছুম ইমামগণের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসেবে মুসলিম জনগণের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের অধিকার ও দায়িত্ব ন্যায়বান ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী মুজতাহিদ আলেমগণের। এটা কোন মামুলী আমল সংক্রান্ত ব্যাপার নয়, বরং রসুলের (সঃ) স্থলাভিষিক্ততার কারণে তা আকায়েদী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, অন্য কারো নেতৃত্ব বৈধ নয়। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ বিষয়টিকে আরো বেশী সুসংবদ্ধ তত্ত্ব আকারে উপস্থাপন করেছেন যা ولايت فقيه (বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন-কর্তৃত্ব) নামে খ্যাতি লাভ করেছে।– অনুবাদক

(৩) وطن پرستی

(৪) উপনিবেশবাদীদের ষড়যন্ত্রসমূহের মধ্যে একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল এই যে, তারা "ইরান" এবং "ইসলাম"-এর অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে দেখাবার চেষ্টা করে। তারা এ ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যে, ইসলামী ঈমান-আকিদা পোষণ এবং বিশ্বের মুসলমানদের সাথে সহমর্মিতা ও ঐক্যের অনুভূতি ইরানের

www.pathagar.com

সম্মান, গৌরব ও উচ্চশির অবস্থা অর্জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নামান্তর। ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার কয়েক বছর পূর্ব থেকে শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মোতাহ্হারীর ন্যায় চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে উপনিবেশবাদীদের দ্বারা প্রচারিত এ ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শহীদ মোতাহ্হারীর লেখা গ্রন্থ خدمت متقابل اسلام و ايران (ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক খেদমত)-এর নাম করা যায়। তেমনি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরেও ইরানের মুসলিম জনগণ ও রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুজাহিদগণ আল্লাহ্, রসুল (সঃ), ইসলাম ও কুরআনের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে কার্যতঃ প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমান হওয়া দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের পরিপন্থী তো নয়ই,বরং ইরানের উন্নতশির হবার ও সম্মান-সম্ভ্রমের একমাত্র পথ হচ্ছে ইরানী জনগণের মুসলমানিত্ব এবং কেবল ইসলামই ইরানী জনগণকে এমনভাবে সংঘবদ্ধ ও সমবেত করতে সক্ষম যে, তার ফলে কোন শক্তিশালী দুশমনই তাদের দেশের ওপর সামান্যতম আগ্রাসন চালাতে সাহস পাবে না বা চালালেও সহজে পার পাবে না।

(৫) اعلى حضرت همايونى

(৬) মোতাবেক ২১শে জুলাই, ১৯৫২ খৃস্টাব্দ।

(৭) অর্থাৎ ২১শে জুলাই (১৯৫২ খৃস্টাব্দ)।

(৮) شاهپور بختيار — তিনি পরে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শাহী সরকারের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী হন এবং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শাহ্ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠাবান সেবাদাস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। —অনুবাদক

(৯) سر لشكر زاهدى

(১০) মোতাকে ১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ।

(১১) মোতাবেক ১৬ই আগস্ট, ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ।

(১২) ১৯শে আগস্ট, (১৯৫৩ খৃস্টাব্দ)।

(১৩) ২১শে জুলাই, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ।

(১৪) অর্থাৎ কার্যতঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করে। —অনুবাদক

(১৫) نهضت مقاومت ملى — জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন।

(১৬) মোতাবেক ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খস্টাব্দ।

(১৭) মোতাবেক ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ খৃস্টাব্দ।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর পরোক্ষ বা নব্য উপনিবেশবাদী আধিপত্য বিস্তার করে। ইতোপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ২৮শে মোর্দাদের (১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩) ক্যু-দেতার মাধ্যমে আমেরিকা ইরানে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণকে সুসংহত করে এবং ইরানের অভিভাবক হিসেবে বৃটেনের স্থান দখল করে।

এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য-উৎপাদক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমান্বয়ে প্রসার ঘটছিল। ক্রমবর্ধমান এ শিল্পের জন্যে কাঁচামাল ও প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহের নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্যে নতুন নতুন বাজারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছিল। অপরদিকে আমেরিকানরা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ ও অন্যান্য উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদকবলিত জনগণের স্বাধীনতাকামী আন্দোলন গড়ে ওঠার বিষয়টি লক্ষ্য করে আসছিল। এ অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তরাষ্ট্র এক নতুন উপনিবেশবাদী নীতি গ্রহণ করে। তারা এমন কর্মকৌশল অবলম্বন করে যাতে তারা তাদের তাঁবেদার দেশগুলোর উপর স্বীয় আধিপত্য অব্যাহত রাখতে পারে, এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আগের মতই লুন্ঠন করতে পারে, তাদের পণ্যবাজার পুরোপুরি কুক্ষিগত করতে পারে এবং একই সাথে এসব দেশের জনগণকে যত বেশী সম্ভব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তায় পরিণত করার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে পারে।

মার্কিন পুঁজিপতিরা খুব ভালো করেই জানতেন যে, বিজাতীয় আধিপত্যের অধীন ও পশ্চাৎপদ করে রাখা দেশগুলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হলে তা আমেরিকার অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করবে এবং তার পরিণতিতে মার্কিন অর্থনীতি ধ্বংসের কবলে নিপতিত হবে। মার্কিন সরকার ও পুঁজিপতিরা এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব রোধের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমেরিকা তার এ নীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ করে রাখা দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠীকে তার একক এজেন্ট ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। তাই আমেরিকা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর নিকট থেকে গোপন রেখে তার সেবাদাসদের বিশ্বের বঞ্চিত মজলুম ও পশ্চাৎপদ করে রাখা দেশসমূহের শাসনক্ষমতায় বসাবার এবং তাদেরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু আমেরিকার এতসব সুকৌশল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার আধিপত্যকবলিত দেশগুলোর জনগণের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধির পরিণতিতে ক্রমান্বয়ে নির্ভেজাল গণজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যায়। আর তাতে জনগণের বিজয় এবং আমেরিকার খপ্পড় থেকে তাদের সকল স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনাও বিদ্যমান থেকে যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বের উপনিবেশবাদ কবলিত দেশগুলোতে উপনিবেশবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা আমেরিকাকে এ বিপদের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে। আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী একদিকে যেমন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

স্বার্থ হাসিলের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে তার (পরোক্ষ) নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলোতে যাতে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিও মনোসংযোগ করে।

সমস্যার সমাধান ঃ যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশিত সংস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বঞ্চিত দেশগুলোতে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তাদের আধিপত্যকবলিত বা প্রভাবাধীন দেশগুলোতে ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে কতগুলো সামাজিক সংস্কার সম্পাদন অপরিহার্য; এসব সংস্কার সম্পাদন করতে পারলে তারা কমপক্ষে কয়েকটি প্রধান লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে। তা হচ্ছে ঃ

১। এসব দেশে আমেরিকার সেবাদাসগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্ মজবুত হবে এবং স্থায়িত্ব লাভ করবে।

২। জনসাধারণের উপর অনেক বেশী চাপ সৃষ্টি রোধ করা যাবে।

৩। জনসাধারণ প্রতারিত হবে এবং এর ফলে খাঁটি ও নির্ভেজাল গণআন্দোলন সৃষ্টি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

আমেরিকার আধিপত্য কবলিত ও প্রভাবাধীন অনেক দেশেই বিশেষতঃ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে এবং ইরানসহ কোন কোন এশীয় দেশে আমেরিকা নির্দেশিত যেসব সংস্কার সাধিত হয়েছে তার প্রতি হাল্কাভাবে দৃষ্টিপাত করলেও এর পিছনে আমেরিকার উল্লেখিত রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ এবং সেই সাথে আমেরিকার এমন সব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, আমেরিকা অত্যন্ত সুকৌশলে যা হাসিলের চেষ্টা করে আসছিল। অর্থাৎ মার্কিন লুটেরার দল তাদের আধিপত্যকবলিত ও প্রভাবাধীন দেশগুলোতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পর বুঝতে পারে যে, এসব সংস্কার কাজ এমনভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে যার ফলে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হওয়া ছাড়াও ঐ সব দেশে তাদের পক্ষে আরো বেশী অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চালানো সম্ভব হবে । উদাহরণস্বরূপ, ইরানে যদি কৃষক সমাজকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তাহলে এ সংস্কারকার্য এমনভাবে আঞ্জাম দেয়া যেতে পারে যে, এর পরিণতিতে আমেরিকার উপর ইরানের অর্থনৈতিক নির্ভরতা আগের চেয়েও বেশী বৃদ্ধি পাবে, অথচ একই সাথে ইরানের গ্রামবাসীদের একাংশের জন্যে স্বল্পমেয়াদে ন্যূনতম আয় নিশ্চিত হবে; আর তারা তাদের এ আয় আমেরিকায় উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্যে ব্যয় করবে। অধিকন্তু ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রাম্য জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের পুঁজিকে শহরে নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং তা আমেরিকার উপর নির্ভরশীল শিল্পের সম্প্রসারণে ব্যয়িত হবে[১] যার ফলে ইরানে পশ্চিমাদের, বিশেষতঃ আমেরিকানদের ব্যাপকতর অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সিংহ দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশিত সংস্কার

আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও ব্রাজিলে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশিত সংস্কার বাস্তবায়নের পর আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী ইরানে তাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইরানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আলী আমীনীকে তাদের নির্দেশিত তথাকথিত ভূমিসংস্কার পরিকল্পনা পাস এবং বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

দায়িত্ব প্রদান করে।[২] আলী আমীনী পরিকল্পনাটি পাস করাতে সক্ষম হন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন পর্যায়ে কঠিন সমস্যা দেখা দেয়; এ পরিকল্পনা গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূমিসংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ের দু'এক বছর পূর্ব থেকে সরকার বিভিন্ন কারণে, অবশ্য আমেরিকানদেরই পরামর্শক্রমে, ২৮শে মোর্‌দাদের (১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩) ক্যু-দেতার পরবর্তী আমলের তুলনায় জনগণকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার কারণেই আমেরিকা নির্দেশিত ভূমিসংস্কার পরিকল্পনার স্বরূপ জনগণের সামনে ফাঁস হয়ে যায় এবং জনগণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এ কারণে সরকার উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথকে কন্টকমুক্ত করার জন্যে সকল প্রকার মুক্তিকামী আন্দোলন দমন এবং দেশের ওপর পুরোপুরি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা চাপিয়ে দেয়া অপরিহার্য গণ্য করে; এ নীতির ভিত্তিতেই এ সময় সামন্তপ্রভু এবং ভূমিমালিকদের "ষড়যন্ত্র" ও "উস্কানি" দমনের নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৈচাশিক হামলা চালানো হয় ও চরম দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

ইরানে ভূমিসংস্কার আইন পাস হবার পর আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী ও সেখানকার সংবাদপত্রসমূহ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শাহের এ সংস্কার পরিকল্পনার প্রশংসা করতে থাকে। তারা এ সংস্কার পরিকল্পনাকে "শ্বেতবিপ্লব বা শাহ্ ও জনগণের বিপ্লব" নামে অভিহিত করে এবং বিভিন্নভাবে এর গুণগান করতে থাকে। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর এশিয়া, আফ্রিকা, ও ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ক উপদেষ্টা ইরান সফর করেন এবং উক্ত সংস্কারের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলী আমীনী ভূমিমালিকদের এক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার একটি 'ভূমিসংস্কার বিপ্লব' সংগঠনের জন্যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি ভূমিমালিকদের প্রতি এ মর্মে আহ্বান জানান যে, তারা যেন এ ব্যাপারে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি না করে।

কিন্তু আমেরিকার সাথে প্রধানমন্ত্রী আলী আমীনীর অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা শাহের অন্তরে তাঁর প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব, বরং ভীতির সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় শাহ্ আমেরিকা সফর করে তাদের প্রতি পূর্বাপেক্ষাও বেশী সেবাদাসগিরির কথা জানিয়ে আমীনীকে পিছনে ফেলে স্বয়ং যথাসম্ভব পূর্ণতররূপে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে মার্কিন সাহায্য লাভের চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শাহ্ ফার্সী ১৩৪১ সালের ফার্‌ভার্‌দীন মাসে[৩] আমেরিকা সফরে যান এবং তাঁর সফরের উদ্দেশ্য সফল হয়। আমেরিকা শাহের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে। আমেরিকা থেকে ইরান প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আলী আমীনীকে বরখাস্ত করেন। একই বছর তীর মাসে[৪] শাহ্ তাঁর একান্ত বাধ্যগত দাসানুদাস আমীর আসাদুল্লাহ্ আলামকে[৫] আমেরিকা নির্দেশিত সংস্কার পরিকল্পনাকে অধিকতর উত্তররূপে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন।

প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল এবং ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতিরোধ

ইতোমধ্যে ইরানী জনগণের সর্বজনমান্য মারজা' আয়াতুল্লাহ্ বোরুজের্‌দী[৬] ইন্তেকাল করেন এবং কোমের ওলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) মারজা' হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ক্ষমতাসীন সরকার ধারণা করেছিল যে, আয়াতুল্লাহ্ বোরুজের্‌দীর ইন্তেকালের ফলে রাজনৈতিক মার্‌জায়িআতের[৭] দৃষ্টিতে আলেম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছেন।[৮] কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তখনো তাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল না। এ কারণে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সঠিক পরিস্থিতি অবগত হওয়া এবং আলেম সমাজের রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তারা একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

www.pathagar.com

আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদী

করে। সরকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে "প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল" নামে একটি বিল উত্থাপন করে। অতঃপর ফার্সী ১৩৪১ সালের ১৬ই মেহের তারিখে[৯] বিলটি অনুমোদিত হয়। বিলটিতে নারীদেরকে ভোটাধিকার দেয়া হয়[১০] এবং একই সাথে নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচিতদের জন্য কুরআন নিয়ে শপথ করার পূর্বতন বিধান বিলোপ করে তদস্থলে "যেকোন আসমানী কিতাবের" শপথ করার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।[১১]

ইমাম খোমেনী (রঃ) এ সময় মারজা' হিসেবে কোমে অবস্থান করছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সরকার একটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং এ বিলটি তারই প্রস্তুতিপর্ব; সরকার এ বিল পাস ও বাস্তবায়ন করে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন তা-ই দেখতে চাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন; তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে কোমের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সাথে মতবিনিময়ের জন্যে তাঁদেরকে দাওয়াত করেন। পরামর্শের পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

১। মারজা'গণের পক্ষ থেকে শাহের বরাবরে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে উক্ত বিলের প্রতি তাঁদের বিরোধিতার কথা জানিয়ে দেয়া হবে এবং বিলটি বাতিলের দাবী জানানো হবে।

২। তেহরানে ও জিলা পর্যায়ে অবস্থানরত আলেমদের সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং তাঁদের বলা হবে তাঁরা যেন এ বিলটির পিছনে নিহিত সরকারী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করেন এবং বিলটি (মজলিসে আনুষ্ঠানিকভাবে) পাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

৩। ঐক্যবদ্ধভাবে ও অভিন্নমত সহকারে আন্দোলন পরিচালনার জন্যে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার ওলামায়ে কেরাম, বিশেষতঃ দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকগণ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শ ও মতবিনিময় করবেন।

এ ছাড়াও হযরত ইমামের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, সরকারের নিকট প্রেরিতব্য টেলিগ্রামের বক্তব্য (টেক্সট্) কপি করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

কোমের শীর্ষস্থানীয় মারজা'গণের পরামর্শ বৈঠকের পর তাঁরা এবং এরপর মাশ্হাদ ও নাজাফের মারজা'গণ বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ও এটি বাতিল করার দাবী তুলে টেলিগ্রাম পাঠালেন। এ ব্যাপারে সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কিছুদিন চুপ করে থাকল এবং টেলিগ্রামগুলোর জবাব দান থেকে বিরত থাকল। তবে প্রধানমন্ত্রী আমীর আসাদুল্লাহ্ আলাম একবার তাঁর এক বেতার ভাষণে এই বলে

www.pathagar.com

হুমকি দেন যে, গোলযোগ সৃষ্টির যেকোন ধরনের প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ "কারণ, সময়ের চাকা পিছন দিকে ঘোরে না।" তাঁর এ ভাষণের পর মসজিদে আর্‌ক্‌-এ[১২] সমবেত জনতা রাস্তায় নেমে আসে এবং "সময়ের চাকা পিছন দিকে ঘুরবে না, মাশ্‌রুতাহ্‌ (সাংবিধানিকতা) স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হবে না" বলে শ্লোগান দিতে থাকে।

এ ঘটনার পর কোম, তেহরান ও অন্যান্য শহরের ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ওয়াজের মাহ্‌ফিলে অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় সরকারের সমালোচনা শুরু করেন। তেমনি মারজা'গণও পুনরায় বিলটির প্রতি তাঁদের বিরোধিতার কথা জানিয়ে সেটিকে বাতিল করার দাবী জানাতে থাকেন।

অবশেষে আলেম সমাজ ও জনগণের চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রী আমীর আসাদুল্লাহ্‌ আলাম তাঁর ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। ১৩৪১ ফার্সী সালের ২রা অবান[১৩] তিনি অত্যন্ত নম্র ভাষায় ওলামায়ে কেরামের টেলিগ্রামের জবাব দেন এবং দৃশ্যতঃ বিলটির ব্যাপারে পশ্চাদপসরণ করেন। তিনি মারজা'গণের বরাবরে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে স্বীকার করেন যে, "নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচিতদের প্রশ্নে ইসলাম সম্মত মত হচ্ছে ওলামায়ে কেরামেরই মত; তবে কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার[১৪] এখানে আমরা 'আসমানী কিতাব' বলতে কুরআনকেই বুঝাতে চেয়েছি।"

কোন কোন প্রতিবাদকারী সরকারের জবাবকে যথেষ্ট গণ্য করেন এবং এতেই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ইমাম খোমেনী (রঃ) সব সময়ই একজন নেতার জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ সতর্কতার অধিকারী ছিলেন; তিনি সরকারের প্রতারণামূলক অপকৌশল বুঝতে পারলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, মন্ত্রিসভায় যে বিল পাস হয়েছে কেবল একটি ব্যক্তিগত টেলিগ্রামের দ্বারা তার আনুষ্ঠানিকতা ও আইনগত বৈধতা রহিত হয়ে যায় না। এ কারণে মারজা'গণ তাঁর সাথে এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিলটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তাই সরকারের টেলিগ্রামের জবাবে মারজা'গণ পুনরায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিলটি বাতিল করার জন্যে দাবী জানালেন। এদিকে ইমাম খোমেনীর (রঃ) এ ভূমিকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতারণামূলক অপকৌশল ফাঁস করে দেয়ার পর এ ইসলামবিরোধী বিলটির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তেহরানের ওলামায়ে কেরাম জনসাধারণের প্রতি মসজিদে হাজী সাইয়েদ আজিজুল্লাহ্‌য় [১৫] এক গণসমাবেশে যোগদানের জন্যে আহ্‌বান জানালেন। এর ফলে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৩৪১ ফার্সী সালের ৭ই অযার তারিখে[১৬] মন্ত্রিসভা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল' বাতিলের কথা ঘোষণা করে।

ইমামের আরো সতর্ক প্রতিরোধ

সরকার বিলটি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ওলামায়ে কেরামকে জানালে ইমাম খোমেনী (রঃ) এর মধ্যেও এক ধরনের ধোঁকা-প্রতারণা লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, সরকার বিলটি বাতিল করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করেনি। এ কারণে তিনি বিষয়টি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘোষণার দাবী জানালেন।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যেই কোন কোন আলেমের পক্ষ থেকে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে উল্লেখ করে প্রচারপত্র ছাপা হয়। এসব প্রচারপত্র পড়ে জনসাধারণ মনে করতে থাকে যে, সমস্যাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর (রহঃ) মতামত জানতে পারার পর লোকেরা প্রচারপত্রগুলো জনসাধারণের নিকট থেকে তুলে নেয় এবং সকলেই সংগ্রামের জন্য হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। সরকারী ঘোষণার দু'দিন পর ৯ই অযার (৩০শে নভেম্বর, ১৯৬২) শুক্রবার কোমের জনসাধারণ এবং অন্যান্য জিলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক জনতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) বাসভবনে গিয়ে সমবেত হয় এবং তাঁর ভাষণ শ্রবণ করে। ইমাম সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন ঃ "সরকার যদি বিলটি বাতিলের কথা সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা না করে তাহলে আমরা (সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বরাবরে কোন) টেলিগ্রাম পাঠানো হয়নি[১৭] বলে মনে করব এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখব।"

ইমামের এ পীড়াপীড়ি এবং সতর্কতামূলক চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আমির আসাদুল্লাহ্ আলাম ১০ই অযার (১লা ডিসেম্বর, ১৯৬২) তারিখে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্ট ভাষায় বিলটি বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। পরদিন হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এক ভাষণে বিষয়টিকে "আপাততঃ সমাপ্ত" বলে গণ্য করেন এবং একই সাথে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন ঃ "আরেকবার যদি দেখি যে, বিদেশ থেকে কোন শয়তান আমাদের দেশের দিকে রওনা হয়েছে তাহলে (জানিয়ে দিতে চাই যে,) আমরা এই আমরাই আছি, আর সরকার সেই সরকারই আছে এবং জনগণও সেই জনগণই রয়েছে.।"

টীকা ঃ

(১) বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (এবং তার পূর্বে অন্যান্য উপনিবেশবাদী শক্তিরও) একটি স্থায়ী নীতি এই যে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রভাবাধীন দেশসমূহে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঐসব শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে যার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ, কাঁচামাল এবং আধা-পাকা উপকরণ (প্রাথমিক উপাদান)-এর সবগুলো বা অন্ততঃ কয়েকটি তার নিকট থেকেই সংগ্রহ করতে হবে; এজন্যে প্রয়োজনে ঋণ দিয়ে হলেও এ কাজে সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় পুঁজি এসব শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে ঋণদানের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, একই উপাদান বা উপকরণ অন্য কোন দেশে অপেক্ষাকৃত কম দামে বা সুবিধাজনক শর্তে পাওয়া গেলেও ঋণগ্রহিতা দেশ তা আমেরিকার নিকট থেকেই সংগ্রহ করতে বাধ্য হবে। — অনুবাদক

(২) এটা ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিককার ঘটনা। — অনুবাদক

(৩) فروردين- ২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল, (১৯৬২ খৃষ্টাব্দে)।

(৪) تير — ২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই।

(৫) امير اسد الله علم

(৬) ايت الله بروجردى

(৭) مرجعيت سياسى - যেহেতু ইরানের মুসলিম জনগণ মুজতাহিদ আলেমগণকে যথার্থ নায়েবে নবী ও ওয়ারেসে নবী হিসেবে মেনে চলত (এবং এখনো মেনে চলে), সেহেতু শুধু ইবাদত-বন্দেগী, হালাল-হারাম ও

www.pathagar.com

সামাজিক বিষয়ে নয়, বরং রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁদেরই ফতোয়া বা রায় মেনে চলত। অন্য কথায়, মারজা'গণ জনসাধারণের যথার্থ রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন বটে। তবে মারজা'গণ জনসাধারণকে নিয়ে কতখানি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করবেন তা সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট মারজা'গণের ব্যক্তিত্ব ও বিবেচনার উপর নির্ভর করত। তাঁরা কখনো রাজনৈতিক বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করলে তা "ইসলামে রাজনীতি নেই" ধারণায় করতেন না, বরং পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে ঐ মুহূর্তে নীরবতাই অধিকতর কল্যাণকর মনে করে নীরব থাকতেন। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসার জবাবদানকারী কেন্দ্র ছিলেন তাঁরাই। — অনুবাদক

(৮) সরকারের এ ভুল ধারণায় নিপতিত হওয়ার কারণ ছিল সম্ভবতঃ এই যে, ইমাম খোমেনী (রঃ) একজন আরেফ (আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি) হিসেবে পুরোপুরি নির্লোভ ও আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন। এ কারণে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদীর জীবদ্দশায় ওলামায়ে কেরামের বাইরে সাধারণ মানুষের এবং সেই সাথে সরকারেরও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা ছিল না। — অনুবাদক

(৯) মোতাবেক ৮ই অক্টোবর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ।

(১০) তৎকালীন আলেম সমাজ মনে করতেন যে, শাহী সরকারের পক্ষ থেকে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য নিছক জনগণের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে, কার্যতঃ ঐ সময় ইরানে পুরুষদেরও ভোটাধিকার ছিল না। কেননা সরকারের পছন্দনীয় ব্যক্তিদেরকেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হিসেবে ঘোষণা করা হত। এ কারণে সুস্পষ্ট ছিল যে, এহেন পরিস্থিতিতে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের বিষয় উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল নিছক এক মিথ্যা প্রচারাভিযানের মহড়া চালানো। শাহী সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে প্রচার চালাতে গিয়ে ইসলাম ও আলেম সমাজের উপর যত বেশী সম্ভব আক্রমণ চালানো। তাই হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) পরবর্তীকালে তাঁর এক ভাষণে নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলেন : "আমরা নারীদের উন্নতি-অগ্রগতির বিরোধী নই; আমরা নির্লজ্জতা-বেহায়াপনার বিরোধী। আমরা এসব অপকর্মের বিরোধী। এদেশের পুরুষদের কি স্বাধীনতা আছে যে, নারীদেরও (স্বাধীনতা) থাকবে? নারীর স্বাধীনতা এবং পুরুষের স্বাধীনতা কি মুখের বুলি দ্বারা তৈরী (নিশ্চিত) হয়?" (১৩৮৩ হিজরীর ২রা জিলহজ্ মোতাবেক ১৯৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রদত্ত ইমামের ভাষণ)।

অনুবাদক :

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে হয়; তা হচ্ছে : শাহী সরকারের উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের গালভরা বুলির প্রচার চালিয়ে সরকারকে একটি বাহাদুরী দেয়া ও তার গণবিরোধী চেহারা আড়াল করা। আর শপথ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সাথে একই বিলে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যই ছিল ওলামায়ে কেরামকে বিলটির বিরোধিতায় নামতে বাধ্য করা। এতে ওলামায়ে কেরাম নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী প্রমাণ করতে না পারলে প্রচারের ক্ষেত্রে বিলের দ্বিতীয় অংশটিকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রথম অংশটিকে অবলম্বন করে আলেম সমাজকে নারীর অধিকারের বিরোধী বলে প্রচার করা হত (এবং ওলামায়ে কেরাম নিজেদের শক্তিশালী প্রমাণ করতে পারা সত্ত্বেও পরবর্তীতে কমবেশী এ মর্মে অপপ্রচার চালানো হয়েছে)।

দ্বিতীয়তঃ নারীর অধিকার সম্পর্কে ইরানী ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলামী বিপ্লবকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে যেমন নারীদের ভূমিকা পুরুষদের চেয়ে বেশী না হলেও কম ছিল না (যা ইমাম খোমেনী (রঃ) বার বার উল্লেখ করেছেন এবং যা ইমাম ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি তথা ইসলামের প্রতি

www.pathagar.com

ইরানী মুসলিম নারীদের পরিপূর্ণ আস্থাই প্রমাণ করে), তেমনি বিপ্লবোত্তর ইরানে নারীরা হিজাব সহকারে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি অঙ্গনে পুরুষদের পাশাপাশি সম্মানজনকভাবে অধিকার ভোগ ও দায়িত্ব পালন করছে এবং পুরুষদের সাথে সমান ভোটাধিকারসহ জনগণের ভোটে নির্বাচিতব্য প্রতিটি প্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রার্থী ও নির্বাচিত হবার অধিকার ভোগ করছে।

(১১) বলা বাহুল্য যে, এর উদ্দেশ্যে ছিল কতক তথাকথিত প্রগতিশীল পাশ্চাত্যবাদী মুসলিম নামধারী লোকের জন্যে বাইবেলের শপথ করার সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া যার দ্বারা মুসলিম নামধারী তথাকথিত প্রগতিশীলদেরকে কুরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হত। — অনুবাদক

(১২) مسجد ارك – মসজিদটি তেহরানের অন্যতম প্রধান মসজিদ।

(১৩) মোতাবেক ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ।

(১৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, আসাদুল্লাহ্ আলামের এ যুক্তি ছিল একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ, ইরানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ দশমিক ৮ ভাগই মুসলমান; মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ খৃষ্টান, ইহুদী, যরথুস্ত্রী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এমতাবস্থায় মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ ধর্মীয় সংখ্যালঘুর কথা বিবেচনা করে কুরআনের শপথের শর্তকে "যেকোন আসমানী কিতাবের শপথ"-এ পরিবর্তিত করা যৌক্তিক হতে পারে না। এক্ষেত্রে অ-মুসলমানদের জন্য নিজ নিজ প্রধান ধর্মগ্রন্থের শপথের জন্যে ব্যতিক্রমধর্মী (Exceptional) আইনগত সুযোগ দেয়াই যথেষ্ট। বর্তমানে তারা সাংবিধানিকভাবে এরূপ সুযোগই ভোগ করছে। –অনুবাদক

(১৫) مسجد حاج سيد عزيز الله

(১৬) মোতাবেক ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) মূল কথাটি একটি বিখ্যাত আরবী বাক্য, তা হচ্ছে - كان لم يكن -"যেন ছিলই না" অর্থাৎ "যেন এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি"। — অনুবাদক

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়

শাহের ছয়দফা সংস্কার কর্মসূচী এবং আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা

শাহ্ ও তাঁর সরকার "প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল" নিয়ে অপমানজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক হলে নিঃসন্দেহে বেশ কিছুদিনের জন্য চুপচাপ থাকতেন এবং এমন কিছু করতেন না যা আরেকটি গণঅভ্যুত্থানের কারণ হতে পারে। কিন্তু পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মার্কিন প্রভুরা তাদের আধিপত্যকবলিত ও প্রভাবাধীন দেশসমূহে কতগুলো সংস্কারকার্য সম্পাদনকে অপরিহার্য গণ্য করছিল। এ কারণে তাদের ইরানী সেবাদাসদের পক্ষে চোখ বুজে তাদের নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কোমের মসজিদে আ'যমে জনতার উদ্দেশে হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ভাষণ

www.pathagar.com

আমেরিকার চাপের মুখে শাহ্ আমেরিকারই দেয়া সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হন।

ইতিপূর্বে আমেরিকার পক্ষ থেকে যে খসড়া পরিকল্পনা শাহ্ ও তাঁর সরকারকে দেয়া হয়েছিল তার বাস্তবায়নের জন্য একটি তথাকথিত গণভিত্তি প্রদর্শনকে জরুরী মনে করা হয়। তদনুযায়ী শাহ্ ফার্সী ১৩৪১ সালের ১৯শে দেই তারিখে[১] ঘোষণা করেন যে, তাঁর পরিকল্পিত ৬ দফা সংস্কার কর্মসূচীর ওপর গণভোটের আয়োজন করবেন। শুধু তা-ই নয়, শাহ্ অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে আমেরিকার চাপিয়ে দেয়া এ তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচীর নাম রাখলেন "শ্বেতবিপ্লব"।

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এবারও চুপ করে বসে থাকলেন না, বরং এ ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় মারজা' ও ওলামায়ে কেরামের এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে আলোচনাক্রমে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, কথিত গণভোট সম্বন্ধে সরকারের নিকট থেকে ব্যাখ্যা দাবী করা হবে। শাহী দরবারের পক্ষ থেকে ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব বেহ্বুদীর[২] মাধ্যমে প্রাথমিক যোগাযোগের পর স্থির হলো, ওলামায়ের কেরামের পক্ষ থেকে আয়াতুল্লাহ হাজী আগা রুহুল্লাহ্ কামাল্ভান্দ[৩] ব্যক্তিগতভাবে শাহের সাথে সাক্ষাৎ করে গণভোটের পিছনে শাহের উদ্দেশ্য কি তা জানতে চাইবেন।

আয়াতুল্লাহ্ কামাল্ভান্দ্ শাহের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। কিন্তু শাহ্ তাঁর প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দানের পরিবর্তে ইরানের আলেম সমাজের বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা অন্যান্য দেশের ওলামায়ে কেরামের ন্যায় নিজেদের শাহের কল্যাণের জন্য দোআ করেন না। জবাবে আয়াতুল্লাহ্ কামাল্ভান্দ্ বললেন ঃ "তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের দেশের সরকারের হুকুমবরদারমাত্র ; বাদশাহ্র জন্য দোআ করাটাই তাঁদের দায়িত্ব, ঠিক যেভাবে ইরানের প্রাদেশিক গভর্নর ও অন্যান্য প্রশাসকগণ সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে বাদশাহ্র জন্য দোআ করেন এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। কিন্তু শিয়া আলেমগণ তাঁদের বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে কখনোই কোন সরকারের হুকুমবরদার ছিলেন না এবং হবেন না। অতএব, তাঁদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে।"

কোমে মারজা'গণের বৈঠকে ইমাম খোমেনীর (রঃ) ভাষণ

আয়াতুল্লাহ্ কাম্‌লভান্দ্ শাহের সাথে সাক্ষাৎ করে কোমে ফিরে এলে তাঁর নিকট থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনার ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোমের শীর্ষস্থানীয় মারজা'গণ এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এতে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন এবং শাহী সরকারের বিরাট ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেন। তিনি জনগণের নিকট এ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে আহ্বান জানানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর ভাষণে বলেন ঃ "মহোদয়গণ যেন মনে রাখেন, যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে ভবিষ্যত অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুভার ও দুরূহ। এখন যেসব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংসের ন্যায় বিপদের হুমকি সৃষ্টি করেছে। ইসলাম, ইসলামী জনগণ ও ইরানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে যে, এ ঘটনাকে (মন্ত্রিসভার) সিদ্ধান্তপ্রস্তাব রূপ অপকর্মের[৪] সাথে তুলনা করা চলে না এবং একই মানদণ্ডে বিচার করে এ ঘটনাকে মোকাবিলা করা ঠিক হবে না। দৃশ্যতঃ

www.pathagar.com

ঐ অপকর্মের হোতা ছিল সরকার; আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল সরকার। তাই তাতে পরাজয়ও সরকারেরই পরাজয় ছিল। আর, একটি সরকারের পরাজয়, এমনকি একটি দেশের অভ্যন্তরে একটি সরকারের পতন ঘটার বিষয়টিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; কারণ তাতে সরকারব্যবস্থার ভিত্তিমূল ধ্বংস হয়ে যায় না। এমনকি অনেক সময় সরকারপদ্ধতিকে সুদৃঢ়করণ ও তাকে হেফাজতের লক্ষ্যে সরকারের পতন ঘটানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু এবার আমাদের প্রতিপক্ষের যার সাথে আমাদের মোকাবিলা ও বোঝাপড়া করতে হবে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং শাহ্। আর তিনি এখন এক জীবন-মরণের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। শাহ্ নিজে যেমন বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর পশ্চাদপসরণের পরিণতি হচ্ছে তাঁর পতন ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন যেকোন মূল্যেই হোক, এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন এবং শুধু যে পশ্চাদপসরণ করা চলবে না ও এ কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া চলবে না তা-ই নয়, বরং যেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, প্রয়োজনে পরিপূর্ণ পৈচাশিকতার আশ্রয় নিয়ে, যেকোন ধরনের বিরোধিতার মোকাবিলা করেন। অতএব, অতীতের অপকর্মটির ন্যায় (এ ব্যাপারে) প্রশাসনযন্ত্রের পশ্চাদপসরণের আশা করা ঠিক হবে না। আর এতদসত্ত্বেও এর বিরোধিতা করা ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আমাদের অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্য।. . . আমরা যদি শাহের এ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে শুধু সজাগ ও সচেতন করতে পারি এবং তাদেরকে প্রতারণার শিকার হওয়া ও শাহের এ প্রতারণাময় কর্মসূচী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে অবশ্যই তাকে পরাজিত করতে এবং অচল করে দিতে সক্ষম হব। আমরা তো আর কামান ও ট্যাঙ্কের যুদ্ধে যাচ্ছি না যে, আপনারা বলছেন, "আমাদের দ্বারা হবে না; আমরা কি করতে পারব? বর্শার ফলায় তো আর ঘুষি মারা চলে না!" (আসলে) আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় যে কাজটি করা সম্ভব তা হচ্ছে জনগণকে জাগ্রত করা, তাদেরকে বোঝানো। তাহলে দেখবেন আমরা কি বিরাট শক্তির অধিকারী হব, যে শক্তি ধ্বংস হবার নয় এবং কামান ও ট্যাঙ্ক যার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম নয়। এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক পথ আমাদের সামনে। আর যাঁরা মোকাবিলা করাকেই নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করেন তাঁদেরকে বিষয়টি সম্বন্ধে ভালোভাবে হিসাব-নিকাশ করতে হবে এবং এর পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। এ পথে তাঁদের ওপর যেসব কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদ-মুছিবত আসতে পারে তার মোকাবিলায় কতখানি প্রতিরোধ করতে ও কতখানি দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারবেন তাঁদেরকে তা (ভেবে) দেখতে হবে।. . . "

ইমাম খোমেনীর (রঃ) পক্ষ থেকে শাহী সরকারের সর্বশেষ চক্রান্তের রহস্য উন্মোচনের পর স্থির হয় যে, এ ব্যাপারে প্রত্যেক মারজা'ই একটি ইশতেহার প্রকাশ করবেন এবং তথাকথিত গণভোট বয়কটের ডাক দেবেন।

গণভোট বয়কট ও তেহরানের গণঅভ্যুত্থান

শাহের আয়োজিত সাজানো নাটকের গণভোট বয়কটের আহ্বান সম্বলিত হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঘোষণাপত্র[৫] প্রকাশিত হবার পর ফার্সী ১৩৪১ সালের ২রা বাহ্মান[৬] তেহরানের জনগণ সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সার্ চাশ্মে,[৭] বাহারিস্তান ও তেহরান শহরের দক্ষিণাংশের অন্যান্য এলাকার বাজারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। তারা "ভুয়া গণভোট ইসলামবিরোধী"[৮] "নাছরুম্ মিনাল্লাহি ওয়া ফাৎহুন কারীব্",[৯] "ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাৎহাম্ মুবীনা",[১০] "ইরান শ্বাসরুদ্ধকর দেশ", "শ্বাসরোধকারীরা[১১] নিপাত যাক"

www.pathagar.com

ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। জনগণের শ্লোগান যেন সরকারের মাথায় অনবরত হাতুড়ীর আঘাত হানতে থাকে।

গণবিক্ষোভ ঐদিন বিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং পরদিনও একইভাবে গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয়। নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভ দমনের ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে গিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক লোককে নির্মমভাবে প্রহার করে এবং কয়েকজন নিহত হয়। এতে সরকার পরিস্থিতিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করে এবং ভয় করতে থাকে যে, গণবিক্ষোভ দমন করা না গেলে নির্ধারিত দিনে (তথাকথিত) গণভোট অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। তাই সরকার তেহরানে সেনাবাহিনী তলব করে এবং শহরের প্রতিটি এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করে।

এদিকে কোম নগরীতেও ব্যাপক গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ রাস্তায় নেমে আসে। বাজার ও দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে সকলে বিক্ষোভে অংশ নেয়। বিক্ষোভকারীরা "আমরা কুরআনের অনুসারী, গণভোট চাই না", "ইসলাম বিজয়ী, স্বৈরাচার নিন্দিত" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। কার্যতঃ কোম নগরী জনসাধারণের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু কিছু সময় পরে সরকারের জল্লাদ বাহিনী এসে হাজির হয় এবং জনগণের ওপর দমন অভিযান শুরু করে। এতে বহুসংখ্যক আলেম, তরুণ মাদ্রাসাছাত্র ও সাধারণ মানুষ গুরুতররূপে আহত হয়।

সর্বজনমান্য মারজা'গণের পক্ষ থেকে ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে (তথাকথিত) গণভোট বয়কটের জন্য আহ্বান জানানোর পর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রছাত্রীরাও সরকারী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে এবং (তথাকথিত) গণভোটের প্রতি নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করে প্রচারপত্র বিতরণ করে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বুদ্ধিজীবী নামধারী কতক পশ্চিমায়িত ব্যক্তি শাহী সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি ওলামায়ে কেরামের বিরোধিতাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বীনদার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা শাহী সংস্কার কর্মসূচীকে প্রত্যাখ্যান করে। এমতাবস্থায় শাহের ভাড়াটে এজেন্টরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শাহ্ বিরোধী ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায় ও তাদেরকে প্রহার করে। এ পৈশাচিক হামলার পরে দ্বীনদার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয় তা থেকে জানা যায়, শাহের ভাড়াটে এজেন্টদের হামলা ও প্রহারের ফলে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ও টেকনিক্যাল ফ্যাকাল্টির পুরো এলাকাটাই ছাত্রছাত্রীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

এ অবস্থায় শাহ্ ধারণা করলেন যে, তিনি কোমে গিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ করে আলেম সমাজ ও জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি তথাকথিত গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে কোম সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন।

শাহের কোম সফর

শাহ্ তাঁর প্রতারণামূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেকে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে প্রদর্শন করার লক্ষ্যে তথাকথিত গণভোটের আগের দিন পূর্বঘোষণা অনুযায়ী কোম সফরে রওয়ানা হলেন। পূর্বেই কোমের জিলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি যেন শাহ্কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওলামায়ে কেরাম ও মারজা'গণকে সম্মত করান। কিন্তু জিলা প্রশাসকের সকল প্রচেষ্টাই পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনী (রঃ) এ সময়ও অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা তাঁর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে। ইমামের নিকট একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল যে, সরকার তার পোষা এজেন্টদের কোমে নিয়ে গিয়ে দেখাতে চাইবে যে, কোমের জনসাধারণ শাহ্‌কে অভ্যর্থনা জানিয়েছে; তাই ইমাম পূর্বাহ্নিক সতর্কতা হিসেবে এক ঘোষণা প্রচার করে কোমের জনসাধারণকে ঐ দিন তাঁদের বাড়ীঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে দেন।

শাহ্ ফার্সী ১৩৪১ সালের চৌঠা বাহ্‌মান[১২] কোম গমন করেন। কিন্তু শাহ্‌কে অভ্যর্থনা জানানোর অভিনয় করার জন্য আগের দিন যেসব ভাড়াটে এজেন্টকে কোমে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে ছাড়া শাহ্ কোমের রাস্তায় অন্য কোন লোক দেখতে পেলেন না। এতে শাহ্ ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। তিনি যে কতখানি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা কোমে হযরত মা'ছূমাহ্ (সালামুল্লাহি আলাইহা)-র মাযার জিয়ারতের ভান করার পর ভাড়াটে লোকদের সামনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ থেকেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

তথাকথিত গণভোট

১৩৪১ ফার্সী সালের ৬ই বাহ্‌মান[১৩] শাহের ঘোষিত (প্রকৃতপক্ষে মার্কিন নির্দেশিত) ছয়দফা সংস্কার কর্মসূচীর ওপর গণভোটের আয়োজন করা হয়। সমগ্র ইরানের প্রায় সকল জনগণই এ তথাকথিত গণভোটকে বয়কট করে। এ সত্ত্বেও শাহ্ গণভোট কর্মসূচী কার্যকর করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শাহের বেতনভুক ও ভাড়াটে এজেন্টরা ছাড়া কেউ এতে ভোট না দিলেও ঐ দিন বিকেলেই ইরানের সকল প্রচার মাধ্যমে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করা হয়, "শাহানশাহের প্রস্তাবিত নীতিমালাকে ইরানী জনগণের পক্ষ থেকে নজীরবিহীন ও ব্যাপক আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে স্বাগত জানানো হয়েছে, সকল শ্রেণীর মানুষ শাহানশাহী মহাবিপ্লবে শরীক হওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে আসে এবং ৫৬ লক্ষ 'হা'-ভোট ও তার মোকাবিলায় চার হাজার এক শ' পঞ্চাশটি 'না'-ভোটে ছয়দফা মূলনীতি ইরানী জনগণের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।"

গণভোটের তথাকথিত সাফল্যের খবর প্রকাশ ও প্রচারের পর শাহের প্রভু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী এক তারবার্তার মাধ্যমে তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন। বৃটিশ রাষ্ট্রদূতও প্রধানমন্ত্রী আমীর আসাদুল্লাহ্ আলামের সাথে সাক্ষাৎ করে (তথাকথিত) গণভোটের ফলাফলে বৃটেনের রাণীর সন্তোষের কথা অবহিত করেন। অবশ্য শাহ্ ও তাঁর মার্কিনী সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দানকারীদের সংখ্যা মাত্র এ দু'টি উপনিবেশবাদী দেশের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। রেডিও মস্কোও ঐ দিন চারটার সংবাদে শাহের কর্মসূচীর প্রশংসা করে এবং শাহের সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধীদেরকে "গুটিকয় পশ্চিমা এজেন্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল লোক" (!) বলে আখ্যায়িত করে।

এভাবে আরো একবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যৌথভাবে শাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং তাঁর গণ-নিপীড়ন ও দমনের নীতিকে স্বাগত জানায়।

১৯৬৩-র রমযান কর্মসূচী

শাহী সরকারের পক্ষ থেকে গণভোট নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হবার দু'দিন পর ফার্সী ১৩৪১ সালের ৮ই বাহ্‌মান (মোতাবেক ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী) ১৩৮২ হিজরী সালের রমযান মাস শুরু হয়। শাহী সরকার এজন্য আনন্দিত ছিল যে, তথাকথিত গণভোট অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং

www.pathagar.com

রমযান মাস শুরু হয়ে যাওয়ায় নতুন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানের মুসলিম জনগণসহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের সামনে স্বৈরাচারী শাহের ও তাঁর সরকারের ইসলামবিরোধী চেহারা তুলে ধরার জন্য এক অভিনব কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা করেন।

ইমামের আহ্বানে কোমের মারজা'গণ ও ওলামায়ে কেরামের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো; এতে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) প্রস্তাব করলেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শাহী সরকারের দমননীতি ও তার ইসলামবিরোধী প্রকৃতির প্রতি ইরানের ও বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে এবারের রমযানে পুরো মাস জুড়ে সারা দেশে নামাজের জামাআত, ওয়াজ মাহ্ফিল ও অন্যান্য তাবলীগী (প্রচারধর্মী) কাজ বন্ধ থাকবে এবং এ সংক্রান্ত খবর বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে পৌঁছে দেয়া হবে। ইমামের এ প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো এবং তার খবর সারা দেশে পৌঁছে দেয়া হলো। ফলে কোম, তেহরান, মাশ্হাদ, ইস্ফাহান ও শীরাযসহ দেশের অনেক শহরে মসজিদসমূহে নামাজ ও ওয়াজ মাহফিল বন্ধ হয়ে গেল। যেহেতু রমযান মাসে সকল মুসলমানই মসজিদে হাজির হয়ে জামাআতে নামাজ আদায়ের এবং ওয়াজ-নছিহত শোনার চেষ্টা করে, সেহেতু জামাআত ও ওয়াজ-নছিয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনগণের মধ্যে শাহী সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও আক্রোশ বৃদ্ধি পায় এবং এক পবিত্র গণঅভ্যুত্থান দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

শাহী সরকার পরিস্থিতি বিপজ্জনক লক্ষ্য করে এক নতুন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। মসজিদে নামাজ ও ওয়াজ বন্ধ রাখার এ গণধর্মঘটের কর্মসূচীকে বানচাল করার লক্ষ্যে শাহী সরকার তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মসজিদসমূহ বন্ধ থাকলে সরকার সেগুলোকে দখল করে নেবে এবং সেনানিবাসে পরিণত করবে।

এদিকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানের মসজিদসমূহে নামাজ ও ওয়াজ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নাজাফের ওলামায়ে কেরাম বরাবরে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং ইরানের মুসলিম জনগণের সমর্থনে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। অন্যদিকে ইরানে মসজিদসমূহ বন্ধের পর বাজার বন্ধেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশ অচল হয়ে যেত এবং শাহ্ ও তাঁর সরকারের পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম শাহের এজেন্টদের ছড়ানো গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মঘট ভঙ্গ করেন এবং মসজিদগুলোতে পুনরায় নামাজ ও ওয়াজ শুরু করেন। এভাবে, ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্যেও চিড় ধরে।

প্রতি বছরের ন্যায় নিয়মমাফিক ঐ বছরও ঈদুল ফিত্‌রের সময় সারা দেশ থেকে বহু লোক কোমে গমন করে। তারা অন্যান্য মারজা'গণের সাথে সাক্ষাতের পর হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) বাসভবনে গমন করে। ইমাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগত জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে শাহী সরকারের সাজানো গণভোট প্রহসনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।[১৪]

নতুন বছরের প্রথম দিনে সংগ্রাম অব্যাহত এবং মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায়[১৫] হামলার প্রস্তুতি

১৩৪২ ফার্সী সালের নববর্ষ সমুপস্থিত হলো।[১৬] বরাবরের মতো এ বছরও ইরানী জনগণ নতুন বছর শুরুর মুহূর্তটিতে আনন্দোৎসব করার জন্য প্রস্তুত।[১৭] কিন্তু ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে

www.pathagar.com

ওলামায়ে কেরাম নববর্ষকে কেন্দ্র করে শাহী সরকারের ওপর আরেকটি আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন। মারজা'গণ এবারের উৎসবকে বয়কট করলেন এবং নববর্ষের দিনকে আনন্দোৎসবের পরিবর্তে সর্বজনীন শোকদিবস ঘোষণা করলেন। সকল দ্বীনী মাদ্রাসার প্রবেশদ্বারের ওপর পতাকা উড়িয়ে দেয়া হলো; এতে লেখা হলো ঃ "এ বছর মুসলমানদের জন্য ঈদ[১৮] নেই।" অনেক আলেম ও মাদ্রাসাছাত্রই সার্বজনীন শোকদিবসের চিহ্ন স্বরূপ বুকে কালো ফিতা ধারণ করলেন।

কোমের জনসাধারণ প্রতি বছরের অভ্যাস অনুযায়ী নববর্ষ বরণের মুহূর্তটিতে[১৯] হযরত মা'ছুমাহ (সালামুল্লাহি আলাইহা)- র হারামে (মাযারে) ও তৎসংলগ্ন মসজিদে আ'যামে[২০] সমবেত হলো। বর্ষবরণের মুহূর্তটিতে যখন পূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী হযরত মা'ছুমাহ্র হারামের বাতিগুলো একবার অফ্ হয়ে আবার অন্ হলো, সাথে সাথেই তরুণ মাদ্রাসাছাত্ররা অসংখ্য প্রচারপত্র ওপর দিকে ছুঁড়ে মারল। প্রচারপত্রে হারামে মা'ছুমাহ্র চত্বর ছেয়ে গেল।

শাহ্ ও তাঁর এজেন্টরা মনে করেছিলেন যে, জনগণের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ ঘটনা শাহের এজেন্টদেরকে হতাশ করল এবং তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। তবে প্রচারপত্রগুলো একবারে এমন আকস্মিকভাবে ছুঁড়ে মারা হয় যে, সমবেত জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা শাহী এজেন্টদের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো না কারা প্রচারপত্রগুলো ছড়ালো। তাই শাহী সরকার ওলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণকে একটা 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল—কোমের বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করল।

শাহী জল্লাদদের কোমে প্রবেশ

নওরোজ (ফার্সী নববর্ষ)-এর পরদিন বেশ কয়েকটি সরকারী বাস কোমে প্রবেশ করল; এসব বাসের আরোহীরা কোমবাসীর নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাসগুলো আসার পরপরই বহু অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যসহ কয়েক ডজন সামরিক ট্রাকও কোমে প্রবেশ করল। সামরিক ট্রাকগুলো শহরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত মহড়ার পর শহরের প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল ও সেখানেই অবস্থান নিল।

ঐ দিন ছিল হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)-এর শাহাদাত বার্ষিকী। এ উপলক্ষে কোম শহরে অনেক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ কারণে সকাল থেকেই বহু লোক হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) বাসভবনে জমায়েত হয়েছিল। একজন আলেম মিম্বারে উঠে[২১] উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজবংশের শাসকদের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম জাফর সাদেকের (আঃ) সংগ্রামের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন।

বক্তৃতা শুরু হবার সামান্য পরে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) মজলিসে এলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন সমবেত জনতার মাঝে বেশ কিছুসংখ্যক সন্দেহজনক ব্যক্তি এলোমেলোভাবে যখন তখন সমবেত কণ্ঠে দরুদ পড়ে[২২] মজলিসের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। তিনি তখন একজন আলেমকে কাছে ডেকে তাঁর পক্ষ থেকে জনতার উদ্দেশে একটি ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমত উক্ত আলেম ঘোষণা করলেন যে, যেসব সরকারী এজেন্ট বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা যদি চুপ না করে তাহলে তিনি (হযরত ইমাম) নিজেই (হযরত মা'ছুমাহ্র) হারামে গমন করবেন এবং যা কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন সেখানেই জনতার উদ্দেশে বলবেন।

হযরত ইমামের পক্ষ থেকে এ হুমকিমূলক ঘোষণা দেয়া হলে সরকারী এজেন্টরা ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ফলে সেখানে গোলযোগের যে ষড়যন্ত্র তারা করেছিল তা আর বাস্তবায়িত করতে পারল না।

www.pathagar.com

শাহী এজেন্টদের মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় হামলা

ঐদিন বিকালে আয়াতুল্লাহ্ ওয়্মা গোল্পায়গানীর[২৩] পক্ষ থেকে হযরত ইমাম জাফর সাদেকের (আঃ) শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে কোমের মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় এক শোকানুষ্ঠানের[২৪] আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সর্বস্তরের জনগণ সেখানে সমবেত হয় এবং মাদ্রাসার অভ্যন্তর ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এমনি অবস্থায় শাহী সরকারের এজেন্টরা মাদ্রাসাকে ঘিরে ফেলে এবং সশস্ত্র সৈন্যরাও মাদ্রাসার চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করে।

একজন আলেম সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধের হেফাজত এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহকে "ইমাম সাদেকের বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) সেনানিবাস" হিসেবে আখ্যায়িত করছিলেন।

মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় শাহী সরকারের হামলায় যাঁরা শাহাদাত বরণ করেন হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) তাঁদের জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন

www.pathagar.com

আগের দিন শাহী সরকারের যেসব এজেন্ট সরকারী বাসযোগে কোমে এসেছিল হঠাৎ করে তারা বক্তৃতার মাঝখানে একবারে মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াহ্ এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং সমবেত জনতার ওপর হামলা চালায়। এ অবস্থায় তরুণ মাদ্রাসাছাত্রগণ এবং সাহসী ওলামায়ে কেরাম সরকারী এজেন্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। তাঁরা মাদ্রাসার তেতলার একটি দেয়াল ভেঙ্গে ইট খসিয়ে নিয়ে সরকারী এজেন্টদের দিকে ছুঁড়ে মারতে থাকেন। অভাবিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সরকারী এজেন্টরা সাময়িকভাবে পিছু হটে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার হামলা চালায় এবং মাদ্রাসার তেতলায় পৌঁছার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তেতলায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় এতক্ষণ অপেক্ষায় থাকা পুলিশ ও সেনাবাহিনী—যারা ভান করছিল যে, জমায়েতে হামলাকারীরা সাধারণ লোক, বিশেষতঃ কৃষক ও গ্রামবাসী—এবার তারা মাদ্রাসায় হামলা শুরু করল।

দাঙ্গাদমন ইউনিটের সদস্যরা মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ার আশপাশের ভবনসমূহের ছাদের ওপর গিয়ে উঠল এবং সেখান থেকে আলেমদের দিকে গুলী বর্ষণ করতে লাগল। সৈন্যরা বেশ কয়েকজন মাদ্রাসাছাত্রকে ছাদের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিল।

মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ার বাইরে অবস্থানরত জনতা যখন বুঝতে পারল যে, মাদ্রাসাছাত্র ও আলেমগণ শাহী এজেন্টদের হামলার শিকার হয়েছেন তখন তারা তাঁদের সাহায্যের জন্য মাদ্রাসায় প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সরকারী এজেন্টরা তাদের ওপরও হামলা চালাল এবং তাদের অনেককে প্রহার ও বেশ কিছুসংখ্যককে হত্যা করল।

গোটা মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াহ্ রক্তস্নাত হয়ে গেল। আর ইসলামের পবিত্র সন্তান ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসাছাত্রদের রক্তবন্যা দেখে শাহী সরকারের এজেন্ট জল্লাদরা পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল। কিন্তু মাদ্রাসাছাত্ররা তখনো বীরের ন্যায় প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন। তাই জল্লাদরা নতুন করে হামলা চালাল। তারা উন্মাদের ন্যায় ছাত্রদের কক্ষগুলোতে ঢুকে পড়ল এবং সবকিছু তছনছ করার পর, ঐসব কক্ষে আশ্রয় গ্রহণকারী ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাহী সরকারের এজেন্টদের পরিচালিত এ হত্যা-উৎসব সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকল।[২৫]

তাব্‌রীযের মাদ্রাসায়ে তালেবিয়ায়ও[২৬] একই ধরনের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা চলে। সেখানেও বহুসংখ্যক আলেম ও মাদ্রাসাছাত্রকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

ইমামের পক্ষ থেকে তাকিয়াহ্[২৭] হারামের ফতোয়া ও সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব

মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় নারকীয় হামলা চালানোর পর শাহ্ ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর বিপদ দূর হয়ে গেছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, ফায়যিয়ার ঘটনায় নিঃসন্দেহে আলেম সমাজের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে থাকবে; তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু শাহের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো, ফায়যিয়ার ঘটনার পরপরই হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তেহরানের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিকট একটি তারবার্তা পাঠালেন। এতে তিনি ঐ সময় বিরাজমান পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে জালেমের সামনে নীরব থাকার তাকিয়াহ্-নীতি অবলম্বনকে হারাম বলে ফতোয়া দিলেন এবং এভাবে যেসব রক্ষণশীল লোক তাকিয়াহ্-নীতির আশ্রয় নিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিল তাদের নীরবতার পথ বন্ধ করে দিলেন।[২৮]

www.pathagar.com

আলেমদেরকে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রেরণ

তেহরানের আলেমদের বরাবরে ইমামের পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণীর প্রতিক্রিয়ায় শাহ্ আলেম সমাজ ও মাদ্রাসাছাত্রদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি ও তাঁদেরকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে আলেম এবং মাদ্রাসাছাত্রদেরকেও বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা প্রদান করতে হবে।

ফার্সী ১৩৪২ সালের পহেলা ওর্দীবেহেশ্‌ত্ তারিখে[২৯] শাহ্ আলেম ও মাদ্রাসাছাত্রদের বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রেরণের জন্য ফরমান জারী করেন। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা রাস্তাঘাটে ও অলিতে-গলিতে আলেম ও মাদ্রাসাছাত্রদের গ্রেফতার করতে ও সেনানিবাসে পাঠাতে শুরু করে। এ সময় যেসব আলেমকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে পাঠানো হয় তাঁদের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল্-মুসলিমিন হাশেমী রাফসানজানী[৩০] ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম এবং ঐ সময়ই সংগ্রামী হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

আলেম ও মাদ্রাসাছাত্রদের গ্রেফতার করে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়ার খবর হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁদের নিকট একটি বাণী পাঠালেন। এ বাণীতে তিনি বললেন ঃ

"আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না, অস্থির হবেন না, বরং পরিপূর্ণ সাহসিকতা সহকারে উচ্চশির থাকুন, মনোবল শক্তিশালী রাখুন। আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, আপনারা হচ্ছেন হযরত ইমামে যামানের (আঃ)[৩১] সৈনিক এবং তাঁর সৈনিকের দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে। এখন তো আপনাদের ওপর এক কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে, তা হচ্ছে, যেসব সৈনিক ও নন-কমিশণ্ড অফিসারের সাথে আপনাদের ওঠাবসা করতে হবে তাঁদেরকে সচেতন করা। এই পবিত্র ইসলামী দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখাবেন না। পূর্ণ মনোযোগ ও দৃঢ়তার সাথে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকুন, মন ও শরীর উভয় দিক থেকেই নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। খোদা না করুন, কখনো যদি আপনাদের মধ্যে দুর্বলতা ও অস্থিরতা দেখা দেয় তাহলে তা আলেম সমাজের হতাশার কারণ হবে এবং আপনাদের জন্য অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনবে। . . ."

টীকা ঃ

(১) মোতাবেক ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ।

(২) بهبودی

(৩) ایت الله حاج آقا روح الله کمالوند

(৪) অর্থাৎ প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি বিল।

(৫) হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঘোষণাপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"হে মুসলমানগণ! জেনে রাখুন, ইসলাম এখন কুফরের দ্বারা বিপন্ন। মারজা' ও ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে কতক অবরুদ্ধ, কারারুদ্ধ ও অপদস্ত-অপমানিত। সরকার দ্বীনী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলো (حوزه های علمیه — দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহ)-কে অবমাননা করার, নিরাশ্রয় মাদ্রাসাছাত্রদের প্রহার করার, মুলমানদের বাজারসমূহ লুণ্ঠন করার এবং দোকানপাটের দরজা-জানালাসমূহ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। তেহরানে হযরত আয়াতুল্লাহ্ খান্‌সারী (خوانساری) ও হযরত আয়াতুল্লাহ্ বেহ্‌বাহনীকে কঠোরভাবে অবরুদ্ধ (গৃহবন্দী) করে রেখেছে এবং একদল

www.pathagar.com

সম্মানিত আলেম ও মহান ওয়ায়েযকে কারারুদ্ধ করেছে; আমরা কোন পন্থায়ই তাঁদের সম্পর্কে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারছি না। ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের অবমাননা করার জন্য নীচু স্তরের লোক ও দুর্বৃত্তদের উস্কানি দিচ্ছে। মাদ্রাসাছাত্রগণ ও মোবাল্লেগগণকে ইসলামের ও দ্বীনী আহ্‌কামের প্রচারকার্যের জন্য ইরানের বিভিন্ন এলাকায় যেতে বাধা দিচ্ছে। আমাদের সাথে মধ্যযুগীয় দাসদের ন্যায় আচরণ করছে। আল্লাহ্‌ তাআলার কসম, আমি এ জীবন চাই না।

انی لا اری الموت الا سعادة ولا الحیوة مع الظالمین الا برما-

(নিশ্চয়ই আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য এবং জালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু মনে করি না।) হায়! শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা যদি আসত, আর আমাকে ধরে নিয়ে যেত! তাহলে আমার ঘাড়ে কোন দায়িত্ব থাকত না। ওলামায়ে ইসলাম এবং অন্যান্য মুসলমানদের একমাত্র অপরাধ এই যে, তাঁরা কুরআনের, ইসলামের ইজ্জতের ও দেশের স্বাধীনতার সমর্থন করছেন এবং উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করছেন। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। এবার দেখা যাক (প্রধানমন্ত্রী) আলাম সাহেব এবং (আলাম সরকারের কৃষিমন্ত্রী ও মার্কিনী কৃষিসংস্কার বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল) আর্‌সেন্‌জানী (ارسنجانی) কি বলেন।"

(৬) মোতাবেক ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ

(৭) سرچشمه —ফোয়ারার স্থান ঃ তেহরানের দক্ষিণাংশের একটি জায়গা।

(৮) এ প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে যে, শাহ্‌ মোহাম্মাদ রেযা পাহ্‌লভী ও তাঁর পিতা রেযা খানের আমলে ভোট গ্রহণ মাত্রই প্রহসন ছিল। কেবল সরকারের পছন্দনীয় রায়ই ঘোষণা করা হত; জনগণ কি রায় দিয়েছে তা দেখা হত না। —অনুবাদক।

(৯) نصر من الله و فتح قریب —আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় সন্নিকটে। (সূরাহ্‌ ছাফ্‌ ঃ ১৩)

(১০) انا فتحنا لك فتحا مبینا —নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (সূরাহ্‌ ফাৎহ্‌ ঃ ১)

(১১) অর্থাৎ যারা জুলুম-নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের দ্বারা দেশে এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে।

— অনুবাদক

(১২) মোতাবেক ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ।

(১৩) মোতাবেক ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ।

(১৪) হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর এ ভাষণে বলেন ঃ ". . . সম্মানিত মহোদয়গণ! আপনারা যিনি যে পদেই থাকুন না কেন, পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও প্রতিরোধশক্তি সহকারে এই সরকারের শরীআত বিরোধী ও আইন বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই মরিচাধরা ও পচে যাওয়া বর্শার ফলাগুলোকে ভয় পাবেন না। এ বর্শার ফলাগুলো খুব শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে। ক্ষমতাসীন প্রশাসন বর্শার ফলার ওপর ভরসা করে একটি মহান জাতির আশা-আকাঙ্খা ও দাবীর মুখে টিকে থাকতে সক্ষম হবে না এবং আগে হোক বা পরেই হোক, পরাজয় বরণ সে করবেই। এখনো সে দিশাহারা ও পরাভূত হয়ে আছে। আর আপনারা যেসব অসভ্যপনা ও জংলীপনা দেখতে পাচ্ছেন তা এই দিশাহারা অবস্থার কারণেই করছে। আমরা চাইনি যে, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য এ ধরনের লাঞ্ছনাকর অবস্থার সৃষ্টি হোক। কেন দেশের শাহ্‌ জনগণ থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন যে, যখন তিনি কোন প্রস্তাব দেবেন তখন জনগণের উপেক্ষা এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন? দেশের বাদশাহ্‌কে এমন হতে হবে যে, যখন কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন, আবেদন করবেন, তখন জনগণ জান-প্রাণ ও অন্তর দিয়ে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে; এরকমটা হবে না যে, জনগণ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং শাহের দেয়া গণভোটে সারা দেশে দু'হাজারের বেশী লোক সমর্থন দেবে না। আমরা চাইনি যে, এ দেশের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের

www.pathagar.com

ভাগ্যে এ ধরনের পরাজয় ও লাঞ্ছনা নেমে আসুক। ঠিক আছে, তারা কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করুন; জাগ্রত হোন ও স্বীয় নীতির প্রশ্নে পুনর্বিবেচনা করুন: আইন লঙ্ঘন এবং ওলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপের পরিবর্তে এবং বর্শার ফলা ও গুণ্ডামীর (ওপর নির্ভরশীল হবার) পরিবর্তে জনগণের দাবীর সামনে আত্মসমর্পণ করুন; আর এ সত্য ও বাস্তবতাটি লক্ষ্য করুন এবং মনে রাখুন যে, বর্শার ফলার জোরে জনগণকে নীরব করে দেয়া ও আত্মসমর্পণ করানো সম্ভব নয়, গায়ের জোরে ও গুণ্ডামী করে আলেম সমাজকে তাঁদের স্কন্ধে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। . . . "

(১৫) مدرسه فيضيه— কোমের বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(১৬) প্রতি বছর ২১শে মার্চ তারিখে ইরানী নববর্ষ শুরু হয়। ইরানী পরিভাষায় বছরের এ প্রথম দিনটিকে "নাওরুয্" (نوروز —নতুন দিন) বলা হয় (বাংলা ভাষায় যা 'নওরোজ' নামে পরিচিত)। এখানে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চের কথা বলা হচ্ছে। — অনুবাদক

(১৭) বলাবহুল্য যে, নওরোজ উৎসব ইরানী জনগণের জীবনে সবচেয়ে বড় বার্ষিক উৎসব। গোটা জাতি বসন্তের প্রথম দিনের এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। — অনুবাদক

(১৮) عيد —"ঈদ" মানে উৎসব। ফার্সীতে "ঈদুল ফিতর", "ঈদুল আযহা", ঈদে নওরোজ" এবং আরো অনেক উৎসব সম্পর্কেই "ঈদ" পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এখানে "ঈদে নওরোজ" বুঝানোই লক্ষ্য। অনুবাদক।

(১৯) ইরানী পঞ্জিকায় প্রতি চতুর্থ বছর লীপইয়ার হিসাবে ৩৬৬ দিনে গণনা করা হলেও ইরানী ঐতিহ্য অনুযায়ী নিখুঁত জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী প্রতি ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা (সেকেণ্ডসহ) অন্তর বর্ষবরণ করা হয়। ফলে বর্ষবরণ বিচারে প্রতিটি বছরের আয়তন সমান হয়। ঐ মুহূর্তটিতে ইরানী জনগণ বর্ষবরণের দোয়া পাঠ করে। দোআটি হচ্ছে এরূপ ঃ

يا مقلب القلوب والابصار-يا مدبر الليل والنهار- يا محول الحول والاحوال -حول حالنا الى احسن الحال-

" হে অন্তরসমূহের ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তন সাধনকারী! হে দিন ও রাত্রির আবর্তনকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)! হে অবস্থা ও পরিস্থিতির রূপান্তরকারী! আমাদের অবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রূপান্তরিত করে দাও।" —অনুবাদক

(২০) مسجد اعظم— এটি কোমের বৃহত্তম মসজিদ।

(২১) ইরানে মসজিদ ছাড়াও হোসেইনয়ায় (ইমামবাড়ী), মাদ্রাসায় ও মারজা'গণের বাসভবনে — যেসব জায়গায় সাধারণতঃ দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা হয় সেসব জায়গায়, বক্তাদের বক্তব্য রাখার সুবিধার্থে মিম্বার রাখা হয়।

—অনুবাদক

(২২) স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইরানী জনগণের মধ্যে হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের প্রতি দরূদ বর্ষণের ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রচলন রয়েছে। যেকোন বক্তৃতা ও আলোচনায় বক্তার মুখে হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে বক্তা-শ্রোতা নির্বিশেষে সকলে সমস্বরে বলেন اللهم صل على محمد و آل محمد — (আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ)। এ ছাড়াও কেউ যখন কোন দ্বীনী ব্যক্তিত্ব বা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে ঘোষণা দেয় যে, "অমুকের জন্য ছালাওয়াৎ (صلوات —দরূদ)" তখনো শ্রোতারা সমস্বরে উক্ত দরূদ পাঠ করে থাকে। এ ছাড়া ঘোষণা ছাড়াও অনেক সময় কতক শ্রোতা বক্তৃতার মাঝখানে ছালাওয়াৎ বলে বসতে পারে। এখানে শাহের এজেন্টরা শুধু বক্তৃতায় বাধা দিয়ে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যখন তখন সমস্বরে দরূদ পড়ছিল। —অনুবাদক

(২৩) ايت الله العظمى گلپايگانى— তিনি হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) পরে সমকালীন ইরানের শীর্ষস্থানীয় মারজা'গণের অন্যতম ছিলেন।— অনুবাদক

www.pathagar.com

(২৪) مراسم عزاداری — আহ্‌লে বাইতের মা'ছুম ইমামগণের (আঃ) শাহাদাত দিবসগুলোতে শিয়া মাজহাবের অনুসারীগণ (আঃ) শোক প্রকাশার্থে মাতম করার জন্য যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

(২৫) মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় সরকারী জল্লাদদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের খবর হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নিকট পৌঁছুলে তিনি মাদ্রাসায় যেতে উদ্যত হন। কিন্তু উপস্থিত জনসাধারণ তাঁকে কসম দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে ও মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় যেতে বাধা দেন। কিছুলোক কোত্থেকে শুনে এল যে, শাহী জল্লাদের দল মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর হযরত ইমামের বাসভবনে হামলা চালাবার পরিকল্পনা করেছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি করে ইমামের বাসভবনের দরজা বন্ধ করে দিল। হযরত ইমাম দরজা বন্ধ করতে দেখে উচ্চস্বরে বললেন ঃ "দরজা বন্ধ করলে কেন? কার অনুমতি নিয়ে দরজা বন্ধ করেছ? দরজা খুলে দাও।"

হযরত ইমামের কড়া নির্দেশ পেয়ে তারা দরজা খুলে দিল। তখন হযরত ইমাম তাঁর বাসভবনের বাইরে অপেক্ষমাণ ভীতসন্ত্রস্ত জনগণের মধ্যে মনোবল সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ

"..... আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না, উদ্বিগ্ন হবেন না; আপনারা অস্থির হবেন না। নিজেদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ককে দূর করে দিন। আপনারা এমন নেতাদের (অর্থাৎ মা'ছুম ইমামগণের।—অনুবাদক) অনুসারী যাঁরা বিপদ-মুছিবত ও বিপর্যয়ের মুখে এমনই ধৈর্য অবলম্বন করেছেন ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন যে, আজকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা তার তুলনায় কিছুই নয়। আমাদের নেতাগণ আশুরার দিনের এবং এগারই মুহাররমের রাতের ঘটনাবলীর ন্যায় ঘটনাবলীকে অতিক্রম করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় এহেন বিপদ-মুছিবতকে সহ্য করেছেন। আপনারা আজকে কি বলছেন? আপনারা কিসের ভয়ে ভীত হচ্ছেন? কি জন্য অস্থির-উদ্বেগাকুল হচ্ছেন? যাঁরা হযরতে আমীর (আলী) আলাইহিস্ সালাম এবং ইমাম হোসেন আলাইহিস্ সালাম-এর অনুসারী হবার দাবী করেন তাঁদের জন্য নিজেদের (দেশের) ক্ষমতাসীন প্রশাসনের এ ধরনের জঘন্য ও নির্লজ্জ কর্মের মোকাবিলায় হার মানা খুবই দূষণীয় ব্যাপার। ক্ষমতাসীন প্রশাসনযন্ত্র এ ধরনের পৈচাশিক অপরাধের আশ্রয় নিয়ে কার্যতঃ নিজেদেরকে ঘৃণ্য ও কলঙ্কিত করেছে এবং স্বীয় চেঙ্গিজী প্রকৃতিকে খুব ভালোভাবেই প্রদর্শন করেছে। স্বৈরাচারী ও ক্ষমতাদর্পী প্রশাসনযন্ত্র এ পৈচাশিকতার আশ্রয় নিয়ে কার্যতঃ স্বীয় পরাজয় এবং ধ্বংস ও নিপাতকেই নিশ্চিত করেছে; আর আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করেছিলাম যে, ক্ষমতাসীন প্রশাসন তার আসল চরিত্র প্রকাশ করুক, তার জঘন্য রূপ প্রদর্শন করুক। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন ইসলাম ও কুরআনে করীমের হুকুম-আহ্‌কামের হেফাযতের জন্য নিহত হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন; কেবল এভাবেই তাঁরা ইসলামকে আজকের দিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছেন এবং আমাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। আজকে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আপতিত বিপদের মোকাবিলায় যেকোন রকমের কঠিন অবস্থা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হব; কেবল তাহলেই ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারব এবং তাদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার গতিরোধ করতে পারব। . . . "

(২৬) مدرسهٔ طالبیه

(২৭) تقیه —যেসব অবস্থায় সত্য প্রকাশ করলেও সত্যের কোন উপকার হবে না এহেন পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচাতে বা জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচতে সত্যকে, বিশেষত ঃ স্বীয় চিন্তা-বিশ্বাসকে গোপন করা বা বাহ্যতঃ অস্বীকার করা।
— অনুবাদক

(২৮) হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর এ বাণীতে বলেন ঃ

".... আলেম সমাজের মিলনকেন্দ্রে নকল পোশাকে কমাণ্ডোদের ও শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের হামলা এবং টহলদার বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা—এ সবই মোঙ্গলদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়; কেবল পার্থক্য

www.pathagar.com

এখানে যে, তারা বিদেশীদের রাজ্যে হামলা করেছিল, আর এরা স্বীয় মুসলিম জাতির ওপর এবং আলেম সমাজ ও নিরাশ্রয় মাদ্রাসাছাত্রদের ওপর হামলা করেছে। . . . এরা শাহ্প্রীতির শ্লোগান দিয়ে দ্বীনের পবিত্র স্থানসমূহের ও পবিত্র ব্যক্তিত্বদের (مقدسات) অবমাননা করছে। শাহ্প্রীতি মানে লুটতরাজ, ইসলামের অবমাননা, মুসলিম জনগণের অধিকার লঙ্ঘন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলোতে হামলা; শাহ্প্রীতি মানে কুরআন ও ইসলামের ওপর আঘাত হানা। . . . শাহ্প্রীতি মানে ইসলামের হুকুম-আহ্কামের ওপর হামলা এবং কুরআনের হুকুম-আহ্কামকে বদলে দেয়া, শাহ্প্রীতি মানে আলেম সমাজকে দমন করা এবং রিসালাতের চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহকে মুছে ফেলা। হযরত মহোদয়গণ মনে রাখবেন, ইসলাম এখন বিপন্ন, কুরআন ও মাজহাব বিপদের মুখে ; এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে এখন তাকিয়াহ্ অবলম্বন পুরোপুরি হারাম এবং সত্যের প্রকাশ করা ফরয

ولو بلغ ما بلغ (তাতে যা হবার হোক)। এখন যখন ইরানে এমন কোন উপযুক্ত জায়গা নেই যেখানে অভিযোগ করা যেতে পারে এবং উন্মাদের ন্যায় যখন দেশ চালানো হচ্ছে, তখন আমি জনগণের পক্ষ থেকে, প্রধানমন্ত্রীর পদে চাকরিরত আলাম সাহাবের নিকট কৈফিয়ৎ চাচ্ছি ঃ কোন্ আইনের অনুমতি নিয়ে দু'মাস আগে তেহ্রানের বাজারে হামলা চালিয়েছিলেন এবং ওলামায়ে ইসলাম ও অন্যান্য মুসলিম জনগণকে প্রহার ও আহত করেছিলেন? কোন্ পরোয়ানা বলে ওলামায়ে কেরাম ও সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকদের আটক করেছেন যাঁদের বিপুল সংখ্যক এখনো আটক রয়েছেন? কোন্ অধিকার বলে রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থ এমন এক গণভোটের জন্য ব্যয় করেছেন যার স্বরূপ সর্বজনবিদিত? . . . কোন্ এখ্তিয়ার বলে হযরত ইমাম জাফর সাদেক সালামুল্লাহি আলাইহি-র ওফাত বার্ষিকী দিবসে নকল পোশাকে ও অস্বাভাবিক অবস্থায় কমাণ্ডোদেরকে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় পাঠিয়েছিলেন এবং এতসব নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন? আমি এখন আপনার নিয়োজিত লোকদের বর্শাফলকের জন্য আমার বক্ষকে প্রস্তুত করেছি, কিন্তু আপনার জোর— জবরদস্তিকে মেনে নিতে এবং আপনার গুণ্ডামিপনার সামনে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত হব না। আল্লাহ্ চাহেন তো আমি যেকোন যথোপযুক্ত সময়-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহ্কাম বয়ান করবই এবং যতক্ষণ আমার হাতে কলম আছে ততক্ষণ দেশের স্বার্থ ও কল্যাণবিরোধী সকল কাজের স্বরূপ ফাঁস করে দেবই। এখন মুসলমানদের একটি চোখ তাদের দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে এবং অপর চোখটি তাদের দ্বীনের প্রতি তাকিয়ে ক্রন্দন করছে। আর আপনি যতই লাফালাফি করুন না কেন, আপনার কয়েক মাসের শাসনকালে দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি ও দ্বীনদারী বিপন্ন হয়ে পড়েছে; যে কোন বিচারে দেশ এখন পতনের দ্বারপ্রান্তে। আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাঁর নিজের ও কুরআনের আশ্রয়ে হেফাযত করুন।"

(২৯) মোতাবেক ২১শে এপ্রিল ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ।

(৩০) যিনি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পরে দুই দফা মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর স্পীকার ও দুই দফা দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

(৩১) امام زمان —হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)।

www.pathagar.com

একবিংশ অধ্যায়

চরম পর্যায়ে আন্দোলন

ফায়যিয়ার শহীদগণের চেহ্‌লাম

মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় শাহী জল্লাদ বাহিনীর পৈচাশিক হামলায় যাঁরা শহীদ হলেন তাঁদের শাহাদাতের চল্লিশতম দিবস (চেহ্‌লাম) ঘনিয়ে এলে এ উপলক্ষে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) জনসাধারণের উদ্দেশে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন। এতে তিনি বললেন ঃ "ইসলামের (ইতিহাসে সংঘটিত এ) বিরাট বিপর্যয়ের চল্লিশতম দিবসে ইরানী ও অ-ইরানী নির্বিশেষে মুসলিম জনগণের জন্য যথোচিত কাজ হচ্ছে এই যে, তাঁরা ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্রসমূহের ওপর চাপিয়ে দেয়া বিপদ-মুছিবতের স্মৃতিচারণ করবেন, সরকারের এজেন্টরা বাধার সৃষ্টি না করলে এ উপলক্ষে শোক—সমাবেশ করবেন এবং এ বিপর্যয়ের জন্যে যারা দায়ী তাদের ওপর অভিসম্পাৎ করবেন।"

ইমামের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইরানের অধিকাংশ শহরে মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ার শুহাদা স্মরণে চেহ্‌লাম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, শাহী সরকার প্রথমে এর বিরুদ্ধে কোন কঠিন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি। কিন্তু সরকার যখন বুঝতে পারল যে, প্রকৃতপক্ষে এসব সমাবেশ সরকারের স্বরূপ তুলে ধরার মাধ্যম মাত্র তখন এসব সমাবেশের কাজ চালিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করতে থাকল এবং সমাবেশ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

তেহরানের মসজিদে আর্‌ক্‌-এ আয়াতুল্লাহ্‌ ওয্‌মা হাকীমের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পুলিশ এ সমাবেশ বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করলে সমবেত জনতা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। একজন সাহসী যুবক সমাবেশে বাধাদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে আহত করে।

মুহররম মাসে বক্তৃতার ওপর শাহী সরকারের পক্ষ থেকে শর্তারোপ

মুহররম মাস ঘনিয়ে এলে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ মাস পালন সম্পর্কে ধর্মীয় বক্তাদের ও জনগণের উদ্দেশে কিছু দিকনির্দেশ প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে, মুহররমের এ দিনগুলোতে চুপ থাকা ক্ষমতাদর্পী স্বৈরাচারী প্রশাসনকে স্বীকৃতি দান ও ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করার সমতুল্য। ইমাম বলেন ঃ এ উপলক্ষে ইসরাইল ও তার এজেন্টদের সৃষ্ট বিপদ সম্পর্ক জনসাধারণকে সচেতন করুন এবং শোকগাঁথা[১] ও বুক চাপড়ানোর অনুষ্ঠানগুলোতে ইসলাম ও ফিকাহ্‌র কেন্দ্রসমূহের ওপর আপতিত বিপদ-মুছিবতের কথা স্মরণ করুন।

শোকানুষ্ঠান পরিচালনাকারী কমিটিসমূহ ও ওলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) এ আদেশ মেনে নেন ও কার্যকর করেন। এর ফলে স্বৈরাচারী শাহী সরকারের স্বরূপ আরো বেশী মাত্রায় ফাঁস হয়ে যায়। সরকার নতুন পন্থায় পুনর্বার সংগ্রামের মুখোমুখি হয়। এমতাবস্থায় বেশ কিছুসংখ্যক বক্তাকে শাহী সরকারের গুপ্ত পুলিশ সংস্থা সাভাকের[২] দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় ও তাঁদেরকে হুমকি দেয়া হয় এবং তাঁদের বক্তৃতা অব্যাহত রাখার জন্যে কয়েকটি শর্ত

www.pathagar.com

জুড়ে দেয়া হয়। তা হচ্ছে ঃ

১। দেশের এক নম্বর ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না।

২। ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না।

৩। জনগণের কানে বারবার আওড়াবেন না যে, ইসলাম বিপন্ন।

তেহরানে আশুরার দিনে ব্যাপক বিক্ষোভ

১৯৬৩ সালের আশুরার দিন[৩] অন্যান্য বছরের আশুরার দিন থেকে ছিল ভিন্নতর। যুগের হোসেনের[৪] পথনির্দেশ পেয়ে ইরানের মুসলিম জনগণ এ দিনে শাহের ইয়াযিদী প্রশাসনের ওপর এক শক্তিশালী আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করছিল। আশুরার দিন সকালে লক্ষ লক্ষ মানুষ তেহরানের রাস্তায় নেমে আসে এবং স্লোগান দিতে থাকে ঃ "খোমেনী! খোমেনী! আল্লাহ্ তোমার রক্ষাকর্তা। নিপাত যাক, নিপাত যাক তোমার রক্তপিপাসু দুশমন।" মিছিলকারীরা তেহরানের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মসজিদে হাজী আবুল ফাৎহ্[৫]-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ খুব সকাল থেকেই মসজিদটিকে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু মানুষ প্লাবনের ন্যায় মসজিদের সামনে চলে আসায় পুলিশের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পুলিশের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে।

এরপর সকাল আটটায় জনসাধারণ মসজিদ থেকে বের হয়[৬] এবং পুনরায় বিক্ষোভসহ মিছিল করে সড়ক প্রদক্ষিণ শুরু করে। এত বিপুল সংখ্যক লোক এমন ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যে, ঐ সময় পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় বিক্ষোভ কোনদিনই হয়নি। শহীদ হাজী মাহ্দী এরাকী[৭] জনতার উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর এ ভাষণে শাহের তথাকথিত শ্বেতবিপ্লবের কঠোর নিন্দা করেন। এরপর জনতার মিছিল তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে রওনা হয়। দুপুর একটায় বিক্ষুব্ধ জনতা মর্মর প্রাসাদের[৮] সামনে এসে জমায়েত হয় এবং "ডিক্টেটর নিপাত যাক" বলে স্লোগান দিতে থাকে। জনতা বেশ কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে এ স্লোগানসহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকে। এরপর জনসাধারণ বাজারের[৯] দিকে রওনা হয়। বাজারে পৌঁছার পর বিকেলে তিনটায় বিক্ষোভ সমাপ্ত হয়।

আশুরার দিনে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঐতিহাসিক ভাষণ

পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আশুরার দিন হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। কিন্তু শাহের এজেন্টরা যেকোন পন্থায়ই হোক না কেন, হযরত ইমামকে ভাষণ দান থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ লক্ষ্যে হযরত ইমামের ওপর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু ইমাম খোমেনী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন এবং ভাষণ তিনি দেবেনই।

আশুরার দিন সকালে শাহী সরকারের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা হযরত ইমামের বাসভবনে গমন করেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, "আমি আ'লা হযরতের[১০] পক্ষ থেকে আপনাকে জানাবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি যে, আপনি যদি আজ মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় গিয়ে বক্তৃতা করতে চান তাহলে আমরা সেখানে কমান্ডোদের লেলিয়ে দেব এবং সেখানে আগুন লাগিয়ে দেব ও রক্তপাত ঘটাব।"

জবাবে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বলেন ঃ "আমরাও আমাদের কমান্ডোদেরকে এ মর্মে হুকুম দেব যে, তারা যেন আ'লা হযরতের প্রেরিত লোকদের সমুচিত শিক্ষা প্রদান করে।"

www.pathagar.com

বিকাল চারটা নাগাদ কোম নগরী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। অনেক লোক শাহাদাত লাভের আকাঙ্খায় ইমামের ভাষণ শুনতে রওয়ানা হবার পূর্বে তাদের অছিয়তকার্য[১১] সমাপন করে গেল।

বিকাল চারটায় হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর বাসভবন থেকে বের হলেন এবং মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছার পর তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করলেন। এতে তিনি শাহ্ ও তাঁর প্রভুদের স্বরূপ পূর্বাপেক্ষাও বেশী পরিমাণে ফাঁস করে দিলেন।

হযরত ইমাম তাঁর ভাষণে সরাসরি শাহ্কে আক্রমণ করেন। ইমাম তাঁর এ ভাষণে বলেন ঃ

"আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজিম। বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। ....এখন আশুরার বিকাল। ... অনেক সময় আমি যখন আশুরার ঘটনা নিয়ে চিন্তা করি তখন আমার সামনে এ প্রশ্নটি এসে হাজির হয় যে, বনি উমাইয়্যাহ্ ও ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার প্রশাসনের যদি শুধু হোসেনের সাথেই যুদ্ধের কারণ থাকত তাহলে আশুরার দিন নিরাশ্রয় নারী ও নিরীহ শিশুদের সাথে তারা যে পৈচাশিক ও মানবতা বিরোধী আচরণ করেছিল তার অর্থ কি ছিল? নারী ও শিশুরা কি দোষ করেছিলেন? হোসেনের ছয় মাসের শিশু কি করেছিলেন? আমার মতে তাদের বিরোধ ছিল মূল ভিত্তির সাথে। বনি উমাইয়্যাহ্ ও ইয়াযিদের হুকুমত হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) আহ্লে বাইতের বিরোধী ছিল। তারা বনি হাশেমকে দেখতে চাচ্ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল এই পবিত্র বৃক্ষের মূলোৎপাটন করা। এই একই প্রশ্ন এখানেও জাগছে যে, ইরানের স্বৈরাচারী প্রশাসনের মারজা'গণের সাথে যুদ্ধাবস্থা রয়েছে। ওলামায়ে ইসলামের সাথে তাদের বিরোধ রয়েছে। কিন্তু কুরআনের সাথে তাদের কি সমস্যা? মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াহ্র সাথে তাদের সমস্যা কি? দ্বীনী ইল্মের ছাত্রদের সাথে তাদের কি কাজ? আমাদের ১৮ বছর বয়স্ক সাইয়্যেদের সাথে[১২] তাদের কি সমস্যা? আমাদের ১৮ বছর বয়স্ক সাইয়্যেদ শাহের কি করেছিল? সরকারের কি ক্ষতি সে করেছিল? ইরানের স্বৈরাচারী প্রশাসনের সাথে সে কি করেছিল? এ থেকে এই উপসংহারেই উপনীত হচ্ছি যে, এদের বিরোধ মূল ভিত্তির সাথে। তারা ইসলামের মূল ভিত্তি এবং ওলামায়ে কেরামের বিরোধী। তারা চায় না, এ ভিত্তি টিকে থাক। তারা চায় না যে, আমাদের ছোটরা ও বড়রা টিকে থাক। ইসরাইল চায় না, এদেশে কুরআন থাকুক। ইসরাইল চায় না, এদেশে ওলামায়ে ইসলাম টিকে থাকুন। ইসরাইল চায় না, এদেশে ইসলামী হুকুম-আহ্কাম থাকুক। ইসরাইল চায় না, এদেশে জ্ঞানী ও পণ্ডিত কেউ থাকুন। ইসরাইল তার কলঙ্কিত ভাড়াটে এজেন্টদের মাধ্যমে মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াকে লণ্ডভণ্ড করেছে, আমাদের ওপর হামলা করেছে, আপনাদের ওপর—জনগণের ওপর—হামলা করেছে। ইসরাইল আপনাদের অর্থনীতিকে দখল করতে চায়, আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, আপনাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করতে চায়। যা কিছু ইসরাইলের লক্ষ্য হাসিলের পথে বাধা, যা কিছু তার পথে প্রতিবন্ধকতা, ইসরাইল তার ভাড়াটে এজেন্টদের মাধ্যমে সেসবকে তার পথ থেকে অপসারণ করতে চায়। কুরআন তার পথে বাধা, অতএব, কুরআনকে সরিয়ে নিতে হবে। আলেম সমাজ তার লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা, অতএব, তাঁদের অপসারণ করতে হবে। মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াহ্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য কেন্দ্র তার পথে বাধা, অতএব সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। মাদ্রাসাছাত্রগণ হয়ত পরে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, অতএব, তাদেরকে হত্যা করতে হবে, ছাদের ওপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে হবে, তাদের হাত ও মাথা চুরমার করতে হবে। ইসরাইল যাতে তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইরান সরকার ইসরাইলের বদমতলব অনুসরণ করে এবং তার পরিকল্পনা কার্যকর করে আমাদেরকে অবমাননা করেছে এবং এখনো করে চলেছে।

www.pathagar.com

"আপনারা কোমের সম্মানিত বাসিন্দারা লক্ষ্য করেছেন, যেদিন সেই ভুয়া গণভোট, নির্লজ্জপনার গণভোট অনুষ্ঠিত হলো, যেদিন বর্শাফলকের ডগায় ইরানী জনগণের স্বার্থের বিরোধী গণভোট অনুষ্ঠিত হলো, সেদিন কোমের রাস্তায় ও গলিতে গলিতে, ওলামায়ে কেরামের সমাবেশকেন্দ্রগুলোতে হযরত ফাতেমা মা'ছুমাহ্ আলাইহাস সালাম-এর (মাযারের) আশপাশে গুটিকয় ইতর ও জঘন্য শ্রেণীর লোককে নামিয়ে দেয়া হলো; তাদেরকে গাড়ীতে চড়িয়ে এনে নামিয়ে দেয়া হলো, আর তারা (চিৎকার করে) বলল ঃ "মুফ্‌তে খাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে! পোলাও খাওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে।" আপনারা বলুন, এই মাদ্রাসাছাত্ররা—যারা তাদের জীবনের সর্বোত্তম সময়টি এবং আনন্দে মগ্ন থাকার সময়টি এই ছোট কক্ষগুলোতে কাটিয়ে দিচ্ছে, অথচ মাসে ৪০ থেকে ১০০ তুমানের বেশী পাচ্ছে না[১৩] তারা কি মুফ্‌ত্‌খোর? কিন্তু যারা কলমের এক এক খোঁচায় কয়েকশ' কোটি তুমান আয় করে তারা মুফ্‌ত্‌খোর নয়? আমরা হচ্ছি মুফ্‌ত্‌খোর যখন (আমাদের অবস্থা এই যে) মরহুম হাজী শেখ আবদুল করীম[১৪] যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন সেই রাতে তাঁর সন্তানদের রাতের খাবার ছিল না? যখন আমাদের মরহুম বুরুজের্দী[১৫] দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন তাঁর ... ঋণ বাকী ছিল; তিনি মুফ্‌ত্‌খোর ছিলেন? কিন্তু যারা জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ বাইরের ব্যাঙ্কসমূহে নিয়ে জমা করেছে, একের পর এক বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরী করেছে, তারপরও জাতিকে রেহাই দিচ্ছে না, এরপরও এদেশের স্বার্থকে নিজের ও ইসরাইলের পকেটে পুরে নেয়ার পিছনে লেগে আছে, তারা মুফ্‌ত্‌খোর নয়? বিশ্বকে বিচার করতে হবে, জাতিকে বিচার করতে হবে, বলতে হবে মুফ্‌ত্‌খোর কারা। ওহে জনাব শাহ্! আমি আপনাকে নছিহত করছি। হে শাহ্ মহোদয়! আমি তোমাকে নছিহত করছি, এই সব কাজকর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাক। আমি পসন্দ করি না যে, যদি কোনদিন তোমার প্রভুরা চায় যে, তুমি কেটে পড়, সেদিন জনসাধারণ (আল্লাহ্‌র নিকট) শুকরিয়া জ্ঞাপন করুক। আমি চাই না যে, তুমি তোমার বাপের মতো হও। ইরানী জনগণ! আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, যাদের বয়স ৪০ বছর, এমন কি যাদের বয়স ৩০ বছর তাদেরও নিঃসন্দেহে স্মরণ আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাইরের তিনটি দেশ আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল; সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকা ইরানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমাদের দেশকে দখল করে নিয়েছিল। তখন জনগণের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখে ছিল, জনগণের মান-ইজ্জত বিনষ্ট হতে চলছিল। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, জনসাধারণ এজন্য খুশী হয়েছিল যে, পাহ্‌লভী[১৬] বিদায় নিয়েছে। আমি চাই না তুমিও এমনি হও। আমি পছন্দ করি না তুমি তোমার বাপের মতো হও। আমার নছিহত শোন, ওলামায়ে কেরামের কথা শোন, ওলামায়ে ইসলামের কথা শোন।

"এরা[১৭] জনগণের কল্যাণ চান। এরা দেশের কল্যাণ কামনা করেন। ইসরাইলের কথা শুনো না; ইসরাইল তোমার কোন কাজে আসবে না। হতভাগা! অসহায়! তোমার জীবন থেকে পঁয়তাল্লিশটি বছর চলে যাচ্ছে; এখনো একটু ভেবে দেখো, একটু চিন্তা কর, নিজের কাজের অনিবার্য পরিণতির প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত কর, একটু শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমার বাপের (পরিণতি) থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর; এই যে (সবাই) বলছে, তুমি ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরোধী, এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে (বলব) তুমি অত্যন্ত খারাপ(ভাবে) চিন্তা করেছ। যদি তোমাকে (কানে কানে কোন কথা) বলে দেয়া হয়, তোমার হাতে (কোন পরিকল্পনা) তুলে দেয়া হয়, সে সম্পর্কে (এবং তার বহির্ভূত সব কিছু সম্পর্কে) চিন্তা কর। কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কেন কথা বলছ? আলেম সমাজ আর ইসলাম কি কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতা? আর কৃষ্ণ (কলঙ্কিত)-প্রতিক্রিয়াশীল এই তুমি কি 'শ্বেত' বিপ্লব করেছ? তুমি কিসের শ্বেতবিপ্লব সংঘটিত করেছ? তুমি কিসের শ্বেতবিপ্লব করেছ? জনগণকে কেন এতটা বোকা বানাতে চাচ্ছ? কেন জনগণকে এত হুমকি দিচ্ছ?

www.pathagar.com

"আজ আমাকে জানানো হয়েছে, তেহরানের কয়েকজন ওয়ায়েয ও খতিবকে নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই বলে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, তিনটি বিষয়ে তাঁরা যেন কথা না বলেন ঃ এক ঃ শাহের দোষ না বলেন, দুই ঃ ইসরাইলকে আক্রমণ না করেন এবং তিন ঃ না বলেন যে, ইসলাম বিপন্ন; আর যা খুশী বলেন সে ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। আমাদের সকল সমস্যা, বিপদাপদ এবং আমাদের সকল বিরোধ এই তিনটি বিষয়ে নিহিত। এ তিনটি বিষয় যদি এড়িয়ে যাই তো আমাদের আর কোন মতপার্থক্যই থাকে না। এখানে দেখতে হবে যে, আমরা যদি না বলি যে, ইসলাম বিপন্ন, তাহলেই কি ইসলাম বিপন্ন নয়? আমরা যদি না বলি যে, শাহ্ এমন বা অমন, তাহলেই কি সে অমন নয়? আমরা যদি না বলি যে, ইসরাইল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক, তাহলেই কি সে বিপজ্জনক নয়? আর নীতিগতভাবে বা মূলগতভাবে শাহ্ ও ইসরাইলের মধ্যে কি সম্পর্ক, কি যোগাযোগ রয়েছে যে, নিরাপত্তা সংস্থা বলছে, শাহ্ সম্পর্কে কথা বলো না, ইসরাইল সম্পর্কেও কথা বলো না? আচ্ছা, নিরাপত্তা সংস্থার দৃষ্টিতে শাহ্ কি ইসরাইলী?

"... বলার কথা অনেক আছে। আপনারা যা ধারণা করছেন তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু বলার আছে। বাস্তব অবস্থা এ রকমই, আমাদের দেশ এবং ইসলাম বিপন্ন। যা ঘটতে চলেছে তা আমাদেরকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন করেছে এবং আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। ইরানের পরিস্থিতির কারণে, এই বিধ্বস্ত দেশের পরিস্থিতির কারণে, এই মন্ত্রিসভার অবস্থার কারণে এবং দেশের হর্তাকর্তাদের অবস্থার কারণে আমরা উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট এ সব কিছুর সংশোধন প্রার্থনা করছি।"

ইমামকে গ্রেফতার ও ১৫ই খোর্‌দাদের[১৮] গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

আশুরার দিন বিকেলে ইমাম তাঁর ভাষণে শাহী সরকারের স্বরূপ ফাঁস করে দিলে ঐদিনই রাতের অন্ধকারে সরকারের কমান্ডোদল ও ছত্রীসেনারা কোমে প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইমামের বাসভবন ঘোরাও করে ফেলে। এরপর শাহের সেবাদাসদের মধ্য থেকে কয়েকজন দেয়াল টপকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইমামকে খোঁজ করতে থাকে। এ সময় যেহেতু মুহররম মাস উপলক্ষে শোকানুষ্ঠানের জন্যে ইমামের বাসভবনের আঙ্গিনায় শামিয়ানা টানানো হয়েছিল এবং সেখানে নিয়মিত শোকানুষ্ঠান হত, এ কারণে একদিনের জন্য ইমাম তাঁর বড় ছেলে মোস্তফার বাসায় গিয়ে রাতের বেলা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাই নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারল না। ইমামকে না পেয়ে তারা, ইমামের বাসায় কাজ করতেন এমন কয়েকজন কর্মচারীকে[১৯] প্রহার করতে শুরু করে।

ইমামের বাসভবনে নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার কিছুক্ষণ পর ইমাম তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের জন্যে জেগে উঠলে হৈচৈ শুনে ঘটনা বুঝতে পারলেন। সাথে সাথে তিনি কাপড়-চোপড় পাল্টে ছেলের বাসা থেকে বেরিয়ে গলিতে নেমে এলেন এবং শাহী জল্লাদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন ঃ "আমি রুহুল্লাহ্ খোমেনী; এ বেচারাদের মারধোর করছ কেন? তোমরা লোকদের সাথে এ কি ধরনের বন্য আচরণ করছ? কেন তোমরা মানবিক নীতিমালা মেনে চলছ না? তোমরা এ কি ধরনের পাশবিক কার্যকলাপ করছ?"

কমান্ডোরা হযরত ইমামকে তাদের সামনে দেখতে পেয়ে সাথে সাথে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিল। ইমামের বড় ছেলে হাজী অগা মোস্তফা খোমেনী কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইমাম তাঁকে নিষেধ করলেন। ফলে শাহী সরকারের সেবাদাসরা ঐ রাতে একদম বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই ইমামকে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

www.pathagar.com

৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থানের প্রাক্কালে হযরত ইমাম খোমেনীকে (রহঃ) গ্রেফতার করে কোম থেকে তেহরানে নিয়ে যাওয়া হয়

ইমামকে বহনকারী গাড়ীটি দ্রুতগতিতে তেহরানের দিকে ছুটে চলল। এমনকি তারা হযরত ইমামকে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সময়ও দিল না। তারা কোন রকম বিরতি ছাড়াই হযরত ইমামকে তেহরানে সেনাবাহিনীর অফিসার্স ক্লাবে নিয়ে গেল।[২০] সেখান থেকে ভোর পাঁচটায় তাঁকে কাছ্র সেনানিবাসে নিয়ে[২১] গেল।

হযরত ইমামকে ১৯দিন কাছ্র সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। এরপর ১৩৪২ ফার্সী সালের ৪ঠা তীর[২২] তাঁকে সেখান থেকে এশ্‌রাৎ আবাদ সেনানিবাসে[২৩] নিয়ে যাওয়া হয়।

কোমের গণঅভ্যুত্থান

যে রাতে নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা ইমামকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সে রাতেই কোমের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ইমামকে বহনকারী গাড়ীটি রওয়ানা হওয়ার পরপরই ইমামের বড় ছেলে হাজী আগা মোস্তফা খোমেনী চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ "জনগণ! খোমেনীকে নিয়ে গেল!" সাথে সাথে কিছু লোক তাড়াহুড়ো করে গলিতে নেমে এল। কিন্তু তারা বাধা দেয়ার আগেই ইমামকে বহনকারী গাড়ীট দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ে।

www.pathagar.com

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক লোক রাস্তায় নেমে এল। তারা মোস্তফা খোমেনীর পিছন পিছন হযরত মা'ছুমাহ্ (সালামুল্লাহি আলাইহা)-র হারামের দিকে রওয়ানা হলো। সেখানে পৌছার পর জনতা ইমামের গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বিশেষ করে তরুণ মাদ্রাসাছাত্রদের "হয় মৃত্যু, নয় খোমেনী" স্লোগানে সমগ্র কোম নগরী প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

কোমের মারজা'গণ ওলামায়ে কেরামও হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) গ্রেফতার হওয়ার খবর শুনে আয়াতুল্লাহ্ ওয্মা গোলপায়গানীর বাসভবনে সমবেত হলেন। তাঁরা হযরত ইমামকে বন্দী করার ঘটনার নিন্দা করে একটি যৌথ বিবৃতি প্রণয়ন করে হযরত মা'ছুমাহ্র হারামের দিকে রওনা হলেন এবং সেখানে ইতিমধ্যেই সমবেত জনতার সামনে হাযির হলেন। এমনকি সাহসী দ্বীনদার মহিলারাও পর্দাসম্মত পোশাকে শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে হযরত মা'ছুমাহ্র হারামে এসে সমাবেশে যোগদান করলেন এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধে তুলে শাহী সরকারের প্রতি স্বীয় ঘৃণা প্রকাশ করে স্লোগান দিতে লাগলেন। ধর্মীয় নগরী কোমে ১৫ই খোর্দাদ (৫ই জুন)-এর গণঅভ্যুত্থান শুরু হলো।

জনতার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার পর সকলে হযরত মা'ছুমাহ্ (সালমুল্লাহি আলাইহা)-র হারামের চত্বর থেকে বেরিয়ে এল এবং কোমের রাস্তায় মিছিল বের করল।

জনতা হারামে মা'ছুমাহ্ থেকে তেমন একটা দূরে যেতে না যেতেই শাহী সরকারের জল্লাদদের সম্মুখীন হল। শাহের এজেন্টরা মেশিনগান থেকে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করতে লাগল। যেহেতু মহিলারা মিছিলের সম্মুখভাবে ছিলেন সেহেতু তাঁরাই অন্যদের তুলনায় আগে গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন।

কিন্তু মেশিনগানের গুলীবর্ষণ সত্ত্বেও জনতা বীরের ন্যায় সামনে এগিয়ে চলল। এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোমের আকাশে জঙ্গী বিমান উড়তে লাগল। বিমান অনেক নীচ দিয়ে উড়ে গিয়ে শব্দতরঙ্গ তুলে জনতাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জনতার প্রতিরোধ অব্যাহত থাকল। কোম-তেহরান মহাসড়কের শুরুর দিকে এবং তৎসংলগ্ন চৌরাস্তায় একদল লোক চারদিক থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল এবং তাদের ওপর গোলাগুলী চলতে থাকল। শহরের অন্যান্য এলাকায়ও ফুলের ছিন্ন পাপড়ি ছড়িয়ে থাকার ন্যায় গুলীবিদ্ধ মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সরকারী জল্লাদের দল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হলো।

কোমের গণঅভ্যুত্থান ৫ই জুন সকাল ৭টায় শুরু হয় এবং বিকেল ৫টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নিঃসন্দেহে কোমের গণঅভ্যুত্থান ছিল পরবর্তী ব্যাপকতর গৌরবময় গণঅভ্যুত্থানের (বিপ্লবের) পটভূমি ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী মাত্র।

পনরই খোর্দাদে তেহরানে রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থান

হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তেহরানের জনগণও আন্দোলনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। বিভিন্ন দ্বীনী সংগঠন, শোকগাঁথার গায়কগণ ও ব্যবসায়ী শ্রেণী সকলেই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাস বর্জন করে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করল। মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা সব সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়রূপ রণবাঙ্কারে থেকে দ্বীনী মাদ্রাসার ওলামায়ে কেরামের সাথে ভ্রাতৃসুলভ সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করে এসেছে; তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে তেহরানের রাস্তায় নেমে এল। তারা "খোমেনীকে মুক্তি

www.pathagar.com

পাঁচই জুন ১৯৬৩ ঃ শাহ্ বিরোধী গণবিক্ষোভের একটি দৃশ্য

দাও" বলে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল এবং সাধারণ গণমানুষকে খুনী শাহী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে লাগল। বাজার ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। তেহরানের রাস্তায় বন্যার মতো জনস্রোত বইতে থাকল। সকলে "হয় মৃত্যু, নয় খোমেনী", "খোমেনী বিজয়ী হোক", "শাহ্ নিপাত যাক" ইত্যাদি স্লোগানের দ্বারা তেহরানকে প্রকম্পিত করে তুলল।

বিক্ষুব্ধ জনতার একটি দল রেডিও স্টেশন দখল করার জন্য ময়দানে আর্ক-এ চলে এল এবং রেডিও ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশেও সক্ষম হল। কিন্তু শাহী জল্লাদদের অনবরত গুলীবৃষ্টির কারণে তাদের পাক্ষে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না।

বিক্ষুব্ধ জনতার আরেকটি দল অস্ত্র সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারে এবং বিভিন্ন পুলিশ লাইনে হামলা চালায়। আরেক দল শাহের প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে যায়। কিন্তু সামরিক বাহিনীর গার্ড গ্রুপ নির্মমভাবে জনতার ওপর গোলা বর্ষণ করে। ফলে বিপুল সংখ্যক লোক শাহের প্রাসাদের চারপাশে রক্তের মধ্যে ডুবে যায় এবং তাদের অনেকেই শাহাদাত বরণ করে।

ভারামীনের[২৪] কাফন পরিধানকারীদের হত্যা

ইমামকে গ্রেফতার করে নেয়ার খবর ভারামীনে পৌঁছলে এ শহরের ও জিলার অসংখ্য লোক, বিশেষতঃ কৃষকরা শাহাদত বরণের প্রস্তুতির নিদর্শনস্বরূপ কাফন পরিধান করে মিছিল সহকারে তেহরান অভিমুখে রওয়ানা হয়। খবর পেয়ে শাহী সরকার কয়েক ট্রাক সশস্ত্র সৈন্য ভারামীনের দিকে পাঠিয়ে দেয়। তারা ভারামীন্ শহরের সামান্য দূরে এ কৃষকদের অবরোধ করে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর হামলা চালায়। শাহী সরকারের জল্লাদ বাহিনীর নির্বিচার গুলীবর্ষণ ও গণহত্যার ফলে তারা নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করে।

এ ছাড়া 'কান' গ্রামের একদল অধিবাসী হযরত ইমামের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনে তেহরানে চলে আসে এবং স্বৈরাচারী শাহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্বীয় ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

গণঅভ্যুত্থানকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র

গণঅভ্যুত্থানের অগ্নি সর্বত্র দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। বিশেষ করে তেহরানের রাজপথ-অলিগলি সংগ্রামী জনগণের পদভারে প্রকম্পিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় শাহের স্বৈরাচারী সরকার গণঅভ্যুত্থানের ওপর কলঙ্ক লেপন করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী একদল সাভাক সদস্যকে কালো পোশাক পরিধান করিয়ে জনতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়।[২৫] এরা বিভিন্ন দোকানপাটে, গ্রন্থাগারে ও বেসরকারী যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ মহিলা ও তরুণীদের ওপর হামলা চালিয়ে আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জনসাধারণ শাহের স্বৈরাচারী সরকারের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিল; এ কারণে অনুপ্রবেশকারী সাভাকীদের এসব দুর্বৃত্তপনায় বাধা দান করে এবং তাদেরকে জনতার নিকট চিহ্নিত করে দেয়।

ব্যাপক ধরপাকড়

পনরই খোর্‌দাদের সূর্যাস্তের সাথে সাথে তেহরানে কবরের নীরবতা নেমে আসে। জনসাধারণ নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে গেলে শাহের জল্লাদ বাহিনী রাতের আঁধারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাড়ীতেই হামলা চালায় এবং তাঁদেরকে গ্রেফতার করে। শাহের বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়পাড়ায়ও হামলা চালায়। ঐ সময় অনেক ছাত্রছাত্রীই ইমামের ভাষণের ক্যাসেট বাজিয়ে শুনছিল; জল্লাদ বাহিনী তাদের অনেককেই গ্রেফতার করে।

পরদিনও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। তেহরানের জনগণের পাশাপাশি অন্যান্য শহরের জনগণও, বিশেষ করে শীরায ও মাশ্‌হাদের জনগণও অভ্যুত্থান করে। তারা সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মাধ্যমে কোম ও তেহরানের জনগণের প্রতি সমর্থন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

বস্তুতঃ পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থান ইরানী জনগণের ইসলামের প্রতি মহব্বত ও বেলায়াতে ফকীহ্‌র[২৬] প্রতি তাদের আনুগত্য থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। যদিও স্বৈরাচারী শাহী সরকার মনে করেছিল যে, চরম দমননীতি ও পাইকারী হত্যাকাণ্ডের দ্বারা গণঅভ্যুত্থানকে দমন করতে ও নীরব করে দিতে সক্ষম হয়েছে, তথাপি এ আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী অভ্যুত্থানসমূহ গড়ে ওঠে। পনরই খোর্‌দাদে ইরানের বুকে যে কারবালার দৃশ্যের অবতারণা হয় তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ১৭ই শাহ্‌রীভারের[২৭] গণঅভ্যুত্থানেও কারবালার দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তেমনি ইরানের বিভিন্ন এলাকায় আরো অনেক অভ্যুত্থানমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত ইরানের বিপ্লবী মুসলিম জনগণ তাদের আপোসহীন নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও তার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে; স্বৈরাচারকে পদানত ও সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে তারা ইসলামকে বিজয়ী করে।

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থান বনাম বিদেশী প্রচার মাধ্যম

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থান প্রশ্নে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমসমূহের নীতিগত অবস্থান অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ আন্দোলনের অনুকূলে হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ পনরই খোর্‌দাদের এ পৈচাশিক গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল শাহের পশ্চিমা প্রভুরা এবং পশ্চিমা সংবাদপত্রসমূহও ছিল তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এ কারণে পশ্চিমা সংবাদপত্রসমূহ এবং সেই সাথে সোভিয়েত সংবাদপত্রসমূহও এ

www.pathagar.com

গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে নানা রকমের মিথ্যা ও কল্পকাহিনী প্রকাশ করে এবং এভাবে ইসলামের মোকাবিলায় আরো একবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সাহায্য-সমর্থন ও সমন্বয় তথা একমুখীনতা প্রমাণ করে, তেমনি বিদেশী রেডিও-র ভূমিকাও ছিল একই রূপ।

রেডিও মস্কো তার ১৬ই খোর্দাদ, ১৩৪২[২৮]—এর নৈশ ফার্সী অনুষ্ঠানে পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানকে এভাবে মূল্যায়ন করে ঃ

"ইরানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশটির সংস্কারকার্য, বিশেষতঃ ভূমিসংস্কারের বিরোধী; তারা সামাজিক অধিকার বৃদ্ধিকরণ এবং ইরানী নারীদের স্বাধীনতার সম্প্রসারণকে পছন্দ করে না; এরা আজ তেহরান, কোম ও মাশ্‌হাদের রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে... । দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নেতৃত্বদানকারী এবং এর মূল উস্কানিদাতা ছিলেন কতক ধর্মীয় নেতা। প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা বাজারে অগ্নিসংযোগ করে, কয়েকটি দোকানে হামলা করে ও লুটপাট করে, গাড়ী ও বাস ভাঙ্গচুর করে এবং কয়েকটি সরকারী অফিসেও হামলা করে।"

তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী দৈনিক 'ইজভেস্তিয়া' তার ১৭ই খোর্দাদ, ১৩৪২ (৭ই জুন, ১৯৬৩) সংখ্যায় এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছিল ঃ

"একদল মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল আলেমের উস্কানিতে তেহরান, মাশ্‌হাদ, কোম ও রেই-তে গোলযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা সরকারের ভূমিসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য শোকের দিনগুলোকে কাজে লাগায় এবং কতক পশ্চাদপদ ধর্মান্ধ যুবক দোকানে হামলা চালায় ও কয়েকটি গাড়ীকে উল্টে দেয়।"

রাশিয়ার 'নিউ এজ'[২৯] সাময়িকী তার ১৭ই খোর্দাদ, ১৩৪২ (৭ই জুন, ১৯৬৩) সংখ্যায় এ ব্যাপারে বলে ঃ

"খোমেনী ও তাঁর সহযোগীরা মু'মিনদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেন; তাঁরা নারীদের সমানাধিকারকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করেন আর তাঁদের প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্ধতায় অন্ধ হয়ে যাওয়া লোকেরা রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গোলযোগ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করে।"

ফ্রান্সের 'লু মুন্‌দ্'[৩০] পত্রিকা তার ৮ই জুন ১৯৬৩ সংখ্যায় ইরানের পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ঃ

"... তেহরানে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা শহরটি দখল করে নেয়, বাজার এবং শহরের দক্ষিণাংশের ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার ওপর দৃষ্টি রাখে। বৃহস্পতিবার শীরাযে হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বহু লোক হতাহত হয়। এখানে বিক্ষোভকারীরা রাজধানীর বিক্ষোভকারীদেরই ন্যায় শীরাযের দোকানপাট ভাঙ্গচুর করে এবং লুটতরাজ করে; তারা বিভিন্ন ভবনে, সিনেমা হলে ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে। ... মাশ্‌হাদ ও তাব্‌রীযেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।"

জার্মানী থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ডিভোল্ট[৩১] ৭ই জুন ১৯৬৩ তারিখে প্রকাশিত তার ১৩০তম সংখ্যায় এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ঃ

"ইরানে এখনো গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ই খোর্দাদ ৬ই জুন) সকালে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শীরাযে ধর্মান্ধ বিক্ষোভকারীরা শাহের পতন কামনা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা দোকানপাট তছনছ করে এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে। ... তেহরানে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছত্রীসেনারা এ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টির নায়কদের খুঁজে বেড়ায় এবং ধাওয়া করে।

www.pathagar.com

শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তবে নিরাপত্তা বাহিনী তা পুরোপুরি দমন করে। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক শীরাযে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবার খবর শুনতে পেয়ে সাথে সাথে ঐ শহরে সামরিক শাসন জারী করেন...। বিক্ষোভকারীরা তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের প্লাকার্ড বহন করে; এসব প্লাকার্ডে "বর্তমান সরকার ধ্বংস হোক", "ইসলামের দুশমন ধ্বংস হোক", "আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতার মুক্তি চাই", "আমরা আমাদের রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে আমাদের পবিত্র সংগ্রামের পথে চলা অব্যাহত রাখব" প্রভৃতি লেখা ছিল।"

টীকা ঃ

(১) نوحه خوانی—এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ বিলাপগাথা যা একজন গাইতে থাকেন এবং সমবেত শোক প্রকাশকারী জনতা তার নির্দিষ্ট দু'একটি বাক্য সমস্বরে পুনরাবৃত্তি করে ও বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করে, অথবা শোক—গাঁথার গায়ক প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করার পর সমবেত জনতা তা পুনরুক্তি করে ও বুক চাপড়ায়। উল্লেখ্য, বুক চাপড়ানো শোকানুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ। —অনুবাদক

(২) ساواک হচ্ছে— سازمان اطلاعات و امنیت کشور —দেশের তথ্য ও নিরাপত্তা সংস্থা)-এর সংক্ষেপণ। অধুনালুপ্ত এ গোয়েন্দা সংস্থাটি হিংস্রতা ও দমননীতির জন্য খ্যাত।—অনুবাদক

(৩) ইরানে চাঁদ দেখা অনুযায়ী ১০ই মুহরম ১৩৮৩ হিজরী আশুরার দিন ছিল ৪ঠা জুন ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ; ফার্সী পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৪ই খোর্‌দাদ ১৩৪২।

(৪) অর্থাৎ হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ)।

(৫) مسجد حاج ابو الفتح

(৬) এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরব ও ইরানী ঐতিহ্য অনুযায়ী শুধু মসজিদ ভবনকেই মসজিদ বলা হয় না, বরং ভবন ও নামাজের জন্য নির্ধারিত তৎসংলগ্ন দেয়ালঘেরা চত্বর পুরোটাই মসজিদরূপে গণ্য হয়। তাই একটি মসজিদে বিপুল সংখ্যক জনসমাবেশের জন্যে জায়গার অভাব হয় না।—অনুবাদক

(৭) حاج مهدی عراقی

(৮) کاخ مرمر—বর্তমান তেহরান শহরের কেন্দ্রস্থলে এবং তৎকালীন তেহরানের উত্তরাংশে অবস্থিত। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত।-অনুবাদক

(৯) মর্মর প্রাসাদ থেকে কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে তেহরানের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বাজার অবস্থিত। সাধারণ মানুষের কাছে এটি بازار بزرگ বা 'বড় বাজার' নামে পরিচিত; সংক্ষেপে শুধু "বাজার" বললেও এটিকেই বুঝায়।—অনুবাদক

(১০) অর্থাৎ শাহের।

(১১) বার্ধক্য, কঠিন রোগব্যাধি বা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন যেকোন কারণেই হোক, মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হলে লিখিত অছিয়ত বা অন্তিম ইচ্ছা রেখে যাওয়া ইরানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটি ঐতিহ্য। এতে প্রধানতঃ ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের উপদেশ বা আবেদন থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি দান ও বন্টনের ব্যাপারেও নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। —অনুবাদক

(১২) মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় শাহী সরকারের এজেন্ট ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হামলায় যেসব মাদ্রাসাছাত্র শহীদ হন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ১৮ বছর বয়স্ক এক সৈয়দ বংশীয় তরুণ; ইমাম উদাহরণস্বরূপ তাঁর কথাই বলেছেন।

(১৩) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, ইরানে দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে মুজতাহিদ তৈরী করা। সাধারণতঃ ছাত্ররা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ডিপ্লোমা (এইচএসসি-র সমমান) বা উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করার পর দ্বীনী

www.pathagar.com

মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং বহু বছর মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন (ছয়, বারো বা আঠার বছর বা আরো বেশী)। এ সময় তাঁদের জীবন ধারণের জন্য মাদ্রাসা ও মারজা'গণের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে একটা ভাতা দেয়া হয়। জাকাত, ওশর, খুমস্ এবং সাধারণ দান থেকে মারজা'গণের নিকট যে তহবিল গড়ে ওঠে তার প্রধান ব্যয়ের খাত হচ্ছে দ্বীনী মাদ্রাসা পরিচালনা এবং মাদ্রাসাছাত্রদের ভাতা প্রদান। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরে ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে প্রতি ডলারের মূল্য ছিল ৭ তুমান বা ৭০ রিয়াল। এ থেকেই মাদ্রাসা ছাত্রদের তৎকালে দেয় ভাতার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। —অনুবাদক।

(১৪) آیت الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری— আয়াতুল্লাহ্ ওযমা আবদুল করীম হায়েরী ছিলেন কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।

(১৫) অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্ ওযমা বোরুজেরদী যিনি হযরত ইমামের অব্যবহিত পূর্বে ইরানী মুসলমানদের সর্বপ্রধান মারজা' ছিলেন।

(১৬) অর্থাৎ রেযা খান।

(১৭) অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম।

(১৮) ৫ই জুন (১৯৬৩)

(১৯) উল্লেখ্য, জাকাত, ওশর, খুমস্ ও সাধারণ দান থেকে প্রত্যেক মারজা'র নিকটই একটি বিরাট তহবিল গড়ে ওঠে যা দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবহার করতে গিয়ে প্রত্যেক মারজা'কে একটি অফিস পরিচালনা করতে এবং সেজন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। এ তহবিল যেমন মারজা'র ব্যক্তিগত তহবিল নয়, (তিনি পরিচালক হিসেবে এ তহবিল থেকে একটি ভাতা গ্রহণ করেন মাত্র, তেমনি এ কর্মচারীরাও তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী নন। — অনুবাদক

(২০) ১৫ই খোরদাদ, ১৩৪২ মোতাবেক ৫ই জুন, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

(২১) باڈگان قصر— অবশ্য "কাছর" মানে "প্রাসাদ"।

(২২) মোতাবেক ২৪শে জুন, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

(২৩) پادگان عشرت آباد

(২৪) ورامین —তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত একটি জিলা।

(২৫) স্মর্তব্য, সিআইএ এবং তার নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এটি অন্যতম স্থায়ী কর্মকৌশল। —অনুবাদক

(২৬) ولایت فقیه শাসন—কর্তৃত্বের বৈধ অধিকার রসূল (সাঃ) ও মা'ছুম ইমামগণের প্রতিনিধি মুজতাহিদ ফকীহ্র—এই তত্ত্ব। তবে পারিভাষিক অর্থে "ফকীহ্ শাসক" (ولی فقیه) বুঝাতেও "বেলায়াতে ফকীহ" (ولایت فقیه) ব্যবহৃত হয়। — অনুবাদক

(২৭) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। এ দিন তেহরানে এক গণঅভ্যুত্থান হয় এবং তা দমন করতে গিয়ে শাহী সরকার ব্যাপক গণহত্যা চালায়।

(২৮) ৬ই জুন, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ।

(২৯) عصر جدید (New Age)

(৩০) لوموند— Lemonde. (বাংলায় সাধারণতঃ 'লে মণ্ডে' লেখা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামটির উচ্চারণ 'লু মুন্দ্')।

(৩১) دی ولت

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

"যাঁরা পনরই খোর্‌দাদ সম্পর্কে কিছু লিখছেন তাঁদের সকলের প্রতি... যাঁরা এ ঘটনাটিকে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করছেন তাঁদের প্রতি আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, পনরই খোর্‌দাদের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রকৃত বাণী হচ্ছে এই তিন উপাদানবিশিষ্ট বাণী : "ইসলাম, ইমাম, জনগণ;" অন্য কথায়, "ইসলামের বরকতে ও ইসলামের ছায়ায় ইমাম ও উম্মাতের পারস্পরিক বন্ধন।"

আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী
তেহরানে প্রদত্ত জুমআ নামাজের খোৎবা
(১৯শে খোরদাদ, ১৩৬৩/৯ই জুন, ১৯৮৪)

ইসলামী বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে ১৩৪১ ফার্সী সালে (মোতাবেক ১৯৬২ খৃস্টাব্দে) কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের অভ্যন্তর থেকে যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৩৪২ ফার্সী সালের ১৫ই খোরদাদ (মোতাবেক ৫ই জুন, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ) শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীর স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক তাকে নির্মমভাবে দমন করা হলেও এ আন্দোলনকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা শাহী সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং এ দমন অভিযানের মাধ্যমে কার্যতঃ শাহী সরকার সারা ইরানের বুকে ইসলামের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দেয়। আর ইরানের মুসলিম জনগণ দীর্ঘ পনর বছর যাবত অত্যন্ত কঠিন ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন ও জ্বালা-যন্ত্রণা-তিক্ততা সহ্য করে ইরানের মাটিতে নিজেদের রক্ত ও অশ্রু সিঞ্চন করে সে বীজের অঙ্কুরোদগমের পরিবেশ তৈরি করে। অবশেষে ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্‌মান (মোতাবেক ১৯৭৯ খৃস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) সে বীজ অঙ্কুরিত হয়, মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে বাইরের উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসে প্রবেশ করে— ইরানের বুকে মহান ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয়। এরপর তা ধীরে ধীরে সবুজ-সতেজ হয়েছে, পরিবৃদ্ধি লাভ করেছে, কাণ্ড সুদীর্ঘ-সুদৃঢ় হয়েছে, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে এবং তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে।

শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহলভীর স্বৈরাচারী সরকার এবং তাঁর মার্কিন প্রভুরা ধারণা করেছিল যে, সহিংসতা ও নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির মাধ্যমে পনরই খোরদাদের ইসলামী গণঅভ্যুত্থান ও তার পিছনে নিহিত আন্দোলনের পুরোপুরি মূলোৎপাটন করতে পেরেছে এবং এ অভ্যুত্থান ও আন্দোলন ইতিহাসের বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে।

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারী শাহী সরকার কতগুলো সামরিক আদালত গঠন করে। এসব তথাকথিত আদালতে পনরই খোর্‌দাদের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী কতক বিপ্লবী মুসলমানের প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এসব তথাকথিত আদালতের বিচার প্রহসনের রায়ে আন্দোলনকারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। তবে তেহরানের দু'জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে- যাঁরা ছিলেন হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ অনুসারী— মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এই দু'জন ব্যক্তিত্ব হলেন তাইয়্যেব্ হাজী রেযায়ী[১] এবং হাজী ইসমাঈল রেযায়ী[২]

www.pathagar.com

এঁদের মৃত্যুদণ্ডদানের পিছনে স্বৈরাচারী শাহী সরকারের দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ এঁদের মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে শাহী সরকার ইরানের জনগণকে পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করার অপচেষ্টা চালায়। সরকার বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এ দুই ব্যক্তিই গণঅভ্যুত্থানের মূল নায়ক ছিলেন। এভাবে এ মহান গণঅভ্যুত্থানের সাথে হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও মারজা'গণের ভূমিকাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। এ পন্থায় সরকার জনমনে এ অভ্যুত্থানের মহান লক্ষ্য ও গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে এ দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করে সরকার সাধারণ গণ-মানুষের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। সরকার তার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে জনগণকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করে যে, কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালে তাকে এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কিন্তু শাহী সরকারের হিসাব-নিকাশ ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তার কারণ ছিল এই যে, সরকার এ গণআন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয়ে ভুল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন বিগত চৌদ্দ শতাব্দীকালীন ইসলামী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইসলামী আন্দোলন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে এ আন্দোলন পূর্ববর্তী এক শতাব্দীকাল যাবত ইরানের মুসলিম জনগণের স্বৈরাচার ও উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পরিপুষ্ট হয়েছিল। এ কারণে শাহী সরকার তার নিষ্ঠুর দমননীতির দ্বারা এ আন্দোলনের বিপ্লবী অগ্নিশিখাকে শুধু নির্বাপিত করতেই ব্যর্থ হয়নি, বরং এর ফলে এ আন্দোলন ইরানের সর্বত্র জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে ও প্রবেশ লাভে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত এ আগুন বিপ্লবের দাবানল হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এবং এমন এক মহাবিস্ফোরণের সৃষ্টি করে যা ইরানের আড়াই হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিরসমাপ্তি ঘটায়।

বস্তুতঃ ১৩৪২ ফার্সী সালের পনরই খোরদাদ (মোতাবেক ৫ই জুন, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ) যে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তা ছিল ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির সূচনামাত্র। ১৩৫৭ ফার্সী সাল মোতাবেক ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রপ্রস্তুতির কাজ অব্যাহত থাকে। তাই এ পনর বছরের ঘটনাবলীর ওপর দৃষ্টিপাত করার পূর্বে পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্যালোচনা অপরিহার্য বলে মনে হয়।

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(ক) আন্দোলনের ইসলামীকরন ঃ পনরই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থান ছিল এমন এক আন্দোলনের সূচনা যে আন্দোলনের প্রকৃতি শতকরা একশ' ভাগই ইসলামী। আন্দোলনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এ আন্দোলনের ইসলামী চরিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কারণ, এ আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিলেন বা যাঁকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠল তিনি ছিলেন সমকালীন ইরানের সবচেয়ে বড় মারজায়ে তাক্‌লীদ, মুজতাহিদ ফকীহ্ এবং কোমের ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান নেতা। পূর্ববর্তী কয়েক দশক যাবত ইসলামের দুশমনরা এবং তাদের মধ্যমণি স্বৈরাচারী শাহী সরকার ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক বলে যে প্রচার করে আসছিল পনরই খোর্‌দাদ হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তা কার্যতঃ বাতিল ও অর্থহীন প্রমাণিত হলো। ইরানের মুসলিম জনগণ এমন এক আন্দোলনের জন্য কদম বাড়িয়ে দিল যা তাদের জন্য নামাজ-রোযার ন্যায় শরীআতের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

পুরোপুরি ফরজ হিসেবে পরিগণিত। এ আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম; আর এর মূলনীতি, ভিত্তি, কর্মপদ্ধতি-কর্মনীতি ও আশু লক্ষ্য কুরআনে মজিদ এবং হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) ও মা'ছুম ইমামগণের (আঃ) সুন্নাত থেকে গৃহীত।

(খ) নেতৃত্বের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা ঃ ইরানের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্ব; এ বৈশিষ্ট্য শুধু ইসলামী বিপ্লবেব বিজয়ের পূর্বে-পরেই ছিল না, বরং হযরত ইমামের ইন্তেকালের পরেও তাঁরই নেতৃত্ব এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হয়ে রয়েছে। হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্ব দ্বীন ও রাজনীতি পৃথকীকরণ ধারণার চিরসমাপ্তি ঘটায়, সুতরাং তা-ই নয়, বরং বিশেষভাবে ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইমামের নেতৃত্ব এ আন্দোলনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করে যা একে ধর্মীয় রাজনীতির শ্লোগান সর্বস্বরূপ পরিগ্রহ করা থেকে রক্ষা করেছে। হযরত ইমামের নেতৃত্বের কারণেই এ আন্দোলন এমন বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র পরিগ্রহ করে যে, বিশ্বের পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ ও সরকার পরিচালকদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের কোন মিল নেই। কারণ, হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং যে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা (ইখ্‌লাছ) এবং শরীয়তগত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত হয়, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য হাসিল করা।

এ আন্দোলন চলাকালে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানের মুসলিম জনগণের উদ্দেশে বার বার বলেছেন ঃ "আমরা হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত অন্যান্য নবী-রসূলের (আঃ) ন্যায় দায়িত্ব পালনে বাধ্য; এক্ষেত্রে আমাদের জন্যে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই দায়িত্ব পালন, বিজয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদি আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালন করতে পেরে থাকি তাহলে তা-ই হবে আমাদের জন্যে সত্যিকারের বিজয়।"

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) এ ইখ্‌লাছ (নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা)—যার মাত্রা ও গভীরতার তুলনা কেবল তিনি নিজেই, তা নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে এমন এক দৃঢ়তা সৃষ্টি করে যে, তা-ই এ আন্দোলনের বিজয়ের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে কাজ করেছিল। যেহেতু হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) আন্দোলনকে একটি দ্বীনী কর্তব্যকাজ বলে মনে করতেন, সেহেতু এ আন্দোলনের পথে তিনি কখনোই কোনরূপ আপোস করেননি বা নমনীয়তা দেখাননি। এটা ঠিক ইবাদতের ন্যায়, কারণ, ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনরূপ আপোসরফা চলে না।

(গ) আন্দোলনের গণভিত্তি পরিগ্রহণ ঃ পনরই খোরদাদের আন্দোলন ছিল একটি পুরোপুরি গণআন্দোলন। এ আন্দোলন জনগণের মধ্যকার বিশেষ কোন শ্রেণীর আন্দোলন ছিল না, বরং শহুরে, গ্রাম্য, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বস্তরের জনগণকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে নিয়ে আসে এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে দেয় তা ছিল ইসলাম। এ আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হবার পিছনে কারণ ছিল এর আদর্শের সর্বজনীনতা, যে আদর্শ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করে রয়েছে। এ আন্দোলনে সাধারণ গণ-মানুষ এবং নেতৃত্বের মধ্যকার যোগসূত্র ছিলেন আলেম সমাজ; তাঁরা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন এবং তাঁরা সাধারণ গণমানুষের জীবনধারার গভীরে প্রবেশ করে তাদেরই পাশে অবস্থান করছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে এদের সাথেই ছিল তাঁদের ওঠা-বসা, চলাফেরা ও সামাজিকতা। তাঁদের এ পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার মূল ঘাঁটি ছিল মসজিদসমূহ, দ্বীনী সভা-সমাবেশ, জিয়ারতগাহ্সমূহ, হোসেনিয়াহসমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলো।

www.pathagar.com

(ঘ) রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধিতা ঃ পূর্ববর্তী অন্যান্য আন্দোলন ও সংগ্রামসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বরখেলাফে পনরই খোর্‌দাদের আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান স্বয়ং শাহ্‌কে প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল এবং তাঁকেই প্রকৃত অপরাধী ও সকল অন্যায়-অপকর্মের হোতা বলে চিহ্নিত করেছিল। ইতিপূর্বেকার আন্দোলনসমূহে নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদগণ ও সংগ্রামী লোকেরা হয় স্বয়ং রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে সাহসী হননি অথবা নীতিগতভাবেই এ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অথবা তাঁরা বড়জোর শাহের ক্ষমতা সীমিত করার লক্ষ্য পোষণ করতেন এবং "শাহ্‌ রাজত্ব করবেন, শাসনকার্য চালাবেন না" শ্লোগান তুলে কার্যতঃ তাঁকে বৈধতা প্রদান করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সরকারের বা প্রশাসনযন্ত্রের সমালোচনা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা এবং মজলিসে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ লাভ করা। তাঁরা চাচ্ছিলেন মূল ও কাণ্ডকে যথাস্থানে রেখে শাখা-প্রশাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে যে আন্দোলন সূচিত হয় তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা জনগণের মনের কথাটিকে আন্দোলনের শ্লোগানে পরিণত করে।

ইরানের জনগণ যথার্থভাবেই জানত যে, ইরানের সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি - অনাচার - অবিচার এবং বিজাতীয়দের যত রকমের শোষণ - লুণ্ঠন - আধিপত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার মূলে রয়েছেন শাহ্‌ এবং তাঁর শাহী দরবার; তাই এ আন্দোলনে সরাসরি শাহ্‌ ও তাঁর দরবারের বিরুদ্ধে শ্লোগান উচ্চারিত হয় এবং রাজতন্ত্রের পচা-গলা মূলের ওপর বিপ্লবী কুঠারাঘাত হানা হয়।

(ঙ) বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ পনরই খোরদাদের আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ আন্দোলনে কোনভাবেই এবং কোন ধরনের বিজাতীয় প্রভাব, আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য ছিল না। না আদর্শগতভাবে, না কার্যতঃ, কোনভাবেই এ আন্দোলনে কোন বিজাতীয় প্রভাব পড়েনি। বরং এ আন্দোলন একটি ইসলামী আন্দোলন হওয়ায় তা ইরানের মুসলিম জনগণের অন্তরের অন্তঃস্থল ও ঈমানী চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল। যেহেতু আন্দোলনের চিন্তাধারা ছিল ইসলামী চিন্তাধারা এবং এ কারণে আল্লাহ্‌তাআলার প্রদর্শিত সহজ-সরল-সুদৃঢ় পথ (সিরাতুল্‌ মুস্তাকিম) থেকে এ চিন্তাধারার বিচ্যুত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, সেহেতু আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সংগ্রামী কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতির ক্ষেত্রেও পথচ্যুত হওয়ার এবং প্রাচ্যমুখী বা পাশ্চাত্যমুখী প্রবণতা পরিগ্রহণের প্রশ্ন ওঠেনি। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) তাঁর আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইরানী জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী করেন এবং বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ফলতঃ ইরানী জনগণ হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) সূচিত আন্দোলনে আদর্শিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা থেকে উৎসারিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করে।

(চ) সংগ্রামের ময়দানে ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতি ঃ এ আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার জনগণের অনেকেই সংগ্রামের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ এ বৈশিষ্ট্য ছিল আন্দোলনের ইসলামী চরিত্রেরই প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। কারণ, আন্দোলনের নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বে আন্দোলনের ইসলামী বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবং এ কারণেই তা অনেক আলেম ও দ্বীনদার লোককেই সংগ্রামের ময়দানে টেনে আনতে সক্ষম হয়। আর ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের আন্দোলনের মাঠে উপস্থিতির কারণেই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এবং সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। ওলামায়ে কেরাম সারা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতেন। বড় বড় শহর থেকে শুরু করে দেশের

www.pathagar.com

প্রত্যন্ত এলাকার অনেক গ্রামেই তাঁরা সাধারণ মানুষের পাশে জীবন যাপন করতেন। আর তাঁরা তাঁদের ইসলামী চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং তাক্‌ওয়া-পরহেজগারীর কারণে জনগণের নিকট সম্মানের পাত্র ও আস্থাভাজন ছিলেন। বস্তুতঃ এ কারণেই এবং এভাবেই ওলামায়ে কেরাম জনসাধারণ ও আন্দোলনের নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টিতে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হন।

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

পনরই খোর্‌দাদের ইসলামী গণঅভ্যুত্থান ইরানী জনগণের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে এ গণঅভ্যুত্থানই ইরানের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এখানে আমরা এ আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

১। **রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের আকর্ষণের বিলুপ্তি ঃ** পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পর ইরানের বুকে নিছক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামী তৎপরতা, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) আন্দোলনের মাঠে সর্বশেষ লক্ষ্যটি অর্থাৎ শাহানশাহী ব্যবস্থা ও সরকারের পতন ঘটানোর চূড়ান্ত কথাটি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। এ কারণে যেসব রাজনৈতিক গোষ্ঠী এর চেয়ে কম কিছু অর্জন করতে পারলেই সন্তুষ্ট ছিল তারা রাজনৈতিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য ১৩৩২ ফার্সী সালের ২৮শে মোর্‌দাদ (মোতাবেক ১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩ খৃস্টাব্দ) তারিখে সংঘটিত ক্যু-দেতা এবং তার পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর পর এক দশককাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় ইরানের কম্যুনিষ্ট শক্তি নতুন করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে পনরই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হওয়ায় তারা এমন এক শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হয় যা ইরানের মুসলিম জনগণের ভিতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং কম্যুনিস্টদের বিপরীত, তা বাইরের ও বিজাতীয় কোন শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

২। **রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ণতা লাভ ও সাধারণ জনগণের পরিপক্বতা বৃদ্ধি ঃ** পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের ফলে ইরানের মুসলিম জনগণের সংগ্রাম পূর্ণতা লাভ করে এবং সংগ্রামের আসল লক্ষ্য নির্ধারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণতর হয় ও পরিপক্বতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পূর্ণতার প্রভাবেই পনরই খোর্‌দাদের পরে শাহানশাহী ব্যবস্থার পতনের শ্লোগান রাজনৈতিক সংগ্রামেচ্ছু সকল দল ও গোষ্ঠীর শ্লোগানে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় কখনো যদি এমন কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটত যে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইত তাহলে সে গোষ্ঠী জনগণের দৃষ্টিতে রক্ষণশীল ও আপোসকামী হিসেবে পরিগণিত হত। তাই যেসব আন্দোলন জনগণের মধ্যে নিজেদের জন্যে ঘাঁটি তৈরি করার লক্ষ্য পোষণ করত পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পর শাহানশাহী ব্যবস্থার উৎখাতের শ্লোগান তাদের সকলেরই শ্লোগানে পরিণত হয়।

৩। **আন্দোলনের আদর্শ ও পথনির্দেশকরূপে ইসলাম ঃ** ইসলাম যে এমন একটি আদর্শ যা আন্দোলনের ভিত্তি ও পথনির্দেশক হতে পারে-এটা পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পূর্বে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী, উচ্চ শিক্ষিত লোক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিকট মনে হত না। একদিকে রেযা

www.pathagar.com

খান ও তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেযার কয়েক দশকব্যাপী শাসনামলে ঢালাওভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে, অন্যদিকে কম্যুনিস্টরা ধর্মকে জাতিসমূহের আফিমস্বরূপ বলে প্রচার চালিয়েছে; এর পাশাপাশি এক শ্রেণীর আলেম ও ধার্মিক ব্যক্তির সংকীর্ণতার কারণে তরুণ শ্রেণীর মন-মগজে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। তারা ইসলামকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ মনে করত না যা মানব জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক-সামষ্টিক সকল প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। তারা বড় জোর এ ধারণা পোষণ করতো যে, দ্বীন হচ্ছে কতগুলো আদব-রসম এবং ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর সমন্বিত রূপ, সামাজিক সমস্যাবলী ও কালের প্রবাহে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ মুসলিম জনগণের সর্বপ্রধান মারজা' যখন সর্বোচ্চ লক্ষ্য হাসিলের জন্য তথা শাহানশাহী শাসন ব্যবস্থার উৎখাত সাধন ও ইসলামী হুকুমৎ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা বিনিয়োগ করলেন এবং কার্যতঃ কারাবাস ও নির্বাসন সহ্য করেও অটল-অনড় থেকে অক্লান্তভাবে সংগ্রামের ময়দানে পদচারণা অব্যাহত রাখলেন, তখন উপনিবেশবাদীদের ও কম্যুনিস্টদের সুদীর্ঘকালীন ধর্মবিরোধী, বিশেষতঃ ইসলামবিরোধী প্রচার ব্যর্থ ও অকেজো হয়ে গেল এবং ধর্ম তথা ইসলাম কুসংস্কার ও মিথ্যা অপবাদরূপ ছাইয়ের নীচে চাপা পড়ে থাকা আগুনের ন্যায় এক সময় দাউদাউ করে জ্বলে উঠল এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তেমনি অনেক লেখক এবং বুদ্ধিজীবীকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো। বস্তুতঃ আলেম সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ এবং মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়াহ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ছিল ইসলামী বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ আশা-আকাংখাসমূহের এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) সামাজিক সংগ্রামের মূলনীতিসমূহের অন্যতম; প্রকৃতপক্ষে পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। **শাহের মোনাফেকী চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ ঃ** পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের ফলে শাহের ও তাঁর হুকুমতের লোকদেখানো মোনাফেকী চেহারার ওপর থেকে কৃত্রিম পর্দাটি খসে পড়ে এবং শাহ্ অনন্যোপায় হয়ে স্বীয় ধর্মবিরোধী ও ইসলামবিরোধী প্রকৃতি প্রদর্শন করেন। আর এটাই ছিল জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং শাহের পতন ঘটার অন্যতম প্রধান কারণ। যেহেতু পনরই খোর্দাদের পূর্বে ইসলাম ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পারস্পরিক সাংঘর্ষিক অবস্থা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়নি, সেহেতু ঐ সময় শাহ্ ও তাঁর সহযোগীরা নিজেদেরকে ইসলাম, মারজা' ও ওলামায়ে কেরামের সমর্থক ও ভক্ত-অনুসারী হিসেবে প্রদর্শনের কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। এভাবে তাঁরা নিজেদেরকে মুসলিম জনগণের নিকট ধর্মপ্রাণ হিসেবে তুলে ধরতেন এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে কমবেশী নিজেদের জন্যে শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু পনরই খোর্দাদের পর শাহের সামনে দু'টির বেশী তৃতীয় কোন পথ খোলা ছিল না, তা হচ্ছে ঃ ইসলামী আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার অথবা ইসলাম, ওলামায়ে কেরাম ও মার্জায়িয়াতের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সুস্পষ্ট মোকাবিলা। আর শাহ্ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনন্যোপায় হয়ে দ্বিতীয় পথকে বেছে নেন। যদিও এ পথ অবলম্বনের ফলে তাঁর জন্য প্রথম দিকে সাময়িকভাবে বিজয় এসে যায়, কিন্তু সেই সাথে তিনি এমন এক অবস্থানে গিয়ে উপনীত হন যেখান থেকে পতন ছিল সুনিশ্চিত। কারণ, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পনরই খোর্দাদের এ গণঅভ্যুত্থান শাহের মুনাফেকী প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট করে দেয় এবং ইসলামের প্রতি তাঁর দুশমনীকে সকলের নিকট প্রকাশ করে দেয়।

www.pathagar.com

৫। আলেম সমাজ, দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক পরিপক্বতা বৃদ্ধি ঃ হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের ফলে ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার জনগণ অতীতের তুলনায় অনেক দ্রুত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর ময়দানে প্রবেশ করেন। তেমনি তাঁরা সংগ্রাম সংক্রান্ত ও সামাজিক সমস্যাবলীর সাথে অধিকতর পরিচিত হন। এর আগে বিভিন্ন কারণে অনেক মাদ্রাসাছাত্র ও আলেমের নিকটই রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী অগ্রাধিকার লাভ করত না। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) যখন ইল্‌ম্‌, তাক্‌ওয়া, ইখ্‌লাছ ও ঈমানী দৃঢ়তার সুদীর্ঘ অতীত ও ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় বিশেষ দখল ও ফিক্‌হী যোগ্যতাসহকারে কুরআন ও সুন্নাতের দলিল পেশ করে ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেহারাকে তুলে ধরেন, অন্যদিকে যেহেতু তাঁর আমল ও তৎপরতা দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্র ও ওলামায়ে কেরামের জন্য পথের প্রদীপস্বরূপ ছিল, কারণ তাঁদের অনেকেই তাঁর ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে স্বভাবতঃই রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পেল; তাঁরা এ বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে শুরু করলেন। অন্যদিকে ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধরনের দ্বীনী অনুষ্ঠানাদিতে সাধারণ মুসলিম জনগণের সাথে ব্যাপকভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রাখতেন; এসব ক্ষেত্রে তাঁরা, যাঁর পক্ষে যেভাবে সম্ভব হয়, তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে জনগণের মধ্যে বিস্তার করতে থাকেন। ফলে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

পনরই খোর্‌দাদ থেকে তেরই অবান[৩]

১৩৪২ ফার্সী সালের ১৫ই খোর্‌দাদ (মোতাবেক ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের ৫ই জুন) তারিখে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও গুরুত্বের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। এবার আমরা হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) গ্রেফতার ও গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দেব।

ইতোপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শাহের স্বৈরাচারী প্রশাসন হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে সূচিত ইসলামী গণআন্দোলনের ওপর বড় ধরনের একটা আকস্মিক আঘাত হেনে এ আন্দোলনের গতিরোধ করতে এবং শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করেছিল এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ১৩৪২ ফার্সী সালের পনরই খোর্‌দাদ মোতাবেক ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের ৫ই জুন হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)-কে গ্রেফতার; কোম, তেহরান, শীরায ও মাশ্‌হাদে গণহত্যা এবং বিরাট সংখ্যক সক্রিয় ও সংগ্রামী আলেমকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে শাহী সরকার এ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করেছিল। প্রথম দিকে সরকার মারাত্মক নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার পরিচয় দেয়; শুধু তা-ই নয়, এ কথাও ঘোষণা করে যে, আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী আলেমদেরকে সামরিক আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

কিন্তু শাহী সরকারের এ আঘাতের জবাবে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও মার্‌জায়ে তাক্‌লীদগণ যথাযথ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন এবং সংগ্রামের অগ্নিমশালকে প্রজ্জ্বলিত রাখেন। মার্‌জায়ে তাক্‌লীদগণ একের পর এক প্রচারপত্র প্রকাশ ও ঘোষণা প্রচার[৪] এবং টেলিগ্রাম প্রেরণের মাধ্যমে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর, অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ববর্গের মুক্তি দাবী করেন। ওলামায়ে কেরামের গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে ছিল সারা দেশ থেকে তেহরানে গিয়ে জমায়েত হওয়া, সেখানে অবস্থান গ্রহণ এবং পারস্পরিক

www.pathagar.com

পরামর্শভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারের নিকট নিজেদের ঐক্য ও হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতি তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন প্রদর্শন। তেমনি এ পন্থায় তাঁরা জনগণকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেন। অন্যদিকে তেহরানের ব্যবসায়ী মহলও দীর্ঘ বাজার-ধর্মঘটের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন।

ইরানের মুসলিম জনগণের, বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের এ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ সংগ্রাম এতই ব্যাপক এবং এমনই শক্তিশালী ছিল যে, তা ইরানের বাইরে কতক মুসলিম দেশে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে শাহী সরকার আমেরিকার নির্দেশিত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে স্বীয় কর্মকৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং প্রথমে যেসব হুমকি প্রদর্শন করেছিল তার বিপরীতে গ্রেফতারকৃত ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশকেই মুক্তি দান করে। তেমনি সরকার হযরত ইমাম খোমেনীকেও বিশেষ শর্তাধীনে ও সীমিত স্বাধীনতা সহকারে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩৪২ ফার্সী সালের ১১ই মোর্দাদ তারিখে[৫] শাহী সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তারা হযরত ইমামকে কারাগার থেকে নিয়ে এসে উত্তর তেহরানের একটি বাড়ীতে গৃহবন্দী করে রাখেন এবং তাঁর ওপর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেন।

সরকার ধারণা করেছিল যে, গ্রেফতার হওয়ার পর হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) সরকারের ও শাহের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নম্র কর্মনীতি অবলম্বন করবেন এবং নম্র আচরণ প্রদর্শন করবেন, তেমনি জনসাধারণও পনরই খোর্দাদের হত্যাকাণ্ড থেকে ভয় পেয়ে থাকবে, অতঃপর ইমামের কাছে ঘেঁষতে সাহসী হবে না। এ ছাড়া সরকার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে এ মর্মে মিথ্যা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ও আন্দোলনের অন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে আপোসরফায় উপনীত হয়েছেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করবেন না বলে কথা দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ যেদিন হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) মুক্তির খবর জানতে পায়, সেদিনই, তাঁকে যে বাড়ীতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে এমনভাবে ভিড় জমাতে থাকে যে, একদিন পরই সরকার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে সাধারণ মানুষকে বাধা দিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই-নয়, ইমামকে অন্য একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে।

সীমিত স্বাধীনতা সহকারে হলেও হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) মুক্তি লাভ করায় জনসাধারণ ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে উদ্বেগের তীব্রতা হ্রাস পায়। ফলে যেসব আলেম অন্যান্য শহর থেকে তেহরানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ শহরে ফিরে যান।

হযরত ইমামের এ সীমিত স্বাধীনতা দশ মাস অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে শাহী সরকার এ ধারণায় উপনীত হয় যে, ইমাম তাঁর পূর্বতন কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করেছেন। তেমনি জনসাধারণ ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইতিপূর্বেকার সে ঐক্য আর অব্যাহত নেই বলেও সরকারের ধারণা হলো। অতঃপর ১৩৪৩ ফার্সী সালের ১৮ই ফার্ভার্দীন[৬] সরকার তাঁকে পুরোপুরি মুক্তি প্রদান করে এবং কোমে পৌঁছে দেয়।

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) মুক্তি লাভ করে কোমে ফিরে এলে কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রগণ এবং সারা দেশের জনসাধারণ ও ওলামায়ে কেরাম তাঁকে মোবারকবাদ জানান; সংগ্রামী জনশক্তি পুনরায় তাঁর চারদিকে সমবেত হয়। কোমে এসে ইমামও সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে পুনরায় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বক্তৃতা-ভাষণ ও বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা ও প্রচারপত্র প্রকাশ-প্রচারের মাধ্যমে (পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থান বার্ষিকী

www.pathagar.com

উপলক্ষে প্রকাশিত ঘোষণাপত্র যার অন্যতম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) প্রমাণ করেন যে, শাহী সরকারের ধারণার বিপরীত, তিনি এখনো আগের ন্যায়ই রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এবং তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর-সম্পর্ক-রহিত গণ্য করেন না।

ক্যাপিচুলেশন[৭] এবং ইমামের বিরোধিতা ও নির্বাসন

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) মুক্তিলাভের পর ক্যাপিচুলেশনকে কেন্দ্র করে শাহী সরকারের সাথে তাঁর বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে।

ঐ সময় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীতে হাজার হাজার মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা কর্মরত ছিলেন। আমেরিকান সরকার ইরানে কর্মরত তার দেশের উপদেষ্টাদেরকে ইরানী আইনের ঊর্ধ্বে রাখতে এবং ইরানী আদালতে জবাবদিহিতার সম্মুখীন না হয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে যা খুশী তাই করার অধিকারী করতে চাচ্ছিল। তাই মার্কিন সরকার ইরানে কর্মরত মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ এবং ইরানে বসবাসরত তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ভিয়েনা চুক্তির অধীনে প্রদত্ত অব্যাহতি-সুবিধা দেয়ার জন্যে ইরান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক দেশে কর্মরত অন্য দেশের কূটনৈতিক দায়িত্বশীলদের সম্পর্কে সম্পাদিত ভিয়েনা চুক্তি বিশ্বের সকল দেশের নিকট গ্রহণযোগ্য। এ চুক্তিতে যেসব সর্বসম্মত শর্ত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ "কূটনৈতিক দায়িত্বশীল দায়মুক্ত[৮] হবেন এবং কিছুতেই তাঁকে হয়রানি বা আটক করা যাবে না।" এতে আরো বলা হয়েছে ঃ "কূটনৈতিক দায়িত্বশীলের ব্যক্তিগত বাসস্থান তাঁর কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের স্থানেরই ন্যায় দায়মুক্ত ও সংরক্ষিত থাকবে।"[৯] তাছাড়া কূটনৈতিক দায়িত্বশীলকে কতক ছোটখাটো বিষয়ের ব্যতিক্রম বাদে "ব্যক্তিগত, আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক বা শহুরে যেকোন ধরনের কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।"

বলা বাহুল্য যে, শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভী ও তাঁর সরকার ছিলেন আমেরিকার শতকরা একশ' ভাগ অনুগত সেবাদাস, আমেরিকার মোকাবিলায় যার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছুই ছিল না। তাই আমেরিকার চাপে পড়ে ইরান সরকার ভিয়েনা চুক্তির আওতা সম্প্রসারণ করে একটি একক বিধি প্রণয়ন করে এবং তা অনুমোদনের জন্যে মজলিসে উত্থাপন করে। এতে "ইরানে কর্মরত মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের এবং ইরানে বসবাসরত তাদের পরিবারবর্গকে" ভিয়েনা চুক্তির সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

সরকার এ একক ধারাবিশিষ্ট আইনের খসড়া প্রথমে অর্ধ-গোপনভাবে সিনেটে এবং এরপর ১৩৪৩ ফার্সী সালের ২১শে মেহের তারিখে[১০] মজ্‌লিসে শূরায়ে মিল্লীতে পাস করিয়ে নেয়। বলা বাহুল্য যে, এ আইনের দ্বারা ইরানী জাতির অধিকার ও সার্বভৌমত্বকে সংকীর্ণ করা হয়েছিল। তাই হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) অপমানজনক এ আইনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ১৩৪৩ ফার্সী সালের ৪ঠা অবান[১১] কোমে স্থানীয় ও দেশের অন্যান্য শহর থেকে আগত বিপুল সংখ্যক জনতার এক সমাবেশে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন ঃ

"...আমি আমার পূর্বেকার বেদনার্ত অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে পারছি না। ...ইরানের সাম্প্রতিক সমস্যার কথা শুনে এ কয়েক দিন যাবত আমার মনের ওপর ভীষণ চাপের সৃষ্টি হয়েছে।... আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, আমাদের স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দিয়েছে।... আমাদের মান-ইজ্জত

www.pathagar.com

পদদলিত হয়েছে, ইরানের মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে; ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদাকে পদদলিত করেছে। মজলিসে একটি বিল নেয়া হয়েছে, এতে... আমেরিকার সকল সামরিক উপদেষ্টা, তাদের পরিবারবর্গ, তাদের কারিগরি কর্মচারীগণ, তাদের অফিস-কর্মচারীগণ তাদের সেবক পর্যায়ের শ্রমিকগণ, যেকেউ তাদের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত... তারা ইরানে যেকোন ফৌজদারী অপরাধই করুক না কেন, তারা দায়মুক্ত। আমেরিকার একজন সেবক[১২] যদি বাজারের মাঝখানে আপনাদের মার্‌জায়ে তাক্‌লীদকে হত্যা করে... ইরানী পুলিশের অধিকার নেই তাকে বাধা দেয়ার, ইরানের আদালতসমূহের অধিকার নেই তার বিচার করার.... সে আমেরিকা চলে যাবে, সেখানে —আমেরিকায় প্রভুরা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। ইরানী জাতিকে আমেরিকার কুকুরদের তুলনায়ও হেয় করেছে। ...কারণ, কেউ যদি কোন আমেরিকান কুকুরের ওপর চড়াও হয় তবে তার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। ইরানের শাহ্ যদি একটি আমেরিকান কুকুরের ওপর চড়াও হন তবে তাঁর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করবে।... কিন্তু একজন আমেরিকান পাচক যদি ইরানের শাহের ওপর চড়াও হয়, সর্বোচ্চ পদাধিকারীর ওপর চড়াও হয়, তার সমুচিত জবাব দেয়ার অধিকার কারো নেই। ...যে মহোদয়গণ বলছেন যে, চুপ করে থাকা উচিত (তাঁদের নিকট আমার প্রশ্ন ঃ) এখানেও চুপ করে থাকতে হবে?...আমাদেরকে বিক্রি করে দেবে, আর আমরা চুপ করে থাকব? আল্লাহ্‌র কসম! এর বিরুদ্ধে যে সোচ্চার না হবে সে গুনাহ্‌গার। ইসলামের নেতাগণ![১৩] আপনারা ইসলামের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন।... নাজাফের আলেমগণ! ইসলামের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। আমাদের সমস্ত বিপদ-মুছিবতের জন্য দায়ী এই আমেরিকা, আমাদের সকল বিপদ-মুছিবতের জন্য দায়ী এই ইসরাইল; আর ইসরাইলও আমেরিকারই সৃষ্টি। জাতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়া..., মজলিসের নিকট প্রতিবাদ জানানো, সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানানো। ...এটা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।"

এ আইনের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম খোমেনীর সুস্পষ্ট ও আপোসহীন বিরোধিতার ফলে সরকার হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং কি করবে বুঝতে পারছিল না। সরকার জানত যে, ইমামকে পুনরায় গ্রেফতার করলে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই শাহী সরকার হযরত ইমামকে ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ই অবান ১৩৪৩ তারিখে[১৪] সাভাকের সদস্যরা রাতের অন্ধকারে ইমামের বাসভবনে অভিযান চালায় এবং ইরানী জনগণের মার্‌জায়ে তাক্‌লীদ ও সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) গ্রেফতার করে তেহরানে নিয়ে যায়। পরদিন ১৩ই অবান তাঁকে সোজাসুজি মেহের আবাদ বিমানবন্দরে[১৫] নিয়ে যায় এবং তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়।

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এগার মাস তুরস্কে অবস্থান করেন। এরপর ইরানের শাহী সরকার তাঁর অবস্থানস্থল পরিবর্তন করে তাঁকে তুরস্ক থেকে ইরাকে স্থানান্তরিত করে। অতঃপর তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার কয়েক মাস পূর্বে তাঁকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ বহিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ তের বছর তিনি ইরাকে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সাল পর্যন্ত[১৬] ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরা হলো। সেই সাথে এ গণঅভ্যুত্থান ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর কি কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো। এবার আমরা ১৩৪৩ ফার্সী সাল থেকে শুরু করে ১৩৫৬

www.pathagar.com

ফার্সী সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়ে ইরানে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার ওপর দৃষ্টি দেব। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব কিছু তুলে ধরার লক্ষ্যে আমরা এখানে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই ঘটনাবলী তুলে ধরব। তবে চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাগণ সামান্য চিন্তা করলেই খুব সহজেই এসব ঘটনার সাথে শাহী সরকারের প্রকৃতি ও ১৫ই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের যোগসূত্র খুঁজে পাবেন।

উল্লিখিত সময়ের ঘটনাবলীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি : সরকারের তৎপরতা এবং জনগণের সংগ্রাম।

ক : সরকারের তৎপরতা

উল্লিখিত ১৩ বছরে সরকারের তৎপরতাকে আমরা তিন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। তা হচ্ছে : (১) রাজনৈতিক তৎপরতা, (২) পুলিশী ও নিরাপত্তা বিভাগীয় তৎপরতা এবং (৩) সাংস্কৃতিক তৎপরতা। এখানে সংক্ষেপে তিনটি ক্ষেত্রের তৎপরতা ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

১ : রাজনৈতিক তৎপরতা

শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর শাসনামলের ১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সাল পর্যন্ত সময়ের সরকারী রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কথা বলতে হয়।

পাহ্লভী রাজবংশ বিজাতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শুরু থেকেই বিজাতীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তাদের এ বিজাতীয় নির্ভরতা পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের পর তীব্রতর ও সুস্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শাহ্ ভূমিসংস্কার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমেরিকার নির্দেশিত নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাধ্য ছিলেন। এরপর হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে আন্দোলন ও পনরই খোর্দাদের অভ্যুত্থানের পর শাহ্ বুঝতে পারলেন যে, জনগণের মধ্যে তাঁর কোন স্থান নেই। এ কারণে তিনি পশ্চিমা দেশসমূহের, বিশেষ করে আমেরিকার কোলে পূর্বাপেক্ষাও বেশী করে আশ্রয় নিলেন এবং তাদের ওপর নির্ভর করে স্বীয় তখ্ত ও তাজ রক্ষা করার চেষ্টায় লিপ্ত হলেন। ফলে পনরই খোর্দাদের পরে পূর্বের তুলনায় অধিকতর প্রকাশ্যে, ব্যাপকভাবে, দ্রুততর গতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীতে এবং দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মার্কিন উপদেষ্টাদের ভিড় বেড়ে গেল; অন্যদিকে আমেরিকান ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের পুঁজিপতিরা ঝড়ের গতিতে ইরানে ছুটে আসতে লাগলেন। শাহ্ একদিকে যেমন আমেরিকা ও পশ্চিমা শিবিরের অন্যান্য দেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত ও সেবাদাস হিসেবে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন, অন্যদিকে আমেরিকার তদারকীর অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রাচ্য শিবিরের অন্যান্য দেশের সাথেও সীমিত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমেরিকানরা এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখত যেন ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কের দ্বারা তাদের স্বার্থহানি না ঘটে। এরূপ সতর্ক পর্যবেক্ষণের অধীনে আমেরিকা শাহ্কে প্রাচ্য শিবিরের সাথে সীমিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার অনুমতি প্রদান করে।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে ইরানী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য-নীতির প্রতি সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। মধ্যপ্রাচ্যের বুকে শাহের শাসিত ইরান ছিল ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক, এ

www.pathagar.com

অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ আরব সরকারগুলোর বন্ধু ও সমর্থক এবং মুসলিম ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের দুশমন ও দমনকারী।

শাহী সরকার অভ্যন্তরীণ কর্মসূচীসমূহের ক্ষেত্রে যে নীতি ও মূলনীতি অনুসরণ করত তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধারণ জনগণের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার মুখে তার শক্তি ও শক্তির ভিত্তিসমূহের হেফাজত করা। এ সময় ইরানে কোন রকমের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। চার বছর মেয়াদী মজলিস ছিল সাজানো নাটকের মাধ্যমে গড়া কৃত্রিম মজলিস। একের পর এক নতুন মজলিস গঠিত হত এবং তার অধিবেশনসমূহের কাজকর্মও সেভাবেই পরিচালিত হত। মজলিসে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন অধিকার কার্যতঃ জনসাধারণের ছিল না। মজলিস ছিল আমেরিকার লিখিত নাটকসমূহ প্রদর্শনীর নাট্যমঞ্চ মাত্র। শাহ্ এসব নাটক প্রযোজনা করতেন এবং সরকার তার মঞ্চ-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতো। সরকার বাহ্যতঃ কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করত এবং এভাবে কৃষক-শ্রমিক অসন্তোষ বিস্তারের সম্ভাবনা রোধের চেষ্টা করত। কিন্তু সকল নীতিগত পদক্ষেপ ও কৃত্রিম সহানুভূতি সত্ত্বেও কার্যতঃ কৃষক-শ্রমিকরা দিনের পর দিন অধিকতর বঞ্চিত হতে লাগল, আর তার বিনিময়ে শাহী দরবারের তাঁবেদার ও আশীর্বাদপুষ্ট পুঁজিপতিরা দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী ও সম্পদশালী হতে লাগল। একদিকে গ্রাম এলাকার অধিবাসীরা চরম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কবলে নিপতিত হচ্ছিল, অন্যদিকে সরকার তেল বিক্রির অর্থে শহরগুলোর বাহ্যিক চেহারা ছিমছাম করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। শহরগুলো বড় বড় রাস্তা, ময়দান (গোল চক্কর) ও বহুতল ভবন দ্বারা সুসজ্জিত হয় এবং এভাবে দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, ইরান খুব উন্নত হয়েছে এবং উন্নত দেশসমূহের কাছাকাছি পৌঁছেছে ও প্রায় বৃহৎ সুসভ্য দেশের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

মানূছুরের মন্ত্রিসভা : পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থানের সময় ইরানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আমীর আসাদুল্লাহ্ আলাম; (তিনি ও তাঁর পিতা ছিলেন ইরানের বৃহৎ সামন্ত জমিদারদের অন্যতম এবং উভয়ই শাহী দরবারের ও বিজাতীয়দের একনিষ্ঠ সেবাদাস ছিলেন)। আলাম পৈশাচিকতা ও গণবিরোধিতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শাহের ও আমেরিকার খেদমত করেন। ১৩৪২ ফার্সী সালের এস্ফান্দ্ মাসে[১৭] তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পর হোসেন আলী মানূছুরকে[১৮] প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তিনিও ব্যক্তিগতভাবে ও পারিবারিক সূত্রে সেবাদাসগিরির বিচারে এবং নীতির প্রশ্নে আলামের চেয়ে কোনদিক দিয়েই পশ্চাদপদ ছিলেন না। তিনি তৎকালে তাঁরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আরো কতক ব্যক্তিকে নিজের চারদিকে একত্র করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের নিয়ে 'কানুনে মোতারাক্কী'[১৯] নামে একটি দল গঠন করেন; প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি এদেরকে নিয়েই সরকার গঠন করেন। কিন্তু ১৩৪৩ ফার্সী সালের বাহ্মান মাসে[২০] শহীদ মোহাম্মাদ বোখারায়ী[২১] ও শহীদ সাইয়েদ আলী আন্দার্যগুর[২২] নামে দু'জন বিপ্লবী তাঁকে বৈপ্লবিক মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ফলে মানূছুর তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার সুযোগ পাননি।

হোভায়দার সরকার গঠন : আমীর আব্বাস হোভায়দা[২৩] ছিলেন হোসেন আলী মানূছুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম, কানুনে মোতারাক্কীর সদস্য এবং তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী। মানূছুর নিহত হবার পর হোভায়দাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তাঁর সরকারের আয়ুষ্কাল ছিল ১৩ বছর। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইরান ও ইসলামের দুশমনদের নীতি কার্যকরীকরণের জন্য উপযুক্ততম ব্যক্তি এবং ফার্সী ১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ সাল[২৪] পর্যন্ত সময়ে এই দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ইরান ও ইসলামের দুশমনদের নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করেন। হোভায়দার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁর মধ্যে মৌলিকত্ব বা

www.pathagar.com

উদ্ভাবনী শক্তি বলতে কিছুই ছিল না। তিনি শতকরা একশ' ভাগই শাহ্ ও শাহী দরবারের অনুগত ছিলেন এবং শাহের গৃহীত নীতিসমূহের পক্ষে সাফাই গাওয়াই ছিল তাঁর আসল কাজ। ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে যে, এ যুগে ইরানে যা ঘটেছিল তা ছিল আমেরিকার লিখিত ও শাহের প্রযোজিত এক সাজানো নাটক; হোভায়দা ছিলেন এ নাটকেরই মঞ্চ-নির্দেশক। এ নাটকের অভিনয় দীর্ঘ ১৩ বছর অব্যাহত থাকে।

আমীর আব্বাস হোভায়দার প্রধানমন্ত্রীত্বের যুগের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে তাই মাত্র কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো ঃ

সংবিধান পরিবর্তন ও ফারাহ্‌কে[২৫] নায়েবাহ্ সালতানা মনোনয়ন ঃ ১৩৪৪ ফার্সী সালের ২১শে ফার্‌ভার্‌দীন[২৬] মর্মর প্রাসাদে শাহের প্রতি গুলীবর্ষণ করা হয়। গুলীবর্ষণকারী ছিলেন রেযা শাম্‌স্ আবাদী[২৭] নামে একজন সৈনিক; তিনি ছিলেন শাহের প্রাসাদে নিয়োজিত রক্ষীদের অন্যতম। অবশ্য শাহের গায়ে গুলী লাগেনি। তবে রেযা শাম্‌স্ আবাদী প্রাসাদরক্ষীদের মধ্যকার দু'জন নন-কমিশন্ড অফিসারকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং নিজেও নিহত হন। এভাবে শাহ্ এক বিরাট ঝুঁকি থেকে প্রাণে বেঁচে যান।

রেযা শাম্‌স্ আবাদী ছিলেন একজন দ্বীনদার সৈনিক। কিন্তু, তিনি একজন ইসলামপন্থী ছিলেন এ খবর প্রচারিত হলে সারা দেশে ইসলামী জনতার মনোবল বৃদ্ধি পাবে মনে করে সরকার তাঁর ইসলামী পরিচিতি গোপন করে এবং তিনি একজন বামপন্থী ছিলেন ও বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে শাহ্‌কে হত্যার চেষ্টা করেন বলে প্রচার করে। তবে এ ঘটনা শাহ্ ও শাহী সরকারের নিকট একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে দিল, তা হচ্ছে, শাহের জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব নয়, বরং দেশবাসীর ঘৃণা, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে যেকোন সময় তাঁর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে এ সময় যুবরাজের (শাহের পুত্রের) বয়স পাঁচ বছরের বেশী ছিল না। তাই শাহের স্ত্রী ফারাহ্‌কে আইনানুগভাবে নায়েবাতুস্ সাল্‌তানাহ্[২৮] নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাতে প্রয়োজন হলে অর্থাৎ ঘটনাক্রমে শাহ্ নিহত হলে তাঁকে সিংহাসনে বসানো যেতে পারে।[২৯]

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ছিল তৎকালীন সংবিধানের পরিপন্থী। এ কারণে ১৩৪৫ ফার্সী সালের ২১শে এস্‌ফান্দ্[৩০] মজলিসে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের মাধ্যমে সংবিধানে পরিবর্তন সাধন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, মনোনীত লোকদের নিয়ে গঠিত এ তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ একটি ফরমায়েশী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই শাহ্ যেরূপ চাইলেন প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ সেরূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

উপর্যুপরি উৎসব ঃ আমীর আব্বাস হোভায়দার শাসনামলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, শাহানশাহী ব্যবস্থার প্রতি স্বীকৃতি ও এর স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একের পর এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১৩৪৫ ফার্সী সালে শাহের সিংহাসনে অধিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[৩১] ১৩৪৬ ফার্সী সালে[৩২] অনুষ্ঠিত হয় তাঁর মুকুট ধারণোৎসব। ১৩৫০ ফার্সী সালে[৩৩] ইরানে শাহানশাহী ব্যবস্থার আড়াই হাজারতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ১৩৫৫ ফার্সী সালে[৩৪] শাহের পিতা রেযা খানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ ছাড়াও আরো অনেক উৎসবের আয়োজন করা হয়। আর এ সমস্ত উৎসবেরই ব্যয়ভার অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘাড়ে চাপানো হয়। এসব উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বিপুল পরিমাণ ফুল, ফল, মিষ্টি অন্যান্য উপকরণ ও উপাদান ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে আনা হয়। আর এসবের জন্য স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অনেক

www.pathagar.com

বেশী মূল্য প্রদান করা হয়। তবে সমস্ত উৎসবের মধ্যে সর্বাধিক ব্যয়বহুল উৎসব ছিল রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বর্ষপূর্তি উৎসব। এ উৎসব এতই বিলাসবহুল ছিল এবং এতে এতই অপচয় হয়েছিল যে, এর ফলে ইরানের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল। এ উৎসব এমন একটি সময়ে উদ্‌যাপিত হয় যখন সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরানের গ্রামাঞ্চলের পরিবারসমূহের শতকরা ৬৭ ভাগের বার্ষিক গড় আয় ছয় হাজার তুমানের নীচে ছিল।[৩৫] উৎসবসমূহে যত বেশী ব্যয় হতে লাগল (তথা উৎসবকারীদের ভাষায়, উৎসব যত জমকালো হতে লাগল), ততই শাহ্ ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের ঘৃণা ও আক্রোশ বৃদ্ধি পেতে থাক।

হেয্‌বে রাস্তাখীয[৩৬] গঠন ঃ ইতোপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইরানে মিল্লিউন্ (জাতীয়তাবাদী) ও মার্‌দোম্ (ডেমোক্র্যাট্‌স্) নামে দু'টি ফরমায়েশী দল ছিল। শাহী দরবারের তাঁবেদার এ দল দু'টির কার্যতঃ কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং সারা বছর কোন তৎপরতা থাকত না, কেবল নির্বাচনের সময়ই দল দু'টি ময়দানে আবির্ভূত হত। পরবর্তীকালে হেয্‌বে মিল্লিউনের নাম পরিবর্তন করে হেয্‌বে ইরান নাভীন্[৩৭] রাখা হয়; অবশ্য এর প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল কানুনে মোতারাক্কী।

ইতোপূর্বে শাহ্ মাঝে মাঝেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তিনি বিভিন্ন দলের অস্তিত্বকে স্বাধীনতার প্রতীকরূপে গণ্য করতেন। কিন্তু ফার্সী ১৩৫৩ সালের শেষের দিকে[৩৮] শাহ্ তাঁর ইতোপূর্বে প্রকাশিত মতামতের বিপরীতে হঠাৎ করে একদলীয় ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং একটি একক দল গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি আরো নির্দেশ দেন যে, হেয্‌বে ইরান্ নাভীন্ ও হেয্‌বে মার্‌দোম্ এ উভয় দলের সদস্যদেরকে, বরং ইরানের সকল জনগণকে এ দলের সদস্য হতে হবে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নতুন একক দল গঠন করা হল এবং এ নবগঠিত দলের নাম রাখা হলো হেয্‌বে রাস্তাখীযে মিল্লাতে ইরান। এ দলের ভিত্তি ঘোষিত হলো তিনটি ঃ 'শাহানশাহী ব্যবস্থা', 'সংবিধান' এবং 'শাহ্ ও জনগণের বিপ্লব'[৩৯]।

হেয্‌বে রাস্তাখীয গঠনের পর শাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, যে কেউ সর্বজনীন ও জাতীয় ভিত্তিক দল রাস্তাখীযে নাম লেখাতে (সদস্য হতে) না চাইবে সে যেন পাসপোর্ট সংগ্রহ করে ও দেশ থেকে চলে যায়।

হেয্‌বে রাস্তাখীয্ গঠনের কথা ঘোষিত হবার পর পারিষদবর্গ, মন্ত্রীগণ, সরকারের তাঁবেদার ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত লোকেরা যথেষ্ট ঢাকঢোল পিটিয়ে এ দলে যোগদান করেন। সেবাদাসদের সকলেই বেধে দেয়া পরিকল্পনা মাফিক একবাক্যে শাহের এ নবউদ্ভাবনের প্রশংসা করতে থাকে এবং নতুন দলের সদস্যপদ গ্রহণ করতে থাকে। ১৩৫৪ ফার্সী সালে[৪০] দলের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এতে জাম্‌শীদ্ অমুযেগার[৪১] দলের প্রথম মহাসচিব নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পরেই শাহের নির্দেশে হেয্‌বে রাস্তাখীযের অভ্যন্তরে 'লিব্‌রালে সযান্দে'[৪২] এবং 'তারাক্কীখা'[৪৩] নামে দু'টি উপদল সৃষ্টি করা হয়। বলা যেতে পারে যে, ১৩৪২ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সাল সময়কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঢাকঢোল পিটানো ও হৈহুল্লোড় করা হয় এবং রাজনৈতিক প্রচারাভিযান চালানো হয় হেয্‌বে রাস্তাখীয্ গঠন সম্পর্কে। কিন্তু যেহেতু শাহের সরকারের পায়ের নীচ থেকে ইতিমধ্যেই মাটি সরে গিয়েছিল সেহেতু এসব পদক্ষেপে তাঁর কোনই লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফার্সী ১৩৫৭ সালে[৪৪] শাহী সরকারের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে হেয্‌বে রাস্তাখীয্ একটি পচা-গলা ও দুর্গন্ধ বিস্তারকারী মৃতদেহে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার দলটি ভেঙ্গে দেয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

২ ঃ পুলিশী ও নিরাপত্তা বিভাগীয় তৎপরতা

শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীর সরকার ১৩৪২ ফার্সী সালের পনরই খোরদাদ (৫ই জুন, ১৯৬৩) শাহ্ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী জনগণের মধ্য থেকে বিরাট সংখ্যক লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবে শাহী সরকার ও জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। অতঃপর জনগণের বৈপ্লবিক তৎপরতার বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য সরকার পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় সহিংস তৎপরতা ব্যাপকভাবে জোরদার করে। সয্‌মনে এত্তেলঅৎ ও আম্‌নীয়াতে কেশ্‌ভার্ (সাভাক্) নামক গুপ্ত পুলিশ সংস্থার দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। এ সংস্থাকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনযন্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রদান করা হয়। ইরানের প্রতিটি শহরে সাভাকের জন্য অত্যাধুনিক ভবন ও ঘাঁটির ব্যবস্থা করা হয়। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) ও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-ও সাভাক্‌কে শক্তিশালীকরণ ও তার সম্প্রসারণে সহায়তা করে। যে সব কেন্দ্রে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশংকা বেশী ছিল, বিশেষ করে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ, আরো বিশেষভাবে কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র, সেই সাথে বাজার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ; সেসবের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং সরকারবিরোধীদেরকে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হয়। যেহেতু শাহী সরকার কোমের ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রকে শাহ্‌বিরোধী সংগ্রামী সংস্থা ও সকল সংগ্রামের উৎসরূপে গণ্য করত, সেহেতু সরকার কোমের ওলামায়ে কেরাম, দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দ ও মাদ্রাসাছাত্রদের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করে। তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে তাঁদেরকে গ্রেফতার এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানোকে তার প্রধান কর্মসূচীতে পরিণত করে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারবিরোধী ছাত্র-শিক্ষকদের দমন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার 'গার্দে দানেশ্‌গাহ্'[৪৫] নামে একটি সুসজ্জিত ও দমন-নিপীড়নকারী বাহিনী তৈরি করে। এ বাহিনীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বত্র সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য উপস্থিতি বজায় রাখতে থাকল। বাজারসমূহেও শাহ্‌বিরোধীদের ওপর কঠোর চাপের সৃষ্টি করা হয়। বাজারে এমন অনেক দোকান দেখা যায় যার সামনের দিকে সাভাকের নির্দেশে ফুটো করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল দোকান বন্ধ থাকা অবস্থায়ও ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করা।

সারা দেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচর নিয়োগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। আর এসব কাজ যতখানি হয় তার চেয়েও অনেক বেশী ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সাভাক, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। ফলে খুব কম লোকই প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি উচ্চারণের সাহস পেত। কারাগারসমূহে নির্যাতন ছিল একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মামুলী ব্যাপার। আয়াতুল্লাহ্ তালেকানীর[৪৬] ন্যায় সংগ্রামী ও সাহসী আলেমগণ বহু বছর যাবত কারাগারে থেকে নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ ছাড়া এ যুগে কারাগারে সাভাকের নির্মম নির্যাতনের ফলে বহু সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব শাহাদাত বরণ করেন। এদের মধ্যে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও একনিষ্ঠ অনুসারী আয়াতুল্লাহ্ সায়ীদী[৪৭] এবং বিপ্লবী আলেম আয়াতুল্লাহ্ গাফ্‌ফারীর[৪৮] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে বিভিন্ন সংগ্রামী গ্রুপকে একের পর এক সামরিক আদালতে হাজির করা হয় এবং বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে তাঁদের মধ্য থেকে বহু লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অন্যদিকে এ সময়ে, বিশেষ করে ফার্সী ১৩৫০ থেকে ১৩৫৫ সাল পর্যন্ত[৪৯] শহরের রাস্তায় রাস্তায় সাভাক সদস্যদের সাথে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ চরমে উপনীত হয়।

www.pathagar.com

৩ ঃ সরকারের সাংস্কৃতিক তৎপরতা

শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর তাগূতী[৫০] সরকার নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা কেবল রাজনৈতিক এবং পুলিশী ও নিরাপত্তা সংস্থার তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ইরানের জাতীয় বাজেটের একটা বিরাট অংশ শাহী সরকারের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হত। তাগূতী সরকারের ওপর পনরই খোর্দাদের গণঅভ্যুত্থান একটা বিরাট আঘাত হেনেছিল। তাই সরকার ইসলাম ও আলেম সমাজকে তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে অনুভব করছিল। এ কারণেই সরকারের প্রায় সকল সাংস্কৃতিক কর্মসূচীই ইসলাম বিতাড়ন এবং ইরানী সংস্কৃতি থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। শাহী সরকার ইরানে ইসলামী সংস্কৃতি উৎখাত করে তদস্থলে যে সংস্কৃতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে তা ছিল "শাহানশাহী সংস্কৃতি"। এই শাহানশাহী সংস্কৃতির মূল বিষয়বস্তু ছিল পশ্চিমায়ন এবং শাহের মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রভুদের অন্ধ অনুসরণ, কুরুশ্[৫১] ও দরীউশের[৫২] পোশাক এবং ইসলাম-পূর্ব ইরানের কথাবার্তা-বোলচাল। আর এর ওপরে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা ও হস্তশিল্পের প্রকাশ্য ও লোক দেখানো অলংকারাদি ও বহিরাবরণ পরানো হয়। এর লক্ষ্য ছিল এই যে, শাহানশাহী সংস্কৃতি মানুষের মুখে মুখে ফিরবে এবং তাদের মন-মগজ দখল করে নেবে, এর ফলে ইসলামের সাথে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই এ যুগে সব রকমের নামকরণ, আনন্দ-উৎসব, পাঠ্য-পুস্তকের বক্তব্য, দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীর প্রচারমূলক বক্তব্য ইত্যাদি প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে মোকাবিলা এবং শাহানশাহী সংস্কৃতি প্রবর্তনের খেদমতে নিয়োজিত হয়।

শাহের তাগূতী সরকার তার ইসলামবিরোধী তথাকথিত শাহানশাহী সংস্কৃতি প্রবর্তনের ধারাক্রমে ফার্সী ১৩৫৪ সালে[৫৩] ইরানী পঞ্জিকা পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। হিজরী শাম্সী[৫৪] নামে পরিচিত ইরানী পঞ্জিকা—যা ঐ বছরের পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে জনগণের চাপের মুখে পুনঃপ্রবর্তিত হয় ও বর্তমানে চালু আছে—হযরত রাসূলে আকরামের (সাঃ) হিজরতের বছরের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত একটি সৌর পঞ্জিকা; এ মহান স্মৃতির স্মারক ও এ যোগসূত্রের কারণে তা একটি ইসলামী পঞ্জিকা হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শাহী সরকার এ ইসলামী পঞ্জিকাকে অ-ইরানী সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততার দোহাই দিয়ে বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে এবং অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য উৎসের ওপর ভিত্তি করে স্বকপোলকল্পিত তারিখ বিন্যস্ত করে তাকে শাহানশাহী পঞ্জিকা নাম দিয়ে হিজরী শাম্সী পঞ্জিকার স্থলাভিষিক্ত করে। এ নবপ্রবর্তিত পঞ্জিকায় বর্ষসংখ্যা গণনা এমনভাবে নির্ধারিত হয় যে, শাহের সিংহাসনে অধিষ্ঠানকে পঞ্জিকার আড়াই হাজার বর্ষপূর্তিতে দেখানো হয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, পঞ্জিকার বর্ষসংখ্যা গণনা সংক্ষেপ করলে অর্থাৎ প্রথম দুই সংখ্যা বাদ দিয়ে শুধু শেষের দুই সংখ্যা উল্লেখ করলে কার্যতঃ শাহের সিংহাসন আরোহণ পরবর্তী বর্ষসংখ্যা পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ হিজরী শাম্সী পঞ্জিকাকে শাহানশাহী পঞ্জিকায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভীর সরকার তার ইসলাম বিরোধিতার অভিযাত্রায় সবচেয়ে গুরুতর পদক্ষেপটি গ্রহণ করে। অতীতের অন্য কোন পদক্ষেপই এ পদক্ষেপের মতো শাহী সরকারের ইসলামবিরোধী প্রকৃতিকে জনগণের নিকট সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেনি। শাহ্ পঞ্জিকা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কার্যতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে ও সরকারীভাবে এ কথাই ঘোষণা করেন যে, তিনি ইরানী জাতি ও ইসলামের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান।

প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশের শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে ইচ্ছুক একটি সরকারের জন্য এ পদক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক আত্মহত্যার সমতুল্য। কিন্তু শাহ্

www.pathagar.com

এবং তাঁর সরকার ছিলেন ক্ষমতাদর্পী, আত্মপ্রতারিত ও নির্বোধ; অন্যদিকে জনগণের প্রকৃত সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ও যোগসূত্র ছিল না। অবশ্য এ সম্পর্কহীনতার জন্য দায়ী ছিল জনগণের সংস্কৃতিতে তাদের আস্থা না থাকা। এ কারণেই শাহী সরকার এহেন ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত হয়। যদি বলা হয়, পঞ্জিকা পরিবর্তন ইরানের জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিমুহূর্ত, যখন শাহী সরকারের পতনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থিরিকৃত হয়ে যায়, তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

শাহী সরকার তরুণ সমাজকে বিপ্লবী ও ইসলামী চিন্তাধারা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তা হচ্ছে তাদেরকে অন্তঃসারশূন্য কাল্পনিক বিষয়বস্তুতে মশগুল করে রাখা। স্বৈরাচারী গণবিরোধী সরকারের জন্য এটা অপরিহার্য ছিল যে, সাধারণ গণমানুষকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণাময় হৈচৈপূর্ণ কর্মসূচীতে এমনভাবে মশগুল করে রাখবে যে, তাদের জন্য যেন সচেতনতা সৃষ্টিকারী ও উদ্দীপনাময় লেখা ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের জন্য কোন সময় অবশিষ্ট না থাকে। সিনেমাহলগুলোতে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রসমূহ, রেডিও থেকে প্রচারিত গান-বাজনা এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠানাদি এতই অশ্লীল ও উত্তেজনাকর ছিল যে, তা অনেক তরুণকেই নেশাগ্রস্ত করে ফেলে এবং তাদের চিন্তাশক্তিকে হরণ করে নেয়। আর শাহী সরকার এটাই চাচ্ছিল।

আমীর আব্বাস হোভায়দার সরকার তরুণ সমাজকে ব্যস্ত রাখার জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল "তরুণদের প্রাসাদ" [৫৫] নামে সারা দেশে অনেকগুলো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। তরুণ সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা-অনৈতিকতার বিস্তার সাধনই ছিল এই তথাকথিত 'তরুণদের প্রাসাদ'-এর আসল কাজ এবং সরকার অশ্লীলতার এই প্রাণকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ওপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করে। দৃঢ়তার সাথে তা কার্যকর করে। তরুণদের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার, অশ্লীলতা-অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতার বিস্তার সাধনের ক্ষেত্রে সরকার এতদূর অগ্রসর হয় যে, একদিকে নারীদেরকে পশ্চিমা ধরনের অদ্ভুত সব বেশভূষা, সাজগোছ ও নগ্নতায় উৎসাহিত করত, অন্যদিকে ইসলামী তথা হিজাব সম্মত পোশাক পরিধানে বাধা দিত। এ ব্যাপারে সরকারের ধৃষ্টতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, ইসলামের আদেশ অনুযায়ী হিজাবসম্মত পোশাক পরিধানকারী ছাত্রীদেরকে হাইস্কুল এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধা দেয়া হত।

ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার পূর্বে ইরানে সাধারণ পরিবেশ, বিশেষ করে শহরসমূহের পরিবেশ অনৈতিকতা ও অশ্লীলতায় কতদূর বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য ঐ সময়কার একজন হাইস্কুল ছাত্রের অবস্থাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ঐ সময়কার একজন কিশোর হাইস্কুল ছাত্র সকালবেলা যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত তখন টেলিভিশনে শেষরাতে প্রচারিত চলচ্চিত্র তার মন-মগজ দখল করে রাখত; এসব চলচ্চিত্র সাধারণতঃ যৌন উত্তেজনাকর ও অপরাধমূলক দৃশ্যে পূর্ণ থাকত। এ অবস্থায় রেডিও থেকে প্রতি কয়েক মিনিট পরপরই যৌন উত্তেজনাকর সঙ্গীত পরিবেশিত হত এবং ছাত্রটি স্কুলে পৌঁছা পর্যন্ত পুরো পথে তার মন-মগজ অনবরত পাপকার্যের চিন্তায় দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে থাকত। নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন-ধারণ, সাময়িকীর কভারে মুদ্রিত ছবিসমূহ, সিনেমা হলের সামনে টানানো চিত্রসমূহ, অশ্লীল সঙ্গীত ও ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট বিক্রির দোকান ও তাতে তরুণদের নিকট বিক্রির জন্য রাখা নায়িকা ও শিল্পীদের ছবি, বিনোদন ক্লাবসমূহ, 'তরুণদের প্রাসাদ'—যেখানে সাধারণতঃ জুয়াখেলা হত ও অন্যান্য অনৈতিক কার্যকলাপ চলত—মদের দোকান, যার সংখ্যা বই বিক্রির দোকানসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, এ ছাড়া আরো

www.pathagar.com

অনেক উপায়-উপকরণ ও উপাদান ইরানের তরুণ সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং যৌনতা, অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল; তাদেরকে চিন্তা করার মতো অবকাশ দিত না। এভাবে পাহ্‌লভী সরকার যে সর্বশক্তি দিয়ে তার সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটাচ্ছিল তা ছিল একটি সুপরিকল্পিত কাজ। সরকারের লক্ষ্য ছিল দেশের তরুণ সমাজের চিন্তাশক্তি এবং আত্মার পবিত্রতা ও মনের পরিচ্ছন্নতাকে কুপ্রবৃত্তি, কামনা-লালসা এবং অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার পূঁতিগন্ধময় বদ্ধডোবায় ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেয়া, যাতে তারা বিরাট মনোবল, উচ্চাশা ও সমুন্নত আকাঙক্ষার অধিকারী হতে না পারে, স্বীয় দেশ ও জাতির ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে না পারে এবং স্বদেশের শোষিত-বঞ্চিত জনগণকে বিজাতীয় শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারে।

শাহী সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্মকর্তারা তরুণ সমাজকে চিন্তা-গবেষণা ও সংগ্রাম থেকে দূরে রাখার জন্য এতসব পরিকল্পনা ও চেষ্টা-সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও যে গুটিকয় তরুণ অধ্যয়ন, আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণাকে পছন্দ করত তাদের জন্যও আলাদা কর্মসূচী প্রণয়ন করে রাখা হয়েছিল। তাদের সামনে আধুনিক কবিতা বনাম গতানুগতিক (ঐতিহ্যিক) কবিতা বা যে কোন নতুন জিনিস ও তার বিপরীতে পুরাতন ও গতানুগতিক (ঐতিহ্যবাহী) জিনিস সংক্রান্ত বিতর্ক, নারী-পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হত এবং তাদেরকে এসবে ব্যস্ত করে রাখা হত।

খ ঃ জনগণের সংগ্রাম

ফার্সী ১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ সাল (১৯৬৪-১৯৭৭ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত সরকারী তৎপরতার মোকাবিলায় ইরানী জনগণ যেসব সংগ্রামী তৎপরতা পরিচালনা করে তাকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তা হচ্ছে ঃ ১) রাজনৈতিক সংগ্রাম, ২) সশস্ত্র সংগ্রাম ও ৩) সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।

১ ঃ রাজনৈতিক সংগ্রাম

যেহেতু পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে খোদ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইরানী জনগণের সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ফলে এরপর আর সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে ও রাজতান্ত্রিক মূলনীতির প্রতি আনুগত্যসহকারে রাজনৈতিক সংগ্রামের কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকেনি। তাই ইরানে এ যুগে "রাজনৈতিক তৎপরতা" কথাটি আর তার গতানুগতিক অর্থে স্থির থাকেনি। অন্যদিকে প্রশাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে এমন এক কণ্ঠরোধকারী অবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল যে, কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী গতানুগতিক অর্থে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে চাইলেও তা তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, এই দীর্ঘ সময়ে ইরানী জনগণ "রাজনীতি" কথাটির সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করেনি।

এ যুগে পরিচালিত রাজনৈতিক তৎপরতাসমূহের মধ্যে "নাহ্‌যাতে আযাদী"[৫৬] পরিচালিত তৎপরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩৩৯ ফার্সী সালে[৫৭] মরহুম আয়াতুল্লাহ্‌ তালেকানী, ইঞ্জিনীয়ার বাযারগান,[৫৮] ডঃ সাহাবী[৫৯] এবং তাঁদের আরো কয়েকজন বন্ধু মিলে নেহ্‌যাতে আযাদী প্রতিষ্ঠা করেন। কার্যতঃ এটি ছিল জেব্‌হেয়ে মিল্লীর[৬০] একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উপদল। এ সংগঠনটি জেব্‌হেয়ে মিল্লীর মতের বিপরীতে রাজনৈতিক সংগ্রামে ইসলামকে সম্পৃক্ত করার পক্ষপাতী ছিল।

www.pathagar.com

নেহ্‌যাতে আযাদী সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষপাতী ছিল এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল না। নাহ্‌যাতে আযাদীর প্রতিষ্ঠাতাগণ ও শীর্ষস্থানীয় সদস্যগণ পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পূর্বেই গ্রেফতার হয়েছিলেন। পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পর তাঁদের বিচার করা হয়; তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে দশ বছর করে এবং কয়েকজনকে এর চেয়ে কিছুটা কম মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

ঐ সময় ইরানের সাধারণ গণমানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে সংগ্রামী পথপরিক্রমার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় মার্‌জায়ে তাক্‌লীদ হিসেবে হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) স্মরণ করা হত। আর শাহী সরকার এটাকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করত।

যদিও হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) ইরান থেকে প্রথমে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয় এবং পরে সেখান থেকে ইরাকে এনে নাজাফে রাখা হয়, আর সেখানে তাঁর সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ও যোগাযোগকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত, তথাপি সংগ্রামী ওলামায়ে কেরামের পক্ষে তাঁর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর নিকট থেকে নির্দেশনা গ্রহণ সম্ভব ছিল। আর তাঁরা প্রচার, ওয়াজ, বক্তৃতা, ঘোষণা ও প্রচারপত্র, বই-পুস্তক ইত্যাদির মাধ্যমে ইমামের বাণীকে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দিতেন। এভাবে তাঁরা হযরত ইমাম সম্পর্কে সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতাকে বানচাল করে দিতেন। ন্যূনকল্পে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের শরয়ী বিষয়ে হযরত ইমামের ফতোয়া উল্লেখ করে জনমনে তাঁদের দ্বীনী নেতৃত্বের স্মরণকে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করতেন। এ যুগে ওলামায়ে কেরামের অনেকে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী তৎপরতা পরিচালনার দায়ে কারারুদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ী, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমীন রাফসানজানী ও আয়াতুল্লাহ্‌ মাহ্‌দাভী কানী[৬১] এবং তাঁদের ন্যায় আরো কতক শীর্ষস্থানীয় আলেম বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত হন এবং বিভিন্ন কারাগারে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন।

এ যুগে পরিচালিত অন্যান্য রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে ওলামায়ে কেরামকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সরকার ও ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগের মুখাপেক্ষী করে তুলে সরকারের তাঁবেদারে পরিণত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলামায়ে কেরাম যেকোন সুযোগেই শাহী সরকারের প্রতি তাঁদের বিরোধিতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রদর্শন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৩৫৪ ফার্সী সালের খোর্‌দাদ মাসে[৬২] মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায়, ১৩৪২ ফার্সী সালের পনরই খোর্‌দাদের (৫ই জুন, ১৯৬৩-র) গণঅভ্যুত্থানের বার্ষিকী স্মরণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এ বিক্ষোভকালে ওলামায়ে কেরাম ও সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের এজেন্টদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে বেশ কিছু সংখ্যক আলেম শাহাদাত বরণ করেন এবং আরো অনেককে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় বা বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রেরণ করা হয়।

এ যুগের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে প্রবাসী ছাত্রছাত্রী ও সংগ্রামীদের ইসলামী সমিতিসমূহের ব্যাপক তৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠন স্বৈরাচারী শাহী সরকারের পৈশাচিকতা ও অপরাধমূলক তৎপরতা ফাঁস করে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব সংগ্রামী ইরানী বিদেশে বসবাস করতেন তাঁদের অনেকের পক্ষেই দেশে ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা একদিকে ইরানের সাধারণ গণমানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথা, অন্যদিকে শাহী সরকারের ভোগ - বিলাসিতা, আরাম - আয়েশ, আমোদ - ফূর্তি, জুলুম - অত্যাচার ও নির্যাতন - নিপীড়নের কথা বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন।

www.pathagar.com

২ ঃ সশস্ত্র সংগ্রাম

ইতোপূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে, এ যুগে যেমন দল ও সংগঠনসমূহের মাধ্যমে রাজনৈতিক তৎপরতা খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না, ঠিক তার বিপরীত পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে। এ যুগে ইরানে সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রুপ গড়ে ওঠে। এখানে এসব সশস্ত্র গ্রুপের মধ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশন[৬৩] ঃ ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশন ছিল ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার তরুণদের একটি সংগঠন। পনরই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানের সময় হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ধারায় ও তাঁর পথনির্দেশনার আলোকে সারা দেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালানোর লক্ষ্যে একটি সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; এ চিন্তা থেকেই পরে এ সংগঠনটি গড়ে ওঠে। ফার্সী ১৩৪৩ সালে (১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে) শাহী সরকার হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) দেশ থেকে নির্বাসিত করে; এ ঘটনার পর ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশন একটি সামরিক শাখা গঠন করে এবং শাহী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও নীতিনির্ধারকদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ গ্রুপের প্রথম পদক্ষেপ ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন আলী মান্‌ছুরকে হত্যার প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় তাঁরা সফল হন। কিন্তু সরকার সংগঠনটির সামরিক শাখার সদস্যদের ও 'কমিটিসমূহে'র সর্বমোট শতাধিক সদস্যকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। সরকার সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার করে এবং এ গ্রুপের চারজন সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মোহাম্মদ বোখারায়ী, মোর্‌তাযা নীক্‌নেযাদ্[৬৪] রেযা ছাফফার হারান্দী[৬৫] এবং হাজী সাদেক আমানী[৬৬]। এ ছাড়া আরো কয়েকজনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; হাজী মাহদী এরাকী[৬৭] তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হেয্‌বে মেলালে ইসলামী ঃ[৬৮] ইসলামী কমিটিসমূহের ফেডারেশনের চারজন সংগ্রামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনার পর কয়েক মাস না যেতেই আরেকটি ইসলামী সশস্ত্র গ্রুপকে গ্রেফতার করার খবর সারা ইরানে ছড়িয়ে পড়ে; এ গ্রুপটি ইরানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পোষণ করত। গ্রুপটির নাম হেয্‌বে মেলালে ইসলামী। ফার্সী ১৩৪৪ সালের ২৪শে মেহের[৬৯] শেমীরানের[৭০] উত্তরে পার্বত্য এলাকায় সরকারী বাহিনীর সাথে সংঘটিত এক সংঘর্ষের পর গ্রুপটির ৫৫জন সদস্য গ্রেফতার হন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে বিচার-প্রহসনের আয়োজন করা হয়।

যদিও এ গ্রুপটির সন্ধান লাভ এবং এর সদস্যদের গ্রেফতার ও বিচার বাহ্যতঃ সরকারের জন্য একটি সাফল্য হিসেবে পরিগণিত হয়, কিন্তু সেই সাথে এ সত্যটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পনরই খোর্‌দাদে শাহী সরকারের পক্ষ থেকে হিংসাত্মক তৎপরতা ও ব্যাপক গণহত্যা এবং সাভাক সদস্যদের পৈচাশিক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও মুসলিম তরুণ ও যুবকশ্রেণী সংগ্রামকে পরিত্যাগ করেনি। বরং তারা ইসলামী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোপন সংগঠন গড়ে তোলে এবং সরকারের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে গিয়ে এক ধরনের সশস্ত্র গেরিলা তৎপরতা চালায়। আর এটা সমাজের গণমানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে এবং জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করে যা শাহের সরকারের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুজাহিদীনে খাল্‌ক্[৭১] ঃ মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ সংস্থা হচ্ছে এ যুগে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত গ্রুপসমূহের অন্যতম। এক দল মুসলিম যুবক এবং নেহযাতে আযাদীর কতক সদস্য এ সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থানের পরে, এবং ইরানের গণমানুষের মধ্যে এ গণঅভ্যুত্থান যে বিবর্তন সৃষ্টি করে ঠিক তারই প্রভাবে এরা নিজেদের চলার পথকে

www.pathagar.com

নেহযাতে আযাদী থেকে পৃথক করে নেন। নেহ্যাতে আযাদী এবং জেব্‌হেয়ে মিল্লী কর্তৃক সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর প্রক্রিয়াকে মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ পরিত্যাগ করে এবং সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে গোপন ও সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার কর্মনীতি গ্রহণ করে।

যদিও মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাগণ দ্বীনদার মুসলমান ছিলেন এবং স্বৈরাচারী শাহ্ ও তাঁর সরকারের উৎখাত ও ইসলামী হুকুমাত কায়েমের লক্ষ্যে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ব্যাপকভিত্তিক গণআন্দোলন থেকে তাঁরা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কিন্তু চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক বিচারে শুরু থেকেই তাঁরা বিচ্যুতি ও বিকৃতির শিকার হয়েছিলেন। আর তাঁদের এই পথভ্রষ্টতাই শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের জন্য এবং ইরানের মুসলিম জনগণ ও ইসলামী বিপ্লবের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুজাহিদীনে খাল্‌কের এ পথভ্রষ্টতার উৎস ছিল তার বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ। দলটির রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বেলায়াতে ফকীহ ও মার্‌জায়িআতের কোন স্থান ছিল না। এ কারণেই, তাঁরা যদিও মুষ্টিমেয় সংখ্যক আলেমের সাথেও সম্পর্ক রাখতেন, তথাপি তাঁরা, মার্‌জায়িআত ও ওলামায়ে কেরাম যে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে পারেন—এ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ ইসলামের অনুধাবন এবং হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামকে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোকে ব্যাখ্যা করতেন, যদিও তাঁরা ফিকাহ্‌সহ সমগ্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী (মুজতাহিদ) ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের যে রূপের প্রতি আগ্রহী ছিলেন তা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের ধারণাকৃত রূপ। তাঁরা নাহ্‌যাতে আযাদী থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে এ ধারণা ও প্রবণতাকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলেন। আর একেই তাঁরা তাঁদের আদর্শিক ভিত্তিতে পরিণত করেন।

মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ মূলনীতি হিসেবে যা গ্রহণ করেছিল তা হচ্ছে, তরুণ সমাজ ও ছাত্রদের নিকট ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যে, তা যেন বুদ্ধিজীবীসুলভ পরিবেশে বিরাজমান চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক প্রবণতার সাথে সঙ্গতিশীল হয়।

মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সংগ্রামের পদ্ধতিগত দিক থেকেও শুরু থেকেই মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। যেহেতু তাঁরা ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করেননি, সেহেতু শ্লোগানের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামকেও ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। একই কারণে তাঁরা নিজেদের জন্য বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ ও আদর্শিক টেক্সট বই রচনায় উদ্যোগী হন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মার্ক্সবাদী রচনাবলীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এর ওপরে কয়েকটি আয়াত ও হাদীসের প্রলেপ প্রদান করেন। আর এগুলোকেই তাঁরা স্বীয় সংগঠনের সদস্যদেরকে ইসলামী দর্শন, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী অর্থনীতি হিসেবে শিক্ষা দিতেন। সেই সাথে তাঁরা মনে করতেন যে, পনরই খোর্‌দাদের গণঅভ্যুত্থান চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয়েছে, অতএব আন্দোলনের জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই অন্য পন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁরা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পদ্ধতিসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন এবং তা থেকেই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, শাহী হুকুমতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র উপায় হচ্ছে এ কর্মপন্থারই অনুসরণ। তাঁদের এ দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারা এবং সংগ্রামের জন্য এ কর্মপন্থা গ্রহণের পরিণতিতেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মুজাহিদীনে খাল্‌ক্ কম্যুনিস্টদের প্রতি শুভেচ্ছা প্রদর্শন করে এবং তাদের সাথে সংমিশ্রণ ও

www.pathagar.com

সহযোগিতা এড়িয়ে চলেনি। এমনকি তাঁরা তাঁদের সংগঠনের নাম ও প্রতীক গ্রহণের ক্ষেত্রেও মার্ক্সবাদ ও কম্যুনিজমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

মুজাহিদীনে খাল্‌ক ১৩৫২ ফার্সী সালে[৭২] তার কেন্দ্রীয় ক্যাডারের একজন নেতাকে নাজাফে হযরত ইমাম খোমেনীর নিকট প্রেরণ করে এবং তাঁর নিকট থেকে সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রার্থনা করে। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) যদিও সব সময়ই মুসলিম যুবকদেরকে সংগ্রামের জন্য উৎসাহিত করতেন তথাপি মুজাহিদীনে খাল্‌কের চিন্তাধারা, আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার পর তাদেরকে স্বীকৃতি দানে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানান। তিনি সেই শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা চিন্তাধারার দিক থেকে এবং আন্দোলনের জন্য গৃহীত কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আর তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদেরকে তাঁদের সম্পর্কিত তাঁর এ অভিমত জানিয়ে দেন।

ফার্সী ১৩৫০ সালে[৭৩] সাভাক মুজাহিদীনে খাল্‌ক্‌কে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং দলটির অনেক সদস্যকে গ্রেফতার করে। এ আঘাতের ফলে সংগঠনটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দলের বাকি সদস্যরা যদিও শাহী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিল এবং 'আকস্মিক হামলা চালানো ও বিক্ষিপ্তভাবে পালিয়ে যাওয়া' পদ্ধতিতে গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল, কিন্তু সাংগঠনিক ও চিন্তাধারাগত দিক থেকে দিশাহারা অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। অবশেষে সেই প্রাথমিক চৈন্তিক পথভ্রষ্টতার কারণেই ১৩৬৩ ফার্সী সালের দিকে[৭৪] সংগঠনের অবশিষ্ট সদস্যদের বেশীর ভাগই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, তারা মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং কম্যুনিস্ট হয়েছে। এ ঘটনার পর স্বয়ং মুজাহিদীনে খাল্‌কের সদস্যদের মধ্যে যেমন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে ইরানের মুসলিম জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অতঃপর যেহেতু জনগণের মধ্যে তাদের কোন স্থান ছিল না, সেই সুযোগে সাভাকও তাদের ওপরে সর্বশেষ আঘাত হানতে এগিয়ে আসে। এ আঘাত এমনই মারাত্মক ছিল যে, ফার্সী ১৩৫৬ সালে[৭৫] মুজাহিদীনে খাল্‌ক বলতে কারাগারে এ দলের কয়েক ডজন নেতাকর্মী এবং বিদেশে কিছু সংখ্যক সদস্য ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

অন্যান্য গ্রুপ ঃ মুজাহিদীনে খাল্‌কের পথভ্রষ্টতা ও প্রায় নিশ্চিহ্নতার পরে এ সংগঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী মুসলিম যুবকদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপ গড়ে ওঠে। এ গ্রুপগুলো গোপন সংগঠন আকারে গড়ে ওঠে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মপন্থা বেছে নেয়। এ সব গ্রুপ ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে। এভাবে তারা মনগড়া ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার সাথে মিশ্রিত সংস্করণের ইসলাম[৭৬] থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। ১৩৫৬ ফার্সী সালের[৭৭] পূর্বে এ গ্রুপগুলো শাহী সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা বিভিন্ন সময় সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের অনেকে গ্রেফতার ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।

ফেদায়িয়ানে খাল্‌ক[৭৮] ঃ ১৩৪৯ ফার্সী সালের শীতকালে[৭৯] এখানে সেখানে একটি কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, শাহী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী সিয়াকোলের[৮০] জঙ্গলে একদল সশস্ত্র সংগ্রামীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। সংঘর্ষের সমাপ্তির পরে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্পর্কে জানানো হয়। এ থেকে জানা যায়, উত্তর ইরানে একটি গোপন ও সশস্ত্র মার্ক্সবাদী গেরিলা সংগঠনের সন্ধান পাওয়ার পর সরকারী বাহিনী তাদেরকে অবরোধ করে। এমতাবস্থায় তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয় এবং তারা গ্রেফতার হয়। ১৩৫০ ফার্সী সালের ফার্ভার্দীন্ মাসে[৮১] এদের মধ্য থেকে ১৩জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং কিছু সংখ্যককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এ ঘটনার পর থেকে এ গ্রুপের সদস্য ও সমর্থকদের সাথে সাভাকের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যরা শাহী সরকারের বেশ কিছু সংখ্যক সেবাদাসকে হত্যা করে। এ ছাড়া তারা কিছু নাশকতামূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করে।

১৩৪৯ ফার্সী সাল থেকে ১৩৫৪ ফার্সী সাল (১৯৭০-১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাহী সরকার বেশ কয়েকটি ছোট সশস্ত্র মার্ক্সবাদী গ্রুপের সন্ধান পায়। পরস্পর স্বতন্ত্র এ ছোট গ্রুপগুলো এবং তৎসহ সিয়াকোল জঙ্গলের গ্রুপটি পরে সাধারণভাবে একক 'ফেদায়িয়ানে খাল্ক্' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ গ্রুপগুলো যেহেতু শুরু থেকেই নিজেদেরকে মার্ক্সবাদী বলে পরিচিত করেছিল সেহেতু সাধারণ জনগণের মধ্যে তারা কোন উল্লেখযোগ্য স্থান লাভে ব্যর্থ হয়। এদের মধ্যে যারা কারাগারের বাইরে ছিল ১৩৫৪ ও ১৩৫৫ ফার্সী সালে সাভাক্ তাদের বেশীর ভাগকেই বিভিন্ন বাড়ীতে দলবদ্ধ অবস্থায়[৮২] গ্রেফতার করতে বা হত্যা করতে সক্ষম হয়।

এ গ্রুপগুলোর ওপর সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীসমূহ এমনই মারাত্মক আঘাত হানতে সক্ষম হয় যে, ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ ফার্সী সালে বেশ কিছু সংখ্যক কম্যুনিস্ট গ্রুপ সশস্ত্র সংগ্রাম আর সুবিধাজনক ও বাঞ্ছিত নয় বলে মনে করে এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আদর্শিক প্রচারের কর্মনীতি অনুসরণকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। আর তারা তাদের এ কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।

কিন্তু এ সময়ে এমন কতক ইসলামী গ্রুপও গড়ে ওঠে যেগুলো মুজাহিদীনে খাল্কের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিহার করে নিজেদেরকে পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি ও মার্ক্সবাদী আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় এবং শাহী সরকারের বিরুদ্ধে গোপন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[৮৩]

৩ ঃ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম

১৩৪২ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সাল (১৯৬৩ থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাহী সরকারের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের সাংস্কৃতিক রণাঙ্গন অত্যন্ত ব্যাপক-বিস্তৃত রণাঙ্গন ছিল এবং এ রণাঙ্গন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ও সরগরম ছিল। এ সময় শাহী সরকারের হাতে রেডিও, টেলিভিশন, থিয়েটার হল, সিনেমা ও সাধারণভাবে পত্রিকা-সাময়িকীসহ প্রচুর সংখ্যক প্রচার ও গণসংযোগ মাধ্যম ছিল; সর্বোপরি ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। এসব কিছুর জন্য সরকারী তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হত এবং এসব মাধ্যমকে সরকার তার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করত। এ ছাড়াও জ্ঞানসৈনিক,[৮৪] সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণকে এ লক্ষ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করত। এভাবে তথাকথিত শাহানশাহী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে শুধু শহরগুলোকেই নয়, বরং গ্রামগুলোকেও অনাচার-অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার ভাগাড়ে পরিণত করার চেষ্টা করত। কিন্তু শাহী সরকারের এত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের ব্যবহার, এত অর্থ ব্যয়, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ইরানের মুসলিম জনগণ সাংস্কৃতিক সংগ্রামে শাহী সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভে সক্ষম হয়। এ সাংস্কৃতিক বিজয় পরবর্তীতে ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের অন্যতম কারণে পরিণত হয়।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এ লড়াইয়ে ইরানের মুসলিম জনগণের বিজয়ের মূল কারণ ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সত্যতা ও যথার্থতা, শক্তি এবং মৌলিকত্ব। সাংস্কৃতিক রণাঙ্গনের লড়াইয়ে ইরানের মুসলিম

www.pathagar.com

জনগণের বিজয় তখন সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন ১৩৫৬ ফার্সী সালে (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে) হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) শাহী সরকারের শিবিরসমূহের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে আহ্বান জানান তাতে অসংখ্য সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও ছাত্রসমাজ যে অভূতপূর্ব সাড়া প্রদান করে তা এটাই প্রমাণ করে যে, এ প্রজন্ম শাহী সরকারের দেয়া কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির মেঘাবরণ ভেদ করে ইসলামের দেদীপ্যমান চেহারা দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এ কারণেই তার জ্যোতিকে লক্ষ্য করে পক্ষ বিস্তার করে অগ্রসর হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না যে, যে জিনিসটি তরুণ সমাজের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তা হচ্ছে পনরই খোর্‌দাদের ঘটনায় হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) দৃঢ়তা, আপোসহীনতা ও তাক্‌ওয়া-পরেহযগারী। হযরত ইমাম অভ্যুত্থান ও স্বীয় জীবনধারার সাহায্যে ইসলামী সংস্কৃতিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও মূর্তিমান করে তুলেছিলেন এবং একটি বাস্তব বা প্রকৃত অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধসমূহকে স্বীয় সত্তায় প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন।

জনগণের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বিভিন্ন দিক ঃ ইরানের মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্‌মান (১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী) ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পথকে মসৃণ ও গম্য করে তুলেছিল। তাই এ সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বিভিন্ন দিকের ওপর সংক্ষেপে হলেও দৃষ্টিপাত করা অপরিহার্য। এখানে এ দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ

(ক) ইসলামী হুকুমতের মূলনীতি ও ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা এবং দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়কে একটি আনুষ্ঠানিক ও আবশ্যিক পাঠের মর্যাদা দান। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) স্বয়ং নাজাফের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রে এ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দায়িত্ব আনজাম দিতেন। আর এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিয়মিত শিক্ষামূলক বক্তৃতামালায় উচু স্তরের দ্বীনী শিক্ষার্থীদের (আলেমগণের) সামনে যে বক্তব্য রাখেন তা-ই পরে "বেলায়াতে ফকীহ্"[৮৫] নামে তাঁর বিখ্যাত দিকনির্দেশক গ্রন্থের রূপ লাভ করে। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং বিশেষভাবে হুকুমত প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

(খ) কুরআনে মজীদের তথ্যাবলী ও শিক্ষাসমূহ এবং ইসলামী মূল্যবোধসমূহ উপস্থাপন, তরুণ প্রজন্মকে ইসলামের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করে তোলা এবং ইসলামের চেহারার ওপর থেকে কুসংস্কার ও বিকৃতির ময়লা-আবর্জনা দূরীকরণ। এ পথে যেসব আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও বক্তা চেষ্টা-সাধনা করেন তাঁদের মধ্যে শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মোর্‌তাযা মোতাহ্‌হারী

www.pathagar.com

মোর্‌তাযা মোতাহ্‌হারী[৮৬] ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য, সর্বাধিক সফল এবং অন্য যে কারো চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব।

(গ) দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানোন্নয়ন এবং দ্বীনী জ্ঞানার্জনরত মাদ্রাসা ছাত্রদের পাঠ-পরিকল্পনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।। এ লক্ষ্যে যাঁরা কাজ করেন ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা মোহাম্মদ হোসেন তাবাতাবায়ী; তিনি দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে শহীদ আয়াতুল্লাহ্‌ কুদ্দুসী[৮৭] ও শহীদ আয়াতুল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তী[৮৮] প্রমুখ ব্যক্তিত্ববর্গ যথেষ্ট চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের জন্য নতুন পরিকল্পনা ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

(ঘ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক পশ্চিমায়িতদের এবং মার্ক্সবাদী ও কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার সমর্থক প্রাচ্যায়িতদের নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী চিন্তাধারাসমূহের বিরুদ্ধে ইসলামী চিন্তাবিদ, বক্তা ও লেখকগণের মোকাবিলা। তাঁরা যথাযথ দলিল – প্রমাণ সহকারে এবং অনবরত, এ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

(ঙ) ইসলামবিরোধী জাতীয়তাবাদীদের প্রভাবশালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোকাবিলা॥ ইসলামবিরোধী জাতীয়তাবাদীরা পাহ্‌লভী শাসনামলে ইসলাম-পূর্ব ইরানের সাথে বর্তমান ইরানের সম্পর্ক দেখাবার ও তাকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা চালায়। এই জাতীয়তাবাদী সরকারের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল শাহানশাহী ব্যবস্থা এবং এর ফলাফল ছিল শাহের হেফাযত ও ইরানে মার্কিন উপস্থিতি অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধান। ইরানের দ্বীনদার মুসলিম জনগণ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে এ প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

(চ) শাহী সরকারের প্রবর্তিত অনাচার ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম॥ শাহী সরকার তার সকল শক্তি দিয়ে তরুণ প্রজন্মের ওপর অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে চিন্তাক্ষমতাশূন্য, উদাসীন ও বেপরোয়া করে গড়ে তোলার, সাময়িক ও অস্থায়ী ভোগ-বিলাস-আরাম-আয়েশে ব্যস্ত রাখার এবং অধঃপতিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।

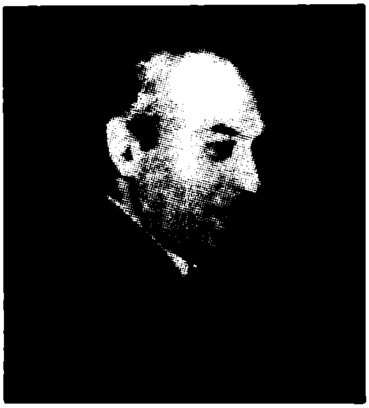
ডঃ আলী শরীয়তী

প্রধানতঃ ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার বক্তা লেখক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকগণ এ সাংস্কৃতিক রণাঙ্গনের সৈনিক হিসেবে কাজ করেন। তাঁরা মসজিদ, হোসেনিয়া ও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের বক্তৃতা ও ওয়ায্‌-নছিহতের মাধ্যমে, হযরত ইমাম হোসেন (আঃ)-এর অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী বর্ণনা এবং বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ডঃ আলী শরীয়াতীর[৮৯] নাম স্মরণ করতে হয়। তিনি যেসব বক্তৃতা করেন এবং যেসব গ্রন্থ রচনা করেন তাতে সাধারণতঃ ইসলামের সামাজিক ও সামষ্টিক সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রধানতঃ তেহরানের হোসেনিয়ায়ে এর্‌শাদে[৯০] প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যেহেতু তিনি তরুণদের ও

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন সেহেতু তাঁর বক্তৃতা ও লেখা এ শ্রেণীর মধ্যে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়।

অবশ্য ইরানে এ যুগের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম কেবল ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং অন্যান্য মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণও নিজ নিজ চিন্তাধারা তুলে ধরার জন্য সাহিত্য-সাময়িকী, অনুবাদ, নাটক, কবিতা ও শিল্পের ব্যবহার করতেন। কিন্তু ইসলামী লেখক ও বক্তাগণ এবং ওলামায়ে কেরামের প্রভাবের ক্ষেত্রের তুলনায় এঁদের প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল খুবই সীমিত। এ কারণে তাঁরা সাধারণ গণমানুষের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কারণ, তাঁরা অনৈসলামী সংস্কৃতির প্রচারক ছিলেন এবং এ কারণেই তাঁরা সাধারণ গণমানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। এই লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের ভাষাও সাধারণতঃ জনগণের নিকট অসুন্দর ও অমসৃণ বলে গণ্য হত। তাঁদের লেখা ও বক্তৃতামালা পশ্চিমা শব্দাবলী ও পরিভাষায় এতই ভারাক্রান্ত থাকত এবং তাঁদের বক্তব্যসমূহ পশ্চিমা রচনাবলীর অনুবাদের সাথে এতই মিলে যেত যে, তাঁদের কথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হত না।

টীকা ঃ

(১) طیب حاج رضائی

(২) حاج اسماعیل رضائی

(৩) ১৩ই অবান্ ১৩৪৩ ফার্সী সাল মোতাবেক ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ। এ দিন হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়। এখানে ১৩ই অবান্ বলতে এ ঘটনাকে বোঝানোই লক্ষ্য। কিন্তু ১৩ই অবান আরো দুটি ঘটনার জন্য ইরানের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৩ই অবান ১৩৫৭ ফার্সী সাল (মোতাবেক ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের মাত্র চার মাস এক সপ্তাহ আগে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হযরত ইমামের অনুসারী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা ইমামের নির্বাসন বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করলে সরকার সেখানে নির্মম গণহত্যার আশ্রয় নেয়। এ ঘটনা স্মরণে বিপ্লবের পরে এ দিনটিকে "ছাত্র-ছাত্রী দিবস" নামকরণ করা হয়। এ ঘটনার এক বছর পর একই দিনে ইমামের অনুসারী ছাত্ররা "গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া" হিসেবে পরিচিত তেহরনাস্থ মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেয় এবং কূটনীতিকবেশী গোয়েন্দাদের আটক করে। —অনুবাদক

(৪) মার্জায়ে তাক্লীদগণ যেসব ঘোষণা প্রচার করেন তার মধ্যে মাশ্হাদের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রে অবস্থানরত ও কর্মতৎপরতা পরিচালনাকারী সমকালীন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মার্জা' আয়াতুল্লাহ্ ওয্মা সাইয়েদ মোহাম্মদ হাদী মীলানীর (سید محمد هادی میلانی) পক্ষ থেকে প্রচারিত সাহসী ও কড়া ভাষার ঘোষণাপত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৫) মোতাবেক ২রা আগস্ট, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ।

(৬) মোতাবেক ৭ই এপ্রিল, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ।

(৭) کاپیتولاسیون —Capitulation, এটি একটি ফরাসী পরিভাষা। "ক্যাপিচুলেশন মানে হচ্ছে "শক্তিশালী ও উপনিবেশবাদী দেশসমূহ, বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে, দুর্বল দেশসমূহের ওপর যেসব চুক্তি চাপিয়ে দিত তা থেকে সৃষ্ট অবস্থা ; এসব চুক্তির ভিত্তিতে উপনিবেশবাদী দেশসমূহের নাগরিকরা দুর্বল দেশের ভৌগোলিক সীমানায় প্রবেশের পরেও স্বদেশের বিচারালয়ের বিচারাধীন থাকত এবং দুর্বল দেশের আদালতসমূহ তাদের বিচার করার কোন অধিকার লাভ করত না।"

(دائرة المعارف فارسی ذیل عنوان کاپیتولاسیون)

www.pathagar.com

(৮) Immune অর্থাৎ ভুলের উর্ধ্বে বলে গণ্য হবেন এবং বিচারযোগ্য হবেন না।

(৯) যেমন ঃ কোন খুনী অপরাধী বা রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিও যদি কোন কূটনৈতিক মিশনে আশ্রয় নেয় এবং মিশন তাকে আশ্রয় দেয় তাহলে পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য ঐ মিশন অফিস বা কূটনীতিকের বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারবে না। — অনুবাদক

(১০) মোতাবেক ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

(১১) মোতাবেক ২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

(১২) ادم — Servaent. পিওন, সুইপার, পাচক ইত্যাদি।

(১৩) سران اسلام —এখানে সম্ভবতঃ মুসলিম দেশসমূহের নেতাদের বোঝানোই হযরত ইমামের উদ্দেশ্য; অথবা দ্বীনী নেতাদের বোঝানোও উদ্দেশ্য হতে পারে। — অনুবাদক

(১৪) মোতাবেক ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ।

(১৫) مهرآباد — তেহরানের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

(১৬) ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) اسفند —এস্ফান্দ্ মাস ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ, (১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ)।

(১৮) حسینعلی منصور

(১৯) کانون مترقی

(২০) بهمن — বাহ্মান ঃ ২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ)।

(২১) محمد بخارائی

(২২) سید علی اندرز گور

(২৩) امیر عباس هویدا — যতদূর জানা যায়, তিনি বাহাই ধর্মাবলম্বী ছিলেন।— অনুবাদক

(২৪) ১৯৬৪-১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ।

(২৫) فرح — শাহের স্ত্রী ফারাহ্ দীবা।

(২৬) মোতাবেক ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ।

(২৭) رضا شمس آبادی

(২৮) نایب السلطنة —পুং- نایبة السلطنة—রাজা বা বাদশাহ্‌র দেশে অনুপস্থিতিকালে অথবা কোন কারণে রাজা বা বাদশাহ্ শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষম হলে, যেমন ঃ বয়োপ্রাপ্ত না হওয়ায়, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।— অনুবাদক

(২৯) অর্থাৎ নাবালক যুবরাজের পক্ষে তাঁকে দেশশাসনের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। — অনুবাদক

(৩০) মোতাবেক ১২ই মার্চ, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ।

(৩১) স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৩২০ ফার্সী সালের ২৫শে শাহ্রীভার মোতাবেক ১৯৪১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রেযা খান সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেযা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সে হিসেবে সম্ভবতঃ ১৩৪৫ ফার্সী সালের ২৫শে শাহ্রীভার মোতাবেক ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। — অনুবাদক

(৩২) মোতাবেক ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে।

(৩৩) মোতাবেক ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে।

(৩৪) মোতাবেক ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে।

(৩৫) তথ্যসূত্র ঃ ১৩৫৫ ফার্সী সালের ওর্দিবেহেশ্‌ত্ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) তৎকালীন ইরান সরকারের

www.pathagar.com

পরিকল্পনা ও বাজেট সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক ডিরেক্টরেটের "অভ্যন্তরীণ — প্রকাশযোগ্য নয়" লিখিত "জনসংখ্যা ও পেশাগত অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন" (گزارش وضع جمعیت و اشتغال) – পৃঃ ১৫।

(৩৬) পুরো নাম حزب رستاخیز ملت ایران — হেযবে রাস্তাখীযে মেল্লাতে ইরানী (ইরানী জাতির পুনর্জাগরণ দল)।

(৩৭) حزب ایران نوین নব্য /আধুনিক ইরান দল।

(৩৮) অর্থাৎ ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে।

(৩৯) অর্থাৎ তথাকথিত শ্বেতবিপ্লব।

(৪০) অর্থাৎ ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে।

(৪১) جمشید آموزگار

(৪২) لیبرال سازنده — গঠনকারী লিবারেল।

(৪৩) ترقی خواه — প্রগতিশীল।

(৪৪) ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ বিপ্লব বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে।

(৪৫) گارد دانشگاه —University Guards.

(৪৬) ایت الله سید محمود طالقانی —ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁকে তেহরানের প্রথম জুম্‌আ ইমাম নিয়োগ করেছিলেন।

(৪৭) ایت الله سعیدی

(৪৮) ایت الله غفاری

(৪৯) ১৯৭১ — ১৯৭৬ খৃস্টাব্দ।

(৫০) طاغوت — আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ও আনুগত্য বা পূজা-উপাসনা দাবী করে। সে হিসেবে রাজা-বাদশাহ্‌রাও তাগূত। —অনুবাদক

(৫১) کوروش — সাইরাস ঃ ইসলামপূর্ব ইরানের অন্যতম খ্যাতনামা সম্রাট।

(৫২) داریوش — ইসলামপূর্ব ইরানের অন্যতম খ্যাতনামা সম্রাট।

(৫৩) ১৯৭৫ খৃস্টাব্দ।

(৫৪) هجری شمسی — হিজরী সৌরবর্ষ। হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) হিজরতের বছর অর্থাৎ ৬২২ খৃস্টাব্দকে ১ ফার্সী সাল ধরে এ পঞ্জিকায় সৌরবর্ষ গণনা করা হয় অর্থাৎ খৃস্টাব্দ থেকে ৬২১ বিয়োগ করলেই ফার্সী সালের সংখ্যা পাওয়া যায়। —অনুবাদক।

(৫৫) کاخ جوانان

(৫৬) نهضت آزادی ایران — ইরান মুক্তি আন্দোলন।

(৫৭) ১৯৬০ খৃস্টাব্দ।

(৫৮) مهدی بازرگان — মেহেদী বাযারগান। ১৯৭৯ সালে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) কর্তৃক ইসলামী ইরানের প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন।

(৫৯) دکتر سحابی

(৬০) جبهه ملی — National Front জাতীয় ফ্রন্ট।

(৬১) ایت الله مهدوی کنی — তিনি কিছু সময়ের জন্য ইসলামী ইরানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

(৬২) خرداد — খোরদাদ মাস ঃ ২২শে মে থেকে ২১শে জুন, (১৯৭৫ খৃস্টাব্দ)। এ বিক্ষোভ ঠিক ১৫ই খোরদাদ, ১৩৫৬ ফার্সী তারিখে হয়েছিল, কি তার পূর্বে বা পরে তা মূল গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। —অনুবাদক

(৬৩) هیأتهای مؤتلفه اسلامی

www.pathagar.com

(৬৪) مرتضى نيك نژاد

(৬৫) رضا صفار هرندى

(৬৬) حاج صادق امانى

(৬৭) حاج مهدى عراقى — তিনি ছিলেন হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) একনিষ্ঠ অনুসারী বিপ্লবী ব্যক্তিত্ববর্গের অন্যতম। তিনি ইসলামী বিপ্লবকে বিজয়ে উপনীত করার লক্ষ্যে ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা চালান এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের এক বছর পর ১৩৫৮ ফার্সী সালে (মোতাবেক ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে) তিনি ও তাঁর পুত্র হোসাম এরাকী (حسام عراقى) (ফোরকান্) (فرقان) নামক বিপ্লব বিরোধী গেরিলা গ্রুপের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

(৬৮) حزب ملل اسلامى — 'ইসলামী জাতিসমূহের দল'।

(৬৯) মোতাবেক ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ।

(৭০) شميران — শেমীরন্ তেহরান প্রদেশের অন্যতম জিলা, বর্তমানে বৃহত্তর তেহরানের অন্তর্ভুক্ত (তেহরানের উত্তরাংশ)। এর উত্তরে রয়েছে আলবোর্য পর্বতমালা।

(৭১) سازمان مجاهدين خلق People's Fighters 'Organization. —'গণযোদ্ধা সংস্থা'।

(৭২) ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে।

(৭৩) ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে।

(৭৪) ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে।

(৭৫) ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে।

(৭৬) اسلام التقاطى

(৭৭) ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ।

(৭৮) فدائيان خلق —People's Guerillas —"জনগণের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ"।

(৭৯) ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দ। শীতকাল —২২শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে মার্চ।

(৮০) سياهكل

(৮১) فروردين (ফারভারদীন) — ২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল (১৯৭১ খৃষ্টাব্দ)।

(৮২) خانه تيمى — এ থেকে মনে হয়, এরা খুবই ছোট ছোট দলে (টীমে) বিভক্ত হয়ে এক একটি বাড়ীতে অবস্থান করত। —অনুবাদক

(৮৩) এ গ্রুপগুলো হচ্ছে ঃ উম্মাতে ওয়াহেদে (امت واحد — এক উম্মাৎ), তাওহীদীয়ে বাদ্‌র্ (توحيدى بدر — বদরের তওহীদী),, তাওহীদী ছাফ্ (توحيدى صف - তওহীদী কাতার, ফালাহ্ (فلاح — সাফল্য/বিজয়),, ফালাক্ (فلق —প্রভাত), মান্‌ছুরুন (منصورون — বিজয়ীগণ), এবং মোওয়াহ্‌হেদীন (موحدين — তওহীদবাদিগণ।

(৮৪) سپاه دانش —বা জ্ঞানী বাহিনী।

(৮৫) ولايت فقيه —মুজতাহিদের শাসন।

(৮৬) مرتضى مطهرى — তিনি ইমামের ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর গ্রন্থাবলী সর্বাধিক পঠিত। — অনুবাদক

(৮৭) بت الله قدوسى

(৮৮) محمد حسين بهشتى — তিনি পরে ইসলামী ইরানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন।

(৮৯) دكتر على شريعتى

(৯০) حسينيه ارشاد

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আন্দোলন বিপ্লবে রূপান্তরিত

১৩৫৬ ফার্সী সালে (মোতাবেক ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে) ও তার পরে ইরানের পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৩৪২ ফার্সী সালে (মোতাবেক ১৯৬২ খৃস্টাব্দে) হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) শাহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তা এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এভাবে আন্দোলন বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্‌মান (মোতাবেক ১৯৭৯ খৃস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) বিপ্লব বিজয়ী হয়।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পূর্ববর্তী দু' বছরের তথা শাহী শাসনামলের শেষ দু' বছরের ঘটনাবলী, বিশেষ করে বিস্তারিতভাবে ১৩৫৬ ফার্সী সালের (১৯৭৭ খৃস্টাব্দের) ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

১৩৫৬ ফার্সী সালে ইরানের সাধারণ অবস্থা

শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্‌লভীর তাগূতী সরকার ও ইরানী জনগণের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এ ব্যবধান ১৩৫৬ ফার্সী সালে সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। ইসলাম, আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র ও নৈতিকতার সাথে শাহী সরকারের বিরোধিতা এতই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনি। সর্বত্র শাহ্ এবং শাহানশাহী ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। শত শত আলেম ও দ্বীনদার

শাহের আমলে তেহরানের দরিদ্র এলাকায় অসংখ্য মানুষ এরূপ পরিত্যক্ত টিনের কৌটা দ্বারা তৈরী ডেরায় মাথা গোঁজার চেষ্টা করত

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অনেক বক্তা এবং অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মোতাহ্হারীসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতই কোন মজলিসে বা সভায় কথা বলার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন না। সর্বত্র অনাচার-অনৈতিকতায় ছেয়ে যায়। সকলেই অনুভব করতে থাকে যে, ইরানী সমাজে মন ও আত্মার জন্য ক্রমেই পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইরানের অবস্থা এমন একজন রোগীর ন্যায় হয়ে দাঁড়ায় কোন ওষুধেই যার রোগ সারছিল না। বিশেষ করে ১৩৫০ ফার্সী সাল (১৯৭১ খৃস্টাব্দ) থেকে হঠাৎ করেই তেল রফতানী থেকে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আসতে থাকে।[১] আর পশ্চিমা তাঁবেদার দালাল চরিত্রের পুঁজিপতিরা অল্প সময়ের মধ্যে শাহের তাগুতী সরকারের এমনই শক্তি বৃদ্ধি করেছিল যে, শাহী সরকার তাদের প্রত্যাশাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। অন্যদিকে বঞ্চিত, দুর্বল করে রাখা মানুষগুলো, শ্রমিক সমাজ ও গ্রাম্য জনগণ তথা সবাই ছিল শোষিত বঞ্চিত। তারা বেঁচে থাকার তাগিদে প্লাবনের ন্যায় শহরে এসে ভিড় করতে থাকে এবং লটারীর টিকিট বিক্রির ন্যায় ভুয়া পেশাসমূহ অবলম্বন করতে থাকে বা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে থাকে।[২] ইরানের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ গ্রামে যেখানে সাধারণ গোসলখানাও[৩] ছিল না, তারই পাশাপাশি মার্কিন পুঁজিপতিরা রিজার্ভ করা বিমান নিয়ে দলে দলে ইরানে আসতে থাকেন এবং ইরানকে ব্যাপকভাবে শোষণের লক্ষ্যে মোটা অংকের পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশী পুঁজিপতিদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে থাকেন।

শাহী সরকার গুপ্ত পুলিশ সংস্থা সাভাক্ এবং সকল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে সশস্ত্র গ্রুপসমূহের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে সক্ষম হয়। কারাগারসমূহ সংগ্রামী কারাবন্দীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। ফলতঃ সারা ইরানে বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকেই আর সশস্ত্র সংগ্রাম পরিলক্ষিত হচ্ছিল না।

উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ

আমেরিকায় ১৯৭৬-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী জেরাল্ড ফোর্ডকে হারিয়ে দিয়ে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ডেমোক্র্যাটরা এটা ভালভাবেই জানত যে, বিশ্বের সাধারণ গণমানুষ আমেরিকাকে এবং দেশে দেশে আমেরিকার সেবাদাস সরকারগুলোকে ঘৃণা করে। তাই এই গণরোষ হ্রাস করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে সাধারণ গণমানুষের মার্কিনবিরোধী ঘৃণা ও আক্রোশকে কাজে লাগিয়ে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করতে না পারে সে লক্ষ্যে ডেমোক্রাটরা তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন তাঁবেদার সরকার কর্তৃক শাসিত দেশসমূহের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই প্রায়-বিস্ফোরণোন্মুখ এসব দেশে গণতন্ত্র ও মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের কথা বলে এক ধরনের নিশ্চিন্ততা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এ কারণেই কার্টার সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণের শ্লোগান তোলে এবং জনগণের ওপর নির্যাতন ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা চাপিয়ে দিয়ে যেসব মার্কিন সেবাদাস ডিক্টেটর দেশ শাসন করছিল তাদেরকে ভিন্নতর নাটকের অভিনয় করার এবং সহিংসতা কিঞ্চিৎ হ্রাস করার নির্দেশ দেয়।

ইরানের শাহ্ও আমেরিকানদের নির্দেশিত তথাকথিত "মুক্ত পরিবেশ" নীতির অনুসরণ করেন যাতে তাঁর প্রতি ইরানী জনগণের ঘৃণা ও রোষের তীব্রতা হ্রাস করা যায়, তাঁর হুকুমতের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং আমেরিকানদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ নীতি বাস্তবায়নের ফলে কারাবন্দীদের অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং নির্যাতনের মাত্রা হ্রাস পায়। কারাগারের বাইরেও ধীরে ধীরে সংবাদপত্রসমূহকে কতক ব্যাপারে মৃদু সমালোচনার অনুমতি দেয়া হয়। সরকার ভান করতে থাকে যে, সমালোচনার মোকাবিলায় তার

www.pathagar.com

সহনশীলতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমীর আব্বাস হোভায়দাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হল; এভাবে ইরানে মার্কিন নীতির পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। হোভায়দা ১৩৫৬ ফার্সী সালে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তেফা দেন। তাঁর পরিবর্তে জাম্‌শিদ অমুযেগার প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় হোভায়দাকে শাহী দরবার বিষয়ক মন্ত্রী করা হল। অমুযেগার ধীরে ধীরে অতীতের সমালোচনা শুরু করলেন। বলাবাহুল্য যে, এর উদ্দেশ্য ছিল ইরানী জনগণকে তথাকথিত উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে মশগুল করে রাখা। যেহেতু ইতিপূর্বেই সশস্ত্র আন্দোলনসমূহকে দমন করা হয়েছিল সেহেতু ইরানের তাগূতী শাহী সরকার ও তার প্রভু আমেরিকা এই গণপ্রতারণামূলক পদক্ষেপে সফল হবে— এর খুবই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ সময় হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) নাজাফে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিলেন। ইরান ও ইরাক এ দু' সরকারের পক্ষ থেকেই তাঁর ওপর নজর রাখা হত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সাথে শাহ্ মোহাম্মদ রেযা পাহ্লভী

মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাত

১৩৫৬ ফার্সী সালের অবান মাসে[৪] হঠাৎ করে খবর এল যে, হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজী আগা মোস্তফা খোমেনী নাজাফে রহস্যজনকভাবে ইন্তেকাল করেছেন। ঐ সময় মোস্তফা খোমেনীর বয়স ছিল ৪৭ বছর। তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ, উঁচুদরের পণ্ডিত, একই সাথে মুত্তাকী-পরহেযগার ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই তিনি তাঁর পিতার পাশে ছিলেন। ইরান ও নাজাফের ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকদের সকলেই তাঁর আধ্যাত্মিক, ইল্‌মী ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছিলেন। বিভিন্ন নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাহ্ আমেরিকা নির্দেশিত তথাকথিত 'মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ'-নীতি কার্যকর করার পাশাপাশি হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইমামকে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক থেকে বঞ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে হযরত ইমামের পুত্রের পক্ষ থেকে শাহী সরকারের জন্য যে সম্ভাব্য বিপদ দেখা দিতে পারত তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। কিন্তু কার্যতঃ এ ঘটনাই ইরানে ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়। কারণ এদিন থেকেই শাহী সরকারের আয়ু দ্রুতহ্রাস পেতে থাকে।

www.pathagar.com

শহীদ মোস্তফা খোমেনীর সাথে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)

মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতের খবর ইরানে এসে পৌঁছলে ইরানী জনগণ একই সাথে ক্ষুব্ধ ও শোকাহত হল। জনসাধারণ বিভিন্নভাবে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতি সমবেদনা এবং শাহী সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করতে লাগল। এভাবে তারা তাদের নেতার প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিল। ইরানের অনেক শহরেই ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার মুসলিম জনগণ শহীদ মোস্তফা খোমেনীর জন্য দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করেন। শাহী সরকার সব সময়ই হযরত ইমামের নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। এ কারণেই ইতিপূর্বে উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নামে এত ঢাকঢোল পিটানো সত্ত্বেও ইরানের সাধারণ জনগণ যখন তাদের মারজায়ে তাক্লীদের পুত্র একজন মুজতাহিদ আলেমের শাহাদাতে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করার উদ্যোগ নিল, তখন সরকার তাতে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এ কারণে সহসাই মসজিদ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং দেশের বাইরে শত শত শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এসব অনুষ্ঠানের ফলে ইরানী জনগণের দৃষ্টি হযরত ইমাম খোমেনী ও নাজাফের দিকে আকৃষ্ট হল। ফলে সমগ্র ইরানী জনগণের নিকট তিনি শাহ্ বিরোধিতার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হতে লাগলেন।

মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতের তৃতীয় দিবস, সপ্তম দিবস ও চল্লিশতম দিবসে সর্বত্র দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসব মাহফিলে বক্তাগণ হযরত ইমামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শাহী সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এর ফলে সরকার বেকায়দায় পড়ে যায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও ক্যাসেটের মাধ্যমে নাজাফ ও ইরানের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

ইমাম খোমেনী সব সময়ই ইরানের পরিস্থিতি সম্বন্ধে খবরাখবর পেতেন। তিনি মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতের চল্লিশতম দিন উপলক্ষে ফার্সী ১৩৫৬ সালের ১০ই দেই (মোতাবেক ৩১শে ডিসেম্বর,

www.pathagar.com

১৯৭৭) নাজাফে তাঁর নিকট সমবেত লোকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতকে আল্লাহ্ তাআলার প্রচ্ছন্ন দয়া ও অনুগ্রহের অন্যতম বলে অভিহিত করেন এবং ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসাছাত্র-সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি সংগ্রাম ও ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইরানে সংগ্রামের জন্য একটি উপযুক্ত সময় এসেছে। হযরত ইমাম তাঁর এ ভাষণে বলেন ঃ

"... আপনাদের উভয়ই[৫] পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করে দিন এবং পরস্পরের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। আজ একটি নিষ্ক্রমণ-পথ সৃষ্টি হয়েছে, এ পথ সৃষ্টি না হলে আজকে ইরানে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। অতএব, এটা একটা নিষ্ক্রমণ-পথ,... তাই এটাকে একটা সৌভাগ্যের আকর মনে করুন, এটা একটা বিরাট সুযোগ। অতএব, মহোদয়গণ যেন এ সুযোগকে সৌভাগ্যের আকর মনে করেন; আপনারা লিখুন, আপনারা প্রতিবাদ জানান... আজকে হচ্ছে এমন একটি দিন যেদিন মুখ খুলতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।... এ সুযোগকে হাতছাড়া হতে দেবেন না। আমি ভয় করছি, খোদা না করুন, এ সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় এবং সে (শাহ্) ওদের (আমেরিকানদের) সাথে গুছিয়ে নিতে পারে... এরা (সরকার) এখন পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যস্ত, তারা তাদের গোলামীকে ... পুরোপুরি পাকাপোক্ত করার জন্য ব্যস্ত। ওরা (আমেরিকানরা) মেনে নেবে না... খোদা না করুন, ওদের কাজ যদি সমাপ্ত হয়... তা হলে তারা ইসলামের ওপর এক বিরাট আঘাত হানতে সক্ষম হবে।[৬]

আহ্মদ রাশীদী মোৎলাকের[৭] প্রবন্ধ

হাজী আগা মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতের পর ইরানে তার যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তা থেকে শাহী সরকার বুঝতে পেরেছিল যে একমাত্র হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ব্যক্তিত্বই শাহী সরকারের 'উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ' নাটকের স্বরূপ উন্মোচন করে দিতে সক্ষম। সরকার জানত যে, ইমাম খোমেনী প্রচলিত রাজনৈতিক খেলায় অভ্যস্ত নন। আপোষ তাঁর অভিধানে নেই। তাই ইরানে ইমামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সরকার ইমামের সম্মানের ওপর আঘাত হানার এবং তাঁর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সর্বশেষ চেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। এরই ভিত্তিতে ১৩৫৬ ফার্সী সালের ১৬ই দেই (৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৮) দৈনিক এত্তেলাআতে আহ্মদ রাশীদী মোৎলাক ছদ্মনামে লেখা কোন এক লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে ইমামের সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানা হয় ও ইমামের অবমাননা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ এ প্রবন্ধ যেন বারুদের গুদামে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করল এবং বিপ্লবের বারুদগুদামে বিস্ফোরণের সৃষ্টি করল। এ ঘটনা সারা ইরানে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিল এবং ধাপে ধাপে সে আগুন বেড়ে চলল ও ক্রমবিস্তার লাভ করতে লাগল। অবশেষে ১৪ মাস পরে ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্মান (মোতাবেক ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯) শাহী শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটল।

১৯শে দেই-এর কোমের অভ্যুত্থান

আহমদ রাশীদী মোৎলাকের প্রবন্ধ সাধারণভাবে ইরানী জনগণকে, বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসাছাত্রদের, আরো বিশেষভাবে কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-শিক্ষকদের খুবই মর্মাহত করে

www.pathagar.com

এবং তাঁদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর দু' মাস আগে হাজ্ আগা মোস্তফা খোমেনীর শাহাদাতের ফলে কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররা যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেন তা ইমামের প্রতি তাঁদের মহব্বতকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং হযরত ইমাম তাঁদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরদিনই তাঁরা তাঁদের ক্লাসসমূহ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং মিছিল সহকারে কোমের মার্জাগণের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যান। হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) সমর্থনে এবং শাহের বিরুদ্ধে ও উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতিবাদে এভাবে ১৭ই দেই (৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৮) থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয় এবং ১৯শে দেই (৯ই জানুয়ারী) পর্যন্ত তা অনবরত চলতে থাকে।

কোম নগরী বহু বছর যাবত শাহী সরকারের সৃষ্ট শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা ও চাপের মধ্যে ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাহের বিরোধিতা ও ইমামের সমর্থনে এভাবে হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্রের এবং সেই সাথে আরো হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় যা ছিল নজীরবিহীন। এমতাবস্থায় শাহী সরকার যদিও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রদর্শনী করে জনগণকে প্রতারিত করার পূর্বতন নীতি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন না, তথাপি কোমের এ বিরাট গণঅভ্যুত্থানকে সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ১৯শে দেই বিকালে শাহী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীসমূহ কোমের ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় এবং তাঁদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে ছাত্র-জনতার মধ্য থেকে বহুসংখ্যক শহীদ হন এবং আরো অনেকে আহত হন। এভাবে এ গণঅভ্যুত্থানকে দমন করা হয়। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইরানের বিভিন্ন শহরের জনগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীরা এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

তাব্রীযের গণঅভ্যুত্থান

১৯শে দেই-এর কোমের শহীদগণের চেহ্লাম উপলক্ষে ১৩৫৬ ফার্সী সালের ২৯শে দেই (মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮) সহসাই তাব্রীযে গণবিদ্রোহের উত্তাল প্লাবনের সৃষ্টি হয়। ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতে শহরের জনগণ সকাল থেকেই শোকানুষ্ঠান ও দোয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য শহরের একটি প্রধান মসজিদে গিয়ে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা সহিংস পন্থায় এ সমাবেশ বানচালের চেষ্টা করে। ফলে এ সমাবেশ থেকে সারা শহরে গণবিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ বিভিন্ন সরকারী অফিসে, রাস্তাখীয্ দলের স্থানীয় দফ্তরে এবং মদের দোকানসমূহের ওপর হামলা চালায়। তারা পুলিশের গাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করে। ফলে কার্যতঃ শহর সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শাহী সরকার জনগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার কথা কখনো কল্পনাও করেনি। তাই অনন্যোপায় হয়ে সেখানে অবস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সদস্যদের ব্যবহার করা ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীকেও বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করে। বস্তুতঃ তাব্রীযের জনগণ শাহী সরকারের ওপর যে আঘাত হানে তাতে সরকার দিশাহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকার সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দাবী করে যে, এ ঘটনার সাথে জড়িত লোকেরা সীমান্তের ওপার থেকে এসেছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাব্রীযের গণঅভ্যুত্থান ছিল এমন এক ঝড়ের দৃষ্টান্ত যা সমগ্র ইরানে বিস্তার লাভ করছিল।

www.pathagar.com

তাব্‌রীযের শহীদগণের চেহ্‌লাম

১৩৫৭ ফার্সী সালের ফার্‌ভার্‌দীন মাসে[৮] তাব্‌রীযের গণঅভ্যুত্থানের শহীদগণের শাহাদাতের চল্লিশতম দিবসে ইরানের অনেক শহরেই মসজিদে মসজিদে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে শাহী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ইয়ায্‌দের[৯] জনগণের বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের ওপর গুলী বর্ষণ করে। জাহ্‌রাম্[১০] ও কযেরুনেও[১১] একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। আর ইয়ায্‌দে, জাহ্‌রাম ও কযেরুনের শহীদগণের চেহ্‌লাম উপলক্ষে ১৯শে ওর্দীবেহেশ্‌ত তারিখে[১২] সারা ইরানে পুনরায় শোকানুষ্ঠান ও স্মরণসভা এবং বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রতিটি অনুষ্ঠান ও বিক্ষোভ সমাবেশে ইরানী জনগণ নতুন করে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) প্রতি তাদের বায়আৎ ঘোষণা করে এবং শাহ্‌ ও শাহীতন্ত্রের প্রতি স্বীয় ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করে।

১৩৫৭ ঃ ভাগ্য নির্ধারণের বছর

১৩৫৭ ফার্সী সাল এমন এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে শুরু হল যে, ১৩৫৬ ফার্সী সালের ১৯শে দেই তারিখে কোমে গণআক্রোশের বিসস্ফোরণের যে প্রলয়ঙ্করী আওয়াজ উত্থিত হয় তা তাব্‌রীয, ইয়ায্‌দ, জাহ্‌রাম, কযেরুন, কোম, তেহরান, ইস্‌ফাহান, শীরায, মাশ্‌হাদ, রাফ্‌সান্‌জান,[১৩] হামেদন্, নাজাফ আবাদ[১৪] এবং ইরানের অন্যান্য শহর থেকেও শাহ্‌ ও তাঁর মার্কিন প্রভুদের কানে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। অন্যদিকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরান থেকে অনেক দূরে থাকলেও দৈনন্দিন ইরানের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। ইরাকের নাজাফ থেকে একের পর এক হযরত ইমাম খোমেনীর বাণী, ঘোষণা ও সাক্ষাতকার ইরানে এসে পৌঁছতে লাগলো। আর প্রচারপত্র বা ক্যাসেট আকারে ইরানে এসে পৌঁছার সাথে সাথেই তা অসংখ্য কপি হয়ে সকলের হাতে পৌঁছে যেত। হযরত ইমাম খোমেনী তাঁর এসব বাণীতে শাহের পতন ঘটানোর জন্য ইরানী জনগণের প্রতি আহ্‌বান জানান এবং যেসব ষড়যন্ত্র বিপ্লবকে বিপথগামী করতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেন।

হযরত ইমামের এসব বাণীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেয়ার জন্য অতি সংক্ষেপে দুই-এক বাক্যে এসব বাণীর মূল কথা (পয়েন্ট) এখানে তুলে ধরছি ঃ

"যেসব হত্যাকাণ্ড ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে তার সবই শাহের নির্দেশে হচ্ছে।" (১৯-১০-১৩৫৬ ফার্সী/৯-১-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"সকল দুর্নীতি ও অনাচারের উৎস হচ্ছে শাহ্।" (১৯-১০-১৩৫৬ ফার্সী/৯-১-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"জনগণের ঐক্য ও সমঝোতা হচ্ছে উপনিবেশবাদের মূলোৎপাটনের হাতিয়ার।" (১৯-১০-১৩৫৬ ফার্সী/৯-১-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"শাহ্ সাল্‌তানাত থেকে অপসারিত।" (২-১১-১৩৫৬ ফার্সী/২২-১-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"চিন্তার ঐক্যের হেফাযত করুন এবং বিরোধ-বিসংবাদ থেকে বিরত থাকুন।" (২-১১-১৩৫৬ ফার্সী/২২-১-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরকারীরাই মানবাধিকারের প্রধান ধ্বংসকর্তা।" (২৯-১১-১৩৫৬ ফার্সী/১৮-২-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

"কোমের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র ইসলাম ও ইরানকে যিন্দা করেছে।" (২৯-১১-১৩৫৬ ফার্সী/১৮-২-১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)

www.pathagar.com

"বিজাতীয়রাই দ্বীন ও রাজনীতি পৃথকীকরণ তত্ত্বের প্রচারক।" (২৯-১১-১৩৫৬ ফার্সী/১৮-২-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"আমেরিকা ও ইসরাইলের এজেন্ট শাহ্ এ অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্যের) মানবদরদী!" (২৯-১১-১৩৫৬ ফার্সী/১৮-২-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"পাহ্লভী বংশের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত (ইরানী) জাতি সংগ্রাম থেকে বিরত হবে না।" (৮-১২-১৩৫৬ ফার্সী/২৭-২-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"ইসলাম ও কুরআনের শ্লোগান সহকারে (সংগ্রামী জনতার) কাতারসমূহকে ঘনসন্নিবদ্ধ করুন।" (৪-১-১৩৫৭ ফার্সী/২৪-৩-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটাই উপনিবেশবাদের বৃক্ষে অগ্নিসংযোগ করছে।" (৪-১-১৩৫৭ ফার্সী/২৪-৩-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"অনৈসলামী লোকদেরকে নিজেদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিন।" (৪-১-১৩৫৭ ফার্সী/২৪-৩-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"মুসলমানদের বড় বড় দুর্যোগ-বিপর্যয়ের উৎস হচ্ছে আমেরিকা।" (৪-১-১৩৫৭ ফার্সী/২৪-৩-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"আমরা এমন কি শাহের পতন ঘটনানোর জন্যও মার্কসবাদীদের সাথে সহযোগিতা করবো না। আমি আমার সমর্থক ও অনুসারীদের বলেছি তাঁরা যেন এ কাজ না করেন। আমরা তাদের চিন্তা-চেতনার বিরোধী। আমরা জানি যে, তারা (সুযোগ পেলে) আমাদের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করবে।" (১৬-২-১৩৫৭ ফার্সী/৬-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"এসব অপকর্মের দ্বারা জনগণের মধ্যে সংঘটিত বিস্ফোরণের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।" (২৩-২-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"কোন অস্ত্রই এ জাতির ঈমান ও অভ্যুত্থানের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।" (২৩-২-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"আপনারা আপনাদের অভ্যুত্থানকে সুসংগঠিত করুন।" (২৩-২-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনী নেতৃবৃন্দবিহীন গোষ্ঠীগুলোর এক কানাকড়ি মূল্য নেই।" (২৩-২-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী হুকুমত কায়েম না করা পর্যন্ত সংগ্রাম থেকে বিরত হব না।" (২৯-২-১৩৫৭ ফার্সী/১৯-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"১৫ই খোর্দাদ যে অপরাধ সংঘটিত হয় তা ব্যক্তিগতভাবে শাহের আদেশেই সংঘটিত হয়েছিল।" (১০-৩-১৩৫৭ ফার্সী/৩১-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশার উৎস হচ্ছে আমেরিকা।" (১০-৩-১৩৫৭ ফার্সী/৩১-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"১৫ই খোর্দাদকে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর শীর্ষে স্থান দেয়া উচিত এবং তা সকল চিন্তার উৎসরূপে গণ্য হওয়া উচিত।" (১০-৩-১৩৫৭ ফার্সী/৩১-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

www.pathagar.com

"আপনারা একবাক্যে শাহের পদত্যাগ দাবী করুন; এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ।" (১৩-৩-১৩৫৭ ফার্সী /৩১-৫-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"শাহ্ পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।" (২০-৩-১৩৫৭ ফার্সী/১০-৬-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"শাহ্ দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়াচ্ছে এবং কমিউনিস্ট ধারাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।" (২০-৩-১৩৫৭ ফার্সী/১০-৬-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"শান্তির (আপোষকামিতার) গান গাওয়া এখন নিন্দনীয়।" (২০-৩-১৩৫৭) ফার্সী/১০-৬-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"জনগণকে শাহ্বিরোধী অভ্যুত্থানের পথ থেকে বিচ্যুতকারী যেকোন শ্লোগানই শয়তানীমাত্র।" (১৩-৪-১৩৫৭ ফার্সী/৪-৭-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"জনগণের বিক্ষোভ শাহের প্রতি গোটা জাতির বিরোধিতাকেই প্রমাণ করছে।" (৫-৫-১৩৫৭ ফার্সী/২৭-৭-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"বর্তমান পরিস্থিতিতে নীরবতা অবলম্বন এবং নীরবতার নির্দেশ দান ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী।" (৫-৫-১৩৫৭ ফার্সী/২৭-৭-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"সশস্ত্র বাহিনী এবং পদস্থ ব্যক্তিদের সত্যের বাহিনীর কাতারে এসে দাঁড়ানো উচিত।" (২২-৫-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৮-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

"শাহ্বিরোধী শ্লোগানকে—যা একটি ইসলামী শ্লোগান—সমুন্নত রাখুন।" (২২-৫-১৩৫৭ ফার্সী/১৩-৮-১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)

১৩৫৭ ফার্সী সালের বসন্তকালে[১৫] শাহ্ পরস্পরবিরোধী দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হন। একদিকে তিনি মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে এবং কড়াকড়ি ও শাসরুদ্ধকর অবস্থা শিথিল করে, জনগণকে শান্ত করার চেষ্টা করেন; সেই সাথে সাভাকের প্রধান নাছিরীকে ও এ জাতীয় অন্যান্য গণবিরোধী লোকদের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে ইমামের নেতৃত্বাধীন ইরানী জনগণ এসব স্বাধীনতামূলক পদক্ষেপের কোনটিতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না, বরং তারা শুধু শাহের পতন দাবী করছিল। এ কারণেই শাহী সরকার একদিকে যেমন উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশকে অধিকতর উন্মুক্ত করতে চাচ্ছিল, একই সাথে জনগণকে গুলীর খোরাকে পরিণত করছিল। এ সময় শাহী সরকার যেসব জঘন্য অপরাধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রমযান মাসে আবাদানে দ্বারবদ্ধ রাক্স্ সিনেমা হলে অগ্নিসংযোগ। শাহী সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইসলামী জনতার ওপরে এ অগ্নিসংযোগের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সরকার এর মাধ্যমে বলতে চাচ্ছিল যে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে সিনেমায় গমনকারী লোকদের সাথে এ ধরনের নৃশংস আচরণ করা হবে। এ ঘৃণ্য লক্ষ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই শাহী সরকার এ সিনেমা হলে কয়েক শ' লোককে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু জনগণ এতখানি সচেতন ও সতর্ক ছিল যে, তাদেরকে বিভ্রান্ত করার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ বৈপ্লবিক তৎপরতা এত দ্রুত তুঙ্গে ওঠে যে, জামশিদ অমুযেগারের সরকার ১৩৫৭ ফার্সী সালের মোর্‌দাদ মাসে[১৬] প্রথমবারের মত ইস্‌ফাহানে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক শাসন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

১৩৫৭ ফার্সী সালের রমযান মাস

ইরানের মুসলিম জনগণের জন্য অধিকতর সুসংগঠিতভাবে মসজিদে উপস্থিতি এবং ব্যাপকভাবে ও প্রচণ্ডতররূপে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ১৩৫৭ ফার্সী সালের রমযান মাস একটা বিরাট সুযোগ হিসেবে সমুপস্থিত হয়। হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মীয় বক্তা ও ওয়ায়েযগণ বক্তৃতামঞ্চে উঠে জনসাধারণকে শাহের ষড়যন্ত্র ও অপরাধসমূহ সম্পর্কে সচেতন করতে এবং ইরানী জাতির একমাত্র দাবী ও জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে পাহ্‌লভী হুকুমতের পতন ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে লাগলেন। অধিকাংশ শহরেই জনসাধারণ যোহর ও আছরের নামাজের পর এবং মাগরেব ও এশার নামাজের পর ওলামায়ে কেরাম ও ওয়ায়েযদের বক্তব্য শোনার পর রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে এবং 'শাহ্ নিপাত যাক' শ্লোগান দিতে থাকে। ফলে শাহী সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সাথে সংঘর্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশ কিছুসংখ্যক লোক বিশেষতঃ যুবক শাহাদাতবরণ করেন। আর প্রতিটি শাহাদাতই বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে আরো উজ্জ্বলতর করতে থাকে এবং জনগণের মধ্যে বিপ্লবী পথচলা অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করতে থাকে। ১৩৫৭ ফার্সী সালের রমযান মাসে (ফার্সী পঞ্জিকার তীর্ ও মোর্‌দাদ মাসে) বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, শাহ্ ও তাঁর মার্কিন প্রভুরা নিরুপায় হয়ে জামশিদ আমুযেগারকে অপসারণ করেন এবং শরীফ ইমামীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। দেশের মুসলিম জনসাধারণকে বোকা বানানোর জন্যে তাঁরা শরীফ ইমামীকে যে নীতি নির্ধারণ করে দিলেন তা হচ্ছে তিনি যেন দ্বীনদার হওয়ার ভান করেন, শাহানশাহী পঞ্জিকাকে বাতিল করে দিয়ে হিজরী শাম্‌সী পঞ্জিকা পুনঃপ্রবর্তন করেন, জুয়ার আড্ডাসমূহ বন্ধ করে দেন, ইসলামী শ্লোগান প্রবর্তন করেন, সাভাকের অতীতের আচরণের নিন্দা করেন, শাহী দরবারের তাবেদার কতক ঘৃণিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুঁজিপতিকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং সবশেষে জাতীয় আপোষ ও স্বাধীনতার বুলি আওড়ান, তাহলে হয়ত রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত সর্বগ্রাসী বিপ্লবী প্লাবনের গতিপথকে অন্যান্য লক্ষ্যপানে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

শরীফ ইমামীর অনুসৃত নীতি থেকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাহী সরকার ইরানী জাতিকে অনেক সুবিধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর সতর্কতার কারণে এ প্রতারণা বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথেই শরীফ ইমামীর ধোঁকা-প্রতারণার মোকাবিলায় আপোষহীনভাবে স্বীয় সুস্পষ্ট নীতি অবস্থান ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ঃ

"ইতিহাসের এ ক্রান্তিকালে শাহ্ তার বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এক বিপজ্জনক ষড়যে লিপ্ত হয়েছে---। এখন যে মুহূর্তে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, জাগ্রত ও প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী এ জাতির মোকাবিলায় কামান, ট্যাঙ্ক, সন্ত্রাস ও হুমকি কোন কাজেই আসেনি, তখন সে এক শয়তানী প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে এবং অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সে স্বীয় অপরাধসমূহ ও বিশ্বাসঘাতকতা অব্যাহত রাখতে চায়।... এ সরকারকে এবং তার সকল সেবাদাসকে—যারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে প্রধান অপরাধীর খেদমত করেছে ও এজন্য তারা গর্বিত—তাদেরকে ইরানী জাতি ঘৃণা করে এবং তাদেরকে কোন পদেরই উপযুক্ত গণ্য করে না। রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ, জোটসমূহ ও আমাদের আন্দোলন আপোষ করতে চায় না। কারণ আপোষের পরিণাম হচ্ছে জাতিকে বন্দিত্বের কবলে নিক্ষেপ করা এবং দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া; আর রাজনীতিক লোকেরা কখনোই এ ধরনের

www.pathagar.com

লজ্জাকর পরিণতিকে মেনে নেবেন না। ... আপনাদের জন্যে অন্যতম জরুরী কাজ হচ্ছে এই যে, আপনাদের পবিত্র ইসলামী আন্দোলনকে জালেম ও শক্তিমদমত্ত এ সরকারের বিলুপ্তি ঘটানো পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন এবং বেআইনী সরকারের কোন অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃষ্টি দেবেন না।[১৭]

এভাবেই শরীফ ইমামীর চক্রান্ত শুরুতেই বানচাল হয়ে যায়। তেমনি মজলিস সদস্যরা তাঁর প্রতি আস্থা ভোট প্রদানকালে তিনি (পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর) সরকারের কঠোর সমালোচনার যে কৃত্রিম প্রদর্শনী করলেন তাতে কোন ফল হল না। ঈদুল ফিতরের দিন ইরানের অনেক শহরেই জনসাধারণ ঈদের নামাজ আদায় করার পর সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তবে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তেহরানে; এখানে কমপক্ষে দশ লাখ লোক সকাল থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর পূর্ব পর্যন্ত এত বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে 'এক চিন্তা–একমন–এক কথা' হয়ে শাহের সুস্পষ্ট বিরোধিতা ছিল এক নজীরবিহীন ঘটনা। ফলে সরকার মারাত্মকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঈদুল ফিতরের তিনদিন পর অর্থাৎ ১৬ই শাহ্‌রীভার (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮) তারিখেও একই ধরনের ব্যাপক গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

এসব বিক্ষোভের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে মুসলিম মহিলাগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ইসলামী পোশাক পরিধান করে গগনবিদারী শ্লোগান তুলে এ বিক্ষোভসমূহে এক বিরাট শক্তি ও বিশেষ তাৎপর্য যোগ করেন। মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছিল যে, শাহের সরকার নারীদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং দ্বীন ও আলেম সমাজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। এসব বিক্ষোভে জনসাধারণ যেসব শ্লোগান দিচ্ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল "স্বাধীনতা, মুক্তি, ইসলামী হুকুমত"[১৮] এবং "আল্লাহু আকবর, খোমেনী নেতা"[১৯] বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতা সৈন্যদের ট্রাকের প্রতি ফুল নিক্ষেপ করে এবং শ্লোগান দেয় ঃ "সৈনিক ভাই, কেন ভাইকে হত্যা করছ?"[২০] সরকার সৈন্যদের জনগণকে দমনের কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। তাই জনতার এ শ্লোগান সরকারকে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে।

১৭ই শাহ্‌রীভার ঃ কালো শুক্রবার

১৬ই শাহ্‌রীভার বৃহস্পতিবার বিক্ষোভকারী জনতা ঘোষণা করে যে, পরদিন ১৭ই শাহ্‌রীভার (৮ সেপ্টেম্বর) শুক্রবার সকালে শুহাদা স্কোয়ারে[২১] হাজির হবে এবং সেখান থেকে মিছিল শুরু হবে। শুক্রবার সকালে রেডিও থেকে বার বার খবর প্রচারিত হয় যে, সরকার তেহরানে এবং দেশের আরো ১১টি শহরে[২২] সামরিক শাসন জারী করেছে। রেডিও থেকে সরকারের ঘোষণা প্রচার করা হয়। কঠোর ভাষা সম্বলিত এ ঘোষণায় জনসাধারণকে রাস্তায় জমায়েত হতে নিষেধ করা হয় এবং যার যার ঘরে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তেহরানের জনসাধারণ সেদিন সরকারের হুমকিতে কর্ণপাত না করে শাহী জল্লাদ বাহিনীর গুলীর সামনে রুখে দাঁড়ায় এবং "আল্লাহু আকবর, খোমেনী নেতা" ও "শাহ্ নিপাত যাক"[২৩] শ্লোগান দিতে থাকে। কিন্তু শাহের সেবাদাসরা দ্বীনদার মুসলিম বীর নারী-পুরুষদের ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। ঐদিন তেহরানে কত হাজার লোক শহীদ হন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দক্ষিণ তেহরানের মহল্লায় মহল্লায় শাহী সরকারের সৈন্যবাহী ট্রাক টহল দিয়ে বেড়ায় এবং অনবরত গুলীবর্ষণের শব্দ শোনা যেতে থাকে। এম্বুলেন্সসমূহ

www.pathagar.com

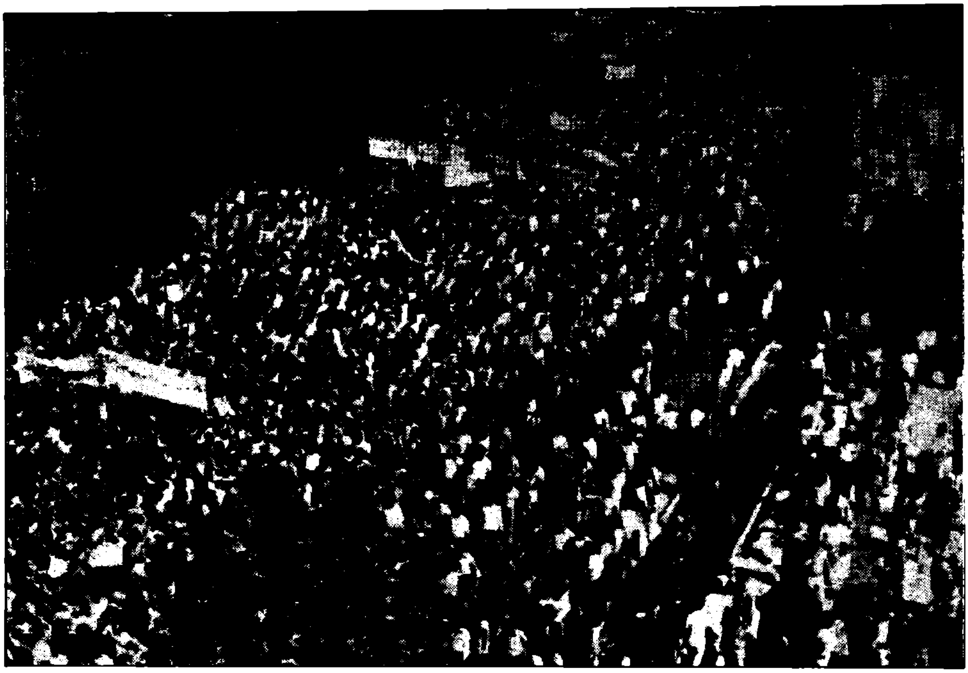

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ (কালো শুক্রবার) শাহ্ বিরোধী গণবিক্ষোভ

বিরামহীনভাবে আসা-যাওয়া করতে থাকে। হাসপাতালগুলো শহীদদের লাশ আর আহতদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। শহীদগণের লাশের মধ্যে অসংখ্য নারী ও তরুণীর লাশ দেখা যায় এবং তাদের কালো রঙের চাদরসমূহ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

শাহী সরকার প্রথমে যদিও শরীফ ইমামীর মাধ্যমে গণপ্রতারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তথাপি সর্বগ্রাসী ঝড় ও প্লাবনের ন্যায় ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে শেষপর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় ১৩৪২ ফার্সী সালের ১৫ই খোর্দাদ (৫ই জুন, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ)-এর গণহত্যার ন্যায় হত্যাকান্ডের আশ্রয় নিয়ে গণআন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এবার গণহত্যা সত্ত্বেও জনগণ সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ থেকে বিরত থাকল না। বস্তুতঃ ১৩৪২ ফার্সী সালের ১৫ই খোর্দাদ থেকে শুরু করে ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৭ই শাহ্রীভার পর্যন্ত দীর্ঘ পনর বছরে ইরানী জনগণ ইসলাম ও ইমামের সাথে আরো বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তেমনি শাহী সরকারের ইসলামবিরোধী ও মার্কিনপন্থী চরিত্র সম্পর্কেও আরো বেশী অবগত হয়েছিল।

পরদিন ১৮ই শাহ্রীভার (৯ই সেপ্টেম্বর) জনসাধারণ তাদের প্রিয়জনদের শহীদগণের রক্তমাখা লাশ কাঁধে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত রাখে। যদিও সরকার জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তথাপি জনগণ সৈন্যদের সম্বোধন করে শ্লোগান দিতে থাকে ঃ "আমরা তোমাদের ফুল দিলাম, তোমরা আমাদের গুলী দিলে!"[২৪]

www.pathagar.com

বস্তুতঃ ১৭ই শাহ্‌রীভার গণআন্দোলনের মৃত্যু দিবস ছিল না, বরং কার্যতঃ এদিন ছিল শাহের লাঞ্ছনার দিবস, শাহের মৃত্যুর দিবস। কারণ, ১৭ই শাহ্‌রীভারের গণহত্যার ফলে শরীফ ইমামী সরকারের প্রকৃত চেহারা বেরিয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দেয়া স্বাধীনতা ও ইসলামপ্রীতির অভিনয় তার জন্য কোন ফায়দাই বয়ে আনেনি। কারণ বিপ্লব এমনই দ্রুততর গতিতে বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছিল যে, সরকার নিরুপায় হয়ে যেসব স্বাধীনতা প্রদান করছিল তার দ্বারা এ বিপ্লবের গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। প্রতিদিনই জনগণ তাদের দাবীনামায় নতুন নতুন দাবী যোগ করছিল এবং সর্বোপরি শাহের পতন কামনা করছিল। সরকার স্বাধীনতা প্রদানের গালভরা দাবী করা সত্ত্বেও জনগণের ওপর গুলীবর্ষণ করছিল এবং এভাবে তার নিজের দাবীকে নিজেই মিথ্যা প্রমাণ করছিল। বস্তুতঃ ১৭ই শাহ্‌রীভার ইরানী জনগণের ঈমান ও ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশের দিনে, বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের দিনে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবের দিনে পরিণত হয়। এ দিনটি ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিবসে পরিণত হয়।

১৯৭৮-এর কালো শুক্রবারে জনতার বিরুদ্ধে শাহী সরকারের সৈন্যদের অ্যাকশনের দু'টি দৃশ্য

টীকা ঃ

(১) সত্তরের দশকের শুরুর দিকে তেল উৎপাদনকারী কোন কোন দেশের পক্ষ থেকে তেলকে পশ্চিমা শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। তেল রফতানীকারক দেশগুলো এ ধারণা গ্রহণ করে রফতানী সীমিতকরণের মাধ্যমে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে এক লাফে তেল রফতানী কারক দেশসমূহের বার্ষিক রফতানী আয় কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এ কারণে ইরানেরও আয় বৃদ্ধি পায় যদিও এ আয় ইরানী জনগণের পরিবর্তে শাহ্ ও তাঁর তাঁবেদারদের পকেটে যেতে থাকে। —অনুবাদক

(২) গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে এবং ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর তা প্রায় প্লাবনের আকার ধারণ করে। ফলে এ প্রবণতা বিপ্লবের জন্য এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে।

(৩) ইরানে বেশীর ভাগ এলাকাই আধা-মরুময় বা পার্বত্য বিধায় পানি সরবরাহ খুবই সীমিত ও ব্যয়বহুল। পুকুর নেই বললেই চলে, নদনদীও সীমিত। কূপ খননও খুবই ব্যয়বহুল। তাই গ্রাম এলাকায় প্রতিটি বাড়ীতে গোসলখানা নেই, বরং প্রতি গ্রামে এক বা একাধিক সাধারণ গোসলখানা রয়েছে। যাদের নিজস্ব গোসলখানা নেই তারা অর্থের বিনিময়ে সাধারণ গোসলখানা ব্যবহার করে। —অনুবাদক

www.pathagar.com

(৪) آبان — অবান মাস ঃ ২৩শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ)।

(৫) অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা ছাত্রসমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ। —অনুবাদক

(৬) صحیفۀ نور - جلد اول - ص ۲۶۶،۲۶۵

(৭) احمد رشیدی مطلق

(৮) ফার্‌ভার্‌দীন—২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল (১৯৭৮)।

(৯) یزد

(১০) جهرم

(১১) کازرون

(১২) ৯ই মে, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ।

(১৩) رفسنجان

(১৪) نجف آباد

(১৫) ফার্‌ভার্‌দীন, ওর্দিবেহেশত ও খোর্‌দাদ —এই তিন মাস (২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন)। (১৯৭৮)

(১৬) مرداد —মোর্‌দাদ মাস ঃ ২৩শে জুলাই থেকে ২২শে আগস্ট (১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

(১৭) صحیفه نور

(১৮) استقلال-آزادی-حکومت اسلامی

(১৯) الله اکبر-خمینی رهبر

(২০) برادر ارتشی - چرا برادر کشی؟

(২১) এটির পূর্বনাম ছিল "জ্বালে স্কোয়ার" (میدان ژاله); ঐ বছর রমযান মাসে সংঘটিত গণহত্যার শহীদগণের স্মরণে জনগণ এর নাম রাখে শুহাদা স্কোয়ার" (میدان شهداء)।

(২২) এ শহরগুলো হচ্ছে ইস্‌ফাহান, মাশ্‌হাদ, শীরায, তাব্‌রীয, আহ্‌ওয়ায (اهواز), আবাদান (آبادان), জাহ্‌রাম, কযেরুন, কোম, কায্‌ভীন ও কারাজ্‌ (کرج)।

(২৩) مرگ بر شاه

(২৪) ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইসলামী বিপ্লব

ইমামের নাজাফ থেকে প্যারিস গমন

ইরানে বিপ্লবের অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার পর ইরানের শাহী সরকার এবং ইরাকের বাথদলীয় সরকার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, ইমামের ওপর বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে এবং তাঁর জন্য বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি করবে। ইরাকের নিরাপত্তা সংস্থা ইমামের বাসভবন ঘিরে রাখল এবং সাধারণ জনগণ ও ওলামায়ে কেরামকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দিতে থাকল। কিন্তু ইমাম তাঁর সংগ্রাম থেকে একপা-ও পিছু হটে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমতাবস্থায় এসব সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি অনন্যোপায় হয়ে ইরাক ত্যাগ করে কুয়েত রওয়ানা হন। কিন্তু কুয়েত সরকার তাঁর কুয়েতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। অগত্যা হযরত ইমাম ফ্রান্সের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। ফ্রান্সে পৌঁছে তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠে 'নওফেল লু শ্যাতো'[১] নামে এক পল্লীতে বসবাস শুরু করলেন।

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ফ্রান্সে পৌঁছার আগে ফরাসী সরকার তাঁর সেখানে রওয়ানা হবার খবর জানতে পারেনি। তিনি ফ্রান্সে পৌঁছার পর ফরাসী সরকার তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু হযরত ইমাম যেহেতু শুধু তাঁর দ্বীনী দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেহেতু এ নিষেধাজ্ঞার প্রতি কর্ণপাত করলেন না। বরং তিনি বিপ্লবের পথনির্দেশদানমূলক কাজ অব্যাহত রাখলেন।

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ফ্রান্সে আসার পর বিপ্লবকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে এলেন। বিশ্বের সর্বত্র থেকে ইমামের ভক্ত-অনুরক্তরা প্যারিসে ছুটে আসতে লাগলেন হযরত ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী ইরানী ছাত্রদের ইসলামী ছাত্রসমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে আসতে লাগলেন। এসব সমিতি বহু বছর যাবত ইরানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে আসছিল। তাঁরা দলে দলে প্যারিসে আসতে লাগলেন। ইরান থেকেও একদল বিপ্লবী প্যারিসে রওয়ানা হলেন; তাঁরা প্যারিসে পৌঁছার পর ইমামের সান্নিধ্যে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

যেহেতু ফরাসী সরকার মুক্তি ও স্বাধীনতার সমর্থক হবার দাবী করত, সেহেতু শাহের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হযরত ইমামকে ঘিরে মুসলমানদের এ আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারল না। ফলে নওফেল লু শ্যাতো বিপ্লবের হৃদপিণ্ডে পরিণত হলো এবং তার প্রতিটি স্পন্দনই বিপ্লবের দেহে তাজা রক্ত প্রবাহিত করতে লাগল।

সমগ্র ইরান জুড়ে তখন শুধু আগুন আর রক্ত। আর সকলের মনোযোগ তখন হযরত ইমামের বাণীর দিকে। সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম সদাসর্বদা প্যারিসের সাথে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। আয়াতুল্লাহ্ মোতাহ্হারী, আয়াতুল্লাহ্ বেহেশ্তী, আয়াতুল্লাহ্ ছাদুকী প্রমুখ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম এবং অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দেশী-বিদেশী সাংবাদিকগণ প্যারিসে ছুটে গেলেন এবং হযরত ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বললেন।

www.pathagar.com

ফ্রান্সের নওফেল লু শ্যাতো পল্লীতে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের রূপায়নের গুরুদায়িত্বের একটা বিরাট অংশ অর্পিত ছিল তরুণ সমাজ এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্বিবিদ্যালয় ও দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ছাত্রছাত্রীদের ওপর। শাহী সরকার বহু বছর যাবত তরুণ সমাজকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও ইরানের তরুণ সমাজ বিপ্লবের অঙ্গনে উপস্থিতি বজায় রাখে। শাহী সরকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গার ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৬ই মেহের (৮ই অক্টোবর, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইরানের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধন করে একটি সুদীর্ঘ বাণী প্রেরণ করেন। এ বাণীর একাংশে তিনি বলেন ঃ

"আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা! স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পরিবেশে সচেতনভাবে ও নিষ্ঠার সাথে উত্থান কর ও পরস্পরের সাথে যোগদান কর এবং ইসলামের ও দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টা কর। আর সর্বাগ্রে ইসলামের দেয়া পবিত্র হুকুম-আহ্কামের অনুসরণ কর, কারণ এসব আহ্কাম হচ্ছে জাতিসমূহের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকারী। আর যেসব উপদল বিজাতীয়দের প্রচারণার ফলে প্রতারিত হয়েছে, বিভিন্ন মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে ও সে-সবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তাদেরকে দুশমনের প্রতারণা ও অপকৌশল সম্বন্ধে সচেতন কর এবং বিকৃত মতাদর্শসমূহের প্রতারক-নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দাও। দেশকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে অনৈক্য ও বিভেদ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাক।....

"ইরানের সন্তানগণ! আমাদের মহান জাতি শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি কোনভাবেই ঝুঁকে পড়তে চায় না। আর এ কারণেই এ জাতি ডানপন্থী ও বামপন্থী হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে, এ কারণেই আমরা প্রতিদিনই তাদেরকে দলে দলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হাতে নিহত হতে দেখছি; তোমরা এ জাতির সাথে তোমাদের বন্ধনকে সুদৃঢ়তর কর।"[২]

একের পর এক ধর্মঘট

বিপ্লবী নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নির্দেশে ইরানী জনগণ পাহ্লভী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একের পর এক ধর্মঘট। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানী জনগণের ইসলামের প্রতি ঈমান ও নিষ্ঠা এবং শাহী সরকারের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ সম্বন্ধে ভালোভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাই তিনি ১৩৫৭ ফার্সী সালের শরৎকালে[৩] ইরানী জনগণের প্রতি ধর্মঘটের আহ্বান জানালেন। প্রথম বারের মতো ব্যাপক ও অবিরত ধর্মঘট ১৭ই শাহ্রীভার (৮ই সেপ্টেম্বর)-এর প্রায় পরপরই শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে ধর্মঘট ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে থাকে। এ ধর্মঘট ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্মান (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত অর্থাৎ বিপ্লবের বিজয়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সকলের চেয়ে বেশী ব্যবসায়ীগণ, অধিকাংশ দোকান মালিক, পেশাজীবীগণ, স্কুল - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রীগণ এবং সংস্কৃতিসেবীগণ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ফলে সারা ইরান ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট সাংবিধানিক বিপ্লব ও পনরই খোরদাদের গণঅভ্যুত্থানকালীন তাদের ধর্মঘটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এবারের ধর্মঘট মাসের পর মাস চলতে থাকে। এর ফলে আরো বহু ক্ষেত্রে ধর্মঘটের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

যেসব ধর্মঘটী ধর্মঘটের ফলে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় তাদের সমস্যাকে পুঁজি করে শাহী সরকার যাতে ধর্মঘট ভাঙ্গানোর ষড়যন্ত্রে সফল হতে না পারে সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণী এ ধরনের সমস্যাক্লিষ্ট ধর্মঘটীদের আর্থিক সাহায্যদানের জন্য এগিয়ে আসেন।

শিল্প-কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘটে যোগদান করায় শাহী সরকারের মেরুদণ্ডে বিরাট আঘাত পড়ে। এক্ষেত্রে তেলশ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাগ্যনির্ধারণী ঘটনা। কারণ তেলশ্রমিকরা দেশের বাইরে তেল রফতানী বন্ধ করে দেয়। ফলে সরকার তার একমাত্র আয়ের উৎসটি থেকে বঞ্চিত হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারী অফিস-আদালতের কর্মচারীরা, এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যও এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। এভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে তাগুতী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ইমামের প্রতি আনুগত্যের ফলে পাহ্লভী সরকার কার্যতঃ দেশ শাসনে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং দেশ অচল হয়ে পড়ে।

১৩ই অবান ও শরীফ ইমামীর পতন

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ইরাক ত্যাগ ও প্যারিস গমনের ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যা ইরানের শাহী সরকার ও ইরাকের বাথ সরকারের কল্পনারও বাইরে ছিল। তাদের ধারণার বিপরীত, ইমামের ইরাক ত্যাগের ফলে শুধু যে বিপ্লব থেমে গেল না তা-ই নয়, বরং বিপ্লবের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। ১৩৫৭ ফার্সী সালের মেহের ও অবান মাসে[৪] শাহী সরকারের অবস্থা এমন এক ভাঙ্গা জাহাজের ন্যায় হয়ে দাঁড়াল যার একাংশ ক্রমান্বয়েই পানিতে ডুবে যাচ্ছে এবং গণরোষের সমুদ্রের ক্রুদ্ধ ঝোড়ো হাওয়ার এক ধাক্কায় পুরোপুরি তলিয়ে যেতে আর বেশী বাকি নেই।

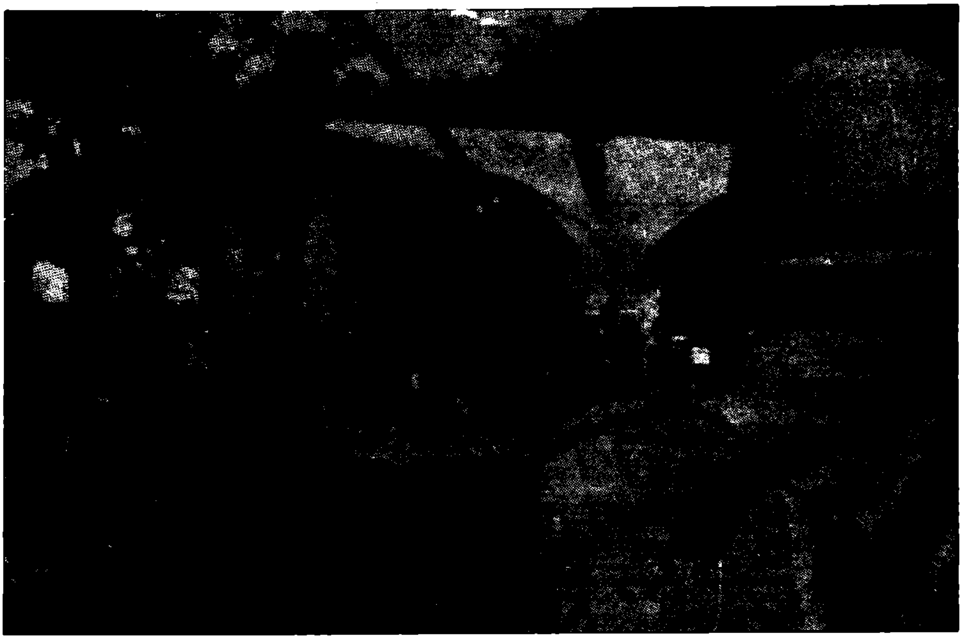

৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৮ ঃ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে শাহী সৈন্যদের হামলা

www.pathagar.com

যদিও বেশ আগেই সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল তথাপি প্রতিদিনই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে লাগল। শাহী সরকারের এজেন্টরা শক্তি প্রদর্শন, ভণ্ডামী ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল।

২৪শে মেহের (১৬ই অক্টোবর, ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে একদল লাঠিধারী লোক কেরমানের মসজিদে হামলা চালিয়ে শহরের দ্বীনদার সংগ্রামী মুসলমানদের অনেককে হত্যা ও অনেককে আহত করে। লাঠিধারীরা মসজিদে রক্ষিত কুরআনের কপিসমূহেও অগ্নিসংযোগ করে।

ইতিমধ্যে শাহ্ এবং তাঁর মার্কিন প্রভুরা বুঝতে পারেন যে, শরীফ ইমামী ও তাঁর ইসলামপ্রীতির অভিনয়মূলক নীতির দ্বারা আর কার্যোদ্ধার সম্ভব নয়, বরং তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন সেবাদাসকে মঞ্চে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এর বেশ আগে থেকেই জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সরকার গঠনের বিষয় বিবেচনাধীন ছিল। কিন্তু শরীফ ইমামীকে সরিয়ে দেয়ার জন্য একটা ছুতার প্রয়োজন ছিল। এ কারণে শাহী প্রশাসন ১৩৫৭-এর ১৩ই অবান (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ)-এর ঘটনা ঘটাল।

এদিন ছিল ১৩ই অবান ১৩৪৩ (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৪)-র স্মরণ বার্ষিকী; ঐ তারিখে হযরত ইমাম খোমেনীকে ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং শাহী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দুপুরের দিকে হঠাৎ করে শাহী সরকারের সশস্ত্র বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। সৈন্যদের গুলীতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শহীদ ও আহত হয়। এ হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র তেহরান শহরে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সরকারী অফিস, সংস্থা ও ব্যাঙ্কে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঐ দিন রাতেই টেলিভিশন থেকে তেহ্রান বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফিল্ম দেখানো হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে আরো বেশী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরদিন শরীফ ইমামী পদত্যাগ করেন এবং শাহী সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সম্মিলিত সংস্থার প্রধান জেনারেল আয্হারী[৫]কে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ ঘটনার পর বিশেষ করে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের আত্মত্যাগের স্মরণে ১৩ই অবানকে 'স্কুল ছাত্রছাত্রী দিবস' নামকরণ করা হয়।

আয্হারীর মন্ত্রিসভা

জেনারেল আয্হারীর মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে শাহ্ রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত এক ভাষণে নতুন এক ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় নেন। তিনি অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে বক্তব্য রাখেন এবং নিজেকে ইসলামের রক্ষক ও জনগণের বেদনায় ব্যথিত হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেন। শাহ্ দেশবাসী ও ওলামায়ে কেরামের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তিনি শুধু রাজত্ব করবেন, রাষ্ট্র চালাবেন না; এজন্য তিনি জনগণের নিকট 'অনুমতি প্রার্থনা' করেন।

একদিকে শাহ্ জাতির নিকট আকুতি সহকারে তাঁর 'তওবাহ্নামা' পেশ করেন যা শাহের মারাত্মক দুর্বল অবস্থারই প্রমাণ বহন করছিল, অন্যদিকে একই সময় জেনারেল আয্হারী তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করছিলেন। আয্হারীর মন্ত্রিসভার অধিকাংশ মন্ত্রীই ছিলেন সামরিক ব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জনসাধারণ যেন সামরিক ব্যক্তিদের বুট আর ঠাট দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ময়দান থেকে কেটে পড়ে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে আযহারীর সামরিক মন্ত্রিসভা ছিল শাহ্‌কে রক্ষার জন্যে আমেরিকার তূনীরের সর্বশেষ তীর। আযহারীকে ক্ষমতায় আনার পিছনে আমেরিকানদের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সামরিক সরকারের ন্যায় একটি রুক্ষ-কঠোর সরকারের চেহারা দেখে হয়তো জনসাধারণ ভয় পাবে এবং বিপ্লবী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ অপকৌশল কাজে না লাগলে এবং জনগণ "শাহ্ নিপাত যাক" শ্লোগান অব্যাহত রাখলে আযহারী যদ্দিন ক্ষমতায় থাকবেন তদ্দিন আমেরিকানরা কিছুটা অবকাশ পাবে এবং নতুন কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করতে ও নতুন কোন সেবাদাস খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

তলোয়ারের ওপর রুধিরের বিজয়

মুহর্‌রম মাস ছিল সন্নিকটবর্তী। এটা সকলেরই জানা ছিল যে, এ মাসের চন্দ্রোদয়ের সাথে সাথে বিপ্লবে নতুন প্রাণ ও নতুন গতি সঞ্চারিত হবে। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন ইরানের জনগণের ইসলামী সংস্কৃতি ও ইরানী সমাজের সমাজতত্ত্বের সাথে পুরোপুরি সুপরিচিত। তাই তিনি মুহর্‌রম মাসের বৈপ্লবিক ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। এ কারণেই তিনি মুহর্‌রম মাস শুরু হবার কয়েক দিন আগে ইরানী জনগণের উদ্দেশে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় আগুন ঝরানো ও রক্ত টগবগ করানো বাণী প্রেরণ করেন। এ বাণীর মাধ্যমে তিনি হোসেইনী স্মৃতিতে চিরভাস্বর কারবালার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

'মুহর্‌রম মাসের আগমনে গৌরবগাথা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাস শুরু হলো, যে মাসে তলোয়ারের ওপরে রুধিরের বিজয় ঘটে, যে মাসে সত্যের শক্তি বাতিলকে চিরদিনের জন্য নিন্দিত করে দিয়েছে, জালেম-অত্যাচারীদের জোট ও শয়তানী হুকুমতসমূহের ওপর বাতিলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যে মাস সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বর্শাফলকের ওপরে বিজয়ী হবার পথ বাৎলে দিয়েছে, যে মাস সত্যের কলেমার মোকাবিলায় পরাশক্তিবর্গের পরাজয়কে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে, যে মাসে মুসলমানদের ইমাম (হোসেইন আঃ) আমাদেরকে ইতিহাসের জালেম-নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ বাৎলে দিয়েছেন।.......

'এখন তো মুহর্‌রম মাস ইসলামের সৈনিকদের, মহান ওলামায়ে কেরামের, সম্মানিত খতীবগণের এবং সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা (ইমাম হোসেন) আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্-সালামের (অনুসারী) মহান মর্যাদাবান শিয়াগণের হাতে এক খোদায়ী তলোয়ারের ন্যায় শোভা পাচ্ছে; তাই তাঁরা যেন এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন ...

'দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্রসমূহের যেসব ছাত্র ও মহান আলেম এ দিনগুলোতে জনগণকে সচেতন করার জন্য গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে গমন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে বঞ্চিত ও সম্মানিত গ্রামবাসী চাষীদেরকে শাহের পৈশাচিক কার্যকলাপ ও নিরীহ লোকদের হত্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ও সচেতন করে দেয়া।... এটা আর স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, (ইমাম হোসেনের স্মরণে) শোকসভার আয়োজন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে হতে হবে, তা যেন শহর পুলিশ বা নাশকতাবাদী তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনীর অনুমতি সাপেক্ষ না হয়। প্রিয় দেশবাসী! আপনারা কর্মকর্তাদের নিকট (অনুমতির জন্য) না গিয়েই (শোক) মজলিসের আয়োজন করুন। এতে বাধা দেয়া হলে আপনারা মাঠে-ময়দানে, চৌরাস্তায়, রাস্তার ওপরে ও গলিতে গলিতে সমাবেশ করুন; ইসলাম ও মুসলমানদের বিপদ-মুছিবত এবং শাহী সরকারের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিন।

www.pathagar.com

'ইরানের মহান জনগণ স্বীয় ইসলামী শক্তির দ্বারা শাহ্ ও তার ধামাধরাদের মুখে শক্তিশালী মুষ্টাঘাত হেনেছেন; আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকতার সাথে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি সত্যের রাস্তায় ও খোদায়ী লক্ষ্যে শাহাদাত বরণকে গৌরব এবং চিরন্তনত্ব লাভ বলে মনে করি। যেসব তরুণ ইসলামের রাস্তায় ও মুক্তির চেতনায় রক্তদান করেছে আমি তাদের পিতা-মাতাদেরকে মোবারকবাদ জানাই।

"যে সব প্রিয় ও বীর তরুণ প্রিয়ের (আল্লাহ্র) পথে জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়।

'ইরানের মহান বিপ্লবের আওয়াজ মুসলিম দেশসমূহে ও অন্যান্য দেশে অনুরণিত হচ্ছে ও গৌরববোধ সৃষ্টি করেছে। প্রিয় ও সম্মানিত দেশবাসী! আপনারা মুসলিম জাতিসমূহের বীর তরুণদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আশা করা যায় যে, আপনাদের সক্ষম হাতে ইসলামী হুকুমতের গৌরবময় পতাকা সকল প্রান্তেই উড্ডীন হবে। আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমার এটাই প্রার্থনা'।[৬]

পহেলা মুহর্‌রমের গৌরবময় ঘটনা

জেনারেল আয্হারী ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সামরিক শাসনের কড়াকড়ি এবং হুমকি ও আতঙ্ক বৃদ্ধি করেন, প্রতিদিনকার জন্য সান্ধ্য আইনের মেয়াদও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু জনসাধারণ শুধু হযরত ইমামের আদেশই মেনে চলতে থাকে।

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) শাহের প্রতারণাময় তওবাহ্ এবং আয্হারীর শক্তি প্রদর্শন ও হুমকিকে নস্যাৎ করে দেন। একদিকে আয্হারী সামরিক শাসন ও সামরিক ব্যক্তিদের সরকারকে সুদৃঢ়তর করার চেষ্টা চালাতে থাকেন, অন্যদিকে জনসাধারণ মুহর্‌রম মাসের প্রথম রাতে এক বীরত্বব্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপেরে মাধ্যমে তারা আয্হারী সরকারের আধিপত্যকে খর্ব করে দেয়। রাত প্রায় ন'টায় রাস্তায় রাস্তায় শুধু সৈন্য, সেনাবাহিনী অফিসার ও পুলিশের বুটের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ করে জনসাধারণ নিজ নিজ বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিতে শুরু করে। আগুনের লেলিহান শিখা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবেই এ শ্লোগান এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সারা তেহরানের সকল ছাদ থেকে শুধু 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান শোনা যেতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সর্বত্র ধ্বনিত হতে লাগল 'আল্লাহু আকবর, খোমেনী রাহ্বার' এবং 'নাছ্রুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাৎহুন্ ক্বারীব'।[৭]

জনগণের এ ধরনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল একটি নতুন উদ্ভাবন। সারা বিশ্বে ইতিপূর্বে কখনো এ ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের নজীর নেই। ফলে শাহ্, আয্হারী এবং সামরিক সরকারের জল্লাদরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারছিল না কি করবে। তারা দিশাহারা হয়ে এলোমেলোভাবে সব দিকে গুলীবর্ষণ করতে লাগল।

দক্ষিণ তেহরানের জনসাধারণ ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দেয়ার পর রাস্তায় নেমে পড়ে এবং রাতের অন্ধকারে "শাহ্ নিপাত যাক" শ্লোগানসহ সামরিক সরকারের গুলীর সামনে রুখে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বহু লোক শহীদ হয় ও অনেকে আহত হয়। তিনজনের বেশী একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পরদিন পহেলা মুহর্‌রম দিনের বেলা জনসাধারণ রাস্তায় নেমে আসে এবং বিরাটাকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর লোকেরা আবারো জনতার দিকে গুলীবর্ষণ করে। ফলে তেহরানের সারচাশ্মে এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক লোক শাহাদাত বরণ করে।

www.pathagar.com

এ বিক্ষোভের বিশেষ গুরুত্ব ছিল এখানে যে, আযহারীব সামরিক মন্ত্রিসভা কাজ শুরু করার পর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের মাথায় এ ব্যাপক গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় যা তাঁর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয় এবং তাসূয়া ও আশুরার (মুহররমের নবম ও দশম দিনের) সর্বাত্মক বিক্ষোভের ক্ষেত্র তৈরী করে।

এবারও পুরুষদের পাশাপাশি দ্বীনদার মহিলাদের উপস্থিতি এ বিক্ষোভকে বিশেষ শৌর্য ও শক্তি প্রদান করে। তবে বিপ্লবে নারীদের অংশগ্রহণ শুধু মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং বিপ্লবে তাদের এর চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই যে, তারা তাদের স্বামী-সন্তানদেরকে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে, আর নিজেরা স্বামীদের ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও কাঠিন্য; অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও তেলের সংকট এবং সর্বোপরি স্বামীদের ও কলিজার টুকরা সন্তানদের শাহাদাতকে সহ্য করে নিয়ে বিরাট মনের পরিচয় প্রদান করে। নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, ইসলামী বিপ্লবে ইরানের মুসলিম নারীরা যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি, ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন না করতো তাহলে বিপ্লব বিজয়ী হতো না।

তাসূয়া ও আশূরার মিছিল

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বাধীন আন্দোলন শুরু থেকেই হযরত ইমাম হোসেনের (আঃ) আন্দোলনের ওপর ভিত্তিশীল ও নির্ভরশীল ছিল। ১৩৪২ ফার্সী সালের ১৫ই খোরদাদের (৫ই জুন, ১৯৬৩-র) ঘটনা মুহররম মাসে এবং আশূরার দু'দিন পর সংঘটিত হয়। দীর্ঘ পনর বছর পর এবারও তাসূয়া ও আশূরা এমন এক পরিস্থিতিতে সমুপস্থিত হয় যে, গোটা জাতিই 'প্রতি দিনই আশুরা, প্রতিটি ভূখণ্ডই কারবালা"[৮] শ্লোগান দিয়ে এ যুগের ইয়াযিদের সামনে কারবালার গৌরবদীপ্ত বীরত্বগাথার পুনরাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হয়।

ইরানের সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ[৯] ও তেহরানের সংগ্রামী আলেমগণ হযরত ইমাম খোমেনীর সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন। এঁদের মধ্যে মরহুম আয়াতুল্লাহ্ তালেকানী, শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোতাহ্হারী, শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বেহেশ্তী, শহীদ বহোনার[১০], আয়াতুল্লাহ্ মুসাভী আরদেবিলী[১১], আয়াতুল্লাহ্ মাহ্দাভী কানী ও হুজ্জাতুল ইসলাম রাফ্সান্জানী ছিলেন অন্যতম। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বিক্ষোভের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাসূয়া ও আশূরার দিন ব্যাপকাকারে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এ সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

জনসাধারণকে বিক্ষোভ মিছিলের প্রশ্নে দৃঢ়সংকল্প লক্ষ্য করে সরকারের ভয় হল যে, বিক্ষুব্ধ জনতা হয়ত শাহী প্রাসাদে হামলা করে বসতে পারে। তাই শাহী সরকার উত্তর ও দক্ষিণ তেহরানের মাঝখানে এক সামরিক প্রতিরক্ষা প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং বিক্ষোভ মিছিলকে দক্ষিণ তেহরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে।

তাসূয়ার দিন সকালে তেহরান শহরের নয়টি ময়দানে (গোল চক্করে) জনগণ সমবেত হয়। এসব ময়দান থেকে ওলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমামগণের নেতৃত্বে মিছিল করে তারা আযাদী সড়কে গিয়ে মিলিত হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। এর বিন্যাস ও শৃঙ্খলা এবং তাদের মধ্যকার সংহতি ও পারস্পরিক সমমর্মিতা ছিল নজিরবিহীন।

পরদিন অর্থাৎ আশূরার দিন আরো বেশীসংখ্যক লোক বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়। এদিন মিছিলের দৈর্ঘ্য ছিল ১২ কিলোমিটারেরও বেশী। সেদিন সকলে সমস্বরে "আল্লাহু আকবর, খোমেনী

www.pathagar.com

রাহ্‌বার", "স্বাধীনতা, মুক্তি, ইসলামী হুকুমত", "শাহ্ নিপাত যাক", "না প্রাচ্য, না পাশ্চাত্য, ইসলামী হুকুমত" স্লোগানসহকারে রাস্তায় নেমে আসে। এভাবে তেহরানসহ ইরানের সকল শহরেই গণবিক্ষোভের মাধ্যমে জনসাধারণ এটাই জানিয়ে দেয় যে, তারা আর শাহ্‌কে চায় না, বরং তারা ইসলামী হুকুমত চায়।

এসব বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবার পর হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ২১শে অযার, ১৩৫৭ (১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ) তারিখে ইরানী জনগণকে সম্বোধন করে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন ঃ

"... আমি আপনাদের এ বিশাল মিছিলের সমসময়ে বিশ্বের সরকার প্রধানদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে ঘোষণা করেছি যে, এ দিনের রেফারেন্ডাম কারো নিকটই আর এ বিষয়টি অস্পষ্ট রাখেনি যে, (ইরানী) জাতি শাহ্‌কে চাচ্ছে না এবং প্রায় সর্বসম্মতভাবে জনগণ তার প্রতি স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে। এ কারণে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি যে, অতঃপর যেসব দেশের সরকার বা সরকার প্রধান শাহ্‌কে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে, সেসব দেশকে ইরানের তেল থেকে বঞ্চিত হতে হবে; তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের বৈধতাহীনতা ঘোষণা করা হলো।...

"তেমনি তরুণ অফিসারদের জন্যও এ মর্মে বাণী পাঠিয়েছি যে, তাঁরা যেন জনগণের কাতারে যোগদান করেন। কারণ আমরা তাদেরকে (বিদেশী) সামরিক উপদেষ্টাদের অধীনতা থেকে মুক্তি দেব এবং উন্মুক্ত বক্ষে টেনে নেব। ... সম্মানিত জনগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, যেসব সৈনিক ও অফিসার তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁদেরকে সর্বতোভাবে এবং তাদের নিরাপত্তার সংরক্ষণ সহকারে দেখাশোনা ও সাহায্য করুন।"[১২]

অতঃপর সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, ইরান এখন হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) হাতে এবং তিনিই অনেক অনেক দূর থেকে এক ক্ষুদ্র কুটির হতে বিপ্লবকে ও দেশকে পরিচালনা করছেন। হযরত ইমামের আদেশের ভিত্তিতে সেনানিবাসগুলো থেকে সৈন্যরা পালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে ইমামের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ইমাম তেলশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদেরকে এ মর্মে আদেশ দেন যে, শীতকালে জনসাধারণের যাতে কষ্ট না হয় সে লক্ষ্যে তারা যেন আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পরিমাণ তেল উৎপাদন করে, কিন্তু দেশের বাইরে এক ফোঁটা তেলও রফতানীর সুযোগ না দেয়। তারা ইমামের এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এক্ষেত্রে শাহী সরকার যা চাচ্ছিল তা ছিল এর বিপরীত। শাহী সরকার চাচ্ছিল যে, ধর্মঘটের ফলে তেলের অভাবে প্রচণ্ড শীতে সাধারণ মানুষের যেন কষ্ট হয়; তাহলে জনসাধারণ ধর্মঘট ও বিপ্লবীদের প্রতি বিরূপ হবে। কিন্তু ইমামের বিজ্ঞজনোচিত নির্দেশের ফলে সরকারের সে আশা হতাশায় পরিণত হয়।

তাসূয়া ও আশূরার বিক্ষোভ মিছিলের পর ইরানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকার নিকট তিনটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তা হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আয্‌হারীর সামরিক সরকার কোন কাজে আসবে না।

দ্বিতীয়তঃ ইরানের জনগণের মধ্যে এতখানি চিন্তার ঐক্য বিরাজ করছে এবং তারা ইমাম খোমেনীর আনুগত্যকে এতখানি অপরিহার্য গণ্য করছে যে, কোনরূপ শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে না।

তৃতীয়তঃ শাহের পক্ষে আর ইরানে হুকুমত করা সম্ভব নয় এবং আমেরিকার পক্ষে আর তাঁর মাধ্যমে ইরানে স্বীয় স্বার্থসমূহ রক্ষা করা সম্ভব নয়। অতএব, অন্য কোন সেবাদাসকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার কথা চিন্তা করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

শাহ্‌পুর বাখ্‌তিয়ারের সরকার

১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৫ই দেই (৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) নীরবে ও শান্তিপূর্ণভাবে শাহ্‌কে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন মার্কিন পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এ পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ ঃ প্রথমে বাহ্যতঃ জাতীয়তাবাদী এমন একজন ব্যক্তিকে (শাহ্‌পুর বাখ্‌তিয়ারকে) প্রধানমন্ত্রী করা হবে এবং তিনি ইসলামী হুকুমত ছাড়া জনগণের বাকী সমস্ত দাবী পূরণ করবেন। কার্যতঃ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা রোধের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে ও প্রতারণাপূর্ণভাবে হলেও, জনগণকে যেকোন সুবিধা দেয়ার জন্যে বাখতিয়ারকে নির্দেশ দেয়া হয়।

তখন মজলিসে শূরায়ে মিল্লীর অবস্থাও মরণাপন্ন রোগীর মতো; মজলিস তখন শাহেরই ন্যায় শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছিল। শাহ্‌ বাখ্‌তিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন এবং অনুমোদনের জন্য মজলিসে উপস্থাপন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই মজলিস বাখ্‌তিয়ারের প্রতি আস্থা ভোট প্রদান করল। বাখ্‌তিয়ার এক সময় জেব্‌হেয়ে মিল্লী (ন্যাশনাল ফ্রন্ট)-এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন; তিনি এ পরিচয়কে গৌরবচিহ্ন স্বরূপ ধারণ করে জনসমক্ষে হাজির হন। তিনি তাঁর অফিসে তাঁর মাথার ওপরে মোসাদ্দেকের ছবি টানিয়ে দেন ও তার নীচে বসে জনগণকে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রদান করেন ঃ

- শাহ্‌ দেশ থেকে চলে যাবেন।
- তাঁর (বাখ্‌তিয়ারের) শাসন হবে গণতান্ত্রিক ও সংবিধানভিত্তিক।
- ইসলামের হুকুম-আহকাম ও রীতিনীতি মেনে চলা হবে।
- ওয়াক্‌ফসমূহ ওলামায়ে কেরামের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে।
- (সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোভায়দা ও সাভাকের সাবেক প্রধান নাছিরীসহ—যাঁরা তখন করাগারে ছিলেন) সাবেক আমলের সকল অপরাধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর্গ ও লুণ্ঠনকারীদের বিচার করা হবে।
- সংবাদপত্রসমূহ (যা আযহারীর সময় প্রকাশিত হত না) স্বাধীনতা লাভ করবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা অবাধ হবে।
- সর্বশেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে।

এসব প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বাখ্‌তিয়ার এই বলে হুমকি দেন যে, "আমি যদি দেশ চালাতে সফল না হই তাহলে সশস্ত্র বাহিনী ক্যু-দেতা করবে ও সারা ইরানে রক্তের বন্যা বয়ে যবে। ইরানের ওপর কম্যুনিজম চেপে বসবে এবং ইরান রুশদের হাতে পড়বে ও বিভক্ত হয়ে যাবে।"

আমেরিকার এবারের পরিকল্পনা ছিল খুবই সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। শাহ্‌পুর বাখ্‌তিয়ার ছিলেন পাশ্চাত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন লোক এবং দেশের ধর্মহীন (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর বহু বন্ধু ও সমচিন্তার অধিকারী লোক ছিলেন। বাখ্‌তিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা তাঁর পক্ষে কলম ধরলেন। তাঁরা শাহ্‌ ও শাহী শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন না জানিয়ে এবং ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রতি কোনরূপ অবমাননা প্রদর্শন না করে ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে লেখালেখি শুরু করলেন এবং সর্বশক্তিতে ধর্ম ও রাজনীতি পৃথকীকরণের সপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টায় লেগে গেলেন, আর এসব কিছুই ছিল ইরানে নিজেকে সংকট থেকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে আমেরিকার প্রণীত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক।

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনী অন্য সকল সময়ের ন্যায় এবারও সতর্কতার পরিচয় দিলেন। তিনি সাথে সাথেই বাখ্তিয়ারের সরকারকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। জনসাধারণ আবারো বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে এল এবং বাখ্তিয়ার তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহের কথা ভুলে গিয়ে বিক্ষোভকারী জনতার রক্তে ইরানের মাটি রঞ্জিত করলেন। কিন্তু ইরানের জনগণ গোলাগুলী উপেক্ষা করে স্লোগান দিতে থাকল ঃ "না শাহ্‌কে চাই, না শাহ্‌পুরকে" এবং "বাখ্তিয়ার, বাখতিয়ার, নওকরে বি-এখ্তিয়ার (ক্ষমতাহীন গোলাম)"।

বিপ্লব এবং রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ

এখানে ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও সংস্থার ভূমিকার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। ইসলামী বিপ্লব ছিল একটি গণবিপ্লব। ইরানের জনগণ তাদের ঈমানের দাবীতে, বিপ্লবের নেতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং শাহ্ ও রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাদের দীর্ঘকালীন ঘৃণার কারণে মনেপ্রাণে ও আন্তরিকতার সাথে এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী শাহী দরবারের তাঁবেদারি এবং বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশের জিন্দেগীর কারণে অথবা আরামপ্রিয় ও ভোগবাদী মানসিকতার কারণে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। কারণ, তারা ভয় পাচ্ছিল যে, ইসলামের বিজয়ের ফলে তাদের জন্য আর আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, অনৈতিকতা, দুর্নীতি ও লুটতরাজের সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, ইরানে বিভিন্ন ধরনের বহু রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ছিল; এসব দল ও সংগঠনের প্রতিটি কমবেশী সরকারের বিরোধিতা করত, কিন্তু ১৩৪২ থেকে ১৩৫৬ ফার্সী সালের (১৯৬৩ থেকে ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে এসব সংগঠনের বেশীর ভাগই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় এবং এসবের প্রতিষ্ঠাতাগণের অধিকাংশই স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেন। জাম্‌শীদ অমুযেগার যেদিন মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের ধুয়া তোলেন তখন এসব দল ও গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কয়েকটি পুনরুজ্জীবনের চিন্তা শুরু করে এবং ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তুলে আত্মপ্রকাশের কথা ঘোষণা করে। তাছাড়া বিপ্লবের পূর্ববর্তী এক বছরে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় নতুন অনেক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গজিয়ে ওঠে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে এসব দল ও সংগঠনের প্রতিটি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে আমরা এসব দল ও সংগঠনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে মোটামুটি উল্লেখ করছি।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ সব দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাধারণতঃ সততা ও সত্যতার অধিকারী ছিলেন না। জনসাধারণ যেখানে ইসলামী হুকুমতের দাবীদার ছিলেন সেখানে তাঁরা এ গণদাবী বাস্তবায়নের চিন্তা না করে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে এবং এক কণ্ঠে শ্লোগান তুলে শাহীতন্ত্রের বৃক্ষের গোড়ায় কুঠারাঘাত হানছে তখন তারা এ সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য এগিয়ে আসেন। তারা একত্রিত হয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ করেন এবং দলে সদস্য সংগ্রহ আর ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের চিন্তায় লিপ্ত হন। তাঁরা ধারণা করতে পারেননি যে, কোনদিন ইরানী জাতি শাহ্‌কে বিতাড়িত করতে ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাঁরা তাদের অন্তঃকরণে যে উদ্দেশ্য পোষণ করতেন জনগণের আশা-আকাঙ্খার বিপরীতে তা প্রকাশ্যে তুলে ধরতে সাহসী হননি। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়ালে জনগণ তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ কারণে

www.pathagar.com

তাঁরা একদিকে যেমন বিপ্লবের পাশাপাশি পদচারণা করতে থাকেন, তেমনি শাহী সরকারের সাথেও সম্পর্কহীন ছিলেন না।

আমেরিকাও এ চিন্তাই করছিল যে, এই সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কিছুটা সহায়তা দিয়ে তাদের মাধ্যমে ইরানী জনগণের হাত থেকে ও ইসলামী হুকুমতের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এ কারণে আমেরিকা পরোক্ষভাবে তাদেরকে শক্তিশালী করতে থাকে এবং সংবাদপত্র ও রেডিও-র মাধ্যমে তাদের শক্তি, প্রভাব ও জনপ্রিয়তাকে বড় করে দেখাতে থাকে; এরূপ ভান করতে থাকে যাতে মনে হতে থাকে যে, উদাহরণস্বরূপ, অমুক বিরাট বিক্ষোভটি ন্যাশনাল ফ্রন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের নেতা ও ওলামায়ে কেরামের মোকাবিলায় ন্যাশনাল ফ্রন্টকে একটি শক্তিতে পরিণত করা। আর আমরা দেখতে পাই যে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা তার শেষ রক্ষার জন্য ন্যাশনাল ফ্রন্টেরই অন্তর্ভুক্ত তার এক সেবাদাসের অর্থাৎ শাহ্‌পুর বাখ্‌তিয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করে।

বামপন্থী ও ডানপন্থী নির্বিশেষ অনেক বুদ্ধিজীবীই জনগণের সাথে পা মিলিয়ে চলা ও জনগণের ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নেয়াকে নিজেদের মর্যাদার জন্যে হানিকর মনে করতেন। তাঁরা বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে বিপ্লবের অগ্রযাত্রা দর্শন করতে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকেন, যদি ধরে নেয়া হয় যে, এই বিরাট জনতা শাহ্‌কে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে, সেক্ষেত্রে তারা নিজেরা বা তাদের সামনে অবস্থান গ্রহণকারী আলেমরা ত আর রাষ্ট্র চালাতে পারবে না, সেক্ষেত্রে অগত্যা তারা আমাদের নিকটেই আসবেন (অর্থাৎ সাংবিধানিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে)। একারণে তাঁরা নিজ নিজ রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী এই সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর কোন কোনটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন যাতে ভবিষ্যতে ভাগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হন।

বিপ্লব এবং কারামুক্ত গেরিলা গোষ্ঠীসমূহ

অমুযেগার ও শরীফ ইমামীর সরকারের আমলে আত্মপ্রকাশকারী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ ছাড়াও ১৩৫৭ ফার্সী সালের শরৎ ও শীতকালে সকল কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়া হলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সশস্ত্র গেরিলা দলের বন্দীরাও, যেমন ঃ ফেদাইয়ানে খালক্ ও মুজাহেদীনে খাল্‌কের গেরিলারাও জনগণের বিপ্লবের বদৌলতে মুক্তিলাভ করে। মুক্তিপ্রাপ্তদের কতক কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপকতা অনুভব করতে পারে এবং সমুদ্রে বারিবিন্দুর আত্মবিসর্জনের ন্যায় বিপ্লবী জনতার কাতারে মিশে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যকার অপর অংশ রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর ন্যায় স্বতন্ত্র গেরিলা ও সংগ্রামী দল গড়ে তোলার চিন্তায় লিপ্ত হয়। তারা বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে বিপ্লবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একাংশ ছিল ফেদাইয়ানে খালক্ বা তাদেরই ন্যায় চিন্তা-বিশ্বাসের অধিকারী যারা আদৌ ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না, অন্যরা ছিল মুজাহেদীনে খাল্‌ক্ বা তাদের অনুরূপ চিন্তাধারার অধিকারী যারা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল বটে কিন্তু তারা নিজেরাই ইসলামের ব্যাখ্যা করত এবং তাতে মার্‌জায়িআৎ ও ওলামায়ে কেরামের কোন স্থান ছিল না। এরা তরুণদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের ভিত্তিহীন, মিশ্র ও সুবিধাবাদী চিন্তাধারার ওপর ইসলামের প্রলেপ দিয়েছিল। এ দু'টি গোষ্ঠী না বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস পোষণ করত, না তাদের দলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এ বিপ্লবের বিজয়ের ব্যাপারে বিশ্বাসী হতে পারছিল। যেহেতু তারা দেশের মুসলিম জনগণের

www.pathagar.com

আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্নতর নিজেদের অতীত আন্দোলন ও কারাবরণকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করত সেহেতু কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পরই নিজ নিজ সংগঠনের প্রচারের কাজে উঠে পড়ে লাগে এবং জনগণের বিক্ষোভ ও মিছিলসমূহ কোন দল বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত না হলেও এবং শুধু জাতির রাহ্‌বার ইমাম খোমেনীর ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ এতে অংশ নিলেও এরা নিজস্ব নাম ও প্রতীক খচিত প্লাকার্ড ও পোস্টারসহ এতে অংশ নিতে থাকে এবং এমন ভান করতে থাকে যে, এসব প্লাকার্ড ও পোস্টারের পিছনে পিছনে যারা আসছে তাদের সকলেই যেন তাদের সংগঠনের সমর্থক। তারা বিপ্লবের বিজয়ের মাস খানেক পূর্বে তরুণ সমাজের মধ্যে সামান্য কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে নিয়ে মিছিলে প্রবেশ করে। মিছিলে তারা জনগণের শ্লোগানে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। যেমন ঃ জনগণ যেখানে শ্লোগান দিত ঃ "স্বাধীনতা, মুক্তি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র" সেখানে তারা "রুটি, বাসস্থান, মুক্তি" শ্লোগান প্রবর্তনের চেষ্টা করত, অথবা জনগণ যখন শ্লোগান দিত ঃ "খোমেনী আমাদের নেতা, সৈন্যরা আমাদের ভাই" তখন তারা বিড়বিড় করে অন্য কিছু আওড়াতো।

মোদ্দা কথা, এই গোষ্ঠীগুলোর অবশিষ্ট কয়েকশ' লোক বিপ্লবের সান্নিধ্যে এসে ভুলে গেল যে, এই ইসলামী বিপ্লব, এর নেতা ইমাম খোমেনী এবং মসজিদ কেন্দ্রিক এই মুসলিম জনগণই তাদেরকে একাকিত্ব ও কোণঠাসা অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন এবং কারাগার থেকে বের করে এনেছেন। তারা ভুলে গেল যে, ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ ফার্সী সালে শাহের সরকার তাদের কোন শক্তি ও সংগঠন অবশিষ্ট রাখেনি। এ কারণেই তারা কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর আত্মপ্রদর্শনী, নেতৃত্ব দখল এবং নিজস্ব রুচি ও মর্জিমাফিক সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ে। তাই তারা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে বারিবিন্দুর ন্যায় হারিয়ে যাবার পরিবর্তে বুদবুদের ন্যায় সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে শোভা পাবার ও আত্মপ্রদর্শনী করার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু কালের প্রবাহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমুদ্র টিকে থাকে ও বুদবুদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বিপ্লবের প্রক্রিয়া চলাকালে যে সব অনৈসলামী দল ও গোষ্ঠী তৎপরতা শুরু করে তার মধ্যে হেয্‌বে তুদেহ্‌-র অবস্থা ছিল সবচেয়ে হাস্যকর। হেয্‌বে তুদেহ্‌ তেল জাতীয়করণ আন্দোলনের সময় থেকে নাশকতামূলক ভূমিকা পালনকারী অতীতের অধিকারী ছিল তেমনি ২৮শে মোর্‌দাদের ক্যু-দেতার সময় দলটি নীরব ছিল; দলটির নেতারা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের অনেকে শাহী সরকারের সাথে আপোষরফা করেছিলেন। এসব কারণে ইরানী জাতির নিকট এ দলটির জন্যে বিন্দুমাত্র সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল না। কারণ, দলটি যে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি, শুধু তা-ই নয়, বরং সংগ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে ও শাহী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তারা জনগণের সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এতদসত্ত্বেও দলটির বিদেশ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁদের সোভিয়েত প্রভুদের নির্দেশে ইরানের অভ্যন্তরে পুনরায় তৎপরতা চালানোর ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। তাঁরা যাতে বিপ্লবী কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে না থাকেন সে লক্ষ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিপ্লবের বিজয়ের কয়েক মাস পূর্ব থেকে তাঁরা রেডিও মস্কো-র সুর পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন।

হেয্‌বে তুদেহ্‌ ইসলামী আন্দোলনে ন্যূনতম বিশ্বাসও পোষণ করত না, বরং সদাসর্বদাই ইরানকে বিজাতীয়দের নিকট আত্মসমর্পণ করানোর চিন্তায় মশগুল ছিল। কিন্তু তারা জানত যে, গেরিলা গোষ্ঠীগুলো ইরানের জনগণের মধ্যে যে সামান্য সমর্থনের অধিকারী ছিল তারা ততটুকু জনসমর্থনেরও

www.pathagar.com

অধিকারী ছিল না। এ কারণে ইসলামী হুকুমতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে সামান্যতম সাফল্য লাভের ব্যাপারেও তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই শুরু থেকেই তারা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নিজেদেরকে বিপ্লবের সমর্থক ও হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) ধারার অনুসারী হিসেবে প্রদর্শন করে। হেযবে তুদেহ্-র কর্মসূচী ছিল এই যে, ইমামের ধারার অনুসরণে পর্দার অন্তরালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে একদিকে দলে রিক্রুটমেন্ট, সংগঠন সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে অনুপ্রবেশ ও গোয়েন্দাগিরির কাজ চালিয়ে যাবে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্যে নিজেদের প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে সাধারণ জনগণ ও মু'মিন জনশক্তির মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। কিন্তু দেশবাসী স্বীয় সতর্কতার কারণে এ দলটির সেবাদাসগিরির কলঙ্কিত চেহারা ধরে ফেলে ও তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়।

বিপ্লবী পরিষদ গঠনের ঘোষণা

১৩৫৭ ফার্সী সালের ২৩শে দেই (১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সমাবেশে হযরত ইমামের একটি বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। হযরত ইমাম তাঁর এ বাণীতে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এ বাণীর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

"ইরানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আমার প্রতি যে আস্থাজ্ঞাপক রায় প্রদান করেছে তদনুযায়ী শরয়ী অধিকারে জাতির ইসলামী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমি উপযুক্ত, দ্বীনদার, নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিয়ে অস্থায়ীভাবে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করেছি যা তার কাজ শুরু করবে। এ পরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তার দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করা এবং এ জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। যখনি সঙ্গত ও সময় যথাযথ বলে বিবেচিত হবে তখনই জাতির সামনে অস্থায়ী সরকার উপস্থাপন করা হবে ও তা কাজ করতে শুরু করবে।"[১৩]

বিপ্লবের নেতার পক্ষ থেকে এই প্রথম বারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এ সংবাদ দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ইরানী জনগণ তাদের বিজয়কে সন্নিকটবর্তী দেখতে পায় ও এ ঘোষণা তাদের জন্যে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ হয়। ফলে বিপ্লবের প্রক্রিয়ার অপরিহার্য ধ্বংসকারিতার পাশাপাশি তারা আগামী দিনের দেশ গড়ার চিত্রও দেখতে পায়।

শাহের পলায়ন

শাহ্পুর বাখ্তিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগলাভের দশদিন পর ১৩৫৭ ফার্সী সালের ২৬শে দেই (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) তারিখে শাহ্ একটি রাজকীয় পরিষদ গঠন করে তার হাতে অস্থায়ীভাবে শাহী ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশ ত্যাগ করেন।[১৪]

বস্তুতঃ শাহের দেশ থেকে পলায়ন ছিল জনগণের বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এ যুগের ঘৃণ্যতম যে তাগূত সুদীর্ঘ ৩৭ বছর তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল এবং জোর করে তাদের জান-মাল-ইজ্জতের ওপর রাজত্ব করেছিল, জনগণ তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। শাহের পলায়নের সংবাদ শোনার পর ইরানী জনগণ যে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে তা ছিল নযীর বিহীন। সেদিনের আনন্দের দৃশ্য ইরানী জনগণ কোনদিনই ভুলবে না।

www.pathagar.com

ইমামের প্রত্যবর্তন

শাহের ইরান থেকে পলায়নের কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ করে ইমাম ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন। এ অপ্রত্যাশিত সংবাদ জাতির জন্য ছিল একটি বিরাট সুসংবাদ এবং বাখ্‌তিয়ারের মাথায় তা বজ্রপাতের ন্যায় আপতিত হয়। আমেরিকার দেয়া জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টিকারী ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে বাখ্‌তিয়ারের অবকাশ প্রয়োজন ছিল। তাই এ খবর শোনার পর বাখ্‌তিয়ার দিশাহারা হয়ে পড়েন। যদিও ইতিপূর্বে জনগণকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে বাখ্‌তিয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আয়াতুল্লাহ্‌ খোমেনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে কোন আপত্তি নেই,' তথাপি এ খবর শোনার সাথে সাথে তিনি বিমান বন্দর বন্ধ করে দেয়ার ও ইমামের দেশে প্রবেশ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন।

ইরানের জনগণ ইমামের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে ও আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। এ সময় দেশের অনেক এলাকায়ই জনগণ শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছিল ও শহরসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছিল; তারা সর্বশক্তিতে ইমামের প্রত্যাবর্তনের দাবী তুলল। অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক আলেম তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইমামের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা না পেলে তাঁরা সেখান থেকে বেরোবেন না। বস্তুতঃ তেহরান

ইমামকে অভ্যর্থনা জানাতে তেহরানের আযাদী স্কোয়ারে অপেক্ষমান জনসমুদ্রের অংশ বিশেষ

www.pathagar.com

ইমামকে অভ্যর্থনা জানাতে তেহরানের আযাদী স্কোয়ারে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মুসলিম মহিলাদের অংশবিশেষ

ইমামের আগমনের প্রতীক্ষায়

www.pathagar.com

১৯৭৯-র ১লা ফেব্রুয়ারী তেহরানের মেহর আবাদ বিমান বন্দরে বিমান থেকে হযরত ইমামের অবতরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ওলামায়ে কেরামের এ অবস্থান গ্রহণের ঘটনা ছিল ইসলামী আন্দোলনের সঠিক ধারার সংরক্ষণে তাঁদের পক্ষ থেকে গৃহীত অন্যতম ভাগ্য নির্ধারনী পদক্ষেপ।

ঐ সময় বাখ্‌তিয়ার মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিকে ইমামের দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। সংগ্রামী ওলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান কর্মসূচী — যাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন — সংগ্রামী জনতার জন্যে একটি স্থায়ী মিলনকেন্দ্র তৈরী করে ও এ সংগ্রামী জনশক্তির জন্যে নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। এভাবে আন্দোলনকে পথচ্যুত ও দুর্বল করার জন্যে বাখ্‌তিয়ার যে পরিকল্পনা করেন তা বানচাল হয়ে যায়।

এ দিনগুলোতে সারা ইরানে জনগণের বিক্ষোভ ও সরকারের পক্ষ থেকে হত্যার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। তেহরানে বিপুল সংখ্যক জনতা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হয় ও সেখানে মসজিদে অবস্থান গ্রহণকারী ওলামায়ে কেরামের ভাষণ শুনতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত পূর্বঘোষিত তারিখের ৬দিন পর ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১২ই বাহ্‌মান (পহেলা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ খৃস্টাব্দ) তারিখে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। জনগণ ইমামের জন্যে নযীরবিহীন অভ্যর্থনার আয়োজন করে। সম্ভবতঃ মানবজাতির ইতিহাসে কোন যুগেই কোথাও জনগণ তাদের কোন প্রিয় ব্যক্তিত্বকে এমন বিরাট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেনি।

www.pathagar.com

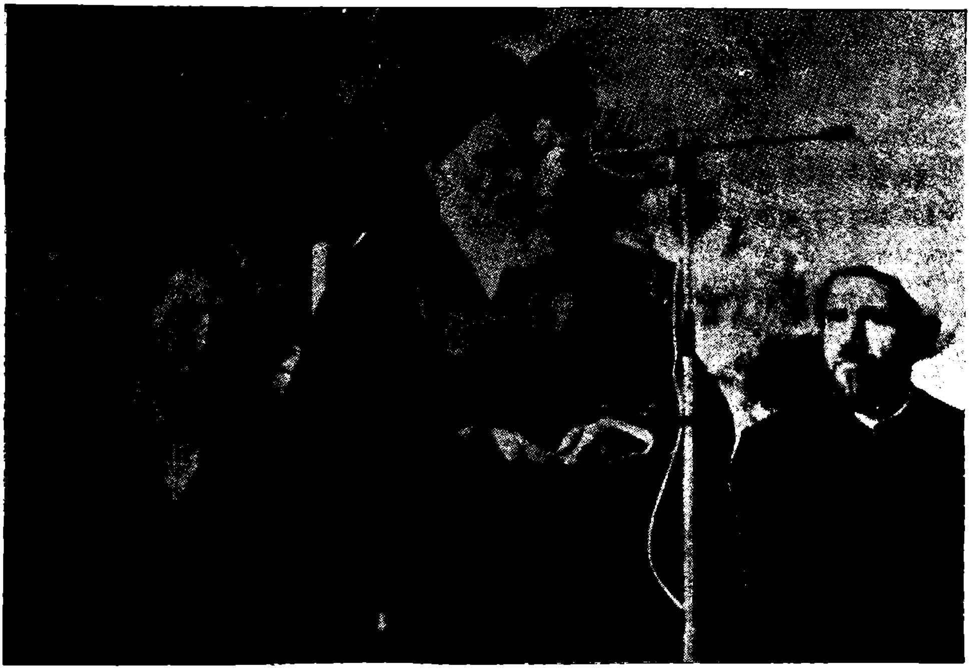

বেহেশতে যাহ্‌রায় হযরত ইমাম ভাষণ দিচ্ছেন

হযরত ইমাম খোমেনী তেহরানের মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এরপর তিনি শহীদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সরাসরি তেহরানের দক্ষিণ উপকণ্ঠে বেহেশতে যাহ্‌রা গোরস্থানে চলে যান। সেখানে তিনি সমবেত জনতার মহাসমুদ্রের সামনে প্রদত্ত ভাষণে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ

"... আমি সরকার মনোনীত করব। আমি এই সরকারের (বাখ্‌তিয়ার সরকারের) মুখে মুষ্টাঘাত হানব; আমি এ জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার মনোনীত করব।.."

অস্থায়ী সরকার গঠন

ইমাম খোমেনী বেহেশতে যাহ্‌রা থেকে দক্ষিণ তেহরানে এসে একটি সাধারণ বাড়ীতে ওঠেন। ইমামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর পরই তাঁকে দেখার জন্যে সারা দেশ থেকে তেহরানে জনস্রোত বইতে থাকে। জনতার প্লাবনে তেহরান ভেসে যাবার উপক্রম হয়। এদিকে জনগণ ইমামের অভ্যর্থনা উপলক্ষে নিজেদেরকে যেভাবে সংগঠিত করেছিল ক্রমান্বয়ে তা সুসংবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৫ই বাহ্‌মান (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ খৃস্টাব্দ) তারিখে ইমাম খোমেনী ইঞ্জিনীয়ার মেহ্‌দী বাযারগানকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন ও সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোন দল বা গোষ্ঠীকে বিবেচনায় আনেননি। এ কারণেই

www.pathagar.com

তিনি, বাযারগান নেহ্যাতে আযাদী-র নেতা হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবের সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে এ পদে নিয়োগদান করেন। জনগণ বিরাটাকারের মিছিল সহকারে ইমামের এ নিয়োগের প্রতি সমর্থন জানায়।

বস্তুতঃ ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৫ই থেকে ২২শে বাহ্মান (৪ঠা থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত ইরানে দু'টো সরকার ছিল। একটি ছিল ইসলামী বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার; হযরত ইমাম খোমেনীর আদেশবলে এ সরকার অস্তিত্ব ও বৈধতা লাভ করে এবং গোটা জাতি এ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে। দ্বিতীয়টি ছিল পলাতক শাহের মনোনীত বাখ্তিয়ারের সরকার যাঁকে এবং যাঁর সরকারের মন্ত্রীবর্গকে জনগণ, এমনকি অফিস-সমূহের বিপ্লব সমর্থক সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, মন্ত্রণালয়ে বা অন্য কোন অফিসে প্রবেশ করতে দেননি।

মেহেদী বাযারগান

বিমান বাহিনীর ঘটনা ঃ বিপ্লবের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ

জনগণ দলে দলে ইমামের সাথে সাক্ষাত করতে আসতে লাগল। সারা ইরান উত্তাল তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সবকিছু থেকেই এ আশু পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেল। বাখ্তিয়ার বিপদ সংকেত ঘোষণা করলেন; তিনি বললেন, আশু পরিবর্তন হবে সম্ভবতঃ এক ক্যু-দেতা; সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেলরা সম্ভবতঃ ক্যু-দেতা ঘটাবেন।

এদিকে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, বিশেষ করে বিমানবাহিনীর সদস্যরা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় এসে ইমামের সাথে সাক্ষাত করতে লাগল। তারা "সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক খোমেনী" বলে শ্লোগান দিয়ে ইমামের নিকট বায়আত হতে লাগল। ফলতঃ এরপর গণধিকৃত পাহ্লভী হুকুমতের ভাঙ্গা তরী বলতে কয়েক টুকরা বিচ্ছিন্ন তক্তার বেশী কিছু থাকল না।

২০শে বাহ্মান (৯ই ফেব্রুয়ারী) রাতে হঠাৎ করে জনগণ নিজ নিজ বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি তুলতে লাগল। কারণ, খবর এল যে, বিমান বাহিনীর যে সব সদস্য বিপ্লবে শামিল হয়েছে শাহী গার্ড বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ খবর শোনার সাথে সাথে জনতা সকল দিক থেকে বিমান বাহিনীর ঘাঁটির দিকে ছুটে চলল। সকাল পর্যন্ত বিমান বাহিনী ও শাহী গার্ড বাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষ এবং সেদিকে জনতার স্রোত অব্যাহত থাকল। বিমান বাহিনীর লোকেরা হিযবুল্লাহ্ জনতার সমাবেশ লক্ষ্য করে তাদের জন্যে বিমান বাহিনীর ঘাঁটির প্রবেশদ্বার খুলে দিল। অস্ত্রগুদামের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হল ও জনগণ সশস্ত্র হল।

www.pathagar.com

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ ঃ জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ

www.pathagar.com

ক্ষমতাচ্যুত শাহের বিশালয়তন মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলে বিপ্লবী জনতার আনন্দ প্রকাশ

www.pathagar.com

সামরিক শাসন ঘোষণা

জনগণ সশস্ত্র হওয়ার ফলে তেহরান শহরও জঙ্গী শহরে পরিণত হল। ২১শে বাহমান (১১ই ফেব্রুয়ারী) শনিবার বিকাল ২টায় তেহরান রেডিও-র—যা তখন সশস্ত্র বাহিনীর দখলে ছিল—খবরে বলা হয় যে, ঐদিন বিকাল ৪টা থেকে সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে ও ঐ সময় থেকে কেউ ঘরের বাইরে বেরোতে বা চলাফেরা করতে পারবে না।

এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, আমেরিকা তার সর্বশেষ প্রতারণাময় অপকৌশল কাজে লাগাতে চাচ্ছিল।

ভাগ্য নির্ধারণী সময়টি ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল। সবাই প্রতীক্ষা করছিল যে, এ হুমকির মোকাবিলায় হযরত ইমাম তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। ঘোষিত সামরিক শাসন শুরুর সময়ের সামান্য আগেই এ সামরিক শাসনের ঘোষণা বাতিল করে প্রদত্ত ইমামের ঘোষণা হাতে হাতে ও মুখে মুখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ইমাম এ ঘোষণায় বললেন ঃ

"... আজকের সামরিক শাসনের ঘোষণা একটি প্রতারণা ও শরীঅত বিরোধী কাজ, জনগণ যেন কোন অবস্থাতেই এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত না করে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনারা ভয় পাবেন না কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সত্যই বিজয়ী।..."[১৫]

জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে এল। সর্বত্র জনসমুদ্র তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল। সামরিক শাসনের ঘোষণা ব্যর্থ হয়ে গেল। এক পক্ষে অস্ত্র ধারণকারী জনতা ও তাদের সাথে যোগদানকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা, অপরপক্ষে ট্যাঙ্কবাহিনী, শাহী গার্ড বাহিনী এবং কোন কোন সামরিক কেন্দ্র ও পুলিশ ব্যারাক; দু'পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল।

বিপ্লবের বিজয়

শেষ পর্যন্ত ২২শে বাহ্‌মান (১১ই ফেব্রুয়ারী) সমুপস্থিত হল। জনতা হাজারে হাজারে সামরিক ঘাঁটিসমূহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হল ও হাজার হাজার শহীদ উৎসর্গ করার বিনিময়ে সব জায়গাতেই জয়লাভ করল। রেডিও-টেলিভিশন সামরিক ব্যক্তিদের দখল থেকে মুক্ত হল; ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ও শাহী সরকারের পতনের সংবাদ সারা দেশের জনগণ ও সকল বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে গেল। বিপ্লব বিজয়ী হল এবং ইরানী জাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগ ও বিশ্বের সকল মুসলিম ও মুস্তাযআফ জনগণের জন্যে এক নতুন ইতিহাসের শুভ সূচনা হল। কারণ, ইসলামের প্রথম যুগের চৌদ্দ শতাব্দী পর বিশ্বের বুকে পুনরায় একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হল।

টীকা ঃ

(১) نوفل لو شاتو

(২) ۱۱۲ -ص ۲ صحیفهٔ نور - جلد

(৩) শরৎকাল ঃ মেহের, আবান ও অযার এই তিন মাস (২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর)। (১৯৭৮)

www.pathagar.com

(৪) ২৩ শে সেপ্টেম্বর—২১শে নভেম্বর (১৯৭৮)।

(৫) ازهاری

(৬) جلد-نور صحيفة ٣ ص-٢٢٥-٢٢٧

(৭) نصر من الله و فتح قريب – আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় সন্নিকটবর্তী। (সূরাহ্ ছাফ ঃ ১৩)

(৮) كل يوم عاشورا وكل ارض كربلا

(৯) شوارى مركزى

(১০) جواد باهنر – ডঃ হুজ্জাতুল ইসলাম জাওয়াদ বহোনার পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং মুজাহিদীনে খাল্‌কের ঘটানো বিস্ফোরণের ফলে শহীদ হন।

(১১) ايت الله موسوى اردبيلى – তিনি বেশ কয়েক বছর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

(১২) جلد-نور صحيفة ۴ ص-۶۱

(১৩) جلد-نور صحيفة ۴ ص-۲۰۷

(১৪) শাহ্ জনগণের ভয়ে এক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন বলে ঘোষণা দেন; সকলের দৃষ্টি যখন সেদিকে তখন সংবাদ সম্মেলনের জন্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি দেশত্যাগ করেন। – অনুবাদক

(১৫) جلد-نور صحيفة ۵ ص-۶۹

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরান

১৩৫৭ ফার্সী সালের ২২শে বাহ্‌মান মোতাবেক ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হয় এবং বিপ্লবী জনগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পরবর্তীকালে অসংখ্য ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্র হিসেবে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দৃষ্টিতে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বের রাজনীতিবিদগণ ও সাধারণ জনগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে ইরানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ বিপ্লব ছিল এমন একটি আন্দোলন, যা আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভর না করে এবং তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। তাই এ বিপ্লব বিশ্বের মুস্তায্‌আফ জনগণ, বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা দাম্ভিক আধিপত্যকামীদের জুলুমের প্রাসাদসমূহে প্রকম্পনের সৃষ্টি করে। এ কারণেই শুরু থেকেই ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে পরাশক্তিবর্গ সীমাহীন শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে থাকে।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পরবর্তী ইরানে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তার গুরুত্ব এতই বেশী ছিল যে, সে তুলনায় বিপ্লবের বিজয় পূর্ববর্তী বছরসমূহ এমনকি ১৩৫৭ ফার্সী সালকেও শান্ত ও কম ঘটনাপূর্ণ সময় বলে মনে হবে। গ্রন্থের সীমিত পরিসর বিবেচনা করে এখানে অতি সংক্ষেপে এর ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পরবর্তী ইরানের সাথে পরিচিতি লাভের জন্য এ সময়টিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করাই শ্রেয়। তা হচ্ছে ঃ (১) ইসলামী বিপ্লবের বিজয় থেকে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ কাল, (২) অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধশুরুর পূর্বকাল, (৩) যুদ্ধের সূচনা থেকে আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ পর্যন্ত সময়কাল (৪) আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ থেকে হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ইন্তেকাল ও আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ীর নেতৃত্ব লাভ এবং (৫) আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ীর নেতৃত্বের যুগ।[১]

এক ঃ ইসলামী বিপ্লবের বিজয় থেকে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগকাল

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি একটি সরকার গঠন করবেন। অতঃপর ১৩৫৭ ফার্সী সালের ১৫ই বাহ্‌মান মোতাবেক ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম তাঁর জারীকৃত এক আদেশে ইঞ্জিনিয়ার মেহ্‌দী বাযারগানকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তাঁর আদেশবলেই এ অস্থায়ী সরকার বৈধতা লাভ করে। এ সরকারকে দেশশাসন ছাড়াও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার লক্ষ্যে গণভোট অনুষ্ঠান এবং নতুন শাসন ব্যবস্থাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

২২শে বাহ্‌মান (১১ই ফেব্রুয়ারী) ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে বাযারগানের সরকার অস্থায়ী ইসলামী বিপ্লবী সরকার হিসেবে দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহন করে। তবে সরকারের ওপরে ছিল

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের স্থান। অন্যদিকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বিপ্লবের নেতা হিসেবে বিপ্লবী পরিষদ ও অস্থায়ী সরকার উভয়ের কাজকর্মের ওপর তথা সকল বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখতেন।

বিপ্লবের বিজয়ের পরবর্তী কয়েক দিন ও কয়েক সপ্তাহ দেশশাসন অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদিও তাগূতী শাসন ব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছিল, কিন্তু নতুন শাসন ব্যবস্থা তখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে তেল রফতানী স্থগিত রাখা ও অবিরত ধর্মঘটের ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পুরোপুরি শূন্য হয়ে পড়েছিল। শাহের আমলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচালনাকার্যে যেসব বিদেশী উপদেষ্টা সাহায্য করতেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই বহিষ্কার করা হয়েছিল।

তাগূতী সরকারের নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকবৃন্দ দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন বা গ্রেফতার হয়ে আদালতে সোপর্দ হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবী পরিষদ ও অস্থায়ী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় চালু করা। সরকারের আরেকটি গুরুদায়িত্ব ছিল বিপ্লব বিজয়কালীন উচ্ছ্বাসদীপ্ত এ বিশাল দেশে শান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনা ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাগূতী সরকারের কর্তাব্যক্তিদের দেশ থেকে পলায়ন ও তার সেবাদাসদের শয়তানী কর্মকান্ড ও তৎপরতা প্রতিহত করা। সমস্যার বিশাল পাহাড়ের পাশাপাশি জনতার সীমাহীন নিষ্কলুষ মহাসমুদ্র ছিল বিপ্লবের সাথী ও সহায়ক। ইরানের মুসলিম জনগণকে বিপ্লবের পূর্বে অত্যন্ত কঠিন অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছিল, কিন্তু বিজয়ের কারণে তারা এতই খুশী ও আনন্দিত ছিল যে, তারা তাদের সর্বশক্তি ইমাম ও বিপ্লবের খেদমতে নিয়োজিত করে।

বিপ্লবের বিজয়ের পরদিন অর্থাৎ ২৩শে বাহ্‌মান মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিপ্লবের প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়— হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ফরমানে ইসলামী বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়। বিপ্লবী জনগণ, বিশেষ করে যেসব যুবক বিপ্লবের বিজয় প্রক্রিয়ায় অস্ত্র ধারণ করেছিল, তারা মসজিদে মসজিদে সমবেত হল এবং প্রতিটি মসজিদকে কেন্দ্র করে একক অধিনায়কত্বের অধীনে কমিটিতে রূপান্তরিত হল। তারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাবেক সরকারের অপরাধী কর্তাব্যক্তিদের গ্রেফতারের দায়িত্ব গ্রহণ করল। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীগণ— যাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন নোহযাতে আযাদী ও জেব্‌হেয়ে মিল্লীর লোক— মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দেশের চাকা সচল হল।

হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানী

এ সময় ইরানের দ্বীনদার বিপ্লবী মুসলিম জনগণ সঠিক ও কার্যকরভাবে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

তৎপরতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করার চিন্তা করে। এ চিন্তার ফলস্বরূপ তাদের অধিকাংশই নবগঠিত হেয্বে জোম্হুরীয়ে ইসলামী[২] দলে সদস্যপদ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ১৩৫৭ ফার্সী সালের বাহ্মান মাসে বিপ্লবের বিজয়ের সামান্য পূর্বে এ দল আত্মপ্রকাশ করে। আয়াতুল্লাহ্ বেহেশ্তী, আয়াতুল্লাহ্ মুসাভী আর্দেবিলী, আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী, হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানী, হুজ্জাতুল ইসলাম জাওয়াদ বাহোনার প্রমুখ বিপ্লবী আলেম— যাঁদের সকলেই ছিলেন হযরত ইমামের ঘনিষ্ঠ সহচর— এ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৩৫৭ ফার্সী সালের ১০ই এস্ফান্দ (১লা মার্চ, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) হযরত ইমাম কোম গমন করেন। কোমের জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। যে শহর থেকে তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর পূর্বে তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন, আবার তিনি সে শহরে ফিরে এলেন।

এ সময় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করণীয় ছিল, তা হচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রশ্নে রেফারেণ্ডাম বা গণভোট অনুষ্ঠান। যদিও বিপ্লবের বিজয়ের পূর্বে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত ইরানী জনগণ লাখে লাখে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে ইসলামী হুকুমতের সপক্ষে তাদের অকাট্য রায় ঘোষণা করেছিল, তা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনগতভাবে এ সমর্থন ব্যক্ত করাই ছিল অধিকতর উত্তম। তাই ১৩৫৮ ফার্সী সালের ১০ই ফার্ভার্দীন (৩০শে মার্চ, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, এতে জনগণ ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রশ্নে "হা" এবং "না" ভোট প্রদান করে। গণভোটে অংশ গ্রহণকারীদের শতকরা ৯৮ ভাগের বেশী "হা" সূচক ভোট প্রদান করে। ১২ই ফার্ভার্দীন (১লা এপ্রিল) গণভোটের রায় ঘোষণা করা হয় এবং এ দিনটিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র দিবস নামকরণ করা হয়।

আয়াতুল্লাহ্ তালেকানী

বিপ্লব বিজয়ী হবার কয়েক মাসের মধ্যে আরো দু'টি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করা হয়। এ দু'টি সংস্থা হচ্ছে সেপাহ্ পাস্দারানে এন্কেলাবে ইসলামী"[৩] এবং "জেহাদে সাযেন্দেগী[৪]। এছাড়া হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) আয়াতুল্লাহ্ তালেকানীকে তেহরানের জুম্আ ইমাম মনোনীত করেন এবং তাঁর ইমামতিতে বিপ্লবোত্তর তেহরানের প্রথম জুম্আ নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হযরত ইমাম পবিত্র রমযান মাসের শেষ শুক্রবারকে বিশ্ব কুদ্স্ দিবস হিসেবে

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন এবং ইরানী জনগণ ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে প্রথম বারের মত বিশ্ব কুদ্‌স্‌ দিবস পালন করে। এ বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ইরানের বিপ্লবী মুসলমানরা বিশ্বের মুসলিম জনগণের উদ্দেশে একথাই ঘোষণা করে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসগ্রাসী সরকার ও জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা সর্বদা উড্ডীন রাখতে হবে।

বিপ্লবী পরিষদ ও অস্থায়ী সরকারের ওপর অর্পিত আরেকটি গুরুদায়িত্ব ছিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্যে বিশেষজ্ঞ পরিষদ নির্বাচন এবং খসড়া সংবিধানের ওপর গণভোট গ্রহণ। ১৩৫৮ ফার্সী সালের মোর্‌দাদ মাসে[৫] বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে মাসেই পরিষদের উদ্বোধন করা হয়। এর কিছুদিন পর বিশেষজ্ঞ পরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য আয়াতুল্লাহ্‌ তালেকানী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, যা ছিল হযরত ইমাম ও ইরানের বিপ্লবী জনগণের জন্য এক বিরাট শোকাবহ ঘটনা।

ইতিমধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১২ই অযার (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) তা গণভোটে দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধান অনুমোদিত হয়।

এর এক মাস আগে ১৩৫৮ ফার্সী সালের ১৩ই অবান (মোতাবেক ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। এ দিন হযরত ইমামের অনুসারী বিপ্লবী ছাত্ররা "গোয়েন্দাগিরির আখড়া"[৬] নামে সুপরিচিত তেহ্‌রানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে।

ছাত্রদের মার্কিন দূতাবাস দখলের পটভূমি ছিল এই যে, ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌ মোহাম্মদ রেযা পাহলভী দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পর কয়েক মাস যাবত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু যেহেতু তাঁর স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসন ও দুর্নীতি সম্পর্কে সারা দুনিয়াই অবগত ছিল, সেহেতু কোন দেশই তাঁকে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দিতে রাজী হয়নি। কিন্তু আমেরিকার একান্ত বাধ্যগত সেবাদাস হিসেবে যেমন শাহের প্রতি আমেরিকার দুর্বলতা ছিল, অন্যদিকে কোন না কোন ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায় শাহ্‌কে পুনরায় ইরানের শাসন ক্ষমতায় বসানোর চিন্তাও আমেরিকা বর্জন করেনি। এ কারণে চিকিৎসার বাহানায় আমেরিকা শাহ্‌কে সে দেশে যাবার ও অবস্থানের অনুমতি দেয়। আমেরিকা ইতিপূর্বে ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, যেসব ষড়যন্ত্র করেছে এবং ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যেভাবে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে, সে প্রেক্ষাপটে শাহের আমেরিকায় প্রবেশের মানে ছিল ইরানের এ গণদুশমনের প্রতি আমেরিকার সুস্পষ্ট সমর্থন ও ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এ কারণে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমেরিকার এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। কিন্তু এ প্রতিবাদে কোন লাভ হল না। এ প্রেক্ষিতে ১৩৫৮ ফার্সী সালের ১৩ই অবান সমুপস্থিত হয়।

এ দিনটি ছিল হযরত ইমাম খোমেনীকে ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করার বার্ষিকী। তেমনি এদিন ছিল তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হত্যার প্রথম বার্ষিকী। এ উপলক্ষে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররা নিজেদেরকে "ইমামের ধারার অনুসারী মুসলিম ছাত্রগণ"[৭] নামে অভিহিত করে। (পরবর্তী সময়ে তারা এ নামেই সুপরিচিতি লাভ করে।) ছাত্ররা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর দলে দলে বিক্ষোভ মিছিলসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং মার্কিন দূতাবাসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা মার্কিন দূতাবাসের কাছে আসার পর কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দূতাবাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এর ভিতরে প্রবেশ করে। তারা অল্প সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যেই দূতাবাস দখল করে এবং সেখানে অবস্থানরত আমেরিকানদের পণবন্দী করে। তারা ঘোষণা করে যে, আমেরিকা ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌কে বিচারের জন্য ইরানী জাতির নিকট অর্পণ না করা পর্যন্ত পণবন্দীদের মুক্তি দেবে না।

মার্কিন দূতাবাস বিপ্লবী ছাত্রদের দখলে আসার পর সেখানে রক্ষিত সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র তাদের হাতে পড়ে। এসব দলিলপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় তেহরানে এবং ইরানের অন্যান্য এলাকায় ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র চলছিল তাতে আমেরিকার হাত ছিল। আমেরিকা তার এজেন্টদের মাধ্যমে এসব ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য করত। ইসলামী বিপ্লবের ওপর আঘাত হানার লক্ষ্যে যে সব ব্যক্তি গোপনে আমেরিকান গোয়েন্দাদের সাথে যোগাযোগ রাখত তাদের অনেকের নাম এসব দলিলপত্র থেকে হাতে এসে যায়।

ছাত্রদের দ্বারা তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল ও কয়েক ডজন আমেরিকানকে পণবন্দী করে রাখার খবর বোমা বিস্ফোরণের ন্যায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় আমেরিকানরা পুরোপুরি দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)ও বিশেষজ্ঞ পরিষদ ছাত্রদের এ পদক্ষেপকে সমর্থন করেন। জনসাধারণও "গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া" নামে সুপরিচিত মার্কিন দূতাবাসের আশেপাশের সড়কসমূহে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও সমাবেশ করে ছাত্রদের এ পদক্ষেপের প্রতি স্বীয় সমর্থন ঘোষণা করে। কিন্তু বাযারগানের অস্থায়ী সরকার এ পদক্ষেপে খুবই অসন্তুষ্ট হয়।

বিপ্লবের বিজয়ের পর খুব শীঘ্রই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সমগ্র জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ও ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অস্থায়ী সরকারের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

হযরত ইমাম খোমেনী ছিলেন একজন বিপ্লবী নেতা; তিনি আমেরিকাকে ইসলাম ও ইসলামী ইরানের আপোষহীন দুশমন মনে করতেন। তেমনি তিনি আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু অস্থায়ী সরকার এ ধরনের পরিবর্তনকে ভয় করত এবং মনে করত যে, আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার সাথে সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব। ইমাম মনে করতেন, জনসাধারণের আগের মতই বিপ্লবের মঞ্চে উপস্থিত থাকা অপরিহার্য এবং যে অগণিত সাধারণ মানুষ বিপ্লবকে বিজয়ী করেছে কেবল তাদের ওপর নির্ভর করেই বিপ্লবের হেফাযত করা সম্ভব। কিন্তু অস্থায়ী সরকারের নেতারা বিপ্লবের মঞ্চে জনতার অব্যাহত উপস্থিতিকে পছন্দ করতেন না। বরং তাঁরা এ ধরনের উপস্থিতিকে সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ ও ঝামেলা সৃষ্টি বলে গণ্য করতেন। তাঁদের মত ছিল এই যে, শাহের দেশত্যাগের ফলে তাগূতী সরকারের মাথা বিদায় নিয়েছে, এমতাবস্থায় সরকারের দেহের প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৌলিক পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিণতি ছিল এই যে, যেসব লোক ইসলাম ও বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল না অথচ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে বসে ছিল— যা বিপ্লবী জনগণকে হতাশ ও বিপ্লব সম্পর্কে উদাসীন করে তুলতে পারত— তাদেরকে ঐসব কেন্দ্রে বহাল রাখা হবে। দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্য মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া দখলের ঘটনার মধ্য দিয়ে চরমে উপনীত হয়। ফলে এ ঘটনার দু'দিন পর, বিপ্লবের বিজয়ের নয় মাসের মাথায় অস্থায়ী সরকার পদত্যাগ করে।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয় থেকে শুরু করে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ পর্যন্ত ইরানে তিক্ত-মধুর বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী— যারা সাধারণ গণমানুষের পথ থেকে নিজেদের চলার পথকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল এবং জনগণ যাদেরকে "ক্ষুদ্রগোষ্ঠী"[৮] নামে আখ্যায়িত

www.pathagar.com

করত— ক্ষমতা দখলের চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং এ কারণে ইসলামী বিপ্লবের বিরোধিতা করার জন্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণেই তারা বিরত থাকেনি। ফেদাইয়ানে খাল্‌ক্‌ গোষ্ঠীর গেরিলারা, হেয্‌বে তুদেহ্‌, জনগণের মধ্যে "মুনাফিকীন" নামে পরিচিত মুজাহিদীনে খাল্‌ক্‌ এবং আরো কয়েকটি দল ও গোষ্ঠী-যাদের এক একটির সদস্যসংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিলনা—তারা সাধ্যানুযায়ী "গণতন্ত্র" ও "স্বাধীনতা"র নামে শ্লোগান তুলে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এবং বইপুস্তক লিখে ইসলাম, ইসলামী বিপ্লব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গুজব রটনা করতে ও প্রচারণা চালাতে থাকে, আর যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই অস্ত্র ধারণ করে বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডের আশ্রয় নেয়। এ জাতীয় সংঘর্ষ দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় কুর্দিস্তানে ও তুর্কামান ছাহ্‌রায়[৯] ছিল প্রচণ্ডতর।

তারা যেকোন পন্থায় অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা গোত্রীয়, ভাষাগত ও মাযহাবী মতপার্থক্য বৃদ্ধির জন্যে উস্কানি প্রদান করতে থাকে। আর এ সকল ষড়যন্ত্রে কতক বিদেশী সরকারের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই হিয্‌বুল্লাহ্‌ যুবকরা আত্মোৎসর্গ সহকারে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়।

এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিয়োগান্তক ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বহু প্রভাবশালী বিপ্লবী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের হত্যাকাণ্ড। বিপ্লব বিরোধী বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ভাড়াটে এজেন্টরা নিজেদেরকে "ফোরকান"[১০] গেরিলাগোষ্ঠী নামে পরিচয় প্রদান করে; তারা বিপ্লবের বিজয়ের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল কারানীকে[১১] হত্যা করে। জেনারেল কারানী ছিলেন বিপ্লবোত্তর ইরানের সকল বাহিনীর সম্মিলিত সংস্থার প্রধান। এরপর তারা অনন্য সাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য আয়াতুল্লাহ মোতাহ্‌হারীকে, তাব্‌রীযের জুম্‌আ ইমাম আয়াতুল্লাহ কাযী তাবাতাবায়ীকে[১২] ও ইমামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হাজী মাহ্‌দী এরাকীকে[১৩] কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করে। তারা হুজ্জাতুল ইসলাম হাশেমী রাফসানজানীকেও হত্যার চেষ্টা করে। এসব বিপ্লব বিরোধী গোষ্ঠী খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে গণঅসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষকদের ফসলের পালায় অগ্নিসংযোগ করে এবং তেলের পাইপ-লাইনে বিস্ফোরণ ঘটায়।

বিপ্লবের বিজয়ের পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে শাহী সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই গ্রেফতার হন। এদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোভায়দা ও সাভাকের সাবেক প্রধান জেনারেল নাছিরীর ন্যায় কয়েক জনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। পাহ্‌লভী পরিবারের ও তাদের সাথে জড়িতদের ধনসম্পদ এবং তাগূতী সরকারের তাঁবেদার বড় বড় পুঁজিপতি ও জমিদারদের সকল সম্পদ জাতীয় স্বার্থে বাজেয়াফত করা হয়। অন্যদিকে দেশের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না থাকা সত্ত্বেও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান ও কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শাহের আমলে প্রণীত ক্যাপিচুলেশন আইন বাতিল করা হয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইসরাইলের সাথে আপোষের দায়ে মিসরের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।

দুই ঃ অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধশুরুর পূর্বকাল

বিপ্লবের বিজয়ের পর ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ প্রধানতঃ আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের কাজে ব্যস্ত ছিল। অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগের পর বিপ্লবী পরিষদ সরাসরি দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর নতুন করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়; নবগঠিত মন্ত্রিসভায় অস্থায়ী সরকারের অনেক মন্ত্রীই বাদ

www.pathagar.com

পড়েন, তাঁদের পরিবর্তে অনেক নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় স্থানলাভ করেন। নতুন মন্ত্রিসভায় বিপ্লবী পরিষদের কয়েকজন সদস্যও স্থানলাভ করেন। এঁদের মধ্যে হাশেমী রাফসানজানী অন্যতম; তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ নতুন পর্যায়ের শুরুতে ইরানের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া দখল থেকে উদ্ভূত সমস্যা। একদিকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ), সরকার ও জনগণ মার্কিন গুপ্তচরদের পণবন্দী হিসেবে গ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছিলেন ও আমেরিকার নিন্দা করছিলেন, অন্যদিকে আমেরিকা যে কোন পন্থায় পণবন্দীদের মুক্ত করার জন্যে বদ্ধপরিবার ছিল।

শুরু থেকেই ইমাম খোমেনী (রঃ) আমেরিকার সাথে কোন আলোচনার প্রস্তাবই মেনে নেননি, আমেরিকার কোন হুমকিতে ভয় না পাওয়ার জন্যে তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তেহরান ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশী গরম খবরের উৎস। আমেরিকান ও আমেরিকা তাবেদার সরকারগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে এবং হুমকি প্রদর্শনমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে আমেরিকায় ও ইউরোপে বসবাসকারী ইসলামপন্থী ইরানী ছাত্রগণ এবং অন্যান্য দেশের মুস্তায্আফ জনগণ বিক্ষোভ মিছিল করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে সমর্থন জানাতে থাকে। এক্ষেত্রে ইরানের নীতি-অবস্থান ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্যদিকে আমেরিকার নীতি এমন এক জটিল গিঁটের সাথে তুলনীয় ছিল যা খোলার উপায় তার জানা ছিল না।

১৩৫৮ ফার্সী সালের অযার মাসে[১৪] বিপ্লবী আলেম তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোফাত্তেহ্[১৫] শাহাদৎ বরণ করেন। এর কিছুদিন পর তাব্রীযে "হেযবে মুসলমান"[১৬] বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। এ দলটি ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পারে গঠিত হয়। এ দলটি হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত ও বিজয় অর্জনকারী আন্দোলনের মোকাবিলায় ইসলাম ও মারজায়িআতের ছদ্মাবরণে একটি পাল্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণের সর্তকতার কারণে এ দলটি শক্তি অর্জন করতে পারেনি। স্বয়ং আযারবাইজানের জনসাধারণই তাব্রীযের বিশৃঙ্খলা দমন করে। অন্যদিকে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের ও কম্যুনিস্টদের সাথে দলটির সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যাবার পর হেযবে মুসলমান বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৩৫৮-র বাহ্মান মাসে[১৭] ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট পদের প্রথম নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আবুল হাসান বানি ছাদর্ বিজয়ী হন। ইমাম খোমেনী সংবিধান অনুযায়ী তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করে ফরমান জারী করেন। এছাড়া সমন্বয় সাধন ও অধিকতর বাস্তবায়ন ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে ইমাম খোমেনী তাঁকে বিপ্লবী পরিষদের প্রধান হিসেবে মনোনীত করেন এবং সংবিধান অনুযায়ী ইমাম স্বয়ং সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থাকা সত্ত্বেও বানি ছাদর্কে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে সকল বাহিনীর (ভারপ্রাপ্ত) সর্বাধিনায়ক মনোনীত করেন। অন্যদিকে ইমাম আয়াতুল্লাহ্ বেহেশতীকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান নিযুক্ত করেন এবং বিচার বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন।

১৩৫৮ ফার্সী সালের এস্ফান্দ মাসে[১৮] ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রথম মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর (পার্লামেন্টের) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৫৯ ফার্সী সালের খোর্দাদ মাসে[১৯] মজলিসের উদ্বোধন করা হয়। আর মজলিস উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশ আরো একটি আইনগত ভিত্তির ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়াল। হাশেমী রাফসানজানী মজলিসের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন।

সংবিধান অনুযায়ী মজলিসের পাশাপাশি সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ গঠিত হয়। এ সময়ের

www.pathagar.com

পুরোটা জুড়েই কুর্দিস্তান ও তুর্কামান্ ছাহ্‌রার ন্যায় এলাকাগুলোতে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মাযহাবী ও গোত্রীয় পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তি বিশেষতঃ সেপাহ্ পাস্‌দার বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর দ্বীনদার অফিসার ও সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইসলামের বীর সেনানায়ক শহীদ ডঃ চামরান এসব যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন ও বিরাট ত্যাগ সহকারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

এ যুগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা। ফার্সী ১৩৫৯ সালের বসন্ত কালের শুরুতে[২০] সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়।

বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকেই অনুভূত হতে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ জনগণের ইসলামী ও বিপ্লবী ধারার সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিশীল নয়। অবশ্য বিশ্বদ্যিালয়সমূহে বহু দ্বীনদার ও বিপ্লবী শিক্ষক ছিলেন, এবং অধিকাংশই দ্বীনদার ও বিপ্লবী ছাত্রদের সাথে ছিলেন। কিন্তু কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী শিক্ষকের, এবং তাঁদের বিপ্লব বিরোধী বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্য কিছু ছাত্রের উপস্থিতির কারণে সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ যথাযথ ছিল না। হযরত ইমামের ভাষায়, এরা বিশ্ববিদ্যালয়কে রণাঙ্গনে পরিণত করেছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বীনদার ছাত্র-ছাত্রীরা এক বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বন্ধ করে দেয় এবং তারা এগুলোর পরিস্থিতির পরিবর্তন ও সংশোধন দাবী করে। 'ইসলামী বিপ্লবী পরিষদও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বন্ধ ঘোষণা করে। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংস্থা"র[২১] নিকট প্রেরিত এক বাণীতে এ সংস্থার সদস্যদের প্রতি 'ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ভবিষ্যত সাংস্কৃতিক ধারা নির্ধারণ; দ্বীনদার, নিষ্ঠাবান ও সচেতন শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচন ও তৈরী করা এবং ইসলামের শিক্ষা-বিপ্লবের অন্যান্য বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য" আহ্বান জানান।

তাবাসে আমেরিকার ব্যর্থতা : ১৩৫৯ ফার্সী সালের ওর্দীবেহেশ্‌ত মাসে[২২] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ মাসে আমেরিকা মার্কিন পণবন্দীদের উদ্ধার করার লক্ষ্যে ইরানে এক অভিযান পরিচালনা করে। আমেরিকার পরিকল্পনা ছিল, পারস্য উপসাগর থেকে বিমান ও হেলিকপ্টারযোগে তার সৈন্যরা ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং রাতের বেলা গোপনে তেহরান পৌঁছবে ও মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়ে সেখান থেকে পণবন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মার্কিন সৈন্যদের অবতরণস্থল তাবাসে বালুঝড়ের কারণে আমেরিকার এ হামলা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়; মার্কিন হেলিকপ্টারগুলোতে আগুন ধরে যায় ও তাদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। ফলে আমেরিকানরা তেহরানে না এসেই ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা সহকারে বেশ কয়েকটি বিমান ও হেলিকপ্টার এবং বেশ কিছু পরিমাণ অন্যান্য উপকরণ মরুভূমির বুকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ক্যু-দেতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ : ১৩৫৯ ফার্সী সালের তীর মাসে[২৩] ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিত এক ক্যু-দেতার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। ক্যু-দেতা পরিকল্পনার নায়কদের মধ্যে কয়েকজন ছিল ক্ষমতাচ্যুত তাগূতী সরকারের সমর্থক সামরিক অফিসার। তারা বিমানযোগে জামারানে[২৪] হযরত ইমামের বাসভবনের ওপর বোমাবর্ষণ করার পরিকল্পনা করেছিল। ইসলামী বিপ্লবী কমিটি ও সেপাহ্ পাস্‌দারানে এনৃকেলাবে ইসলামীর সদর দফতরে হামলা চালানোও তাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর কতক দ্বীনদার ও বিপ্লবী লোক এ ক্যু-দেতার ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানতে পেরে দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেন। ফলে ক্যু-দেতা পরিকল্পনা-র নায়করা বন্দী হয় এবং তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তারা স্বীকার করে যে, বিভিন্ন বিদেশী সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে এ ক্যু-দেতা-র পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছিল।

ক্ষমতাচ্যুত শাহ্ দীর্ঘ দেড় বছর বিভিন্ন দেশে ভবঘুরের জীবন কাটানোর পর ১৩৫৮ ফার্সী সালের মোর্‌দাদ মাসে[২৫] মিসরে এসে মারা যান। এভাবে যে তাগূতী স্বৈরশাসক দীর্ঘ ৩৭ বছর ইরানী জনগণের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিলেন, ইরানকে বিদেশীদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং জুলুম-অত্যাচার, অপরাধ ও দুর্নীতির দ্বারা দেশের আবহাওয়াকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করেছিলেন, তার কলঙ্কিত জীবনের চির অবসান ঘটে।

শহীদ মোহাম্মদ আলী রাজাই

রাজায়ীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ঃ এ যুগের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর অন্যতম ছিল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ। বানি ছাদ্‌র্‌ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর স্বীয় কর্মনীতিতে পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি ইমাম ও দ্বীনদার বিপ্লবী মুসলিম জনগণ থেকে দূরে সরে গেলেন। "সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক"," ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি" এবং "দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট" পদগুলো তাঁর মধ্যে অহঙ্কার ও আত্মপ্রতারণার সৃষ্টি করে। তিনি অনেক বিষয়েই ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ ও মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের সময় এ মতপার্থক্য অনেকখানি প্রকাশ হয়ে পড়ে। বানি ছাদ্‌র এমন লোকদের মধ্য থেকে কাউকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করত চাচ্ছিলেন যাঁদেরকে অনুমোদন দিতে মজলিস প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে মজলিস এমন লোকদের মধ্য থেকে কাউকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে ছিল বানি ছাদ্‌র্‌ যাঁদের কাউকে এ পদের জন্যে মনোনীত করাতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বানি ছাদ্‌র ইমাম এবং দ্বীনদার ও বিপ্লবী মুসলিম জনগণের আস্থাভাজন মোহাম্মাদ আলী রাজায়ীকে[২৬] প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হন। তাঁর প্রস্তাব মজলিসে উপস্থাপিত হলে মজলিস তাঁকে অনুমোদন প্রদান করে। ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বানি ছাদ্‌রের সাথে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। এ মতপার্থক্য বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজায়ী তাঁর মনোনীত মন্ত্রিসভার তালিকায় বানি ছাদ্‌রের সম্মতি আদায়ে সক্ষম হন এবং অনুমোদনের জন্যে মজলিসে পেশ করেন। ১৩৫৯ ফার্সী সালের ৩০শে শাহ্‌রীভার (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০) মজলিস তাঁর মনোনীত মন্ত্রীদের প্রতি আস্থাসূচক রায় প্রদান করে।

বস্তুতঃ ১৩৫৮ ফার্সী সালের আবান মাস থেকে ১৩৫৯ ফার্সী সালের শাহ্‌রীভার পর্যন্ত দশমাস সময়কাল ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল ও কঠিন সময় ছিল। এ সময় একদিকে

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বীর সৈনিকদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের একটি দৃশ্য

বিপ্লবীরা দেশের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে বিদেশী দুশমনদের সুস্পষ্ট মদদপুষ্ট বিপ্লব বিরোধীরা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে বিপ্লবের অগ্রযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। তবে বিপ্লব বিরোধীরা তাদের কোন চেষ্টায়ই সফল হয়নি এবং বিপ্লব পূর্ণ শক্তিতে স্বীয় পথে এগিয়ে যেতে থাকে। ইমামের নেতৃত্ব, জনগণের ঈমান ও ঐক্য এবং বিপ্লবের শহীদগণের আত্মত্যাগ দুশমনদের ষড়যন্ত্র সমূহের ওপর জয়লাভের মূল কারণ ছিল।

তিন ঃ যুদ্ধের সূচনা থেকে আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ পর্যন্ত সময়কাল

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ফলে পরাশক্তিবর্গ যে ইরানে তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে শুধু তাই নয়, বরং তারা অন্যান্য মুসলিম দেশে বিপ্লবের বিস্তারলাভের ব্যাপারেও খুবই শংকিত হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা ইসলামী বিপ্লবের ওপর আঘাত হানার জন্যে কোন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণেই দ্বিধা করেনি। কিন্তু তাদের কাছে যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও গেরিলা গোষ্ঠীগুলোর নাশকতামূলক পদক্ষেপসমূহ বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম নয়, তখন পরাশক্তিবর্গ ইরানের প্রতিবেশী ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করার জন্য উস্কানি ও উৎসাহ প্রদান করে।

এ সময় ইরানে সবেমাত্র সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন শুরু হয়েছে; একটি ব্যাপক ভিত্তিক যুদ্ধে যোগদানের মত কোন প্রস্তুতিই তার ছিল না। সেপাহ্ পাস্দার বাহিনীও ছিল একটি নবগঠিত বাহিনী। তাই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ধারণা করেছিলেন যে, ইসলামী বিপ্লবের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বাহিনীকে তেহরানে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন, অথবা কমপক্ষে

www.pathagar.com

খুররম শহরে ইরাকী হামলার ধ্বংসলীলাসমূহের একটি খণ্ড দৃশ্য

খুযিস্তান প্রদেশ দখল করে ইরানকে তার তেল বিক্রির আয় থেকে বঞ্চিত করতে ও অচল করে দিতে পারবেন।

এ ধরনের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৩৫৯ ফার্সী সালের ৩১শে শাহ্‌রীভার (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০) বিকালে কয়েক ডজন ইরাকী জঙ্গী বিমান ইরানে হামলা চালায়। ইরাকী বিমানগুলো তেহরানের মেহ্‌রাবাদ বিমান বন্দর ও ইরানের আরো কয়েকটি শহরের বিমান বন্দরে বোমাবর্ষণ করে। একই সাথে ইরাকী স্থলবাহিনী ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খুযিস্তান, ইলাম, কুর্দিস্তান ও বখ্‌তারানে হামলা চালায় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইরানী ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যা দীর্ঘ ৮ বছর অব্যাহত থাকে।

হযরত ইমাম ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতেন; তিনি ইরাকী হামলা শুরু হবার সাথে সাথে ইরানী জনগণের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের এবং আশা বিসর্জন না দেয়ার আহ্‌বান জানান। হামলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও সেপাহ্‌ পাস্‌দার বাহিনী, বিশেষ করে বিমান বাহিনী স্বীয় ইসলামী স্বদেশের প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে যায়। পরদিন ইরানের ১৪০টি জঙ্গী বিমান বাগদাদসহ ইরাকের অন্যান্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে বোমাবর্ষণ করে স্বদেশের প্রতিরক্ষা ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে স্বীয় দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়।

বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইরাকী স্থল বাহিনী ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকার কয়েকটি ছোট

www.pathagar.com

ছোট শহর দখল করে নেয় এবং খুযিস্তান প্রদেশের বিরাট জনসংখ্যা বিশিষ্ট দুটি বড় শহর আবাদান ও খুররম শহর অবরোধ করে।

ইরানের মুসলিম জনগণ, বিশেষতঃ দ্বীনদার যুবকগণ ইসলামী বিপ্লবকে হুমকির সম্মুখীন দেখে সর্বত্র থেকে রণাঙ্গনসমূহের দিকে ছুটে এল। শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্যে বিপ্লবী জনশক্তিকে সমবেত করার কাজ শুরু হল। ফলে সশস্ত্র বাহিনী এবং সেপাহ্ পাস্‌দারের পাশাপাশি "বাসিজ"[২৭] নামে এক বিরাট ত্যাগী গণবাহিনী গড়ে ওঠে ও রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এটা ছিল এমন একটি বাহিনী দুশমনরা যার সম্ভাব্য অস্তিত্ব সম্পর্কে কল্পনাও করেনি।

ইরাকী বাহিনী ইরানী বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তাদের হামলা তীব্রতর করে। ইরাকী বিমান রণাঙ্গন ও সেনানিবাসসমূহে ইরানী বাহিনীর ওপর হামলা চালানো ছাড়াও ইরানের কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, তেল শোধনাগার, সেতু, মহাসড়ক, এমনকি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকার ওপরে পর্যন্ত বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এছাড়া তারা ইরানের সীমান্তবর্তী শহর সমূহের হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

ইরাকী বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রায় এক মাস অব্যাহত থাকে। এ সময় পরাশক্তিবর্গের প্রভাবাধীন আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ নীরবতা অবলম্বন করে। শুধু তাই নয়, অনেক আরব দেশই ইরাক ও সাদ্দাম হোসেনকে রাজনৈতিক দিক থেকে সমর্থন জানায় এবং অর্থনেতিক ও সামরিক দিক থেকে সাহায্য করে ইরাকের শক্তি বৃদ্ধি করে। খুযিস্তান প্রদেশের দ্বীনদার যুবকরা বিস্ময়কর আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও অবান মাসে[২৮] খুররম শহরের পতন ঘটে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এ বন্দরনগরীর বিরাট অংশ ইরাকীদের দখলে চলে যায়। তবে ইরাকীরা অবাদান দখলে ব্যর্থ হয়।

কয়েক সপ্তাহ পর ইরাকী বাহিনীর অগ্রযাত্রা থেমে যায়। ইরানের মাটিতে তারা এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তারা ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও গণবাহিনীর প্রতিরোধ থেকে বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতিপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী, যারা স্বীয় রাহ্‌বারের ফরমানে "দেশ ও দ্বীনের ইজ্জত ও মর্যাদার" হেফাজতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব, এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা কোন সহজ ব্যাপার নয়।

যুদ্ধের এ পর্যায়ে অস্ত্রবিরতির জন্য ইরানে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের আসা-যাওয়া শুরু হয়। কিন্তু ইরান ইরাকী বাহিনীর আন্তর্জাতিক সীমান্তে পশ্চাদপসরণ ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ঃ এ সময়ে ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল মার্কিন পণবন্দী সমস্যা। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) পণবন্দী সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর ওপর অর্পণ করেন। যেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আমেরিকার সাথে সরাসরি আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না সেহেতু আলজেরিয়া সরকারকে দু'পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ৪৪৪ দিন পর পণবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়; বিনিময়ে আমেরিকা মার্কিন ব্যাংকে আটককৃত ইরানী অর্থ ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে।

১৩৫৯ ফার্সী সালের দ্বিতীয়ার্ধে[২৯] ইরানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ইরাকের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ। এ সময় জনগণ, মজলিস ও সরকার তথা সকালেই একই সাথে যতখানি সম্ভব সাফল্যের সঙ্গে রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবিলা এবং দেশের পরিচালনার চেষ্টায় নিয়েজিত ছিল। কিন্ত একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বানি ছাদ্‌রের অনুসৃত কর্মনীতি ও প্রক্রিয়া।

www.pathagar.com

বানিছাদর্ ইমাম এবং বিপ্লবী জনগণের প্রতি অনুগত ও উৎসর্গিত প্রাণ হবার ভান করে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে সক্ষম হলেও দিনের পর দিন ইমাম ও বিপ্লবী জনগণ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। অন্যদিকে তিনি পূর্বে নিজেকে যেসব ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও গেরিলা গোষ্ঠীর ঘোরতর দুশমন হিসেবে পরিচয় দিতেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। তিনি হযরত ইমামের একনিষ্ঠ বিপ্লবী সহচরদের ও দেশের আইনানুগ সংস্থাসমূহকে, যেমনঃ মজলিস, বিচার বিভাগ ও সেপাহ্ পাস্দার বাহিনীকে দুর্বল করার জন্যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই দ্বিধা করতেন না। অন্যদিকে জনগণের সাথে মোকাবিলা করার জন্য তিনি ঐসব ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেন এবং তাদের সহায়তায় এখানে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকেন।

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বেহেশ্তী

একটা মারাত্মক ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত একটি দেশের জন্য এহেন পরিস্থিতি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় ছিল না। এ পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) সকলের প্রতি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানাতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হল যে, হযরত ইমাম ১৩৬০ ফার্সী সালের খোর্দাদ মাসে[৩০] বানি ছাদরকে সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদ থেকে অপসারণ করেন। এর কয়েকদিন পর মজলিস অযোগ্যতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে। ফলে বানি ছাদ্র্ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারিত হন। সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি অস্থায়ী 'প্রেসিডেন্ট পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদ বানি ছাদরের স্থলাভিষিক্ত হয়।

বানি ছাদরের অপসারণের ঘটনার পর একদিকে ইরাকী বাহিনী

www.pathagar.com

ইরানী শহর সমূহের ওপর বোমাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহও বিপ্লবে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে হতাশ হয়ে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে 'মুজাহিদীনে খাল্‌ক্‌ নামধারী মুনাফিকীন বানি ছাদ্‌রের সাথে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল; তারা রাজপথে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে প্রকাশ্যেই জনতার ওপর সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে।

এ সময় রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ডঃ মোস্তফা চামরানের শাহাদাৎ বরণ সকলকে শোকের সাগরে নিমজ্জিত করে। দেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক এ সময়ই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহ, বিশেষতঃ মুনাফিকীন জনসাধারণকে ও বিপ্লবের প্রথম কাতারের ব্যক্তিত্ববর্গকে হত্যার জন্য অভিযান শুরু করে। প্রথমে তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হযরত আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ীকে হত্যার চেষ্টা চালায়। পরদিন অর্থাৎ ১৩৬০ ফার্সী সালের ৭ই তীর (১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন) আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ী যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন মুনাফিকরা তেহ্‌রানে হেয্‌বে জম্‌হুরিয়ে ইসলামীর সদর দফতরে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে বিচার বিভাগের প্রধান আয়াতুল্লাহ্‌ বেহেশ্‌তী এবং প্রধানমন্ত্রী রাজায়ীর মন্ত্রিসভার চারজন মন্ত্রী ও ২৭ জন মজলিস সদস্যসহ মোট ৭২ ব্যক্তি শাহাদাৎ বরণ করেন।

মুনাফিকরা ধারণা করেছিল যে, এ হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এর ফল যা হল তা তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। জনসাধারণ বিপ্লব বিরোধীদের নির্মম ও বন্য চেহারা আরো ভালভাবে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। তারা ব্যাপকভাবে ৭ই তীরের শহীদগণের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে বিপ্লবের দুশমনদের হতাশ করে দেয়।

শহীদ জাওয়াদ বহোনার

এর কয়েকদিন পরেই প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মাদ আলী রাজায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং বিপ্লবী আলেম ও মনীষী ডঃ মোহাম্মাদ জাওয়াদ বহোনার—যিনি পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন— প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন।

এদিকে বানি ছাদ্‌র্‌ ক্ষমতাচ্যুত হবার পর প্রথমে আত্মগোপন করে থাকেন; তারপর এক সময় নারীর বেশ ধারণ করে একদল মুনাফিকের সাথে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্যারিসে আশ্রয় নেন। মুনাফিকরা দিনের পর দিন নিজেদের অধিকতর ব্যর্থতা লক্ষ্য করে এবং ক্রমেই অধিকতর হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে। এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান রাহ্‌বর আয়াতুল্লাহ্‌ খামেনেয়ী

www.pathagar.com

৭ই তীরের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর মাত্র দু'মাসের মাথায় ৮ই শাহ্রীভার (৩০শে আগস্ট, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ)। তারা আরেকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে থাকাকালে রাজায়ী ও বহে-নারকে হত্যা করে। সাথে সাথে মজলিসের পক্ষ থেকে আয়াতুল্লাহ্ মাহ্দাভী কানীকে (অন্তর্বর্তীকালের জন্য) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় যাতে দেশশাসন ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনরূপ শূন্যতার সৃষ্টি না হয়।

সম্ভবতঃ এই কয়েক মাস ও কয়েক সপ্তাহ্ সময়কে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসের কঠিনতম সময় বলে অভিহিত করা চলে। এ সময় ইরানের জনগণ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ একদিকে রণাঙ্গনে ইরাকী হামলা ও তার আন্তর্জাতিক সহযোগীদের মোকাবিলা করছিলেন ও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ফলে অনেক লোক শাহাদাত বরণ করছিলেন, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে তাঁরা বিপ্লব বিরোধীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী সমস্ত রকমের বিপদ-মুছিবত ও কঠিন সমস্যার মোকাবিলায়ও পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকতেন; ফলে ইমামের নেতৃত্বে ইরানী জনগণ ও দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঈমান ও ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এসব ঘটনার ঝড়ঝঞ্ঝা সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

রাজায়ী ও বহোনারের শাহাদাতের এক মাস পরে ইরানী জনগণ তৃতীয় বারের ন্যায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট প্রদান করে এবং আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

চার ঃ আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ থেকে ইমামের ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়কাল

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ইতিহাসের এ সময়কালের সাথে পরিচিতি লাভের জন্য এ কয়েক বছরের ঘটনাবলীকে "আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী" এবং "যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী" এ দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। যদিও এই দুই ধরনের সমস্যাবলী সম্পূর্ণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল, তথাপি আলোচনার সুবিধার্থেই এভাবে বিভক্ত করা হল।

ক ঃ আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী

আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ার মীর হোসেন মুসাভীকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা মজলিসের আস্থাভোট

মীর হোসেন মুসাভী

www.pathagar.com

লাভ করে। অতঃপর দেশে পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় এক ধরনের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এই স্থিতিশীলতার কারণেই দেশের পরিচালকবৃন্দ দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ যুগের শুরুতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহ, বিশেষতঃ মুনাফিকীন আগের ন্যায়ই ষড়যন্ত্র, বোমাবিস্ফোরণ ঘটানো এবং সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তারা জনগণের শ্রদ্ধেয় বহু বিপ্লবী আলেম ও জুম্‌আ ইমামকে শহীদ করে; এঁদের মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ আয়াতুল্লাহ্ দাস্ত্‌গায়েব[৩১] আয়াতুল্লাহ্ ছাদুকী ও আয়াতুল্লাহ্ আশরাফীর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাঁরা তাঁদের গোটা জীবনকে পূতঃপবিত্র রেখে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন।

এ যুগে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও আক্রোশও চরমে উপনীত হয়। তাই জনগণের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ তাদের বহু গোপন আড্ডা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের জন্য ইরানের বুকে আর কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি অবশিষ্ট থাকল না। কোন কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কুর্দিস্তানে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল স্বয়ং কুর্দী জনগণের সতর্কতার কারণে এবং সেপাহ্ পাস্‌দার বাহিনী ও গণবাহিনী (বাসিজ)-এর আত্মত্যাগের বদৌলতে ধীরে ধীরে তা দূরীভূত হয়ে যায়।

১৩৫৯ ফার্সী সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল; ১৩৬২ ফার্সী সালের অযার মাসে[৩২] সেগুলো পুনরায় খোলা হয়। ইতিমধ্যে নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩৬২ ফার্সী সালে এ পরিষদের উদ্বোধন করা হয়। একই বছর উদ্‌ঘাটিত হয় যে, হেয্‌বে তুদেহ্ এক ক্যু-দেতা ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেছে। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং দলটির নেতৃবৃন্দ ও সক্রিয় কর্মীগণকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। ফলে ইরানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির কাজে সদালিপ্ত এ দলটির কলঙ্কিত অস্তিত্বের চিরপরিসমাপ্তি ঘটে।

১৩৫৭ ফার্সী সালে ও তৎপরবর্তীকালে ইরানকে অপর একটি বড় ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, তা হচ্ছে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান এবং যুবক শ্রেণীর মধ্যে হেরোইন ও আফিমের ব্যাপক ছড়াছড়ি। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ও প্রশাসন, ইরাকের সাথে দেশ এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এ সমস্যার মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, এ সমস্যাটি ছিল আসলে দুশমনদের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত যারা ইরানের যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাচ্ছিল। তাই সরকার তার বাহিনী ও শক্তির একটি অংশকে মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধের জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে ও সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করেন।

১৩৬৩ ফার্সী সালে মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৩৬৪ ফার্সী সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি মীর হোসেন মুসাভীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন এবং মজলিস তা অনুমোদন করে।

এ যুগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে ছিল একটি উচ্চপদস্থ মার্কিন প্রতিনিধিদলের বিনা অনুমতিতে ইরানে প্রবেশ। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ম্যাক্ ফারলিনের নেতৃত্বাধীনে এ প্রতিনিধি দলটির ইরানে আগমনের উদ্দেশ্যে ছিল ইরানের সাথে আমেরিকার আপোষরফা ও

www.pathagar.com

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ মার্কিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ইরানের পক্ষ থেকে এ ঘটনা ফাঁস করে দেয়া হলে একে কেন্দ্র করে আমেরিকার ভিতরে-বাইরে বহু রাজনৈতিক আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সামগ্রিকভাবে যা ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের গুরুত্বই তুলে ধরে।

এ সময়ের মধ্যে মক্কা শরীফে ইরানী হজ্জযাত্রীদের হত্যাকাণ্ডও ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক ঘটনা।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার পর থেকেই প্রতি বছর ইরানী হজযাত্রীরা হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) পথনির্দেশ অনুযায়ী মক্কায় আমেরিকা ও ইসরাইলের ন্যায় ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছিলেন। এভাবে তাঁরা হজের মহান বিশ্বসম্মেলনকে এক নতুন তাৎপর্য প্রদান করেন। কিন্তু ১৩৬৬ ফার্সী সালের হজের সময়[৩৩] সৌদী সরকার বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণকারী হাজীদের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকশ' নিরীহ ও নিরস্ত্র ইরানী হাজীকে হত্যা করে, কয়েক হাজার হাজীকে আহত করে। এঁদের মধ্যে কতক অ-ইরানী হাজীও ছিলেন যাঁরা হযরত ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়ার লক্ষ্যে এ বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইরানী জনগণসহ সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এবং এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইরান ও সৌদী আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া পরবর্তী কয়েক বছর ইরান হজযাত্রী প্রেরণ বন্ধ রাখে।

১৩৬৬ ফার্সী সালের শীতকালে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নির্দেশে "কাম্যতা নির্ধারণ পরিষদ"[৩৪] নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি মজলিসে শূরায়ে ইসলামী ও সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মধ্যে এমনভাবে মতপার্থক্য ঘটে যে, মজলিসে পাশকৃত কোন বিলকে অভিভাবক পরিষদ ইসলাম বা সংবিধানসম্মত গণ্য না করে, অথচ মজলিস তা সংশোধন বা বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানায়, বরং বিলটিকে দেশের স্বার্থে অপরিহার্য গণ্য করে, সেক্ষেত্রে এই পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং দেশ চালানোর ক্ষেত্রে শূন্যতা বা সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দূরীভূত করবে।

১৩৬৭ ফার্সী সালে তৃতীয় মেয়াদের জন্য মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই একই বছর হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) একটি ঐতিহাসিক পত্র লেখেন এবং একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া জারী করেন। আর এ দু'টিই ইরানের ও সারা বিশ্বের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে একটি পত্র লেখেন। এ পত্রে তিনি কম্যুনিজমের আশু মৃত্যুর কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন এবং গর্বাচেভকে স্মরণ করিয়ে দেন, "অতঃপর কম্যুনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরসমূহে সন্ধান করতে হবে।" পরে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশে একের পর কম্যুনিজমের ভিত্তি ধসে পড়ে। ফলে এ ব্যাপারে হযরত ইমামের সাহসিকতা ও ভবিষ্যদ্বাণীকরণ ক্ষমতা সর্বত্র প্রশংসা লাভ করে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ছিল "স্যাটানিক ভার্সেস" বইয়ের লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে মুর্তাদ হওয়ার ও তাকে হত্যার অপরিহার্যতার ফতোয়া জারী। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক

www.pathagar.com

সালমান রুশদী বাহ্যতঃ মুসলমান ছিল। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে উপন্যাস আকারে লিখিত তার এ বইয়ে ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গের, বিশেষতঃ রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অবমাননা করা হয়। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) শরয়ী দায়িত্ব হিসেবে এবং কোনরূপ রাজনৈতিক বিবেচনাকে সামনে না রেখে সর্বশক্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তাকে হত্যা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। তাঁর এ সাহসী ফতোয়ার ফলে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। যারা এক শতাব্দীকালেরও বেশীকাল মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আসছিল এবং ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গকে অবমাননা করছিল, অথচ তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়নি তারা হযরত ইমামের এ বীরত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপে মারাত্মকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হযরত ইমামের এ ফতোয়া সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পশ্চিমা দেশসমূহ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সমর্থনের নামে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কোন কোন দেশ ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যায়গত দিক থেকে নীচে নামিয়ে আনে। এছাড়া তারা হযরত ইমাম ও ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে। অন্যদিকে ইরানের ও বিশ্বের বীর মুসলিম জনগণ হযরত ইমামের ফতোয়ার প্রতি সমর্থন জানায়। সব দেশেই, বিশেষ করে বৃটেনে— যেখান থেকে "স্যাটানিক ভার্সেস" বইটি প্রকাশিত হয় এবং যেখানে সালমান রুশদী বসবাস করত ও এ ফতোয়ার পর আত্মগোপন করে ছিল— সেখানে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রদশন করে এ বইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামী বৃটেনকে এক চরমপত্র প্রদান করে এবং তার ভিত্তিতে ইরান ও বৃটেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসলামের দুশমনরা ও ইসলামী উম্মাহ্ উভয়ের নিকটই সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

যেহেতু ইসলামী বিপ্লবের বিজয়পরবর্তী এক দশককালের অভিজ্ঞতায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে কিছু পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন বলে অনুভূত হচ্ছিল সেহেতু হযরত ইমামের সম্মতি ও পথনির্দেশক্রমে 'সংবিধান পর্যালোচনা পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদের ওপর সংবিধান সংশোধনীর খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যা পরে গণভোটের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে।

হযরত ইমাম খোমেনীর ইন্তেকাল

সংবিধান পর্যালোচনা পরিষদের কাজ শেষ হবার পূর্বেই এক স্বল্পকালীন রোগভোগের পর ১৩৬৮ ফার্সী সালের ১৩ই খোরদাদ (১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন) হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ৮৭ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে সেই পরম প্রিয় আল্লাহ্ তাআলার পানে চিরযাত্রা করেন যাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর সারাটি জীবন সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন।

হযরত ইমামের কনিষ্ঠ পুত্র হাজী আগা সাইয়েদ আহ্মাদ খোমেনী— যিনি সদাসর্বদা ছায়ার মত হযরত ইমামের পাশে অবস্থান করতেন—হযরতের ইন্তেকালের খবর ইরানী জনগণ ও বিশ্বের মুসলমানদের সামনে ঘোষণা করেন। এ খবর সকলকে সীমাহীন শোকের সাগরে নিমজ্জিত করে। দীর্ঘ বহু শতাব্দী পর যে মর্দে মুজাহিদ বিশ্বের বুকে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তিকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন তাঁর ইন্তেকালকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিত্বগণ এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন।

www.pathagar.com

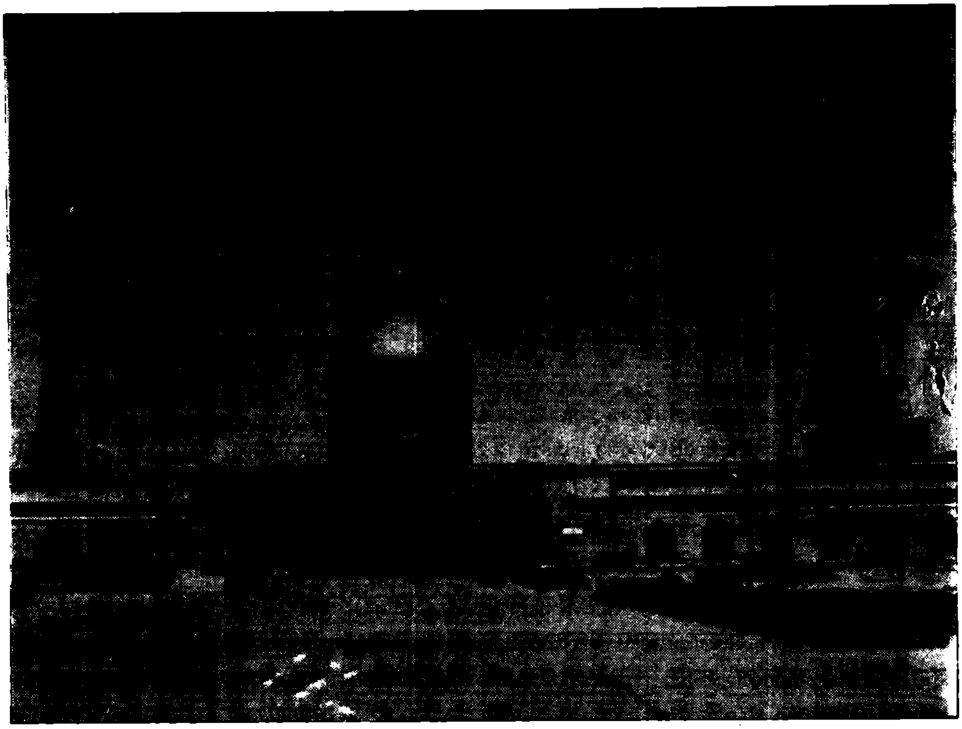

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) মাযার

হযরত ইমামের ইন্তেকালের পর পরই নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ অধিবেশনে বসে এবং এক দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাক্ওয়া, ইজতিহাদ, সচেতনতা, চিন্তাধারার গভীরতা, ইমামের কর্মনীতি ও কর্মধারা অনুসরণ, বিপ্লবের রাস্তায় সংগ্রামী তৎপরতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার বিচারে যোগ্যতম বিবেচিত হওয়ায় হযরত আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীকে দেশের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। দ্রুত গতিতে ও স্বল্পতম সময়ে নতুন নেতা নির্বাচন এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) জন্য শোকানুষ্ঠান ও তাঁর লাশ নিয়ে মিছিলে কয়েক মিলিয়ন মানুষের অংশগ্রহণ ইসলামী বিপ্লবের বন্ধু ও দুশমন উভয়কে বুঝিয়ে দিল যে, ইসলামী বিপ্লব অত্যন্ত মজবুত চৈন্তিক ও সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

খ ঃ চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ

ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে, ইরাক ১৯৮০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ইরানের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু আক্রমণের তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরাকী বাহিনী অগ্রযাত্রার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এরপর অধিকৃত ভূখণ্ডে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম এক বছরে ইরানী বাহিনী শুধু যে নিজেদের অবস্থানসমূহের হেফাযত করে তা-ই নয়, বরং সীমিত পর্যায়ে হলেও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় প্রবেশ করে বহু গেরিলা হামলা চালাতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

ইরানী বাহিনী ইরানী ভূখণ্ড দখলকারী ইরাকী বাহিনীকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে প্রথম বড় আকারের ও ক্লাসিক ধরনের হামলা চালায় ফার্সী ১৩৬০ সালের মেহের মাসের শুরুর দিকে।[৩৫] ফলে আবাদান শহর ইরাকী বাহিনীর দখলমুক্ত হয়। এরপর সশস্ত্র বাহিনী, সেপাহ্ পাস্দার বাহিনী ও বাসিজ (গণবাহিনী) পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে এবং আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়ে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকায় শত্রুর ওপর ব্যাপক হামলা পরিচালনা করে। ইরানের বীর জওয়ানরা স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করে হাজার হাজার শত্রু সৈন্যকে হত্যা করতে এবং আরো হাজার হাজার জনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। তারা শত্রু বাহিনীকে ধাপে ধাপে পিছু হটিয়ে দেয়। ১৩৬১ ফার্সী সালের ফার্ভার্দীন মাসে[৩৬] ইরানী বাহিনী শুধু একটি অভিযান চালিয়ে খুযিস্তান প্রদেশের দেড় হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা শত্রুর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করতে এবং ১৮ হাজার শত্রু সৈন্যকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। এ অভিযানের নাম ছিল 'ফাত্হুম্ মুবীন'।[৩৭]

এরপর ইরানের ইসলামী বাহিনীর এক গৌরবময় মুহূর্ত এসে হাজির হয় ১৩৬১ ফার্সী সালের ৩রা খোর্দাদ (১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে)। এদিন ইরানের ইসলামী বীরযোদ্ধারা ইরাকী বাহিনীর দখল থেকে খুররম শহর পুনরুদ্ধার করে। ইরাকী বাহিনী ইসলামী ইরানের এ স্বনামখ্যাত বন্দরনগরীতে অবাধ লুটতরাজ চালিয়েছিল এবং বন্দরটিকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল।

যেহেতু এরপর আর ইরাকী বাহিনীর পক্ষে রণাঙ্গনে ইরানী হামলার মুখে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না সেহেতু তারা ইরানের শহরসমূহে এবং শিল্প-কারখানা ও তেল স্থাপনাসমূহের ওপর বিমান হামলা বৃদ্ধি করে। এমনকি ইরাকী বাহিনী পারস্য উপসাগরে ইরানের তেলকূপে পর্যন্ত অগ্নিসংযোগ করে। অবশ্য ইরানী বাহিনীও আকাশে, সমুদ্রে ও স্থলভাগে শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে থাকে। ইরানী বাহিনী অধিকাংশ রণাঙ্গনের যুদ্ধেই ইরাকী বাহিনীকে প্রায় সীমান্ত পর্যন্ত হটিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে ইরাককে যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ ইরানের ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী মেনে নিতে বাধ্য করার লক্ষ্যে ইরানী বাহিনী ইরাকী ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে স্বীয় অভিযান অব্যাহত রাখে এবং ইরাকের কয়েকটি প্রদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ইসলামের সৈনিকরা বিরাট ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এ সাফল্যের অধিকারী হলে ইরাক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেকে মজলুম হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে এবং শান্তিকামিতার শ্লোগান তোলে, অন্যদিকে পারস্য উপসাগরে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলা চালাতে থাকে, রণাঙ্গনে রাসায়নিক বোমা বর্ষণ করে এবং ইরানের বিভিন্ন শহরের ওপর বোমা বর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। পুরো যুদ্ধকালে ইরানের অন্যতম যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর দেয্ফুল একশ' ষাট বারের অধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দীর্ঘদিন যাবত ইরাকের শহরসমূহে ও আবাসিক এলাকাসমূহে হামলা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরান অনন্যোপায় হয়ে "অনুরূপ মোকাবিলা"র নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে হামলার পূর্বে ইরানের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ইরাকী শহরসমূহের বেসামরিক নাগরিকদের সতর্ক করে দেয়া হয় এবং শহর ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বলা হয়। এ পন্থায় ইরান ইরাকের ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন শহরগুলো বাদে বাগদাদসহ অনেক শহরেই বোমা বর্ষণ[৩৮] ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। তেমনি ইরানী বাহিনী দক্ষিণ ইরাকের তেল বন্দর ফাও সহ ফাও উপদ্বীপ[৩৮] দখল করে নিতে সক্ষম হয় এবং বস্রাকে হুমকির সম্মুখীন করে।

ইরানের জনগণ হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) আদেশে হানাদার দুশমনকে দমনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ও যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং একে নিজেদের জন্যে ফরয

www.pathagar.com

গণ্য করে। এর ফলে ইরাক, তার আরব সাহায্যকারীরা এবং আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশসমূহ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা ইরাককে সীমাহীন আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল; কিন্তু তা থেকে তারা মোটেই লাভবান হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা সরাসরি যুদ্ধে প্রবেশ করে। আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ পারস্য উপসাগরে শতাধিক যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ও কার্যতঃ ইরাকের পক্ষাবলম্বন করে। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদ ইরান-ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে তার ৫৯৮নং প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবে উভয় পক্ষকে নিজ নিজ সীমান্তে পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং ইরাক তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। জবাবে ইরানী বাহিনী ইরাকী ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে হালাব্‌জাহ[৩৯] শহরসহ উত্তর ইরাকের বিরাট এলাকা নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু কুর্দী অধ্যুষিত হালাবজাহ্‌র জনগণ ইরানী বাহিনীকে স্বাগতম জানায়; এ কারণে ইরাকী বাহিনী হালাবজাহ্‌বাসীদের ওপর রাসায়নিক বোমা বর্ষণ করে। ফলে সেখানে এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়; নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ পাঁচ হাজার নিরীহ মানুষ শাহাদাত বরণ করে।

পারস্য উপসাগরে পশ্চিমা বাহিনীসমূহের, বিশেষ করে মার্কিন রণতরীর উপস্থিতির ফলে সেখানে এক গুরুতর সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যা অবশ্য ইরাকের অনুকূলে ছিল। ফলে পারস্য উপসাগরের বুকে সংঘর্ষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৩৬৭ ফার্সী সালের ওর্দিবেহেশ্‌ত্‌ মাসে[৪০] ইরাকী বাহিনী মার্কিন নৌ-বাহিনীর সহায়তায় ফাও বন্দর ও উপদ্বীপ পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়। এর অল্পদিন পরেই পারস্য উপসাগরে একটি মার্কিন রণতরী থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি যাত্রীবাহী বিমানকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়; এর ফলে ২৯৭ জন নিরীহ যাত্রী ও ক্রু শাহাদাত বরণ করেন। এতে অবশ্য আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরানী জনগণ ও বিশ্বের সকল স্বাধীনচেতা মানুষের ঘৃণা ও আক্রোশ ঝড়ে পড়ে। বিশ্বের দাম্ভিক পরাশক্তিবর্গ এবং প্রতিক্রিয়াশীল আরব সরকারগুলো ইরাকের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, আর তাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে ইরানকে একাই লড়ে যেতে হয়। এহেন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ইরান নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮নং প্রস্তাব মেনে নেয় এবং যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবার কথা ঘোষণা করে।

এ সময় মুনাফিকীন (মুজাহিদীনে খাল্‌ক্‌ হবার দাবীদাররা) ধারণা করে যে, ইরান তার সশস্ত্র বাহিনীর দুর্বলতার কারণে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। তাই ইরানের দুশমনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইরাকী বাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে ইরান-ইরাক সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম দিক থেকে ইরানে প্রবেশ করে। তারা ইসলাম আবাদ শহর অতিক্রম করার পর ইরানী বাহিনীর মুখোমুখি হয়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার অধিকারী ইরানী বাহিনী মুনাফিকীনের বিরুদ্ধে "মের্‌ছাদ"[৪১] নামক অভিযান পরিচালনা করে। এতে মুনাফিকদের অনেকেই নিহত হয় এবং আরো অনেকে বন্দী হয়।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর যুদ্ধ চলার পর ১৩৬৭ ফার্সী সালের ২৯শে মোর্‌দাদ (১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট) আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য পুরো ইরান-ইরাক সীমান্ত জুড়ে জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ অবস্থান গ্রহণ করেন। অবশ্য তখনো ইরানী ভূখণ্ডের অংশবিশেষ ইরাকের দখলে থেকে যায়।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবার পর নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮নং প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় জেনেভা ও নিউইয়র্কে ইরান ও ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু অনেক দিন যাবত আলোচনা অব্যাহত থাকলেও এতে কোনই ফল হয়নি।

অপরপৃষ্ঠার ছবি ঃ হযরত ইমাম খোমেনীর ইন্তেকালে তেহরানের মোছাল্লায়ে বোযর্গ সমবেত কয়েক মিলিয়ন শোকার্ত মানুষের একাংশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নেতৃত্বের যুগ

হযরত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ইন্তেকালের পর হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নেতৃত্বের যুগ শুরু হয় যা বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ৩রা জুন ইন্তেকাল করেন।[৪২] এর কিছুদিন পরে, তাঁরই সম্মতিক্রমে ইতিপূর্বে প্রণীত সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব গণভোটে দেয়া হয় এবং ইরানী জনগণ এ প্রস্তাবের পক্ষে হাঁ-সূচক ভোট প্রদান করে। এ সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং প্রেসিডেন্টকে সরকার প্রধান করা হয়। এছাড়া এতে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধান সংশোধনীর গণভোটের পাশাপাশি একই সাথে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষিত বিপ্লবী আলেম, হযরত ইমামের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং শুরু থেকে মজলিসের স্পীকার হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল্-মুসলিমীন আলী আকবর হাশেমী রাফ্সান্জানী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে হুজ্জাতুল ইসলাম মাহ্দী কার্রুবী মজলিসের স্পীকার নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট রাফসান্জানী মজলিসে তাঁর মন্ত্রিসভার তালিকা পেশ করেন এবং মজলিস তা অনুমোদন করে। এতে ডঃ হাবীবীকে এক নম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়। চার বছর পর ১৯৯৩ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাফসানজানী দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ইসলামী বিপ্লবের নতুন নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর পরই বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ "আমাদের পথ ইমাম খোমেনীর (রহঃ) পথ।" এ ঘোষণা অনুযায়ী তিনি হযরত ইমামের নীতি-আদর্শের আলোকেই ইরানকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নেতৃত্বের যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ইরান-ইরাক বিরোধের অবসান। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ১৩৬৭ ফার্সী সালের ২৯শে মোরদাদ (১৯৮৮ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট) ইরান ও ইরাকের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় যদিও ইরানী ভূখণ্ডের অংশবিশেষ তখনো ইরাকী দখলে ছিল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় দু'বছর পর ১৩৬৯ ফার্সী সালের ওর্দীবেহেশ্ত্ মাসে[৪৩] ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসান্জানীর নিকট একটি পত্র পাঠান। এতে দু'দেশের প্রেসিডেন্টের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। ইরানের প্রেসিডেন্ট এ চিঠির জবাব দিলে ইরাকের প্রেসিডেন্ট পুনরায় চিঠি লেখেন এবং এভাবে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে পত্রবিনিময় অব্যাহত থাকে। দু'জনের মধ্যে মোট ছয়বার পত্রবিনিময় হয়। শেষ পর্যন্ত ইরাকের প্রেসিডেন্ট তাঁর ষষ্ঠ পত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন যে, ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮নং প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে ইরান ও ইরাকের মধ্যে সম্পদিত চুক্তিতে বর্ণিত দু'দেশের সীমান্তে নিজ বাহিনীকে সরিয়ে নেবে। তিনি লিখেন ঃ "এভাবে, আপনারা যা যা চাচ্ছিলেন এবং যার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করছিলেন তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করছে।"

এখানে উল্লেখ্য যে, ইরাক ১৯৯০ খৃস্টাব্দের ২রা আগস্ট মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে কুয়েত দখল করে নেয়। এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ও আরব দেশগুলো কড়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার লক্ষ্যেই ইরাকী প্রেসিডেন্ট ইরানের সাথে দ্রুত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। কুয়েত দখলের অব্যবহিত পরেই সাদ্দাম হোসেন রাফসানজানীকে তাঁর ষষ্ঠ পত্রখানি লেখেন।

www.pathagar.com

ইরাক থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পত্র প্রেরণের পর তিন দিনের মাথায়, ইরাকে বন্দী ইরানী সৈন্যদের প্রথম দলটি স্বদেশে ফিরে আসেন। জবাবে ইরানের পক্ষ থেকে ইরাকী বন্দীদের মুক্তি দানও শুরু হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উভয় দেশ প্রায় সকল বন্দীকেই মুক্তি দান করে। ইসলাম ও স্বদেশের হেফাযত ও প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে লড়তে গিয়ে যারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলেন ইরানী জনগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ সহকারে তাঁদেরকে ইরানের মাটিতে স্বাগত জানায়।

ইরাক কুয়েত দখল করে নেয়ায় পশ্চিমা ও আরব দেশসমূহ নিজেদের স্বার্থকে বিপন্ন গণ্য করে। এমতাবস্থায় তারা ইরাকের বিরুদ্ধে কড়া নীতি-অবস্থান গ্রহণ করে, সেই সাথে প্রথম বারের মত স্বীকার করে যে, ইরাকই ইরান-ইরাক যুদ্ধের সূচনা করেছিল। তারা আরো স্বীকার করে যে, তারাই ইরাকী বাহিনীকে শক্তিশালী করে ও অস্ত্রসজ্জিত করে ইরানের ওপর হামলা চালাবার জন্য উৎসাহিত করেছিল।

তেমনি কুয়েত থেকে ইরাককে তাড়াবার জন্য আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেনসহ তিন ডজন দেশের প্রায় দশ লাখ সৈন্যকে পারস্য উপসাগর ও তার পশ্চিম তীরে মোতায়েন করা হয় এবং নৌ, বিমান ও স্থল যুদ্ধের জন্য বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পারস্য উপসাগরে এনে জমা করা হয়। এ থেকে বিশ্ববাসী বুঝতে পারে যে, ইরানী বাহিনী কেমন শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর লড়াই

www.pathagar.com

জনগণ ইরাক থেকে প্রত্যাগত মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে

করেছিল। বিশ্ববাসী এ থেকে ইরানের ইসলামী যোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা, ঈমানী শক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম হয়।

ইরাককে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করার জন্যে যে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করা হয় তাতে যোগদানের জন্য ইরানকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করা হয়। এ প্ররোচনা আসে আমেরিকা ও তার তাবেদারদের পক্ষ থেকে। কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান অতীত আগ্রাসনের জবাবে ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের নিন্দার পাশাপাশি কুয়েত উদ্ধারের নামে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাইরের শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপেরও নিন্দা করে। ইরান আলোচনার মাধ্যমে ইরাক-কুয়েত বিরোধ নিষ্পত্তির যে চেষ্টা চালায় তা সফল না হলেও ইরানের এ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

যুদ্ধোত্তর ইরান একটি নতুন সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তা হচ্ছে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও পুনর্গঠনের সংগ্রাম। দীর্ঘ আট বছরব্যাপী যুদ্ধে হাজার হাজার লোক শহীদ হয়েছে, আরো হাজার হাজার লোক আহত ও পঙ্গু হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বহু শহর-গ্রাম-জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, শিল্প-কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এখন সে ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বগ্রাসী আমেরিকার দুশমনী ও বয়কটকে চ্যালেঞ্জ করে হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর সুযোগ্য

www.pathagar.com

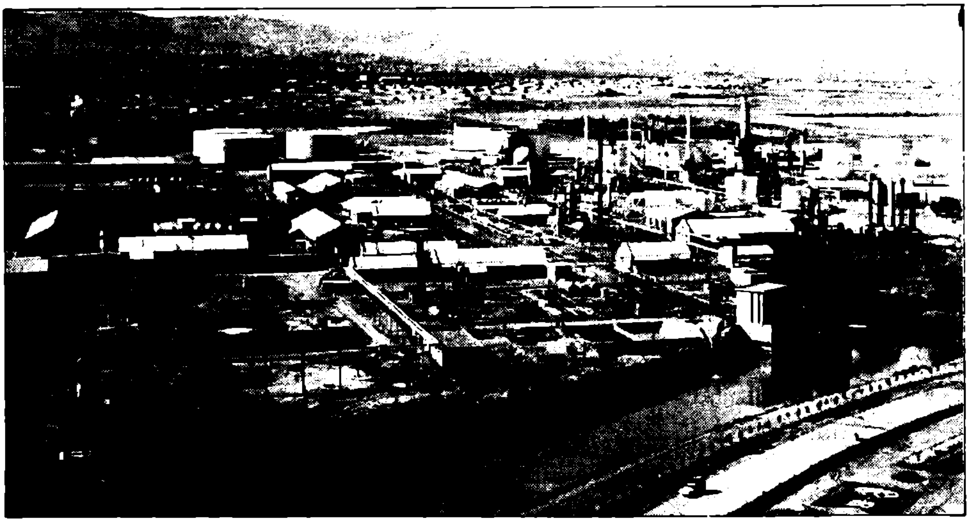

আবাদানের তেল শোধনাগার ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সমৃদ্ধির অন্যতম প্রতীক

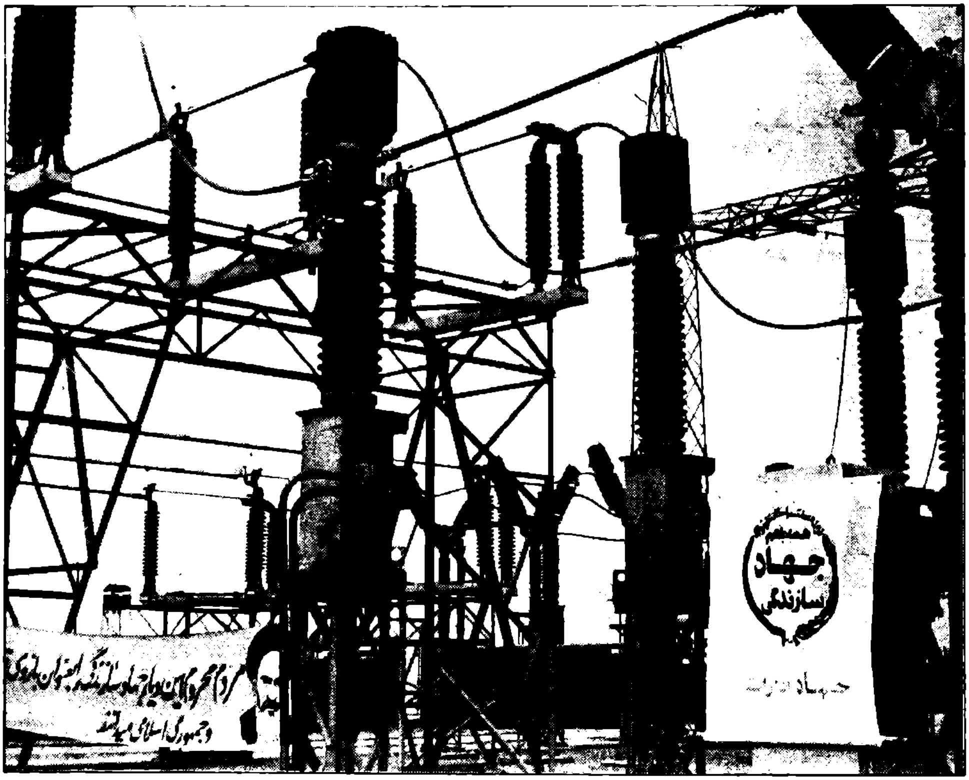

জিহাদে সযান্দেগী সংস্থার অসংখ্য অবদানের অন্যতম

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ইসলামী ইরান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজের পায় দাঁড়িয়ে চলার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে এবং বিশ্বের মুস্তায্‌আফ জাতিসমূহ, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র আশা-আকাঙ্ক্ষার পতাকা বহন করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে।

টীকা ঃ

(১) ১৩৭২ ফার্সী সালে (১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত মূল গ্রন্থে শুধু প্রথম চারটি ভাগ দেখানো হয়েছে এবং পঞ্চম ভাগ হিসেবে এখানে উল্লেখিত অংশটির কিছু ঘটনা তার শেষাংশে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সময়ের ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করে অনুবাদকের পক্ষ থেকে পঞ্চম ভাগ বিন্যস্ত হয়েছে। —অনুবাদক

(২) حزب جمهوری اسلامی —ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দল— Islamic Republic Party (IRP)

(৩) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی —ইসলামী বিপ্লবের রক্ষীবাহিনী— Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). সংক্ষেপে "সেপাহ্‌" নামে পরিচিত।

(৪) جهاد سازندگی —নির্মাণের জিহাদ — Jihad of Consircion. সংক্ষেপে "জেহাদ" নামে পরিচিত।

(৫) مرداد (মোর্‌দাদ)—২৩শে জুলাই থেকে ২২শে আগস্ট (১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

(৬) لانهٔ جاسوسی

(৭) دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

(৮) گروهك

(৯) صحراء - ترکمن صحراء মানে মরুভূমি।

(১০) فرقان

(১১) سر لشکر قرنی

(১২) ایت الله قاضی طباطبائی

(১৩) حج مهدی عراقی

(১৪) آذر —২২শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৭৯)

(১৫) دکتر مفتح

(১৬) حزب مسلمان

(১৭) بهمن —২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮০)।

(১৮) اسفند —২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ (১৯৮০)।

(১৯) خرداد —২২শে মে থেকে ২১ জুন (১৯৮০)।

(২০) ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন বসন্তকাল। (১৯৮০) প্রথম দিকে বলতে সম্ভবতঃ মার্চের শেষ দিকে বা এপ্রিলের শুরুর দিকে বোঝানো হয়েছে। —অনুবাদক

(২১) ستاد انقلاب فرهنگی

(২২) اردیبهشت —২১শে এপ্রিল থেকে ২১শে মে (১৯৮০)।

(২৩) تیر —২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই (১৯৮০)।

(২৪) جماران- —উত্তর তেহ্‌রানের একটি পার্বত্য পল্লী।

www.pathagar.com

(২৫) مرداد —২৩শে জুলাই থেকে ২২শে আগস্ট (১৯৮৩)।

(২৬) محمد على رجائى

(২৭) بسيج —ইংরেজীতে এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 'Mobilization'.

(২৮) آبان —২৩শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর (১৯৮০)।

(২৯) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০—২০শে মার্চ, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ।

(৩০) খোর্‌দাদ্—২২শে মে থেকে ২১শে জুন (১৯৮১)।

(৩১) ايت الله دستغيب

(৩২) آذر—২২শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৮৩)।

(৩৩) জিলহজ্, ১৪০৭ হিজরী—আগস্ট, ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ।

(৩৪) مجمع تشخيص مصلحت —Expediency Council.

(৩৫) ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হবার এক বছর পর।

(৩৬) ফার্‌ভার্‌দীন—২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ)।

(৩৭) فتح المبين

(৩৮) شبهٔ جزيرهٔ فاو

(৩৯) حلبچه —আরবী উচ্চারণ 'হালাব্‌জাহ্' (حلبجه)

(৪০) ওর্দীবেহেশ্‌ত্ ঃ ২১শে এপ্রিল—২১শে মে (১৯৮৮)

(৪১) مرصاد

(৪২) হযরত ইমাম ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন রাত ১০টা ২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু রাতের বেলা শোকসন্তপ্ত জনতার ঢল রাস্তায় নেমে এলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না চিন্তা করে সাথে সাথে এ সংবাদ প্রচার না করে পরদিন ৪ঠা জুন সকালে প্রচার করা হয় এবং পরবর্তীতে ৪ঠা জুনকেই ইমামের ওফাত বার্ষিকী পালনের জন্য নির্ধারণ করা হয়।—অনুবাদক

(৪৩) ওর্দী বেহেশ্‌ত্ ঃ ২১ এপ্রিল—২১শে মে (১৯৯০)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

تاریخ ایران در دوران معاصر

تألیف :

گروه تاریخ دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مترجم :

نور حسین مجیدی

نظارت :

علی اورسجی
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ناشر :

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
داکا-بنگلادش

www.pathagar.com

www.pathagar.com

شناسنامهٔ کتاب

اسم کتاب : تاریخ ایران در دوران معاصر

تألیف : گروه تاریخ دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی
وزارت آموزش و پرورش

زبان مبدء : فارسی

زبان ترجمه : بنگالی

مترجم : نور حسین مجیدی

نظارت : علی اورسجی
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ناشر : رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
داکا-بنگلادش

زمان انتشار : دی، ۱۳۷۵ هـ - ش - مطابق، دسامبر ۱۹۹۶ م

قیمت : ۱۵۰ تاکا

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইরানের সমকালীন ইতিহাস